Contents

১

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

Contents

تاريخ الأنبياء والرسل ﷺ (الجزء الأول)

تأليف: د. محمد أسد الله الغالب

الناشر: حديث فاؤنديشن بنغلاديش

(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة و النشر)

প্রকাশক

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

কাজলা, রাজশাহী-৬২০৪

হা.ফা.বা. প্রকাশনা- ৩১

ফোন ও ফ্যাক্স ঃ ০৭২১-৮৬১৩৬৫

১ম প্রকাশ

মার্চ ২০১০ ইং

২য় সংস্করণ

অক্টোবর ২০১০ ইং

কম্পোজ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

নির্ধারিত মূল্য

১২০ (একশত বিশ) টাকা মাত্র।

NOBIDER KAHINI-1 by **Dr. Muhammad Asadullah Al-Ghalib**. Professor, Department of Arabic, University of Rajshahi, Bangladesh. Published by: **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH**. Kajla, Rajshahi, Bangladesh. Ph & Fax : 88-0721-861365. Fixed Price: US Doller: $4 (four) only.

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের নিবেদন

আশরাফুল মাখলূক্বাত মানবজাতির কল্যাণে প্রেরিত বিধান সমূহ প্রচার ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে আদম (আঃ) থেকে মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত যুগে যুগে যে অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন, তাঁদের মধ্য থেকে মাত্র পঁচিশজন নবীর নাম আল্লাহ পবিত্র কুরআনে গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছেন এবং সত্যের পথে তাঁদের দৃঢ়চিত্ত সংগ্রামের হৃদয়গ্রাহী কাহিনী বর্ণনা করে মানবতার সামনে সত্য, ন্যায় ও সুন্দরের অনুপম মানদণ্ড উপস্থাপন করেছেন। এসব কাহিনী কেবল চিত্তবিনোদনের খোরাক নয়, বরং এক অবিরাম বিচ্ছুরিত আলোকধারা, যার প্রতিটি কণায় বিকশিত হয় মানবতার সর্বোচ্চ নমুনা। নবী ও রাসূলগণের জীবনালেখ্য জানা ও তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হ'লেও সত্য যে, বাংলাভাষায় এ সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস খুবই দুর্লভ। তাই বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে মাননীয় লেখক **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বগুড়া যেলা কারাগারে অবস্থানকালে পবিত্র কুরআনের তাফসীর ও মিশকাতুল মাছাবীহের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা রচনার ফাঁকে ফাঁকে এই মূল্যবান পাণ্ডুলিপিটি সমাপ্ত করেন। মুহতারাম লেখক এই ইতিহাস রচনায় কেবল বিশুদ্ধ সূত্রগুলির উপর নির্ভর করেছেন এবং যাবতীয় ইসরাঈলী বর্ণনা ও সমাজে প্রচলিত নানা উপকথা ও ভিত্তিহীন কেচ্ছা-কাহিনী থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত থাকার চেষ্টা করেছেন। তাঁর সবচেয়ে মূল্যবান সংযোজন হ'ল আম্বিয়ায়ে কেরামের জীবনী থেকে বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপটে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ পাঠকের সামনে তুলে ধরা। মার্চ'১০-য়ে ১৩ জন নবীর জীবনী নিয়ে ১ম খণ্ডের 'প্রথম সংস্করণ' বের হবার পর কয়েক মাসের মধ্যে সব কপি শেষ হয়ে যায়। এবারের ২য় সংস্করণে কিছু সংযুক্তি ও বিযুক্তি ছাড়াও বইয়ের শেষে 'প্রশ্নমালা' সংযোজন করা হয়েছে, যা ব্যস্ত পাঠক ও শিক্ষক-ছাত্রদের জন্য সহায়ক হবে। বাকী ১১ জন নবীর জীবনী নিয়ে ২য় খণ্ড এবং শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জীবনী নিয়ে ৩য় খণ্ড সত্বর বের হবে ইনশাআল্লাহ। আমরা দৃঢ় আশাবাদী যে, এর মাধ্যমে পাঠকসমাজ মানবজাতির প্রাচীন ইতিহাসের পাদপীঠে নিজেদেরকে নতুনভাবে মূল্যায়ন করতে সক্ষম হবেন এবং নবীগণের উন্নত জীবনকে উত্তম আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করার প্রেরণা লাভ করবেন।

পরিশেষে সুলিখিত এ গ্রন্থটির বিজ্ঞ রচয়িতার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সকলকে ইহকালে ও পরকালে উত্তম জাযা দান করুন- আমীন!!

-প্রকাশক

Contents

সূচীপত্র (المحتويات)

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করে তাকে পৃথিবীতে স্থিতি দান করেছেন। তিনি তাদেরকে অসহায় ও লাগামহীনভাবে ছেড়ে দেননি *(মুমিনূন ২৩/১১৫)*। বরং ‘প্রথম মানুষ’ আদমকে তাঁর বংশধরগণের হেদায়াতের জন্য ‘প্রথম নবী’ হিসাবে প্রেরণ করেন *(বাক্বারাহ ২/৩৮-৩৯)*। এভাবে আদম *(আলাইহিস সালাম)* হ’তে শেষনবী মুহাম্মাদ *(ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)* পর্যন্ত ৩১৫ জন রাসূল সহ এক লক্ষ চব্বিশ হাযার পয়গম্বর প্রেরিত হন।[১] বহু নবীর নিকটে আল্লাহ পাক ‘ছহীফা’ বা পুস্তিকা প্রদান করেন এবং প্রত্যেক রাসূলকে দেন পৃথক পৃথক শরী‘আত বা জীবন বিধান। তবে চার জন শ্রেষ্ঠ রাসূলের নিকটে আল্লাহ প্রধান চারটি ‘কিতাব’ প্রদান করেন। যথাক্রমে মূসা *(আলাইহিস সালাম)*-এর উপরে ‘তাওরাত’, দাঊদ (আঃ)-এর উপরে ‘যবূর’, ঈসা (আঃ)-এর উপরে ‘ইনজীল’ এবং শেষনবী মুহাম্মাদ *(ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)*-এর উপরে ‘কুরআন’। প্রথমোক্ত তিনজন ছিলেন বনু ইস্রাঈলের নবী এবং তাদের নিকটে প্রদত্ত তিনটি কিতাব নাযিল হয়েছিল একত্রিত আকারে। কিন্তু শেষনবী প্রেরিত হয়েছিলেন ‘বিশ্বনবী’ হিসাবে বনু ইসমাঈলে এবং শেষ কিতাব ‘কুরআন’ নাযিল হয়েছিল বিশ্বমানবের জন্য সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর উপরে দীর্ঘ ২৩ বছরের বিস্তৃত সময় ধরে মানুষের বাস্তব চাহিদার প্রেক্ষিতে খণ্ডাকারে। শেষনবী মুহাম্মাদ (*ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম*)-এর আগমন ও শেষ কিতাব ‘কুরআন’ নাযিলের পর বিগত সকল নবুঅত ও সকল কিতাবের হুকুম রহিত হয়ে গেছে। এখন বিশ্বমানবতার পথপ্রদর্শক গ্রন্থ হিসাবে *(বাক্বারাহ ২/২, ১৮৫)* কেবলমাত্র শেষনবী মুহাম্মাদ (*ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম*) আনীত সর্বশেষ এলাহীগ্রন্থ পবিত্র কুরআনই বাকী রয়েছে। নিঃসন্দেহে রাসূলের ছহীহ হাদীছ সমূহ আল্লাহ্‌র অহী (*নাজম ৫৩/৩-৪*) এবং কুরআনের বাস্তব ব্যাখ্যা (*ক্বিয়ামাহ ৭৫/১৯*) ও জীবন মুকুর বৈ কিছুই নয়। যা মুমিন জীবনের চলার পথে ধ্রুবতারার ন্যায় সর্বদা পথ প্রদর্শন করে থাকে (*হাশর ৫৯/৭*)।

---

১. আহমাদ, ত্বাবারাণী, মিশকাত হা/৫৭৩৭ ‘ক্বিয়ামতের অবস্থা’ অধ্যায় ‘সৃষ্টির সূচনা ও নবীগণের আলোচনা’ অনুচ্ছেদ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬৬৮।

হাদীছে বর্ণিত উপরোক্ত বিরাট সংখ্যক নবীগণের মধ্যে পবিত্র কুরআনে মাত্র ২৫ জন নবীর নাম এসেছে। তন্মধ্যে একত্রে ১৭ জন নবীর নাম এসেছে সূরা আন‘আম ৮৩ হ’তে ৮৬ আয়াতে। বাকী নাম সমূহ এসেছে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে। কেবলমাত্র ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনী সূরা ইউসুফে একত্রে বর্ণিত হয়েছে। বাকী নবীগণের কাহিনী কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রসঙ্গে এসেছে। যেমন মূসা ও ফেরাঊনের ঘটনা কুরআনের ২৭টি সূরায় ৭৫টি স্থানে বর্ণিত হয়েছে। সেগুলিকে একত্রিত করে কাহিনীর রূপ দেওয়া রীতিমত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। আল্লাহ বলেন, وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلاً لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. ‘আমরা আপনার পূর্বে এমন বহু রাসূল পাঠিয়েছি, যাদের বৃত্তান্ত আপনাকে শুনিয়েছি এবং এমন বহু রাসূল পাঠিয়েছি, যাদের বৃত্তান্ত আপনাকে শুনাইনি...’ *(নিসা ৪/১৬৪, মুমিন ৪০/৭৮)*।

আমরা বর্তমান আলোচনায় কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত ঘটনা ও বক্তব্য সমূহ একত্রিত করে কাহিনীর রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছি। সেই সাথে বিশ্বস্ত তাফসীর, হাদীছ ও ইতিহাস গ্রন্থ সমূহ থেকেও সামান্য কিছু উদ্ধৃত করেছি। চেষ্টা করেছি নবীদের কাহিনীর নামে প্রচলিত কেচ্ছা-কাহিনী ও ইস্রাঈলী উপকথা সমূহ হ’তে বিরত থাকতে। সীমিত পরিসর ও সীমিত সাধ্যের কারণে অনাকাংখিত ত্রুটি সমূহ থেকে আল্লাহ্‌র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

উল্লেখ্য যে, পৃথিবীতে আগত সকল নবীই মূলতঃ চারটি বংশধারা থেকে এসেছেন। আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيْمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِيْنَ ، ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ. ‘নিঃসন্দেহে আল্লাহ আদম, নূহ, আলে ইব্রাহীম ও আলে ইমরানকে নির্বাচিত করেছেন। যারা একে অপরের বংশধর ছিল ...’ *(আলে ইমরান ৩/৩৩-৩৪)*। এখানে আলে ইবরাহীম বলতে ইসমাঈল ও ইসহাক এবং আলে ইমরান বলতে মূসা ও তাঁর বংশধরগণকে বুঝানো হয়েছে। ইবরাহীম-পুত্র ইসহাক তনয় ইয়াকূব-এর অপর নাম ছিল ‘ইস্রাঈল’ (অর্থ ‘আল্লাহ্‌র দাস’)। তাঁর পুত্র ‘লাভী’ থেকে ইমরান-পুত্র মূসা, দাঊদ ও ঈসা পর্যন্ত সবাই বনু ইস্রাঈলের নবী ছিলেন *(আনকাবূত ২৯/২৭)*। ইবরাহীমের জ্যেষ্ঠ পুত্র ইসমাঈলের বংশে জন্মগ্রহণ করেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ (*ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*)। এজন্য

ইবরাহীম (*আলাইহিস সালাম*)-কে 'আবুল আম্বিয়া' বা নবীগণের পিতা বলা হয়। উল্লেখ্য যে, বিশ্বে মাত্র দু'জন নবীর একাধিক নাম ছিল। তন্মধ্যে ইয়াকূব (আঃ)-এর অপর নাম 'ইস্রাঈল' এবং সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (*ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম*)-এর অপর নাম ছিল 'আহমাদ' *(ছফ ৬১/৬)* এবং আরও কয়েকটি গুণবাচক নাম। আল্লাহ সকল নবীর উপরে শান্তি বর্ষণ করুন- আমীন!!

কাহিনী বর্ণনার উদ্দেশ্যঃ

প্রশ্ন হ'তে পারে, পবিত্র কুরআনে বিগত নবীগণের ও ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি সমূহের কাহিনী বর্ণনার উদ্দেশ্য কি? এর জবাব আল্লাহ দিয়েছেন, وَكُلاًّ نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِيْ هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَّذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِيْنَ– 'আমরা পয়গম্বরদের এসব কাহিনী আপনার কাছে বর্ণনা করি, যদ্দারা আমরা আপনার অন্তরকে সুদৃঢ় করি। আর এর মধ্যে এসেছে আপনার নিকটে সত্য, উপদেশ ও স্মরণীয় বস্তু সমূহ বিশ্বাসীদের জন্য' *(হূদ ১১/১২০)*। অর্থাৎ এর উদ্দেশ্য হ'ল, যাতে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) নবুঅতের গুরু দায়িত্ব বহন করার জন্য যেকোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হয়ে যান এবং তাঁর উম্মত এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।

কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর নামঃ

আদম, নূহ, ইদরীস, হূদ, ছালেহ, ইবরাহীম, লূত্ব, ইসমাঈল, ইসহাক্ব, ইয়াকূব, ইউসুফ, আইয়ূব, শু'আয়েব, মূসা, হারূণ, ইউনুস, দাঊদ, সুলায়মান, ইলিয়াস, আল-ইয়াসা', যুল-কিফ্ল, যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া, ঈসা (আঃ) ও মুহাম্মাদ (ছাঃ)। *(ইবনু কাছীর, তাফসীর নিসা ২৬৪)* এঁদের মধ্যে ইবরাহীম-পূর্ব সকল নবী আদম ও নূহের বংশধর এবং ইবরাহীম-পরবর্তী সকল নবী ও রাসূল ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশধর। উল্লেখ্য যে, সূরা তওবা ৩০ আয়াতে ওযায়ের-এর নাম, এলেও তিনি নবী ছিলেন না। বরং একজন সৎকর্মশীল ব্যক্তি ছিলেন। কুরতুবী বলেন, অত্যাচারী খৃষ্টান রাজা বুখতানছরের ভয়ে যখন ফিলিস্তীনের ইহুদীরা সবাই তওরাত মাটিতে পুঁতে ফেলে এবং তওরাত ভুলে যায়, তখন ওযায়ের তওরাত মুখস্ত করে সবাইকে শুনান। তাতে অনেকে এটাকে অলৌকিকভাবে তাকে 'ইবনুল্লাহ' বা আল্লাহ্র বেটা বলতে থাকে। ইবনু কাছীর ও সুদ্দী প্রমুখের বরাতে কাছাকাছি একইরূপ বর্ণনা করেছেন। আমরা এক্ষণে পরপর তাঁদের জীবনী ও তা থেকে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ তুলে ধরার চেষ্টা পাব *ইনশাআল্লাহ*।

১. হযরত আদম *(আলাইহিস সালাম)*

বিশ্ব ইতিহাসে প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী হিসাবে আল্লাহ পাক আদম (*আলাইহিস সালাম*)-কে নিজ দু'হাত দ্বারা সরাসরি সৃষ্টি করেন *(ছোয়াদ ৩৮/৭৫)*। মাটির সকল উপাদানের সার-নির্যাস একত্রিত করে আঠালো ও পোড়ামাটির ন্যায় শুষ্ক মাটির তৈরী সুন্দরতম অবয়বে রূহ ফুঁকে দিয়ে আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করেছেন।[২]

অতঃপর আদমের পাঁজর থেকে তাঁর স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করেন।[৩] আর এ কারণেই স্ত্রী জাতি স্বভাবগত ভাবেই পুরুষ জাতির অনুগামী ও পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট। অতঃপর স্বামী-স্ত্রীর মাধ্যমে যুগ যুগ ধরে একই নিয়মে মানববংশ বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রয়েছে। কুরআন-এর বর্ণনা অনুযায়ী প্রথম দিন থেকেই মানুষ পূর্ণ চেতনা ও জ্ঞান সম্পন্ন সভ্য মানুষ হিসাবেই যাত্রারম্ভ করেছে এবং আজও সেভাবেই তা অব্যাহত রয়েছে। অতএব গুহামানব, বন্যমানব, আদিম মানব ইত্যাদি বলে অসভ্য যুগ থেকে সভ্য যুগে মানুষের উত্তরণ ঘটেছে বলে কিছু কিছু ঐতিহাসিক যেসব কথা শুনিয়ে থাকেন, তা অলীক কল্পনা ব্যতীত কিছুই নয়। সূচনা থেকে এযাবত এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় মানুষ কখনোই মানুষ ব্যতীত অন্য কিছু ছিল না। মানুষ বানর বা উল্লুকের উদ্বর্তিত রূপ বলে ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে চার্লস ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২) যে 'বিবর্তনবাদ' (Theory of Evolution) পেশ করেছেন, তা বর্তমানে একটি মৃত মতবাদ মাত্র এবং তা প্রায় সকল বিজ্ঞানী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

প্রথম মানুষ আদি পিতা আদম (আঃ)-কে আল্লাহ সর্ব বিষয়ের জ্ঞান ও যোগ্যতা দান করেন এবং বিশ্বে আল্লাহ্র খেলাফত পরিচালনার মর্যাদায় অভিষিক্ত করেন। সাথে সাথে সকল সৃষ্ট বস্তুকে করে দেন মানুষের অনুগত

---

২. *মুমিনূন ২৩/১২; ছাফফাত ৩৭/১১; রহমান ৫৫/১৪; তীন ৯৫/৪ ইত্যাদি।*

৩. *নিসা ৪/১; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩২৩৮ 'বিবাহ' অধ্যায় 'নারীদের সাথে সদ্ব্যবহার' অনুচ্ছেদ। আদম এর মূল উপাদান হ'ল মাটি, তাই তাকে 'আদম' বলা হয়। পক্ষান্তরে হাওয়ার মূল হ'লেন আদম, যিনি তখন জীবন্ত ব্যক্তি। তাই তাকে 'হাওয়া' বলা হয়, যা 'হাই' (জীবন্ত) থেকে উৎপন্ন (কুরতুবী), বাক্বারাহ ৩৫; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/৬২ পৃঃ।*

(লোকমান ৩১/২০) ও সবকিছুর উপরে দেন মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব *(ইসরা ১৭/৭০)*। আর সেকারণেই জিন-ফিরিশতা সবাইকে মানুষের মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য আদমকে সিজদা করার আদেশ দেন। সবাই সে নির্দেশ মেনে নিয়েছিল। কিন্তু ইবলীস অহংকার বশে সে নির্দেশ অমান্য করায় চিরকালের মত অভিশপ্ত হয়ে যায় *(বাক্বারাহ ২/৩৪)*। অথচ সে ছিল বড় আলেম ও ইবাদতগুযার। সেকারণ জিন জাতির হওয়া সত্ত্বেও সে ফিরিশতাদের সঙ্গে বসবাস করার অনুমতি পেয়েছিল ও তাদের নেতা হয়েছিল।[৪] কিন্তু আদমের উচ্চ মর্যাদা দেখে সে ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়ে। ফলে অহংকার বশে আদমকে সিজদা না করায় এবং আল্লাহ ভীতি না থাকায় সে আল্লাহ্র গযবে পতিত হয়। এজন্য জনৈক আরবী কবি বলেন,

لو كان للعلم شرف من دون التقى

لكان أشرف خلق الله إبليسُ

‘যদি তাক্বওয়া বিহীন ইলমের কোন মর্যাদা থাকত,

তবে ইবলীস আল্লাহ্র সৃষ্টিকুলের সেরা বলে গণ্য হ’ত’।

শয়তানের সৃষ্টি ছিল মানুষের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ :

ইবলীসকে আল্লাহ মানুষের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ সৃষ্টি করেন এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত তার হায়াত দীর্ঘ করে দেন। মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুৎ করার জন্য ও তাকে ধোঁকা দেওয়াই শয়তানের একমাত্র কাজ। ‘সে মানুষকে বলে কুফরী কর’। কিন্তু যখন সে কুফরী করে, তখন শয়তান বলে ‘আমি তোমার থেকে মুক্ত। আমি বিশ্বপ্রভু আল্লাহ্কে ভয় করি’ *(হাশর ৫৯/১৬)*। অন্যদিকে যুগে যুগে নবী-রাসূল ও কিতাব পাঠিয়ে আল্লাহ মানুষকে সত্য পথ প্রদর্শনের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখেন *(বাক্বারাহ ২/২১৩)*। আদম থেকে শুরু করে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত এক লক্ষ চব্বিশ হাযার পয়গাম্বর দুনিয়াতে এসেছেন[৫] এবং বর্তমানে সর্বশেষ এলাহীগ্রন্থ পবিত্র কুরআনের ধারক ও বাহক মুসলিম

---

৪. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (বৈরুত:দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তাবি) ১/৬৭।

৫. আহমাদ, ত্বাবারাণী, মিশকাত হা/৫৭৩৭ ‘ক্বিয়ামতের অবস্থা’ অধ্যায় ‘সৃষ্টির সূচনা ও নবীগণের আলোচনা’ অনুচ্ছেদ।

ওলামায়ে কেরাম শেষনবীর ‘ওয়ারিছ’ হিসাবে[৬] আল্লাহ প্রেরিত অহীর বিধান সমূহ বিশ্বব্যাপী পৌঁছে দেবার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন *(মায়েদাহ ৫/৬৭)*। পৃথিবীর চূড়ান্ত ধ্বংস তথা ক্বিয়ামতের অব্যবহিত কাল পূর্ব পর্যন্ত এই নিয়ম জারি থাকবে। শেষনবীর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী পৃথিবীর এমন কোন বস্তি ও ঝুপড়ি ঘরও থাকবে না, যেখানে আল্লাহ ইসলামের বাণী পৌঁছে দেবেন না।[৭] এতদসত্ত্বেও অবশেষে পৃথিবীতে যখন ‘আল্লাহ’ বলার মত কোন লোক থাকবে না, অর্থাৎ প্রকৃত তাওহীদের অনুসারী কোন মুমিন বাকী থাকবে না, তখন আল্লাহ্র হুকুমে প্রলয় ঘনিয়ে আসবে এবং ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে।[৮] মানুষের দেহগুলি সব মৃত্যুর পরে মাটিতে মিশে যাবে। কিন্তু রূহগুলি স্ব স্ব ভাল বা মন্দ আমল অনুযায়ী ‘ইল্লীন’ অথবা ‘সিজ্জীনে’ অবস্থান করবে *(মুত্বাফফেফীন ৮৩/৭, ১৮)*। যা ক্বিয়ামতের পরপরই আল্লাহ্র হুকুমে স্ব স্ব দেহে পুনঃপ্রবেশ করবে (*ফজর ৮৯/২৯*) এবং চূড়ান্ত হিসাব-নিকাশের জন্য সকল মানুষ সশরীরে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র দরবারে নীত হবে *(মুত্বাফফেফীন ৮৩/৪-৬)*।

মানুষের ঠিকানা হ’ল তিনটি : ১- দারুদ দুনিয়া। অর্থাৎ যেখানে আমরা এখন বসবাস করছি ২- দারুল বরযখ। অর্থাৎ মৃত্যুর পরে কবরের জগত। ৩- দারুল ক্বারার। অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিন শেষ বিচার শেষে জান্নাত বা জাহান্নামের চিরস্থায়ী ঠিকানা।

অতএব পৃথিবী হ’ল মানুষের জন্য সাময়িক পরীক্ষাগার মাত্র। জান্নাত থেকে নেমে আসা মানুষ এই পরীক্ষাস্থলে পরীক্ষা শেষে সুন্দর ফল লাভে পুনরায় জান্নাতে ফিরে যাবে, অথবা ব্যর্থকাম হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। অতঃপর সেখানেই হবে তাদের সর্বশেষ যাত্রাবিরতি এবং সেটাই হবে তাদের চূড়ান্ত ও চিরস্থায়ী ঠিকানা। আল্লাহ বলেন, ‘মাটি থেকেই আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছি। ঐ মাটিতেই তোমাদের ফিরিয়ে নেব। অতঃপর ঐ মাটি থেকেই আমরা তোমাদেরকে পুনরায় বের করে আনব’ *(ত্বোয়াহা ২০/৫৫)*। অতঃপর বিচার শেষে কাফেরদেরকে হাঁকিয়ে নেওয়া হবে জাহান্নামের দিকে এবং মুত্তাক্বীদের নেওয়া হবে জান্নাতে *(যুমার ৩৯/৬৯-৭৩)*। এভাবেই সেদিন যালেম

---

৬. তিরমিযী, আহমাদ, আবুদাঊদ মিশকাত হা/২১২ ‘ইল্ম’ অধ্যায়।

৭. আহমাদ, মিশকাত হা/৪২ ‘ঈমান’ অধ্যায়।

৮. মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫১৬ ‘ফিতান’ অধ্যায়।

তার প্রাপ্য শাস্তি ভোগ করবে এবং মযলূম তার যথাযথ প্রতিদান পেয়ে ধন্য হবে। সেদিন কারু প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হবে না *(বাক্বারাহ ২/২৮১)*।

উল্লেখ্য যে, হযরত আদম (আঃ) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ১০টি সূরায় ৫০টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।[৯]

এক্ষণে আদম সৃষ্টির ঘটনাবলী কুরআনে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, তার আলোকে সার-সংক্ষেপ আমরা তুলে ধরার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

আদম সৃষ্টির কাহিনী :

আল্লাহ একদা ফেরেশতাদের ডেকে বললেন, আমি পৃথিবীতে 'খলীফা' অর্থাৎ প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে চাই। বল, এ বিষয়ে তোমাদের বক্তব্য কি? তারা (সম্ভবতঃ ইতিপূর্বে সৃষ্ট জিন জাতির তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে) বলল, হে আল্লাহ! আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে আবাদ করতে চান, যারা গিয়ে সেখানে ফাসাদ সৃষ্টি করবে ও রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরা সর্বদা আপনার হুকুম পালনে এবং আপনার গুণগান ও পবিত্রতা বর্ণনায় রত আছি। এখানে ফেরেশতাদের উক্ত বক্তব্য আপত্তির জন্য ছিল না, বরং জানার জন্য ছিল। আল্লাহ বললেন, আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না *(বাক্বারাহ ২/৩০)*। অর্থাৎ আল্লাহ চান এ পৃথিবীতে এমন একটা সৃষ্টির আবাদ করতে, যারা হবে জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন এবং নিজস্ব বিচার-বুদ্ধি ও চিন্তা-গবেষণা সহকারে স্বেচ্ছায়-সজ্ঞানে আল্লাহ্র বিধান সমূহের আনুগত্য করবে ও তাঁর ইবাদত করবে। ফেরেশতাদের মত কেবল হুকুম তামিলকারী জাতি নয়।

খলীফা অর্থ :

এখানে 'খলীফা' বা প্রতিনিধি বলে জিনদের পরবর্তী প্রতিনিধি হিসাবে বনু আদমকে বুঝানো হয়েছে, যারা পৃথিবীতে একে অপরের প্রতিনিধি হবে *(ইবনু কাছীর)*। অথবা এর দ্বারা আদম ও পরবর্তী ন্যায়নিষ্ঠ শাসকদের বুঝানো হয়েছে, যারা জনগণের মধ্যে আল্লাহ্র আনুগত্য ও ইনছাফপূর্ণ শাসক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আল্লাহ্র প্রতিনিধিত্ব করবে। কেননা ফাসাদ সৃষ্টিকারী ও

---

৯. যথাক্রমে সূরা বাক্বারাহ ২/৩১-৩৭= ৭; আলে ইমরান ৩/৩৩,৫৯; মায়েদাহ ৫/২৭-৩২= ৬; আ'রাফ ৭/১১, ১৯, ২৬, ২৭, ৩১, ৩৫, ১৭২-৭৩= ৮; হিজর ১৫/২৬-৪২= ১৭; ইসরা ১৭/৬১, ৭০; ইয়াসীন ৩৬/৬০। সর্বমোট = ৫০টি।

অন্যায় রক্তপাতকারী ব্যক্তিরা আল্লাহ্র প্রতিনিধি নয় (*ইবনু জারীর*)। তবে প্রথম ব্যাখ্যাই অগ্রগণ্য, যা ফেরেশতাদের জবাবে প্রতীয়মান হয় যে, এমন প্রতিনিধি আপনি সৃষ্টি করবেন, যারা পূর্ববর্তী জিন জাতির মত পৃথিবীতে গিয়ে ফাসাদ ও রক্তপাত ঘটাবে। বস্তুতঃ 'জিন জাতির উপর ক্বিয়াস করেই তারা এরূপ কথা বলে থাকতে পারে' (*ইবনু কাছীর*)।

অতঃপর আল্লাহ আদমকে সবকিছুর নাম শিক্ষা দিলেন। 'সবকিছুর নাম' বলতে পৃথিবীর সূচনা থেকে লয় পর্যন্ত ছোট-বড় সকল সৃষ্টবস্তুর ইল্ম ও তা ব্যবহারের যোগ্যতা তাকে দিয়ে দেওয়া হ'ল।[১০] যা দিয়ে সৃষ্টবস্তু সমূহকে আদম ও বনু আদম নিজেদের অনুগত করতে পারে এবং তা থেকে ফায়েদা হাছিল করতে পারে। যদিও আল্লাহ্র অসীম জ্ঞানরাশির সাথে মানবজাতির সম্মিলিত জ্ঞানের তুলনা মহাসাগরের অথৈ জলরাশির বুক থেকে পাখির ছোঁ মারা এক ফোঁটা পানির সমতুল্য মাত্র।[১১] বলা চলে যে, আদমকে দেওয়া সেই যোগ্যতা ও জ্ঞান ভাণ্ডার যুগে যুগে তাঁর জ্ঞানী ও বিজ্ঞানী সন্তানদের মাধ্যমে বিতরিত হচ্ছে ও তার দ্বারা জগত সংসার উপকৃত হচ্ছে। আদমকে সবকিছুর নাম শিক্ষা দেওয়ার পর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য আল্লাহ তাকে ফেরেশতাদের সম্মুখে পেশ করলেন। কুরআনে কেবল ফেরেশতাদের কথা উল্লেখিত হ'লেও সেখানে জিনদের সদস্য ইবলীসও উপস্থিত ছিল *(কাহফ ১৮/৫০)*। অর্থাৎ আল্লাহ চেয়েছিলেন, জিন ও ফেরেশতা উভয় সম্প্রদায়ের উপরে আদম-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হৌক এবং বাস্তবে সেটাই হ'ল। তবে যেহেতু ফেরেশতাগণ জিনদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন, সেজন্য কেবল তাদের নাম নেওয়া হয়েছে। আর দুনিয়াতে জিনদের ইতিপূর্বেকার উৎপাত ও অনাচার সম্বন্ধে ফেরেশতারা আগে থেকেই অবহিত ছিল, সেকারণ তারা মানুষ সম্বন্ধেও একইরূপ ধারণা পোষণ করেছিল এবং প্রশ্নের জবাবে নেতিবাচক উত্তর দিয়েছিল। উল্লেখ্য যে, 'আল্লাহ জিন জাতিকে আগেই সৃষ্টি করেন গনগনে আগুন থেকে' *(হিজর ১৫/২৭)*। কিন্তু তারা অবাধ্যতার চূড়ান্ত করে।

---

১০. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/৬৫।

১১. বুখারী হা/৪৭২৭ 'তাফসীর' অধ্যায়, সূরা কাহফ।

আদমকে ফেরেশতাদের সম্মুখে পেশ করার পর আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে ঐসব বস্তুর নাম জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু সঙ্গত কারণেই তারা তা বলতে পারল না। তখন আল্লাহ আদমকে নির্দেশ দিলেন এবং তিনি সবকিছুর নাম বলে দিলেন। ফলে ফেরেশতারা অকপটে তাদের পরাজয় মেনে নিল এবং আল্লাহ্র মহত্ত্ব ও পবিত্রতা ঘোষণা করে বলল, হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে যতটুকু শিখিয়েছেন, তার বাইরে আমাদের কোন জ্ঞান নেই। নিশ্চয়ই আপনি সর্বজ্ঞ ও দূরদৃষ্টিময়' *(বাক্বারাহ ২/৩২)*। অতঃপর আল্লাহ তাদের সবাইকে আদমের সম্মুখে সম্মানের সিজদা করতে বললেন। সবাই সিজদা করল, ইবলীস ব্যতীত। সে অস্বীকার করল ও অহংকারে স্ফীত হয়ে প্রত্যাখ্যান করল। ফলে সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হ'ল *(বাক্বারাহ ২/৩৪)*। ইবলীস ঐ সময় নিজের পক্ষে যুক্তি পেশ করে বলল, 'আমি ওর চাইতে উত্তম। কেননা আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন আর ওকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দিয়ে'। আল্লাহ বললেন, তুই বের হয়ে যা। তুই অভিশপ্ত, তোর উপরে আমার অভিশাপ রইল পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত' *(ছোয়াদ ৩৮/৭৬-৭৮; আ'রাফ ৭/১২)*।

সিজদার ব্যাখ্যা ও উদ্দেশ্য :

আদমকে সৃষ্টি করার আগেই আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে আদমের প্রতি সিজদা করার কথা বলে দিয়েছিলেন *(হা-মীম সাজদাহ/ফুছছিলাত ৪১/১১)*। তাছাড়া কুরআনের বর্ণনা সমূহ থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে, আদমকে সিজদা করার জন্য আল্লাহ্র নির্দেশ ব্যক্তি আদম হিসাবে ছিল না, বরং ভবিষ্যৎ মানব জাতির প্রতিনিধিত্বকারী হিসাবে তাঁর প্রতি সম্মান জানানোর জন্য জিন ও ফিরিশতাদের সিজদা করতে বলা হয়েছিল। এই সিজদা কখনোই আদমের প্রতি ইবাদত পর্যায়ের ছিল না। বরং তা ছিল মানবজাতির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন ও তাদেরকে সকল কাজে সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি দানের প্রতীকী ও সম্মান সূচক সিজদা মাত্র।

ওদিকে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হ'লেও ইবলীস কিন্তু আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা হিসাবে অস্বীকার করেনি। বরং আল্লাহ যখন তাকে 'অভিসম্পাৎ' করে জান্নাত থেকে চিরদিনের মত বিতাড়িত করলেন, তখন সে আল্লাহ্কে 'রব' হিসাবেই সম্বোধন করে প্রার্থনা করল, قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ– 'হে আমার প্রভু! আমাকে আপনি ক্বিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দিন'

(হিজর ১৫/৩৬, ছোয়াদ ৩৮/৭৯)। আল্লাহ তার প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। অতঃপর সে বলল, ‘হে আমার পালনকর্তা! আপনি যেমন আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, আমিও তেমনি তাদের সবাইকে পৃথিবীতে নানারূপ সৌন্দর্যে প্রলুব্ধ করব এবং তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দেব। তবে যারা আপনার একনিষ্ঠ বান্দা, তাদের ব্যতীত’ *(হিজর ১৫/৩৪-৪০; ছোয়াদ ৩৮/৭৯-৮৩)*। আল্লাহ তাকে বললেন, তুমি নেমে যাও এবং এখান থেকে বেরিয়ে যাও। তুমি নীচুতমদের অন্তর্ভুক্ত। এখানে তোমার অহংকার করার অধিকার নেই’ *(আ'রাফ ৭/১৩)*। উল্লেখ্য যে, ইবলীস জান্নাত থেকে বহিস্কৃত হ’লেও মানুষের রগ-রেশায় ঢুকে ধোঁকা দেওয়ার ও বিভ্রান্ত করার ক্ষমতা আল্লাহ তাকে দিয়েছিলেন।[১২] আর এটা ছিল মানুষের পরীক্ষার জন্য। শয়তানের ধোঁকার বিরুদ্ধে জিততে পারলেই মানুষ তার শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে পারবে এবং আখেরাতে জান্নাত লাভে ধন্য হবে। নইলে ইহকাল ও পরকালে ব্যর্থকাম হবে। মানুষের প্রতি ফেরেশতাদের সিজদা করা ও ইবলীসের সিজদা না করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে এ বিষয়ে যে, মানুষ যেন প্রতি পদে পদে শয়তানের ব্যাপারে সতর্ক থাকে এবং আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখে।

আদমের পাঁচটি শ্রেষ্ঠত্ব :

(১) আল্লাহ তাকে নিজ দু’হাতে সৃষ্টি করেছেন *(ছোয়াদ ৩৮/৭৫)*। (২) আল্লাহ নিজে তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দিয়েছেন *(ছোয়াদ ৩৮/৭২)*। (৩) আল্লাহ তাকে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিয়েছেন *(বাক্বারাহ ২/৩১)*। (৪) তাকে সিজদা করার জন্য আল্লাহ ফেরেশতাদের নির্দেশ দিয়েছেন *(বাক্বারাহ ২/৩৪)*। (৫) আদম একাই মাত্র মাটি থেকে সৃষ্ট। বাকী সবাই পিতা-মাতার মাধ্যমে সৃষ্ট *(সাজদাহ ৩২/৭-৯)*।

ইবলীসের অভিশপ্ত হওয়ার কারণ ছিল তার ক্বিয়াস। সে আল্লাহ্র আদেশের বিরুদ্ধে যুক্তি পেশ করে বলেছিল, ‘আমি আদমের চাইতে উত্তম। কেননা আপনি আমাকে আগুন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি

---

১২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৮ ‘ঈমান’ অধ্যায় ‘ওয়াসওয়াসা’ অনুচ্ছেদ।*

দিয়ে' *(হিজর ২৯)*। মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন বলেন, اول من قاس ابليس 'প্রথম ক্বিয়াস করেছিল ইবলীস'। হাসান বছরীও অনুরূপ বলেছেন।[১৩]

নারী জাতি পুরুষেরই অংশ এবং তার অনুগত :

সিজদা অনুষ্ঠানের পর আল্লাহ আদমের জুড়ি হিসাবে তার অবয়ব হ'তে একাংশ নিয়ে অর্থাৎ তার পাঁজর হ'তে তার স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করলেন[১৪] মাটি থেকে সৃষ্ট হওয়া আদমের নাম হ'ল 'আদম' এবং জীবন্ত আদমের পাঁজর হ'তে সৃষ্ট হওয়ায় তাঁর স্ত্রীর নাম হ'ল 'হাওয়া' *(কুরতুবী)*। অতঃপর তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ বললেন, 'তোমরা দু'জন জান্নাতে বসবাস কর ও সেখান থেকে যা খুশী খেয়ে বেড়াও। তবে সাবধান! এই গাছটির নিকটে যেয়ো না। তাহ'লে তোমরা সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে' *(বাক্বারাহ ২/৩৫)*। এতে বুঝা যায় যে, ফেরেশতাগণের সিজদা কেবল আদমের জন্য ছিল, হাওয়ার জন্য নয়। দ্বিতীয়তঃ সিজদা অনুষ্ঠানের পরে আদমের অবয়ব থেকে হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়, পূর্বে নয়। তিনি পৃথক কোন সৃষ্টি ছিলেন না। এতে পুরুষের প্রতি নারীর অনুগামী হওয়া প্রমাণিত হয়। আল্লাহ বলেন, 'পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল' *(নিসা ৪/৩৪)*। অতঃপর বহিস্কৃত ইবলীস তার প্রথম টার্গেট হিসাবে আদম ও হাওয়ার বিরুদ্ধে প্রতারণার জাল নিক্ষেপ করল। সেমতে সে প্রথমে তাদের খুব আপনজন বনে গেল এবং নানা কথায় তাদের ভুলাতে লাগল। এক পর্যায়ে সে বলল, 'আল্লাহ যে তোমাদেরকে ঐ গাছটির নিকটে যেতে নিষেধ করেছেন, তার কারণ হ'ল এই যে, তোমরা তাহ'লে ফেরেশতা হয়ে যাবে কিংবা তোমরা এখানে চিরস্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যাবে' *(আ'রাফ ৭/২০)*। সে অতঃপর কসম খেয়ে বলল যে, আমি অবশ্যই তোমাদের হিতাকাংখী' *(ঐ, ২১)*। 'এভাবেই সে আদম ও হাওয়াকে সম্মত করে ফেলল এবং তার প্রতারণার জালে আটকে গিয়ে তারা উক্ত নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল আস্বাদন করল। ফলে সাথে সাথে তাদের গুপ্তাঙ্গ প্রকাশিত হয়ে পড়ল এবং তারা তড়িঘড়ি গাছের পাতা সমূহ দিয়ে তা ঢাকতে লাগল। আল্লাহ তাদেরকে ডেকে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করিনি এবং বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? *(ঐ, ২২)*

---

১৩. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/৬৬।*

১৪. *নিসা ৪/১; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩২৩৮ 'বিবাহ' অধ্যায় ১০ম অনুচ্ছেদ।*

তখন তারা অনুতপ্ত হ’য়ে বলল, قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ– ‘হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিজেদের উপর যুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন, তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব’ *(২৩)*। ‘আল্লাহ তখন বললেন, তোমরা (জান্নাত থেকে) নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু। তোমাদের অবস্থান হবে পৃথিবীতে এবং সেখানেই তোমরা একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত সম্পদরাজি ভোগ করবে’ *(২৪)*। তিনি আরও বললেন যে, ‘তোমরা পৃথিবীতেই জীবনযাপন করবে, সেখানেই মৃত্যুবরণ করবে এবং সেখান থেকেই তোমরা পুনরুত্থিত হবে’ *(আ‘রাফ ৭/২০-২৫)*।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইবলীসের কথায় সর্বপ্রথম হাওয়া প্রতারিত হন। অতঃপর তার মাধ্যমে আদম প্রতারিত হন বলে যে কথা চালু আছে কুরআনে এর কোন সমর্থন নেই। ছহীহ হাদীছেও স্পষ্ট কিছু নেই। এ বিষয়ে তাফসীরে ইবনু জারীরে ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে যে বর্ণনা এসেছে, তা যঈফ।[১৫] দ্বিতীয়তঃ জান্নাত থেকে অবতরণের নির্দেশ তাদের অপরাধের শাস্তি স্বরূপ ছিলনা। কেননা এটা ছিল তওবা কবুলের পরের ঘটনা। অতএব এটা ছিল হয়তবা তাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দানের জন্য। বরং সঠিক কথা এই যে, এটা ছিল আল্লাহ্র পূর্ব নির্ধারিত ও দূরদর্শী পরিকল্পনারই অংশ। কেননা জান্নাত হ’ল কর্মফল লাভের স্থান, কর্মের স্থান নয়। তাছাড়া জান্নাতে মানুষের বংশ বৃদ্ধির সুযোগ নেই। এজন্য দুনিয়ায় নামিয়ে দেওয়া যরূরী ছিল।

প্রথম বার আদেশ দানের পরে পুনরায় স্নেহ ও অনুগ্রহ মিশ্রিত আদেশ দিয়ে বললেন, ‘তোমরা সবাই নেমে যাও’। অতঃপর পৃথিবীতে আল্লাহ্র খলীফা হওয়ার *(বাক্বারাহ ২/৩০; ফাত্বির ৩৫/৩৯)* মহান মর্যাদা প্রদান করে বললেন, ‘তোমাদের নিকটে আমার পক্ষ থেকে হেদায়াত অবতীর্ণ হবে। যারা তার অনুসরণ করবে, তাদের জন্য কোন ভয় বা চিন্তার কারণ থাকবে না। কিন্তু যারা তা প্রত্যাখ্যান করবে ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে, তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী এবং সেখানে তারা অনন্তকাল ধরে অবস্থান করবে’ *(বাক্বারাহ ২/৩৮-৩৯)*।

---

১৫. তাফসীর ইবনে জারীর (বৈরুত: ১৪০৬/১৯৮৬) ৮/১০৯ পৃঃ, সূরা আ‘রাফ ৭/ ২২।

Contents

উল্লেখ্য যে, নবীগণ ছিলেন নিষ্পাপ এবং হযরত আদম (আঃ) ছিলেন নিঃসন্দেহে নিষ্পাপ। তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ভুল করেননি। বরং শয়তানের প্ররোচনায় প্রতারিত হয়ে তিনি সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ বৃক্ষের নিকটবর্তী হওয়ার নিষেধাজ্ঞার কথাটি ভুলে গিয়েছিলেন। যেমন অন্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا– 'অতঃপর আদম ভুলে গেল এবং আমি তার মধ্যে (সংকল্পের) দৃঢ়তা পাইনি' *(ত্বোয়াহা ২০/১১৫)*। তাছাড়া উক্ত ঘটনার সময় তিনি নবী হননি বরং পদস্খলনের ঘটনার পরে আল্লাহ তাকে নবী মনোনীত করে দুনিয়ায় পাঠান ও হেদায়াত প্রদান করেন' *(আ'রাফ ৭/১২২)*।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, ইবলীসের ক্ষেত্রে আল্লাহ বললেন, قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ– 'তুমি জান্নাত থেকে বেরিয়ে যাও। নিশ্চয়ই তুমি অভিশপ্ত' *(হিজর ১৫/৩৪; আ'রাফ ৭/১৮)*। অন্যদিকে আদম ও হাওয়ার ক্ষেত্রে বললেন, قُلْنَا اهْبِطُواْ مِنْهَا– ' তোমরা নেমে যাও' *(বাক্বারাহ ২/৩৬, ৩৮; আ'রাফ ৭/২৪)*। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইবলীস কখনোই আর জান্নাতে ফিরে আসতে পারবে না। কিন্তু বনু আদমের ঈমানদারগণ পুনরায় ফিরে আসতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

নগ্নতা শয়তানের প্রথম কাজ :

মানুষের উপরে শয়তানের প্রথম হামলা ছিল তার দেহ থেকে কাপড় খসিয়ে তাকে উলঙ্গ করে দেওয়া। আজও পৃথিবীতে শয়তানের পদাংক অনুসারী ও ইবলীসের শিখণ্ডীদের প্রথম কাজ হ'ল তথাকথিত ক্ষমতায়ন ও লিঙ্গ সমতার নামে নারীকে উলঙ্গ করে ঘরের বাইরে আনা ও তার সৌন্দর্য উপভোগ করা। অথচ পৃথিবীর বিগত সভ্যতাগুলি ধ্বংস হয়েছে মূলতঃ নারী ও মদের সহজলভ্যতার কারণেই। অতএব সভ্য-ভদ্র ও আল্লাহভীরু বান্দাদের নিকটে ঈমানের পর সর্বপ্রথম ফরয হ'ল স্ব স্ব লজ্জাস্থান আবৃত রাখা ও ইযযত-আবরূর হেফাযত করা। অন্যান্য ফরয সবই এর পরে। নারীর পর্দা কেবল পোষাকে হবে না, বরং তা হবে তার ভিতরে, তার কথা-বার্তায়, আচার-আচরণে ও চাল-চলনে সর্ব বিষয়ে। পরনারীর প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি ও মিষ্ট কণ্ঠস্বর পরপুরুষের হৃদয়ে অন্যায় প্রভাব বিস্তার করে। অতএব লজ্জাশীলতাই মুমিন

নর-নারীর অঙ্গভূষণ ও পারস্পরিক নিরাপত্তার গ্যারান্টি। নারী ও পুরুষ প্রত্যেকে একে অপরের থেকে স্ব স্ব দৃষ্টিকে অবনত রাখবে *(নূর ২৪/৩০-৩১)* এবং পরস্পরে সার্বিক পর্দা বজায় রেখে কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় কথাটুকু স্বাভাবিকভাবে সংক্ষেপে বলবে। নারী ও পুরুষ প্রত্যেকে নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য ও পর্দা বজায় রেখে স্ব স্ব কর্মস্থলে ও কর্মপরিধির মধ্যে স্বাধীনভাবে কাজ করবে এবং সংসার ও সমাজের কল্যাণে সাধ্যমত অবদান রাখবে। নেগেটিভ ও পজেটিভ পাশাপাশি বিদ্যুৎবাহী দু'টি ক্যাবলের মাঝে প্লাষ্টিকের আবরণ যেমন পর্দার কাজ করে এবং অপরিহার্য এক্সিডেন্ট ও অগ্নিকাণ্ড থেকে রক্ষা করে, অনুরূপভাবে পরনারী ও পরপুরুষের মধ্যকার পর্দা উভয়ের মাঝে ঘটিতব্য যেকোন অনাকাংখিত বিষয় থেকে পরস্পরকে হেফাযত করে। অতএব শয়তানের প্ররোচনায় জান্নাতের পবিত্র পরিবেশে আদি পিতা-মাতার জীবনে ঘটিত উক্ত অনিচ্ছাকৃত দুর্ঘটনা থেকে দুনিয়ার এই পঙ্কিল পরিবেশে বসবাসরত মানব জাতিকে আরও বেশী সতর্ক ও সাবধান থাকা উচিত। কুরআন ও হাদীছ আমাদেরকে সেদিকেই হুঁশিয়ার করেছে।

মানব সৃষ্টির রহস্য :

আল্লাহ বলেন, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّيْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُوْنٍ، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِن رُّوحِيْ فَقَعُوْا لَهُ سَاجِدِيْنَ- 'স্মরণ কর সেই সময়ের কথা, যখন তোমার প্রভু ফেরেশতাদের বললেন, আমি মিশ্রিত পচা কাদার শুকনো মাটি দিয়ে 'মানুষ' সৃষ্টি করব। অতঃপর যখন আমি তার অবয়ব পূর্ণভাবে তৈরী করে ফেলব ও তাতে আমি আমার রূহ ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তার প্রতি সিজদায় পড়ে যাবে' *(হিজর ১৫/২৮-২৯)*। অন্যত্র তিনি বলেন, هُوَ الَّذِيْ يُصَوِّرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لآ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ- (آل عمران ٦)- 'তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে মাতৃগর্ভে আকার-আকৃতি দান করেছেন যেমন তিনি চেয়েছেন। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি মহা পরাক্রান্ত ও মহা বিজ্ঞানী' *(আলে ইমরান ৩/৬)*। তিনি আরও বলেন, يَخْلُقُكُمْ فِيْ بُطُوْنِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلاَثٍ- (زمر ٦)- 'তিনি তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃগর্ভে সৃষ্টি করেন

একের পর এক স্তরে তিনটি অন্ধকারাচ্ছন্ন আবরণের মধ্যে’ *(যুমার ৩৯/৬)*। তিনটি আবরণ হ’ল- পেট, রেহেম বা জরায়ু এবং জরায়ুর ফুল বা গর্ভাধার।

উপরোক্ত আয়াতগুলিতে আদম সৃষ্টির তিনটি পর্যায় বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমে মাটি দ্বারা অবয়ব নির্মাণ, অতঃপর তার আকার-আকৃতি গঠন ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহে শক্তির আনুপতিক হার নির্ধারণ ও পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান এবং সবশেষে তাতে রূহ সঞ্চার করে আদমকে অস্তিত্ব দান। অতঃপর আদমের অবয়ব (পাঁজর) থেকে কিছু অংশ নিয়ে তার জোড়া বা স্ত্রী সৃষ্টি করা। সৃষ্টির সূচনা পর্বের এই কাজগুলি আল্লাহ সরাসরি নিজ হাতে করেছেন *(ছোয়াদ ৩৮/৭৫)*। অতঃপর এই পুরুষ ও নারী স্বামী-স্ত্রী হিসাবে বসবাস করে প্রথম যে যমজ সন্তান জন্ম দেয়, তারাই হ’ল মানুষের মাধ্যমে সৃষ্ট পৃথিবীর প্রথম মানব যুগল। তারপর থেকে এযাবত স্বামী-স্ত্রীর মিলনে মানুষের বংশ বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে।

শুধু মানুষ নয়, উদ্ভিদরাজি, জীবজন্তু ও প্রাণীকুলের সৃষ্টি হয়েছে মাটি থেকে। আর মাটি সৃষ্টি হয়েছে পানি থেকে। পানিই হ’ল সকল জীবন্ত বস্তুর মূল *(ফুরক্বান ২৫/৫৪)*।

মৃত্তিকাজাত সকল প্রাণীর জীবনের প্রথম ও মূল একক (Unit) হচ্ছে ‘প্রোটোপ্লাজম’ (Protoplasm)। যাকে বলা হয় ‘আদি প্রাণসত্তা’। এ থেকেই সকল প্রাণী সৃষ্টি হয়েছে। এজন্য বিজ্ঞানী মরিস বুকাইলী একে Bomb shell বলে অভিহিত করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে মাটির সকল প্রকারের রাসায়নিক উপাদান। মানুষের জীবন বীজে প্রচুর পরিমাণে চারটি উপাদান পাওয়া যায়। অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ও হাইড্রোজেন। আর আটটি পাওয়া যায় সাধারণভাবে সমপরিমাণে। সেগুলি হ’ল- ম্যাগনেশিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ক্লোরিন, সালফার ও আয়রণ। আরও আটটি পদার্থ পাওয়া যায় স্বল্প পরিমাণে। তাহ’ল: সিলিকন, মোলিবডেনাম, ফ্লুরাইন, কোবাল্ট, ম্যাঙ্গানিজ, আয়োডিন, কপার ও যিংক। কিন্তু এই সব উপাদান সংমিশ্রিত করে জীবনের কণা তথা ‘প্রোটোপ্লাজম’ তৈরী করা সম্ভব নয়। জনৈক বিজ্ঞানী দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে এসব মৌল উপাদান সংমিশ্রিত করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছেন এবং তাতে কোন জীবনের ‘কণা’

পরিলক্ষিত হয়নি। এই সংমিশ্রণ ও তাতে জীবন সঞ্চার আল্লাহ ব্যতীত কারু পক্ষে সম্ভব নয়। বিজ্ঞান এক্ষেত্রে মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছে।

প্রথম পর্যায়ে মাটি থেকে সরাসরি আদমকে অতঃপর আদম থেকে তার স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করার পরবর্তী পর্যায়ে আল্লাহ আদম সন্তানদের মাধ্যমে বনু আদমের বংশ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করেছেন। এখানেও রয়েছে সাতটি স্তর। যেমন: মৃত্তিকার সারাংশ তথা প্রোটোপ্লাজম, বীর্য বা শুক্রকীট, জমাট রক্ত, মাংসপিণ্ড, অস্থিমজ্জা, অস্থি পরিবেষ্টনকারী মাংস এবং সবশেষে রূহ সঞ্চারণ *(মুমিনূন ২৩/১২-১৪; মুমিন ৪০/৬৭; ফুরক্বান ২৫/৪৪; তারেক্ব ৮৬/৫-৭)*। স্বামীর শুক্রকীট স্ত্রীর জরায়ুতে রক্ষিত ডিম্বকোষে প্রবেশ করার পর উভয়ের সংমিশ্রিত বীর্যে সন্তান জন্ম গ্রহণ করে *(দাহ্‌র ৭৬/২)*। উল্লেখ্য যে, পুরুষের একবার নির্গত লম্ফমান বীর্যে লক্ষ-কোটি শুক্রাণু থাকে। আল্লাহ্‌র হুকুমে তন্মধ্যকার একটি মাত্র শুক্রকীট স্ত্রীর জরায়ুতে প্রবেশ করে। এই শুক্রকীট পুরুষ ক্রোমোজম Y অথবা স্ত্রী ক্রোমোজম X হয়ে থাকে। এর মধ্যে যেটি স্ত্রীর ডিম্বের X ক্রোমোজমের সাথে মিলিত হয়, সেভাবেই পুত্র বা কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করে আল্লাহ্‌র হুকুমে।

মাতৃগর্ভের তিন তিনটি গাঢ় অন্ধকার পর্দার অন্তরালে এইভাবে দীর্ঘ নয় মাস ধরে বেড়ে ওঠা প্রথমত: একটি পূর্ণ জীবন সত্তার সৃষ্টি, অতঃপর একটি জীবন্ত প্রাণবন্ত ও প্রতিভাবান শিশু হিসাবে দুনিয়াতে ভূমিষ্ট হওয়া কতই না বিস্ময়কর ব্যাপার। কোন মানুষের পক্ষে এই অনন্য-অকল্পনীয় সৃষ্টিকর্ম আদৌ সম্ভব কী? মাতৃগর্ভের ঐ অন্ধকার গৃহে মানবশিশু সৃষ্টির সেই মহান কারিগর কে? কে সেই মহান আর্কিটেক্ট, যিনি ঐ গোপন কুঠরীতে পিতার ২৩টি ক্রোমোজম ও মাতার ২৩টি ক্রোমোজম একত্রিত করে সংমিশ্রিত বীর্য প্রস্তুত করেন? কে সেই মহান শিল্পী, যিনি রক্তপিণ্ড আকারের জীবন টুকরাটিকে মাতৃগর্ভে পুষ্ট করেন? অতঃপর ১২০ দিন পরে তাতে রূহ সঞ্চার করে তাকে জীবন্ত মানব শিশুতে পরিণত করেন এবং পূর্ণ-পরিণত হওয়ার পরে সেখান থেকে বাইরে ঠেলে দেন (*আবাসা ৮০/১৮-২০*)। বাপ-মায়ের স্বপ্নের ফসল হিসাবে নয়নের পুত্তলি হিসাবে? মায়ের গর্ভে মানুষ তৈরীর সেই বিস্ময়কর যন্ত্রের দক্ষ কারিগর ও সেই মহান শিল্পী আর কেউ নন, তিনি আল্লাহ! *সুবহানাল্লাহি ওয়া বেহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযীম!!*

পুরুষ ও নারীর সংমিশ্রিত বীর্যে সন্তান জন্ম লাভের তথ্য কুরআনই সর্বপ্রথম উপস্থাপন করেছে (*দাহ্‌র ৭৬/২*)। আধুনিক বিজ্ঞান এ তথ্য জনতে পেরেছে মাত্র গত শতাব্দীতে ১৮৭৫ সালে ও ১৯১২ সালে। তার পূর্বে এরিষ্টটল সহ সকল বিজ্ঞানীর ধারণা ছিল যে, পুরুষের বীর্যের কোন কার্যকারিতা নেই। রাসূলের হাদীছ বিজ্ঞানীদের এই মতকে সম্পূর্ণ বাতিল ঘোষণা করেছে।[১৬] কেননা সেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে সন্তান প্রজননে পুরুষ ও নারী উভয়ের বীর্য সমানভাবে কার্যকর।

উল্লেখ্য যে, মাতৃগর্ভে বীর্য প্রথম ৬ দিন কেবল বুদ্বুদ আকারে থাকে। তারপর জরায়ুতে সম্পর্কিত হয়। তিন মাসের আগে ছেলে বা মেয়ে সন্তান চিহ্নিত হয় না। চার মাস পর রূহ সঞ্চারিত হয়ে বাচ্চা নড়েচড়ে ওঠে ও আঙ্গুল চুষতে থাকে। যাতে ভূমিষ্ট হওয়ার পরে মায়ের স্তন চুষতে অসুবিধা না হয়। এ সময় তার কপালে চারটি বস্তু লিখে দেওয়া হয়। তার আজাল (হায়াত), আমল, রিযিক এবং সে ভাগ্যবান না দুর্ভাগা।[১৭]

এভাবেই জগত সংসারে মানববংশ বৃদ্ধির ধারা এগিয়ে চলেছে। এ নিয়মের ব্যতিক্রম নেই কেবল আল্লাহ্‌র হুকুম ব্যতীত। একারণেই আল্লাহ অহংকারী মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ‘মানুষ কি দেখে না যে, আমরা তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্রবিন্দু থেকে? অতঃপর সে হয়ে গেল প্রকাশ্যে বিতণ্ডাকারী’। ‘সে আমাদের সম্পর্কে নানারূপ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে। অথচ সে নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে ভুলে যায়, আর বলে যে, কে জীবিত করবে এসব হাড়গোড় সমূহকে, যখন সেগুলো পচে গলে যাবে? (*ইয়াসীন ৩৬/৭৭-৭৮*)।

জান্নাত থেকে পতিত হবার পর :

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে ছহীহ সনদে ইমাম আহমাদ, নাসাঈ ও হাকেম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ألست بربكم ‘আমি কি তোমাদের প্রভু নই? বনু আদমের কাছ থেকে এই বহুল প্রসিদ্ধ ‘আহদে আলাস্তু’ বা প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতিটি তখনই নেওয়া হয়, যখন আদম (আঃ)-কে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেওয়া হয়। আর এ প্রতিশ্রুতি নেওয়া

---

১৬. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৩৩-৪৩৪ ‘পবিত্রতা’ অধ্যায় ‘গোসল’ অনুচ্ছেদ।
১৭. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮২ ‘ঈমান’ অধ্যায় ‘তাক্বদীরে বিশ্বাস’ অনুচ্ছেদ।

হয়েছিল না'মান (وادى نَعْمَانَ) নামক উপত্যকায়, যা পরবর্তীকালে 'আরাফাত'-এর ময়দান নামে পরিচিত হয়েছে।[১৮] এর দ্বারা একটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, জান্নাত ও জাহান্নামের অবস্থান পৃথিবীর বাইরে অন্যত্র এবং তা সৃষ্ট অবস্থায় তখনও ছিল এখনও আছে। আধুনিক বিজ্ঞান এ পৃথিবী ও সৌরলোকের বাইরে দূরে বহুদূরে অগণিত সৌরলোকের সন্ধান দিয়ে কুরআন ও হাদীছের তথ্যকেই সপ্রমাণ করে দিচ্ছে।

আদমের অবতরণ স্থল :

আদম ও হাওয়াকে আসমানে অবস্থিত জান্নাত থেকে নামিয়ে দুনিয়ায় কোথায় রাখা হয়েছিল, সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। যেমন বলা হয়েছে আদমকে সরনদীপে (শ্রীলংকা) ও হাওয়াকে জেদ্দায় (সঊদী আরব) এবং ইবলীসকে বছরায় (ইরাক) ও ইবলাসের জান্নাতে ঢোকার কথিত বাহন সাপকে ইস্ফাহানে (ইরান) নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কেউ বলেছেন, আদমকে মক্কার ছাফা পাহাড়ে এবং হাওয়াকে মারওয়া পাহাড়ে নামানো হয়েছিল। এছাড়া আরও বক্তব্য এসেছে। তবে যেহেতু কুরআন ও ছহীহ হাদীছে এ বিষয়ে স্পষ্ট কিছু বলা হয়নি, সেকারণ এ বিষয়ে আমাদের চুপ থাকাই শ্রেয়।

'আহ্‌দে আলাস্তু-র বিবরণ :

মুসলিম ইবনে ইয়াসার (রাঃ) বলেন, কিছু লোক হযরত ওমর ফারূক (রাঃ)-এর নিকটে সূরা আ'রাফ ১৭২ আয়াতের মর্ম জানতে চাইলে তিনি বলেন, এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে প্রশ্ন করা হ'লে তাঁকে আমি বলতে শুনেছি যে, 'আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেন।[১৯] অতঃপর নিজের ডান হাত তার পিঠে বুলিয়ে দিলেন। তখন তার ঔরসে যত সৎ মানুষ জন্মাবার ছিল,

---

১৮. আহমাদ, মিশকাত হা/১২১ 'ঈমান' অধ্যায় 'তাক্বদীরে বিশ্বাস' অনুচ্ছেদ।

১৯. আয়াতটি হ'লঃ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِيْنَ. *'আর যখন তোমার পালনকর্তা বনু আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের সন্তানদের বের করে আনলেন এবং নিজের উপর তাদের প্রতিজ্ঞা করালেন 'আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই'? তারা বলল, অবশ্যই। 'আমরা এ বিষয়ে অঙ্গীকার করছি' আর এটা এজন্য, যাতে তোমরা ক্বিয়ামতের দিন একথা বলতে না পারো যে, বিষয়টি আমাদের জানা ছিল না' (আ'রাফ ৭/১১২)।*

তারা সব বেরিয়ে এল। আল্লাহ বললেন, এদেরকে আমি জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং এরা দুনিয়াতে জান্নাতেরই কাজ করবে। অতঃপর তিনি পুনরায় তার পিঠে হাত বুলালেন, তখন সেখান থেকে একদল সন্তান বের করে আনলেন এবং বললেন, এদেরকে আমি জাহান্নামের জন্যে সৃষ্টি করেছি। এরা দুনিয়াতে জাহান্নামের কাজই করবে। একথা শুনে জনৈক ছাহাবী প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! তাহ'লে আর আমল করানোর উদ্দেশ্য কি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যখন আল্লাহ কাউকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেন, তখন তিনি তাকে দিয়ে জান্নাতের কাজই করিয়ে নেন, এমনকি তার মৃত্যুও অনুরূপ কাজের মধ্যে হয়ে থাকে। অতঃপর আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। পক্ষান্তরে যখন তিনি কাউকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেন, তখন তাকে দিয়ে জাহান্নামের কাজই করিয়ে নেন। এমনকি তার মৃত্যুও অনুরূপ কাজের মধ্যে হয়ে থাকে। অতঃপর আল্লাহ তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করান।[২০] আবুদ্দারদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ডান মুষ্টির লোকগুলো ছিল সুন্দর চকচকে ক্ষুদ্র পিপীলিকা দলের ন্যায়। আর বাম মুষ্টির ক্ষুদ্র লোকগুলো ছিল কালো কয়লার ন্যায়'।[২১]

উল্লেখ্য যে, কুরআনে বলা হয়েছে, 'বনু আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে' *(আ'রাফ ১৭২)*। অন্যদিকে হাদীছে বলা হয়েছে, 'আদমের পৃষ্ঠদেশ' থেকে- মূলতঃ উভয়ের মধ্যে কোন বৈপরিত্য নেই। আদম যেহেতু বনু আদমের মূল এবং আদি পিতা, সেহেতু তাঁর পৃষ্ঠদেশ বলা আর বনু আদমের পৃষ্ঠদেশ বলা একই কথা। তাছাড়া আদমের দেহের প্রতিটি লোমকূপ থেকে অসংখ্য বনু আদমকে বের করে এনে উপস্থিত করানো আল্লাহ্র জন্য বিচিত্র কিছুই নয়।

মানুষ যেহেতু তার ভাগ্য সম্পর্কে জানে না, সেহেতু তাকে সর্বদা জান্নাত লাভের আশায় উক্ত পথেই কাজ করে যেতে হবে। সাধ্যমত চেষ্টা সত্ত্বেও ব্যর্থ হ'লে বুঝতে হবে যে, ওটাই তার তাকদীরের লিখন ছিল। বান্দাকে ভাল ও মন্দ দু'টি করারই স্বাধীন এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। আর এই ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের স্বাধীনতার কারণেই বনু আদম আল্লাহ্র সেরা সৃষ্টির মর্যাদায়

---

২০. মালেক, আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৯৫ 'ঈমান' অধ্যায় 'তাক্বদীরে বিশ্বাস' অনুচ্ছেদ।

২১. আহমাদ, মিশকাত হা/১১৯ 'তাক্বদীরে বিশ্বাস' অনুচ্ছেদ।

অভিষিক্ত হয়েছে। আর একারণেই তাকে তার ভাল ও মন্দ কাজের পরিণতি ভোগ করতে হয়।

এখানে আদমের ঔরস বলতে আদম ও তার ভবিষ্যৎ সন্তানদের ঔরস বুঝানো হয়েছে। এখানে ‘বংশধর’ বলতে তাদের অশরীরী আত্মাকে বুঝানো হয়নি, বরং আত্মা ও দেহের সমন্বয়ে জ্ঞান ও চেতনা সম্পন্ন ক্ষুদ্র অবয়ব সমূহকে বুঝানো হয়েছে, যাদের কাছ থেকে সেদিন সজ্ঞানে তাদের প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছিল। আর এটা আল্লাহ্র জন্য খুবই সহজ। আজকের বিজ্ঞান একটা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুর ভিতরে গোটা সৌরমণ্ডলীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে। ফিল্মের মাধ্যমে একটি বিরাটকায় বস্তুকে একটি ছোট্ট বিন্দুর আয়তনে দেখানো হচ্ছে। কাজেই আল্লাহ তা‘আলা যদি উক্ত অঙ্গীকার অনুষ্ঠানে সকল আদম সন্তানকে জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন করে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দেহে অণু-বিন্দুতে অস্তিত্ব দান করে থাকেন, তবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তাছাড়া জ্ঞানসম্পন্ন না হ’লে এবং বিষয়টি তাদের অনুধাবনে ও উপলব্ধিতে না আসলে এ ধরনের প্রতিশ্রুতি গ্রহণের ও অঙ্গীকার ঘোষণার কোন গুরুত্ব থাকে না।

প্রশ্ন হ’তে পারে যে, সৃষ্টির সূচনায় গৃহীত এই প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতির কথা পরবর্তীতে মানুষের ভুলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। তাহ’লে এ ধরনের প্রতিশ্রুতি গ্রহণের ফলাফলটা কি? এর জবাব এই যে, আদি পিতা-মাতা আদম-হাওয়ার রক্ত ও মানসিকতার প্রভাব যেমন যুগে-যুগে দেশে-দেশে সকল ভাষা ও বর্ণের মানুষের মধ্যে সমভাবে পরিদৃষ্ট হয়, তেমনিভাবে সেদিনে গৃহীত তাওহীদের স্বীকৃতি ও প্রতিশ্রুতির প্রভাব সকল মানুষের মধ্যেই কমবেশী বিদ্যমান রয়েছে। মানুষের অস্তিত্বই মানুষকে তার সৃষ্টিকর্তার সন্ধান দেয় ও বিপন্ন অবস্থায় তার কাছে আশ্রয় গ্রহণের জন্য তার হৃদয় ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

তাই তো দেখা গেছে, বিশ্ব ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম শাসক ও আল্লাহদ্রোহী ফেরাঊন ডুবে মরার সময় চীৎকার দিয়ে আল্লাহ্র উপরে তার বিশ্বাস ঘোষণা করেছিল’ *(ইউনুস ১০/৯০-৯১)*। মক্কা-মদীনার কাফের-মুশরিকরা শেষনবীর সাথে শত্রুতা পোষণ করলেও কখনো আল্লাহকে অস্বীকার করেনি। আধুনিক বিশ্বের নাস্তিকসেরা স্ট্যালিনকে পর্যন্ত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্ব মুহূর্তে ‘ওহ মাই গড’ বলে চীৎকার করে উঠতে শোনা গেছে। প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টির

সূচনালগ্নে গৃহীত উক্ত স্বীকারোক্তি প্রত্যেকটি মানুষের হৃদয়ে আল্লাহ্র অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাসের বীজ বপন করে দিয়েছে। চাই তার বিকাশ কোন শিরকী ও ভ্রান্ত পদ্ধতিতে হৌক বা নবীদের দেখানো সঠিক তাওহীদী পদ্ধতিতে হৌক।

এ কথাটাই হাদীছে এসেছে এভাবে যে, مَامِنْ مَوْلُوْدٍ إِلاَّ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبْوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ... 'প্রত্যেক মানবশিশুই ফিৎরাতের উপরে জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী-নাছারা বা মজূসী (অগ্নিউপাসক) বানায়'।[২২] এখানে 'ফিৎরাত' অর্থ স্বভাবধর্ম ইসলাম।[২৩] অর্থাৎ মানব শিশু কোন শিরকী ও কুফরী চেতনা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না। বরং আল্লাহকে চেনা ও তার প্রতি আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের চেতনা ও যোগ্যতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এর ফলে নবীদের প্রদত্ত তাওহীদের শিক্ষাকে সে অত্যন্ত সহজে ও সাগ্রহে বরণ করে নেয়। কেননা শুধু জন্মগত চেতনার কারণেই কেউ মুসলমান হ'তে পারে না। যতক্ষণ না সে নবীর মাধ্যমে প্রেরিত দ্বীন সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় কবুল করে।

ছহীহ মুসলিমের অপর বর্ণনায় এসেছে, وَإِنِّى خَلَقْتُ عِبَادِيْ حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَأَنَّهُمْ أَتَتْهُمْ الشَّيَاطِيْنُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِيْنِهِمْ... 'আল্লাহ বলেছেন, যে আমি আমার বান্দাদের 'হানীফ' অর্থাৎ 'আল্লাহ্র প্রতি একনিষ্ঠ' রূপে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর শয়তান তার পিছে লেগে তাকে আল্লাহ্র পথ থেকে দূরে নিয়ে গেছে।[২৪] আল্লাহ বলেন, فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللَّهِ 'আল্লাহ্র ফিৎরত, যার উপরে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্র এই সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই' *(রূম ৩০/৩০)*।

মোট কথা প্রত্যেক মানবশিশু স্বভাবধর্ম ইসলামের উপরে জন্মগ্রহণ করে এবং নিজ সৃষ্টিকর্তাকে চেনার ও তাকে মেনে চলার অনুভূতি ও যোগ্যতা নিয়ে সৃষ্টি

---

২২. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৯০ 'ঈমান' অধ্যায়, 'তাক্বদীরে বিশ্বাস' অনুচ্ছেদ।

২৩. যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, على فطرة الاسلام 'ইসলামের উপর' ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/১৩২; শু'আয়েব আরনাঊত্ব বলেন, রাবীগণ সকলে বিশ্বস্ত।

২৪. মুসলিম হা/২৮৬৫ 'জান্নাতের বিবরণ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১৬; আহমাদ হা/১৬৮৩৭।

হয়। যদিও পিতা-মাতা ও পরিবেশের কারণে কিংবা শয়তানের ওয়াসওয়াসায় পরবর্তীতে অনেকে বিভ্রান্ত হয়। অতএব কাফির-মুমিন-মুশরিক সবার মধ্যে আল্লাহকে চেনার ও তাঁর ইবাদত ও আনুগত্যের চেতনা ও যোগ্যতা বিদ্যমান রয়েছে। এই সৃষ্টিগত চেতনা ও অনুভূতিকে কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। অর্থাৎ কুশিক্ষা, কুসঙ্গ ও শয়তানী সাহিত্য পাঠ করে বা নষ্ট ব্লু ফিল্মের নীল দংশনে উক্ত চেতনাকে পরিবর্তনের চেষ্টা করা আল্লাহ্র সৃষ্টির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার শামিল। অতএব উক্ত সৃষ্টিগত চেতনাকে সমুন্নত রাখাই ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্তব্য।

একথা ব্যক্ত করে আল্লাহ বলেন, –وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ 'আমি জিন ও ইনসানকে আমার ইবাদত ব্যতীত অন্য কোন কাজের জন্য সৃষ্টি করিনি' *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*। অর্থাৎ আমি তার প্রকৃতিতে আমার প্রতি ইবাদত ও দাসত্বের আগ্রহ ও যোগ্যতা সৃষ্টি করে দিয়েছি। এটাকে সঠিক অর্থে কাজে লাগালে আমার অবাধ্যতামূলক কোন কাজ বান্দার দ্বারা সংঘটিত হবে না এবং জগতসংসারেও কোন অশান্তি ঘটবে না। যেমনভাবে কোন মুসলিম শিশু জন্মগ্রহণের সাথে সাথে তার কানে আযান শোনানো হয়।[২৫] অথচ ঐ শিশু আযানের মর্ম বুঝে না বা বড় হয়েও তার সেকথা মনে থাকে না। অথচ ঐ আযানের মাধ্যমে তার হৃদয়ে প্রোথিত হয়ে যায় তাওহীদ, রিসালাত ও ইবাদতের বীজ। যার প্রভাব সে আজীবন অনুভব করে। সে বে-আমল হ'লেও 'ইসলাম'-এর গণ্ডী থেকে খারিজ হয়ে যেতে তার অন্তর কখনোই সায় দেয় না। তার অবচেতন মনে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি আনুগত্য বোধ অক্ষুণ্ন থাকে। বিশেষ করে হতাশা ও বিপন্ন অবস্থায় সে তার প্রভুর সাহায্য ও সান্নিধ্য লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

অর্থ না বুঝলেও কুরআন পাঠ ও আযানের ধ্বনি মানুষের মনকে যেভাবে আকৃষ্ট করে এবং হৃদয়ে যে স্থায়ী প্রভাব ফেলে তার কোন তুলনা নেই। একারণেই কাফির আরব নেতারা মানুষকে কুরআন শুনতে দিত না। অথচ নিজেরা রাতের অন্ধকারে তা গোপনে আড়ি পেতে শুনত এবং একে জাদু বলত। শ্রেষ্ঠ আরব কবিগণ কুরআনের অলৌকিকত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করেন এমনকি অন্যতম শ্রেষ্ঠ আরবী কবি লাবীদ বিন রাবী'আহ কুরআন

---

২৫. আলবানী, ছহীহ তিরমিযী হা/১২২৪; মিশকাত হা/৪১৫৭ 'আক্বীক্বা' অনুচ্ছেদ।

শোনার পর কাব্যচর্চা পরিত্যাগ করেন। গত শতাব্দীর শুরুতে তুরস্কে ওছমানীয় খেলাফত উৎখাত করে কামাল পাশা ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা করেন এবং মসজিদ সমূহে আরবী আযান বন্ধ করে তুর্কী ভাষায় আযান দেওয়ার নির্দেশ জারি করেন। কিন্তু তাতে আরবী আযানের প্রতি মানুষের হৃদয়াবেগ আরও বৃদ্ধি পায়। ফলে গণবিদ্রোহ দেখা দিলে তিনি উক্ত আদেশ বাতিল করতে বাধ্য হন।

আধুনিক বিজ্ঞানও প্রমাণ করে দিয়েছে যে, শব্দ মানব মনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। তাই আল্লাহ প্রেরিত আযানের ধ্বনি সদ্যপ্রসূত শিশুর কচি মনে আজীবনের জন্য সুদূরপ্রসারী স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করবে- এটাই স্বাভাবিক। অতএব সৃষ্টির সূচনাকালের গৃহীত 'আহ্‌দে আলাস্তু' বা আল্লাহ্‌র প্রতি ইবাদত ও আনুগত্যের প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি মানব মনে জীবনব্যাপী স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে থাকে। যার কথা বারবার বান্দাকে স্মরণ করিয়ে দিতে হয় এবং যার বিরোধিতা করা আত্মপ্রবঞ্চনা করার শামিল।

'আহ্‌দে আলাস্তু-র উদ্দেশ্য :

আল্লাহ বলেন,

أَنْ تَقُولُوْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ، أَوْ تَقُولُوْا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ- (الأعراف ١٧٢-١٧٤)-

'(আমি পৃথিবীতে আবাদ করার আগেভাগে তোমাদের অঙ্গীকার এজন্যেই নিয়েছি) যাতে তোমরা ক্বিয়ামতের দিন একথা বলতে না পার যে, (তাওহীদ ও ইবাদতের) এ বিষয়টি আমাদের জানা ছিল না'। 'অথবা একথা বলতে না পার যে, শিরকের প্রথা তো আমাদের পূর্বে আমাদের বাপ-দাদারা চালু করেছিল। আমরা হ'লাম তাদের পরবর্তী বংশধর। তাহ'লে সেই বাতিলপন্থীরা যে কাজ করেছে, তার জন্য কি আপনি আমাদের ধ্বংস করবেন'? আল্লাহ বলেন, 'বস্তুতঃ এভাবে আমরা (আদিকালে ঘটিত) বিষয়সমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করলাম, যাতে তারা (অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা আমার পথে) ফিরে আসে' *(আ'রাফ ১৭২-১৭৪)*।

উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে বুঝা যায় যে, উক্ত প্রতিজ্ঞা ছিল দু'ধরনের। এক- আদিকালে ঘটিত প্রতিজ্ঞা (الميثاق الأزلي) এবং দুই- অহীর বিধানের আনুগত্য করার জাগতিক প্রতিজ্ঞা (والميثاق الإنزالي الحالي) যা প্রত্যেক নবীর আমলে তার উম্মতগণের উপরে ছিল অপরিহার্য।

অন্যান্য অঙ্গীকার গ্রহণ :

(১) নবী-রাসূলদের প্রতিশ্রুতি :

'আহ্দে আলাস্তুর মাধ্যমে সাধারণভাবে সকল আদম সন্তানের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণের পর আল্লাহ নবী-রাসূলদের কাছ থেকে বিশেষভাবে প্রতিশ্রুতি নেন; তারা যেন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রাপ্তব্য রেসালাতের বাণীসমূহ স্ব স্ব উম্মতের নিকটে যথাযথভাবে পৌঁছে দেন এবং এতে কারো ভয়-ভীতি ও অপবাদ-ভর্ৎসনার পরোয়া না করেন।

(২) উম্মতগণের প্রতিশ্রুতি :

অনুরূপভাবে বিভিন্ন নবীর উম্মতগণের কাছ থেকেও প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়, তারা যেন নিজ নিজ নবী-রাসূলদের আনুগত্য করে ও কোন অবস্থায় তাদের নাফরমানী না করে।

যেমন ছাহাবী উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) সূরা আ'রাফ ১৭২ আয়াত (অনুবাদঃ 'যখন তোমার প্রভু বনু আদমের পিঠ সমূহ থেকে তাদের সন্তানদের বের করে আনলেন')-এর ব্যাখ্যায় বলেন, অতঃপর আল্লাহ তাদের একত্রিত করলেন এবং নারী-পুরুষে বিভক্ত করলেন। অতঃপর তাদেরকে ভবিষ্যতের আকৃতি দান করলেন ও কথা বলার ক্ষমতা দিলেন। তখন তারা কথা বলল। অতঃপর আল্লাহ তাদের কাছ থেকে প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলেন এবং তাদেরকে নিজেদের উপরে সাক্ষী করে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তারা বলল, হ্যাঁ। আল্লাহ বললেন, আমি তোমাদের একথার উপর সাত আসমান ও সাত যমীনকে সাক্ষী করছি এবং তোমাদের উপর তোমাদের পিতা আদমকে সাক্ষী রাখছি, যাতে তোমরা ক্বিয়ামতের দিন একথা বলতে না পার যে, এ প্রতিশ্রুতির কথা আমরা জানতাম না।

তোমরা জেনে রাখ যে, আমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই ও আমি ব্যতীত কোন প্রতিপালক নেই। আর তোমরা আমার সাথে কাউকে শরীক করো না। সত্বর আমি তোমাদের নিকট আমার রাসূলগণকে পাঠাব। তাঁরা তোমাদেরকে আমার সাথে কৃত এই প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। আর আমি তোমাদের প্রতি আমার কিতাব সমূহ নাযিল করব। তখন তারা বলল, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই আপনি আমাদের প্রভু এবং উপাস্য। আপনি ব্যতীত আমাদের কোন প্রতিপালক নেই এবং আপনি ব্যতীত আমাদের কোন উপাস্য নেই। এভাবে তারা স্বীকৃতি দিল। অতঃপর আদমকে তাদের উপর উঠিয়ে ধরা হ'ল। তিনি তাদের দিকে দেখতে লাগলেন। তিনি দেখলেন তাদের মধ্যকার ধনী-গরীব, সুন্দর-অসুন্দর সবাইকে। তখন তিনি বললেন, হে প্রভু! আপনি কেন আপনার বান্দাদের সমান করলেন না? আল্লাহ বললেন, আমি চাই যে, এর ফলে আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হউক।

তিনি তাদের মধ্যে নবীগণকে দেখলেন প্রদীপ সদৃশ। তাঁদের নিকট থেকে পৃথকভাবে রিসালাত ও নবুঅতের দায়িত্ব পালনের বিশেষ অঙ্গীকার নেওয়া হয়। যে সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'যখন আমরা নবীগণের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করলাম এবং আপনার নিকট থেকেও এবং নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও মারিয়াম-পুত্র ঈসার নিকট থেকে' *(আহযাব ৩৩/৭)*। ঐ রূহগুলির মধ্যে ঈসার রূহ ছিল, যা মারিয়ামের কাছে পাঠানো হয়। উবাই থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, উক্ত রূহ মারিয়ামের মুখ দিয়ে প্রবেশ করে'।[২৬]

(৪) শেষনবীর জন্য প্রতিশ্রুতি :

এরপর সকল নবীর কাছ থেকে বিশেষ প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদাকে মেনে নেওয়ার জন্য, তাঁর অনুসরণের জন্য এবং তাঁর যুগ পেলে তাঁকে সাহায্য করার জন্য। যেমন- আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيْثَاقَ النَّبِيِّيْنَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِيْ قَالُوْا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوْا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِيْنَ- (آل عمران ٨١)-

---

২৬. আহমাদ, মওকূফ ছহীহ, মারফূ হুকমী, মিশকাত হা/১২২ 'তাক্বদীরে বিশ্বাস' অনুচ্ছেদ।

'আর আল্লাহ যখন নবীগণের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলেন যে, আমি যা কিছু তোমাদেরকে দান করেছি কিতাব ও হিকমত, অতঃপর তোমাদের নিকটে (যখন) রাসূল (শেষনবী) আসেন তোমাদের নিকট যা আছে (তাওরাত-ইঞ্জীল) তার সত্যয়নকারী হিসাবে, তখন সেই রাসূলের (শেষনবীর) প্রতি তোমরা ঈমান আনবে ও তাকে সাহায্য করবে। তিনি বললেন, তোমরা কি অঙ্গীকার করছ? এবং উপরোক্ত শর্তে তোমরা আমার ওয়াদা কবুল করে নিচ্ছ? তারা (নবীগণ) বলল, আমরা অঙ্গীকার করছি। তিনি (আল্লাহ) বললেন, তাহ'লে তোমরা সাক্ষী থাক। আর আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম' *(আলে ইমরান ৩/৮১)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ...، 'স্মরণ কর, যখন মারিয়াম-তনয় ঈসা বলল, হে ইস্রাঈল সন্তানগণ! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল এবং আমার পূর্ববর্তী তাওরাত কিতাবের সত্যয়নকারী। আর আমি একজন রাসূলের সুসংবাদ দানকারী, যিনি আমার পরে আসবেন, যার নাম হবে 'আহমাদ'... *(ছফ ৬১/৬)*।

উপরোক্ত আয়াত দ্বয়ে বুঝা যায় যে, বিগত সকল নবী যেমন তাঁর পূর্ববর্তী নবীর সত্যয়নকারী ছিলেন, তেমনি সকল নবী স্ব স্ব উম্মতের নিকটে শেষনবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আগমনবার্তা শুনিয়ে গেছেন ও তাঁর প্রতি ঈমান, আনুগত্য ও তাঁকে সার্বিকভাবে সাহায্য করার জন্য অছিয়ত করে গেছেন। এদিক দিয়ে শেষনবী যে বিশ্বনবী ছিলেন এবং তাঁর আনীত শরী'আতের মধ্যে বিগত সকল শরী'আত যে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে, তা পরিষ্কার হয়ে যায়।

(৫) ইহুদী পণ্ডিতদের প্রতিশ্রুতি :

উপরোক্ত ওয়াদা ছাড়াও ইহুদী-নাছারা পণ্ডিতদের কাছ থেকে বিশেষ প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়, যাতে তারা সত্য গোপন না করে। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ أُوتُوْا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوْهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيْلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ– (آل عمران ١٨٧)–

‘আর আল্লাহ যখন আহলে কিতাবদের (পণ্ডিতদের) নিকট থেকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন যে, তারা তা লোকদের নিকটে বর্ণনা করবে ও তা গোপন করবে না। তখন তারা সে প্রতিজ্ঞাকে পিছনে রেখে দিল, আর তা বেচা-কেনা করল সামান্য পয়সার বিনিময়ে। কতই না মন্দ তাদের এ বেচা-কেনা’ *(আলে ইমরান ৩/১৮৭)*।

(৬) সাধারণ বনু ইস্রাঈলগণের প্রতিশ্রুতি :

অতঃপর বনু ইস্রাঈলের সাধারণ লোকদের কাছ থেকেও প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَقُولُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُوْنَ– (البقرة ٨٣)–

‘যখন আমরা বনু ইস্রাঈলগণের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিলাম এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারু ইবাদত করবে না। আর তোমরা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন ও ইয়াতীম-মিসকীনদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে এবং মানুষের সাথে সুন্দর কথা বলবে, ছালাত কায়েম করবে ও যাকাত আদায় করবে। কিন্তু কিছু লোক ব্যতীত তোমরা সবাই মুখ ফিরিয়ে নিলে এবং তোমরা তা অগ্রাহ্য করলে’ *(বাক্বারাহ ২/৮৩)*।

বলা বাহুল্য যে, অধিকাংশ নবী বনু ইস্রাঈল থেকেই হয়েছেন। কিন্তু বনু ইস্রাঈলরাই অধিকাংশ নবীকে হত্যা করেছে, তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, তাদের ঐশী কিতাবসমূহকে পরিবর্তন ও বিকৃত করেছে, তাদের নবীদের চরিত্র হনন করেছে, তাদের নামে কলংক লেপন করেছে এবং অবশেষে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে চিনতে পেরেও *(বাক্বারাহ ২/১৪৬; আন‘আম ৬/২০)* না চেনার ভান করেছে ও তাঁর সঙ্গে চূড়ান্ত গাদ্দারী করেছে। অবশ্য তাদের মধ্যে অনেকে (قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا) ঈমান এনে ধন্য হয়েছিলেন এবং

আল্লাহ্র নিকটে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছিলেন।[২৭] যেমন খ্যাতনামা ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম, আদী ইবনে হাতেম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। এতদ্ব্যতীত হাবশার খৃষ্টান বাদশাহ নাজ্জাশী নিজে তো শেষনবীর উপরে বিশ্বাসী ছিলেন। অধিকন্তু তিনি আবিসিনিয়ার ৬২ জন ও সিরিয়ার ৮ জন মোট ৭০ জনের একটি শীর্ষস্থানীয় খৃষ্টান ধর্মীয় প্রতিনিধিদলকে মদীনায় প্রেরণ করেন। তাঁরা রাসূলের মুখে সূরা ইয়াসীন শুনে অবিরল ধারায় অশ্রু বিসর্জন দেন। অতঃপর সবাই ইসলাম গ্রহণ করেন'। তাদের প্রত্যাবর্তনের পর নাজ্জাশী নিজের ইসলাম কবুলের কথা ঘোষণা করেন এবং একখানা পত্র লিখে স্বীয় পুত্রের নেতৃত্বে আরেকটি প্রতিনিধিদল মদীনায় প্রেরণ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে জাহায ডুবির কারণে তারা সবাই পথিমধ্যে মৃত্যুবরণ করেন।[২৮]

আদমের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব :

'আশরাফুল মাখলূক্বাত' বা সেরা সৃষ্টি হিসাবে আল্লাহ আদম ও বনু আদমকে সৃষ্টি করেন। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلاً- (الإسراء ٧٠)-

'আমরা বনু আদমকে উচ্চ সম্মানিত করেছি, তাদেরকে স্থল ও জলপথে বহন করে নিয়েছি, তাদেরকে পবিত্র বস্তু সমূহ হ'তে খাদ্য দান করেছি এবং আমাদের বহু সৃষ্টির উপরে তাদেরকে উচ্চ মর্যাদা প্রদান করেছি' *(ইসরা ১৭/৭০)*।

এখানে প্রথমে كَرَّمْنَا শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষকে এমন কিছু বিষয়ে একচ্ছত্র সম্মান দানের কথা বলা হয়েছে, যা অন্য কোন সৃষ্টিকে দেওয়া হয়নি। যেমন জ্ঞান-বিবেক, চিন্তাশক্তি, ভাল-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্যবোধ, স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা ইত্যাদি। অতঃপর فَضَّلْنَا শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে অন্যের তুলনায় মানুষকে উচ্চ মর্যাদা দানের কথা

---

২৭. মায়েদাহ ৫/৮২; ক্বাছাছ ২৮/৫২-৫৪; ঐ, তাফসীর ত্বাবারী ২০/৫৬ পৃ: ; তাফসীর ইবনু কাছীর; ত্বাবারী ৩২+৮=৪০ জন এবং ইবনু কাছীর ৭০ জন বলেছেন।

২৮. মুফতী মুহাম্মাদ শফী, তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন (বঙ্গানুবাদ সংক্ষেপায়িত : মদীনা ত্বাইয়েবা ১৪১৩/১৯৯৩), পৃঃ ৩৪০।

বলা হয়েছে। যেমন মানুষের উন্নত হ'তে উন্নততর জীবন যাপন প্রণালী, গৃহ নির্মাণ পদ্ধতি, খাদ্য গ্রহণ, পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদিতে উন্নততর রুচিশীলতা, আইনানুগ ও সমাজবদ্ধ জীবনযাপন প্রভৃতি বিষয়গুলি অন্যান্য প্রাণী হ'তে বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত এবং নানা বৈচিত্র্যে ভরপুর। তাতে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন, পরিবর্ধন, বিবর্তন ও উন্নয়ন অব্যাহত রয়েছে। অথচ বাবুই পাখির নীড় রচনা কিংবা বনে-জঙ্গলে বাঘ-শৃগালের বসবাস পদ্ধতি লক্ষ বছর ধরে অপরিবর্তিত রয়েছে। না তাতে অতীতে কোন পরিবর্তন এসেছে, না ভবিষ্যতে কোন পরিবর্তন আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

মানুষ জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে উন্নত হ'তে উন্নততর পরিবহনে চলাফেরা ও ব্যবসা-বাণিজ্য করছে। তারা পৃথিবীর সর্বোত্তম খাদ্যসমূহ গ্রহণ করছে, উন্নত পাক-প্রণালীর মাধ্যমে সুস্বাদু খাবার গ্রহণ ও সর্বোত্তম পানীয় পান করছে, যা অন্য প্রাণীর পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়।

মানব মর্যাদার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিষয় হচ্ছে তাকে কথা বলার শক্তি দান করা, যা অন্য কোন সৃষ্টিকে দেওয়া হয়নি। তাকে দেওয়া হয়েছে ভাষা ও রঙের বৈচিত্র্য, দেওয়া হয়েছে লিখনক্ষমতা এবং উন্নত সাহিত্য জ্ঞান ও অলংকার সমৃদ্ধ বাক্য গঠন ও কাব্য রচনার যোগ্যতা, যা অন্য কোন সৃষ্টিকে দেওয়া হয়নি।

মানব মর্যাদার অন্যতম বিষয় হ'ল, বিশ্বের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল সৃষ্টিকে মানুষের অনুগত করে দেওয়া হয়েছে *(লোকমান ৩১/২০)*। যেন আল্লাহ্‌র যাবতীয় সৃষ্টিকর্মের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষ। মানুষের জন্যই যেন সবকিছু। সূর্যের কিরণ, চন্দ্রের জ্যোতি, গ্রহ-নক্ষত্রের মিটিমিটি আলো, বাতাসের মৃদুমন্দ প্রবাহ, পানির জীবনদায়িনী ক্ষমতা, মাটির উর্বরা শক্তি, আগুনের দাহিকা শক্তি, বিদ্যুতের বহু মাত্রিক কল্যাণকারিতা, মাঠভরা সবুজ শস্যভাণ্ডার, গাছ ভরা ফল-ফলাদি, বাগিচায় রং-বেরংয়ের ফুলের বাহার, পুকুর-নদী-সাগর ভরা নানা জাতের মাছ ও মণি-মুক্তার সমাহার, ভূগর্ভে সঞ্চিত স্বর্ণ-রৌপ্য ও খনিজ সম্পদরাজি ও তৈল-গ্যাসের আকর, গোয়াল ও জঙ্গলভরা পশু-পক্ষীর আবাস কাদের জন্য? এক কথায় জবাব: এসবই কেবল মানুষের জন্য। আল্লাহ বলেন, هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً 'তিনিই

সেই সত্তা, যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীর সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন' *(বাক্বারাহ ২/২৯)*।

প্রশ্ন হ'ল: সবই যখন মানুষের জন্য, তাহ'লে মানুষ কার জন্য? তারও জবাব একটাই: 'আমরা আল্লাহ্র জন্য, এবং আমরা তাঁর কাছেই ফিরে যাব' *(বাক্বারাহ ২/১৫৬)*। 'আমরা এসেছি তাঁর ইবাদতের জন্য, সর্বক্ষেত্রে তাঁর দাসত্বের জন্য *(যারিয়াত ৫১/৫৬)* এবং দুনিয়ায় তাঁর খেলাফত পরিচালনার জন্য' *(বাক্বারাহ ২/৩০)*।। বিশ্বলোকে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্র ইবাদতে রত। সবই একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য *(লোকমান ৩১/২৯)* নির্দিষ্ট নিয়মের অধীনে পরিচালিত *(ফাতির ৩৫/৪৩)*। সবই আল্লাহ্র অনুগত ও তাঁর প্রতি সিজদায় অবনত এবং কেবল তাঁরই গুণগানে রত। জগত সংসার পরিচালনার এই সুনির্দিষ্ট নিয়মটাই হ'ল 'দ্বীন' এবং এই দ্বীনের প্রতি নিখাদ আনুগত্য ও আত্মসমর্পণকেই বলা হয় 'ইসলাম'। এজন্যেই বলা হয়েছে إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّٰهِ الإِسْلاَمُ। 'আল্লাহ্র নিকটে 'দ্বীন' হ'ল কেবল 'ইসলাম' *(আলে ইমরান ৩/১৯)*।

ইসলামের দু'টি দিক রয়েছে, প্রাকৃতিক ও মানবিক। প্রথমটি সমস্ত বিশ্ব প্রকৃতিতে পরিব্যপ্ত। যেখানে সবকিছু সরাসরি আল্লাহ কর্তৃক প্রাকৃতিক নিয়মে পরিচালিত। যে নিয়মের কোন ব্যত্যয় নেই কোন ব্যতিক্রম নেই (আল্লাহ্র বিশেষ হুকুম ব্যতীত) *(ইউসুফ ১২/৪০; আহযাব ৩৩/৬২; ইসরা ১৭/৭৭)*।

দ্বিতীয়টি অর্থাৎ মানবিক জীবন পরিচালনার ব্যবহারিক নীতি-নিয়ম যা আল্লাহ যুগে যুগে নবী-রাসূলদের মাধ্যমে পাঠিয়েছেন। একেই বলে ইসলামী শরী'আত। যা আদম *আলাইহিস সালামের* মাধ্যমে শুরু হয়ে শেষনবী মুহাম্মাদ *ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের* মাধ্যমে শেষ হয়েছে ও পূর্ণতা লাভ করেছে *(মায়েদাহ ৫/৩)*। উল্লেখ্য যে, আভিধানিক অর্থে বিগত সকল নবীর দ্বীনকে ইসলাম বলা গেলেও পারিভাষিকভাবে শেষনবীর নিকটে প্রেরিত সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ দ্বীনকেই কেবল 'ইসলাম' বলা হয়ে থাকে। আল্লাহ বলেন,

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ
ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ- (الروم ٣٠)-

'তুমি তোমার চেহারাকে দ্বীনের জন্য একনিষ্ঠ কর। এটিই আল্লাহ্‌র ফিৎরাত, যার উপরে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্‌র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই হ'ল সরল ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না' *(রূম ৩০/৩০)*।

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা অপরিবর্তনীয় দ্বীনের প্রতি মানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে বলেছেন, সেটি হ'ল সেই দ্বীন, যা বিশ্বলোকে প্রাকৃতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত। মানুষের দেহসত্তায় ও জীবন প্রবাহে উক্ত দ্বীন প্রতিবিম্বিত। উক্ত দ্বীনের প্রতি আনুগত্যের কারণেই পিতার সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম শুক্রাণু থেকে মাতৃগর্ভে ভ্রুণ সৃষ্টি হয়। অতঃপর নির্ধারিত সময়ে তা সুন্দর ফুটফুটে মানবশিশু রূপে দুনিয়াতে ভূমিষ্ট হয়। অতঃপর শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও প্রৌঢ়ত্ব পেরিয়ে সে বার্ধক্যে উপনীত হয় ও এক সময় তার মৃত্যু হয়। দেহের এই জন্ম-মৃত্যুর নিয়মের কোন পরিবর্তন নেই। এক্ষেত্রে মানুষ সহ সকল সৃষ্টজীব ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় আল্লাহ্‌র অলংঘনীয় বিধানের প্রতি আনুগত্যশীল ও আত্মসমর্পিত 'মুসলিম' *(আলে ইমরান ৩/৮৩; রা'দ ১৩/১৫)*। এটা হ'ল 'ইসলাম'-এর প্রাকৃতিক দিক, যা মানতে প্রত্যেক মানুষ বাধ্য। মানুষের দেহ তাই প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। কিন্তু জ্ঞানের দিক দিয়ে সে স্বাধীন। সে তার জ্ঞানকে স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করতে পারে।

মানুষের বাহ্যিক আকৃতির শ্রেষ্ঠত্বের সাথে তার আধ্যাত্মিক দিকের সংযোগ এক অসাধারণ ব্যাপার। অথচ বিশ্বলোকের অন্যান্য সৃষ্টির বাইরের দিক ও ভিতরের দিকের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। চন্দ্র-সূর্যের সবটাই আলো, পশুর সবটাই পশুত্বে ভরা। কিন্তু মানুষের বাইরের দিকের সাথে ভিতরের দিকের কোন মিল নেই। বরং তা আরও জটিল ও দুর্বোধ্য। মানুষের দৈহিক অবয়বের মধ্যে ওটা একটা আলাদা জগত। যা দেখা যায় না, কেবল উপলব্ধি করা যায়। মানুষ যেমন ষড় রিপু সমৃদ্ধ একটি জৈবিক সত্তা, তেমনি সে একটি বিবেকবান নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সত্তা। মানুষের দেহ জগতের চিকিৎসা ও আরাম-আয়েশের উপকরণ তাই কমবেশী সর্বত্র প্রায় সমান হ'লেও তার মনোজগতের চিকিৎসা ও সুখ-দুঃখের অনুভূতি সবার জন্য সমান নয়। মনোজগতে শয়তানের তাবেদার হয়ে সে অনেক সময় তার বাহ্যিক দেহ জগতকে ধ্বংস করে দেয়। মূলতঃ মনোজগতে লালিত ধারণা ও বিশ্বাসই মানুষের কর্মজগতে প্রতিফলিত হয়। তাই দয়ালু আল্লাহ তাঁর প্রিয়

সৃষ্টি মানুষের সার্বিক জীবন সঠিক পথে পরিচালনার জন্য যুগে যুগে নবীগণের মাধ্যমে এলাহী হেদায়াত সমূহ পাঠিয়েছেন। প্রাকৃতিক দ্বীন-এর মত এই দ্বীনও অপরিবর্তনীয় ও চিরকল্যাণময়। আর সেটাই হ'ল ইসলামের বাহ্যিক মানবিক দিক। উক্ত মানবিক দিক পরিচালনার উদ্দেশ্যে যে দ্বীন নবীদের মাধ্যমে প্রেরিত হয়েছে, তা গ্রহণ ও পালনের স্বাধীন এখতিয়ার মানুষকে দেওয়া হয়েছে *(কাহফ ১৮/২৯; দাহর ৭৬/৪)*।

এ দ্বীন বা শরী'আতের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণে মানুষ দুনিয়ায় শান্তি পাবে ও আখেরাতে জান্নাত লাভে ধন্য হবে। আর তা অমান্য করলে দুনিয়ায় অশান্তি ভোগ করবে ও পরকালে জাহান্নামের আগুনে দগ্ধীভূত হবে *(বাক্বারাহ ২/৩৮-৩৯; তাগাবুন ৬৪/ ৯-১০)*।

বলা বাহুল্য, এ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিই মানুষের 'সৃষ্টির সেরা' হওয়ার মূল কারণ। এতেই তার পরীক্ষা এবং এতেই তার জান্নাত বা জাহান্নাম। মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের সবচেয়ে বড় দিক হ'ল এ পৃথিবীতে আল্লাহ্র খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা। কেননা তাকে 'আল্লাহ্র খলীফা' হিসাবেই দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে।[২৯] এ দুনিয়াকে আল্লাহ্র ইচ্ছা অনুযায়ী সুন্দরভাবে আবাদ করা এবং অহীর বিধান অনুযায়ী সার্বিক জীবন পরিচালনার মাধ্যমে আল্লাহ্র প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করাই তার প্রধান কাজ। খেলাফতের এ দায়িত্ব সে ব্যক্তি জীবনে যেমন পালন করবে, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনেও তেমনি পালন করবে। সর্বত্র সে আল্লাহ্র বিধানের প্রতি আনুগত্যশীল বান্দা হিসাবে নিজেকে প্রমাণ করবে। এই গুরু দায়িত্ব আসমান-যমীন, পাহাড়-পর্বত কেউ গ্রহণ করতে সাহসী হয়নি। মানুষ স্বেচ্ছায় এ দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল *(আহযাব ৩৩/৮২)*। কিন্তু দুনিয়ায় এসে এর চাকচিক্য দেখে মানুষ মোহগ্রস্ত হয়ে গেছে ও আল্লাহ্র খেলাফতের দায়িত্ব পালনের কথা ভুলে গেছে। কেউবা তাতে অলসতা দেখাচ্ছে, কেউবা অস্বীকার করছে। তবুও ক্বিয়ামত-প্রাক্কাল অবধি একদল লোক চিরদিন থাকবে, যারা এ দায়িত্ব পালন করে যাবে।[৩০] আল্লাহ বলেন, وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ– 'আমরা যাদের সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে একটি দল রয়েছে, যারা সত্য পথ দেখায় ও সেমতে

---

২৯. বাক্বারাহ ২/৩০; আন'আম ৬/১৬৫; ফাত্বির ৩৫/৩৯।
৩০. মুসলিম, হা/১৯২০ 'নেতৃত্ব' অধ্যায়।

ন্যায়বিচার করে' *(আ'রাফ ৭/১৮১)*। অতঃপর তিনি বলেন, سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ 'হে জিন ও ইনসান! অতিসত্বর আমরা তোমাদের ব্যাপারে মনোনিবেশ করব' *(রহমান ৫৫/৩১)*। অর্থাৎ একটি বিশেষ মুহূর্তে দুনিয়াতে তোমাদের পরীক্ষা গ্রহণের এই ধারা সহসাই বন্ধ হয়ে যাবে এবং তোমাদেরকে পুনর্জীবিত করে হাশরের ময়দানে একত্রিত করা হবে। সেদিন আমার সুক্ষ্ম বিচারের হাত থেকে তোমরা কেউই রেহাই পাবে না।

জিনদের আল্লাহ আগেই সৃষ্টি করেন আগুন থেকে। তারাও ছিল স্বাধীন এখতিয়ার সম্পন্ন। কিন্তু তারা অবাধ্যতা করেছিল। অনেকে জিনকে চর্ম চক্ষুতে দেখতে পায় না বলে তাদেরকে অস্বীকার করে। অথচ বহু জিনিষ রয়েছে যা মানুষ বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখতে পায় না। তাই বলে তাদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না। যেমন বিদ্যুৎ, বায়ু প্রবাহ, বস্তুর স্বাদ ও গন্ধ ইত্যাদি। মানুষের নবীই জিনদের নবী। তাদের মধ্যে মুমিন, কাফির, ফাসিক সবই রয়েছে। জিনেরা যে এলাকায় বাস করে সে এলাকার মানুষের ভাষা তারা বুঝে। নবুঅতের দশম বছরে ত্বায়েফ থেকে ফেরার পথে 'নাখলা' উপত্যকায় জিনেরা রাসূলের কণ্ঠে সূরা রহমান শুনেছিল ও যতবারই আল্লাহ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ বলেছেন, ততবারই তারা জবাবে বলেছিল, *লা বেশাইয়িন মিন নি'আমিকা রব্বানা নুকাযযিবু ফালাকাল হাম্‌দ*।[৩১] তারা মানুষের কথা শোনে, বুঝে ও উপলব্ধি করে। আল্লাহ্র কিতাব জিন ও ইনসান সবার জন্য। অতএব তাদের পরিণতি ও মানুষের পরিণতি একই।

বস্তুতঃ আদম ও বনু আদম হ'ল আল্লাহ্র সর্বাধিক প্রিয় ও সেরা সৃষ্টি। মৃত্যুকাল অবধি তাকে এ দুনিয়ার পরীক্ষাগারে অবস্থান করতে হবে একজন সজাগ ও সক্রিয় পরীক্ষার্থী হিসাবে। মৃত্যুর পরেই তার ক্বিয়ামত শুরু হয়ে যাবে। ভাল-মন্দ কর্মের সুযোগ আর থাকবে না। তাই আল্লাহ প্রেরিত অহীর বিধান মেনে চলে কল্যাণময় জীবন পরিচালনার মাধ্যমে আল্লাহ্র সেরা সৃষ্টির মর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখে দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়াই বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য।

---

৩১. *তিরমিযী হা/৩৫২২ 'তাফসীর' অধ্যায় সূরা রহমান; সনদ হাসান, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২১৫০।*

মনে রাখতে হবে যে, ‘আমরা সবাই আল্লাহ্‌র জন্য এবং আমরা সবাই তাঁর দিকেই ফিরে যাব’ *(বাক্বারাহ ২/১৫৬)*। ‘আমাদের ছালাত, আমাদের কুরবানী, আমাদের জীবন, আমাদের মরণ সবকিছুই কেবলমাত্র বিশ্বপ্রভু আল্লাহ্‌র জন্য’ *(আন‘আম ৬/১৬৩)*। জান্নাত থেকে নিক্ষিপ্ত বনু আদম আমরা যেন পুনরায় জান্নাতে ফিরে যেতে পারি, করুণাময় আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন- আমীন!!

দুনিয়াবী ব্যবস্থাপনায় আদম (আঃ) :

হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী (রহঃ) الطب النبوى কেতাবে বলেন, মানুষের দুনিয়াবী জীবনে প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার শিল্পকর্ম অহীর মাধ্যমে কোন না কোন নবীর হাতে শুরু হয়েছে। অতঃপর যুগে যুগে তার উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। সর্বপ্রথম আদম (আঃ)-এর উপরে যে সব অহী নাযিল করা হয়েছিল, তার অধিকাংশ ছিল ভূমি আবাদ করা, কৃষিকার্য ও শিল্প সংক্রান্ত। যাতায়াত ও পরিবহনের জন্য চাকা চালিত গাড়ী সর্বপ্রথম আদম (আঃ) আবিষ্কার করেন। কালের বিবর্তনে নানাবিধ মডেলের গাড়ী এখন চালু হয়েছে। কিন্তু সব গাড়ীর ভিত্তি হ’ল চাকার উপরে। বলা চলে যে, সভ্যতা এগিয়ে চলেছে চাকার উপরে ভিত্তি করে। অতএব যিনি প্রথম এটা চালু করেন, তিনিই বড় আবিষ্কারক। আর তিনি ছিলেন আমাদের আদি পিতা প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী হযরত আদম *(আলাইহিস সালাম)*। যা তিনি অহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়েছিলেন।[৩২] আদমের যুগে পৃথিবীর প্রথম কৃষিপণ্য ছিল ‘তীন’ ফল। ফিলিস্তীন ভূখণ্ড থেকে সম্প্রতি প্রাপ্ত সে যুগের একটি আস্ত তীন ফলের শুষ্ক ফসিল পরীক্ষা করে একথা প্রমাণিত হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ‘তীন’ ফলের শপথ করেছেন। আল্লাহ আমাদের আদি পিতার উপরে শান্তি বর্ষণ করুন- আমীন!

আদম পুত্রদ্বয়ের কাহিনী :

আল্লাহ বলেন, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. ‘আপনি ওদেরকে (আহলে কিতাবদেরকে) আদম পুত্রদ্বয়ের যথার্থ কাহিনী শুনিয়ে দিন। যখন তারা উভয়ে কুরবানী পেশ করল। অতঃপর তাদের একজনের কুরবানী কবুল

৩২. *তাসফীর মা‘আরেফুল কুরআন পৃঃ ৬২৯।*

হ'ল। কিন্তু অপরজনের কুরবানী কবুল হ'ল না। তখন একজন বলল, আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব। জবাবে অপরজন বলল, আল্লাহ কেবলমাত্র আল্লাহভীরুদের থেকেই কবুল করেন' *(মায়েদাহ ২৭)*। 'যদি তুমি আমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে হাত বাড়াও, আমি তোমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে হাত বাড়াবো না। আমি বিশ্বপ্রভু আল্লাহকে ভয় করি' *(২৮)*। 'আমি মনে করি এর ফলে তুমি আমাকে হত্যার পাপ ও তোমার অন্যান্য পাপসমূহের বোঝা নিয়ে জাহান্নামবাসী হবে। আর সেটাই হ'ল অত্যাচারীদের কর্মফল' *(২৯)*। 'অতঃপর তার মন তাকে ভ্রাতৃহত্যায় প্ররোচিত করল এবং সে তাকে হত্যা করল। ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হ'ল' *(৩০)*। 'অতঃপর আল্লাহ একটি কাক পাঠালেন। যে মাটি খনন করতে লাগল এটা দেখানোর জন্য যে কিভাবে সে তার ভাইয়ের মৃতদেহ দাফন করবে। সে বলল, হায়! আমি কি এই কাকটির মতোও হ'তে পারলাম না, যাতে আমি আমার ভাইয়ের মৃতদেহ দাফন করতে পারি। অতঃপর সে অনুতপ্ত হ'ল' *(মায়েদাহ ৫/২৭-৩১)*।

কুরআনের উক্ত বর্ণনা ছাড়াও 'জাইয়িদ' (উত্তম) সনদ সহ আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে 'মওকূফ' সূত্রে যা যা বর্ণিত হয়েছে এবং হাফেয ইবনু কাছীর যাকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী একাধিক বিদ্বানগণের 'মশহূর' বক্তব্য বলে স্বীয় তাফসীরে ও তারীখে উল্লেখ করেছেন, সে অনুযায়ী আদম পুত্রদ্বয়ের নাম ছিল ক্বাবীল ও হাবীল (قابيل وهابيل) এবং ক্বাবীল ছিল আদমের প্রথম সন্তান ও সবার বড় এবং হাবীল ছিল তার ছোট।

হত্যাকাণ্ডের কারণ :

এ বিষয়ে কুরআন যা বলেছে তা এই যে, দু'ভাই আল্লাহ্র নামে কুরবানী করেছিল। কিন্তু আল্লাহ একজনের কুরবানী কবুল করেন, অন্যজনেরটা করেননি। তাতে ক্ষেপে গিয়ে একজন অন্যজনকে হত্যা করে, যার কুরবানী কবুল হয়েছিল।

উল্লেখ্য যে, সে যুগে কুরবানী কবুল হওয়ার নিদর্শন ছিল এই যে, আসমান থেকে একটি আগুন এসে কুরবানী নিয়ে অন্তর্হিত হয়ে যেত। যে কুরবানীকে উক্ত অগ্নি গ্রহণ করত না, সে কুরবানীকে প্রত্যাখ্যাত মনে করা হ'ত। ক্বাবীল কৃষিকাজ করত। সে কার্পণ্য বশে কিছু নিকৃষ্ট প্রকারের শস্য, গম ইত্যাদি কুরবানীর জন্য পেশ করল। হাবীল পশু পালন করত। সে আল্লাহ্র মহব্বতে

তার উৎকৃষ্ট দুম্বাটি কুরবানী করল। অতঃপর আসমান থেকে আগুন এসে হাবীলের কুরবানীটি নিয়ে গেল। কিন্তু কাবীলের কুরবানী যেমন ছিল, তেমনি পড়ে রইল। এতে ক্বাবীল ক্ষুব্ধ হ'ল এবং হাবীলকে বলল, لَأَقْتُلَنَّكَ 'আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব'। হাবীল তখন তাকে উপদেশ দিয়ে মার্জিত ভাষায় বলল, إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাক্বওয়াশীল বান্দাদের থেকে (কুরবানী) কবুল করে থাকেন। এক্ষণে যদি তুমি আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হও, তবে আমি তোমাকে পাল্টা হত্যা করতে উদ্যত হব না। কেননা আমি বিশ্বচরাচরের পালনকর্তা আল্লাহ্‌কে ভয় করি' *(মায়েদাহ ৫/২৭-২৮)*।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, হাবীলের কুরবানী দেওয়া দুম্বাটিই পরবর্তীতে ইবরাহীম (আঃ) কর্তৃক ইসমাঈলকে কুরবানীর বিনিময় হিসাবে জান্নাত থেকে পাঠানো হয়।[৩৩]

আহলে কিতাব-এর মধ্যে যুগ যুগ ধরে প্রসিদ্ধি আছে যে, হত্যাকাণ্ডের স্থলটি ছিল উত্তর দামেস্কে 'ক্বাসিয়ূন' (قاسيون) পাহাড়ের একটি গুহায়। যা আজও 'রক্তগুহা' (مغارة الدم) নামে খ্যাত। যদিও এর কোন নিশ্চিত ভিত্তি নেই।[৩৪]

কুরতুবী বলেন, ক্বাবীল স্রেফ হিংসা বশে হাবীলকে হত্যা করেছিল। সে চায়নি যে, ছোট ভাই হাবীল তার চাইতে উত্তম ব্যক্তি হিসাবে সমাজে প্রশংসিত হৌক *(তাফসীর কুরতুবী)* ইবনু কাছীর বলেন, ইতিপূর্বে মায়েদাহ ২০ হ'তে ২৬ আয়াত পর্যন্ত ৭টি আয়াতে মূসার প্রতি বনু ইস্রাঈলের অবাধ্যতা এবং তার শাস্তি স্বরূপ তীহ প্রান্তরে তাদের দীর্ঘ ৪০ বছরের বন্দীত্ব বরণের লাঞ্ছনাকর ইতিহাস শুনানোর পর মদীনার ইহুদীদেরকে আদম পুত্রদ্বয়ের পারস্পরিক হিংসার মর্মান্তিক পরিণামের কথা শুনানো হয়েছে একারণে যে,

---

৩৩. তাফসীর ইবনু কাছীর, মায়েদাহ ২৭-৩১ আয়াত; গৃহীত। তাফসীর ইবনু জারীর, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে, সনদ জাইয়িদ।

৩৪. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তাবি) ১/৮৭ পৃঃ।

তারা যেন স্রেফ হিংসা বশে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অবাধ্যতা না করে এবং কুরআনকে অস্বীকার না করে' *(তাফসীর ইবনু কাছীর)*। কেননা তারা শেষনবীকে চিনলেও তাকে মানেনি স্রেফ এই হিংসার কারণে যে, ইস্রাঈল বংশে তাঁর জন্ম না হয়ে ইসমাঈল বংশে জন্ম হয়েছিল। এই জ্ঞাতি হিংসা ইহুদীদেরকে মুসলমানদের চিরশত্রুতে পরিণত করেছে। একইভাবে কেবল মাত্র হিংসার কারণেই কাবীল তার সহোদর ছোট ভাই হাবীলকে খুন করেছিল এবং পৃথিবীতে প্রথম হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। কেবল ইহুদী-নাছারা নয়, যুগে যুগে ইসলাম-বিদ্বেষী সকলের অবস্থা প্রায় একইরূপ। আজকের বিশ্বের অশুভ শক্তি বলয় সর্বত্র ইসলামের ও ইসলামের নবীর বিরুদ্ধে যেভাবে বিষোদ্গার করে যাচ্ছে, তা কেবলি সত্যের বিরুদ্ধে মিথ্যার চিরন্তন হিংসার আধুনিক রূপ মাত্র।

উল্লেখ্য যে, আদম (আঃ)-এর শরী'আতের বিরোধিতা করে নিজের যমজ সুশ্রী বোনকে জোর করে বিয়ে করার জন্য এবং উক্ত বিয়ের দাবীদার হাবীলকে পথের কাঁটা মনে করে তাকে চিরতরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য কাবীল হাবীলকে হত্যা করে ছিল বলে যে 'আছার' সমূহ ইবনু জারীর, কুরতুবী, ইবনু কাছীর প্রভৃতি তাফসীরের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, তার সবগুলিই 'মুরসাল', যঈফ ও মওযূ। ইবনু কাছীর বলেন, এগুলি স্রেফ ইস্রাঈলী উপকথা মাত্র এবং পরবর্তীতে মুসলমান হওয়া সাবেক ইহুদী পণ্ডিত কা'ব আল-আহবার থেকে নকলকৃত।[৩৫]

আইয়ূব সাখতিয়ানী বলেন, উম্মতে মুহাম্মাদীর মধ্যে এই আয়াতের উপর আমলকারী প্রথম ব্যক্তি হ'লেন তৃতীয় খলীফা হযরত ওছমান ইবনু আফফান (ইবনু কাছীর)। যিনি ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও এবং নিজের জীবনের বিনিময়ে হ'লেও বিদ্রোহীদের দমনে মদীনাবাসীকে অস্ত্রধারণের অনুমতি দেননি। 'ফিৎনার সময় বসে থাকা ব্যক্তি দাঁড়ানো ব্যক্তির চেয়ে উত্তম' রাসূল (ছাঃ)-এর এরূপ নির্দেশনা প্রসঙ্গে হযরত সা'দ ইবনু আবী ওয়াকক্বাছ (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! যখন আমাকে হত্যার জন্য আমার ঘরে ঢুকে কেউ আমার দিকে হাত বাড়াবে, তখন আমি কি করব? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, كُنْ

---

৩৫. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/৮৭ পৃঃ।

كَخَيْرِ ابْنَىْ آدَمَ ‘তুমি আদমের দুই পুত্রের মধ্যে উত্তমটির মত হও’ (অর্থাৎ হাবীলের মত মৃত্যুকে বরণ কর)। অতঃপর আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) মায়েদাহ ২৮ আয়াতটি পাঠ করে শুনালেন’।[৩৬]

ইবনু কাছীর বলেন যে, এই সব ‘আছার’ একথা দাবী করে যে, আদম পুত্রদ্বয়ের কুরবানী বিশেষ কোন কারণ বশে ছিল না বা কোন নারীঘটিত বিষয় এর মধ্যে জড়িত ছিল না। কুরআনের প্রকাশ্য অর্থ উক্ত কথা সমর্থন করে, যা মায়েদাহ ২৭ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। অতএব পূর্বাপর বিষয় সমূহ দ্বারা একথাই স্পষ্ট হয় যে, ভ্রাতৃ হত্যার কারণ ছিল স্রেফ এই হিংসা বশতঃ যে, হাবীলের কুরবানী কবুল হয়েছিল, কিন্তু ক্বাবীলের কুরবানী কবুল হয়নি *(তাফসীর ইবনু কাছীর)*। যদিও এতে হাবীলের কোন হাত ছিল না। ভালোর প্রতি এই হিংসা ও আক্রোশ মন্দ লোকদের মজ্জাগত স্বভাব। যা পৃথিবীতে সর্ব যুগে বিদ্যমান রয়েছে। এর ফলে ভালো লোকেরা সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হ’লেও চূড়ান্ত বিচারে তারাই লাভবান হয়ে থাকেন। পক্ষান্তরে মন্দ লোকেরা সাময়িকভাবে লাভবান হ’লেও চূড়ান্ত বিচারে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। নির্দোষ হাবীলকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে ক্বাবীল তার আক্রোশ মিটিয়ে সাময়িকভাবে তৃপ্তিবোধ করলেও চূড়ান্ত বিচারে সে অনন্ত ক্ষতির মধ্যে পতিত হয়েছে। সেদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেন, فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ– ‘অতঃপর সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হ’ল’ *(মায়েদাহ ৫/৩০)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لاَ تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ، رواه البخاريُّ– ‘অন্যায়ভাবে কোন মানুষ নিহত হ’লে তাকে খুন করার পাপের একটা অংশ আদমের প্রথম পুত্রের আমলনামায় যুক্ত হয়। কেননা সেই-ই প্রথম হত্যাকাণ্ডের সূচনা করে’।[৩৭] তিনি আরও বলেন, ‘যে ব্যক্তির উপর তার ভাইয়ের সম্মানহানি বা অন্য কোন প্রকারের যুলুম রয়েছে, সে যেন তার থেকে আজই তা মুক্ত করে

---

৩৬. আবুদাঊদ হা/৪২৫৭, ৫৯৬২ ‘ফিতান’ অধ্যায়; তিরমিযী হা/২২০৪, ইবনু মাজাহ হা/৩৯৬১ সনদ ছহীহ।

৩৭. বুখারী হা/৩৩৩৫; মুসলিম, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ; মিশকাত হা/২১১ ‘ইল্‌ম’ অধ্যায়।

নেয়, সেইদিন আসার আগে, যেদিন তার নিকটে দীনার ও দিরহাম (স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা) কিছুই থাকবে না (অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বে)। যদি তার নিকট কোন সৎকর্ম থাকে, তবে তার যুলুম পরিমাণ নেকী সেখান থেকে নিয়ে নেওয়া হবে। আর যদি তার কোন নেকী না থাকে, তাহ'লে মযলূমের পাপ সমূহ নিয়ে যালেমের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে'।[৩৮]

উক্ত মর্মে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالاً مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ– 'আর তারা অবশ্যই নিজেদের পাপভার বহন করবে ও তার সাথে অন্যদের পাপভার এবং তারা যেসব মিথ্যারোপ করে, সে সম্পর্কে ক্বিয়ামতের দিন অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে' *(আনকাবূত ২৯/১৩)*।

শিক্ষণীয় বিষয় :

(১) ক্বাবীল ও হাবীলের উক্ত কাহিনীর মধ্যে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির তাড়নায় প্ররোচিত হওয়ার ও তার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন হওয়ার প্রমাণ নিহিত রয়েছে।

(২) অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা যে সর্বাপেক্ষা জঘন্য পাপ এবং তওবা ব্যতীত হত্যাকারীর কোন নেক আমল আল্লাহ কবুল করেন না, তার প্রমাণ রয়েছে।

(৩) আল্লাহভীরু ব্যক্তিগণ অন্যায়ের পাল্টা অন্যায় করেন না, বরং আল্লাহ্র উপরে ভরসা করেন ও তাঁর নিকটেই তার বদ্‌লা কামনা করেন।

(৪) অন্যায়ের ফলে অন্যায়কারী এক সময় অনুতপ্ত হয় ও দুনিয়াতে সে অন্ত র্জ্বালায় দগ্ধীভূত হয় এবং আখেরাতে জাহান্নামের খোরাক হয়।

(৫) নেককার ব্যক্তিগণ দুনিয়ার দুঃখ-কষ্টকে আল্লাহ্র পরীক্ষা মনে করেন এবং এতে ধৈর্য ধারণ করেন।

---

৩৮. বুখারী হা/২৪৪৯; মিশকাত হা/৫১২৬ 'শিষ্টাচার' অধ্যায় 'যুলুম' অনুচ্ছেদ ২১।

(৬) মযলূম যদি ধৈর্য ধারণ করে, তবে তার গোনাহ সমূহ যালেমের ঘাড়ে চাপে এবং দুই জনের পাপের শাস্তি যালেমকে একাই ভোগ করতে হয়।

(৭) মানুষ মারা গেলে কবর দেওয়াই আল্লাহ প্রদত্ত চিরন্তন বিধান। ইসলামী শরী'আতে এই বিধান রয়েছে *(আবাসা ৮০/২১)*। অতএব মৃত মানুষকে পুড়িয়ে ভস্ম করা উক্ত আবহমান কালব্যাপী এলাহী সুন্নাতের স্পষ্ট লংঘন।

(৮) অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যার এই সিলসিলা ক্বাবীলের মাধ্যমে শুরু হয় বিধায় ক্বিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ অন্যায়ভাবে খুন হবে, সকল হত্যাকারীর পাপের বোঝা ক্বাবীলের আমলনামায় চাপানো হবে। অতএব অন্যায়ের সূচনাকারীগণ সাবধান!

মৃত্যু ও বয়স :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের দিনগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম দিন হ'ল জুম'আর দিন। এ দিনেই আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে, এ দিনেই তার মৃত্যু হয়েছে এবং এ দিনেই ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে...'।[৩৯] আদম (আঃ)-কে এক হাযার বছর বয়স দেওয়া হয়েছিল। রূহের জগতে দাঊদ (আঃ)-এর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তিনি নিজের বয়স থেকে ৪০ বছর তাকে দান করেন। ফলে অবশিষ্ট ৯৬০ বছর তিনি জীবিত ছিলেন।[৪০]

আদম (আঃ)-এর জীবনী থেকে শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ :

১. তিনি সরাসরি আল্লাহ্র দু'হাতে গড়া এবং মাটি হ'তে সৃষ্ট। তিনি জ্ঞানসম্পন্ন ও পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসাবে জীবন লাভ করেছিলেন।

২. তিনি ছিলেন মানব জাতির আদি পিতা ও প্রথম নবী।

---

৩৯. *মুওয়াত্ত্বা, আবুদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/১৩৫৯; সনদ ছহীহ, 'ছালাত' অধ্যায় 'জুম'আ' অনুচ্ছেদ।*

৪০. *তিরমিযী, মিশকাত হা/১১৮ 'তাক্বদীরে বিশ্বাস' অনুচ্ছেদ; সনদ ছহীহ, তিরমিযী হা/৩০৭৬ 'তাফসীর সূরা আ'রাফ'। একই হাদীছ মিশকাত হা/৪৬৬২ 'শিষ্টাচার' অধ্যায় 'সালাম' অনুচ্ছেদে এসেছে। যেখানে 'আদম তার বয়স থেকে ৬০ বছর দান করেন' বলা হয়েছে। তিরমিযী হাদীছটিকে 'হাসান গরীব' বলেছেন ছাহেবে মিরক্বাত ও ছাহেবে তোহফা উভয়ে বলেন যে, '৪০ বছর দান করার হাদীছ অগ্রগণ্য (الأرجح)। দ্রঃ তুহফাতুল আহওয়াযী হা/৫০৭২-এর ব্যাখ্যা।*

৩. তিনি জিন জাতির পরবর্তী প্রতিনিধি হিসাবে এবং দুনিয়া পরিচালনার দায়িত্বশীল খলিফা হিসাবে প্রেরিত হয়েছিলেন।

৪. দুনিয়ার সকল সৃষ্ট বস্তুর নাম অর্থাৎ সেসবের জ্ঞান ও তা ব্যবহারের যোগ্যতা তাকে দান করা হয়েছিল।

৫. জিন ও ফিরিশতা সহ সকল প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সৃষ্টির উপরে মানব জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত। সকলে তাদের অনুগত ও তাদের সেবায় নিয়োজিত।

৬. আদমকে জান্নাতে সৃষ্টি করা হয়। যা পৃথিবীর বাইরে আসমানে সৃষ্ট অবস্থায় তখনও ছিল, এখনও আছে।

৭. জান্নাতে আদমের পাঁজরের হাড় থেকে তার জোড়া হিসাবে স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়। সেকারণ স্ত্রী জাতি সর্বদা পুরুষ জাতির অনুগামী এবং উভয়ে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট।

৮. আদম ও হাওয়াকে আসমানী জান্নাত থেকে দুনিয়ায় নামিয়ে দেওয়া হয় এবং পৃথিবীর নাভিস্থল মক্কার সন্নিকটে না‘মান উপত্যকায় অর্থাৎ আরাফাতের ময়দানে ক্বিয়ামত পর্যন্ত জন্মগ্রহণকারী সকল মানুষের ক্ষুদ্রদেহী অবয়ব সৃষ্টি করে তাদের নিকট থেকে ‘আহদে আলাস্তু’ অর্থাৎ আল্লাহ্র প্রতি দাসত্বের স্বীকৃতি ও প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়।

৯. মানুষ হ’ল পৃথিবীর একমাত্র জ্ঞান সম্পন্ন প্রাণী। তাকে ভাল ও মন্দ দু’টিই করার ইচ্ছাশক্তি ও স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে।

১০. আদমের মধ্যে মানবত্ব ও নবুওয়াতের নিষ্পাপত্ব উভয় গুণ ছিল। তিনি শয়তানের প্ররোচনায় আল্লাহ্র নিষেধাজ্ঞার কথা সাময়িকভাবে ভুলে গিয়ে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেয়ে অনুতপ্ত হন ও তওবা করেন। তওবা কবুল হবার পরে তিনি নবুঅত প্রাপ্ত হন। অতএব নিঃসন্দেহে তিনি নিষ্পাপ ছিলেন। একইভাবে আদমের আওলাদগণ পাপ করে তওবা করলে আল্লাহ তা মাফ করে থাকেন।

১১. আদমকে সিজদা না করার পিছনে ইবলীসের অহংকার ও তার পরিণতিতে তার অভিশপ্ত হওয়ার ঘটনার মধ্যে মানুষকে অহংকারী না হওয়ার শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে।

১২. জৈবিক ও আধ্যাত্মিক দিকের সমন্বয়ে মানুষ একটি অসাধারণ সত্তা, যা অন্য কোন সৃষ্টির সাথে তুলনীয় নয়।

১৩. ঈমানদার বান্দাগণ ক্বিয়ামতের দিন বিচার শেষে পুনরায় জান্নাতে ফিরে যাবে।

১৪. দুনিয়াবী ব্যবস্থাপনার সকল জ্ঞান আদমকে দেওয়া হয়েছিল এবং তার মাধ্যমেই পৃথিবীতে প্রথম ভূমি আবাদ ও চাকা চালিত পরিবহনের সূচনা হয়।

১৫. সবকিছুই সৃষ্টি হয়েছে মানুষের সেবার জন্য। আর মানুষ সৃষ্টি হয়েছে আল্লাহ্র দাসত্বের জন্য।

২. হযরত নূহ *(আলাইহিস সালাম)*

আদম (আঃ) থেকে নূহ (আঃ) পর্যন্ত দশ শতাব্দীর ব্যবধান ছিল। যার শেষদিকে ক্রমবর্ধমান মানবকুলে শিরক ও কুসংস্কারের আবির্ভাব ঘটে এবং তা বিস্তৃতি লাভ করে। ফলে তাদের সংশোধনের জন্য আল্লাহ নূহ (আঃ)-কে নবী ও রাসূল করে পাঠান। তিনি সাড়ে নয়শত বছরের দীর্ঘ বয়স লাভ করেছিলেন এবং সারা জীবন পথভোলা মানুষকে পথে আনার জন্য দাওয়াতে অতিবাহিত করেন। কিন্তু তাঁর কওম তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে। ফলে আল্লাহ্র গযবে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এরপরে আরও কয়েকটি কওম আল্লাহ্র অবাধ্যতার কারণে পরপর ধ্বংস হয়। এভাবে পৃথিবীতে আদি যুগে ধ্বংসপ্রাপ্ত ৬টি জাতির ঘটনা কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে এবং কুরআনের মাধ্যমেই জগদ্বাসী তাদের খবর জানতে পেরেছে। যাতে মুসলিম উম্মাহ ও পৃথিবীবাসী তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। উক্ত ৬টি জাতি হ'ল- কওমে নূহ, 'আদ, ছামূদ, কওমে লূত, মাদইয়ান ও কওমে ফেরাঊন। অবশ্য কুরআনে এ তালিকায় কওমে ইবরাহীমের কথাও এসেছে *(তওবাহ ৯/৭০)*। যদিও তারা একত্রে ধ্বংস হয়নি। তবে ইবরাহীমের ভাতিজা লূত-এর কওম একত্রে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়েছিল। আমরা এখানে প্রথমে নূহ (আঃ) ও তাঁর কওম সম্পর্কে আলোচনা করব।

নূহ (আঃ)-এর পরিচয় :

'আবুল বাশার ছানী' (ابوالبشر الثانى) বা মানবজাতির দ্বিতীয় পিতা বলে খ্যাত নূহ *(আলাইহিস সালাম)* ছিলেন পিতা আদম *(আলাইহিস সালাম)*-এর দশম অথবা অষ্টম অধঃস্তন পুরুষ। তিনি ছিলেন দুনিয়াতে ১ম রাসূল।[৪১]

নূহ (আঃ)-এর চারটি পুত্র ছিলঃ সাম, হাম, ইয়াফিছ ও ইয়াম অথবা কেন'আন।[৪২] প্রথম তিনজন ঈমান আনেন। কিন্তু শেষোক্ত জন কাফের হয়ে প্লাবনে ডুবে মারা যায়। নূহ (আঃ)-এর দাওয়াতে তাঁর কওমের হাতেগণা

---

৪১. মুসলিম হা/৩২৭ 'ঈমান' অধ্যায় ৮৪ অনুচ্ছেদ। রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।
৪২. কুরতুবী, সূরা আনকাবূত ১৪ আয়াতের ব্যাখ্যা।

মাত্র কয়েকজন ঈমানদার ব্যক্তি সাড়া দেন এবং তারাই প্লাবনের সময় নৌকারোহণের মাধ্যমে নাজাত পান। নূহের কিশতীতে কয়জন ঈমানদার ব্যক্তি আরোহণ করে নাজাত পেয়েছিলেন, সে বিষয়ে কুরআনে বা হাদীছে কোন কিছুই বর্ণিত হয়নি। অমনিভাবে কিশতীটি কত বড় ছিল, কিভাবে ও কত দিনে তৈরী হয়েছিল, এসব বিষয়েও কিছু বর্ণিত হয়নি। এসব বিষয়ে যা কিছু বিভিন্ন তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে, সবকিছুর ভিত্তি হ'ল ইস্রাঈলী উপকথা সমূহ। যার সঠিক কোন ভিত্তি নেই।[৪৩] ইমাম তিরমিযী হযরত সামুরা (রাঃ) প্রমুখাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে সূরা ছাফফাত ৭৭ আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করেন যে, নূহের প্লাবন শেষে কেবল তাঁর তিন পুত্র সাম, হাম ও ইয়াফেছ-এর বংশধরগণই অবশিষ্ট ছিল।[৪৪] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরও বলেন যে, سام أبو العرب وحام أبو الحبش و يافث أبو الروم. 'সাম আরবের পিতা, হাম হাবশার পিতা এবং ইয়াফেছ রোমকদের (গ্রীক) পিতা'।[৪৫] ইবনু আব্বাস ও ক্বাতাদাহ (রাঃ) বলেন, পরবর্তী মানব জাতি সবাই নূহের বংশধর'।[৪৬]

আল্লাহ বলেন, وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِيْنَ. 'আমরা তার (নূহের) বংশধরগণকেই অবশিষ্ট রেখেছি' *(ছাফফাত ৩৭/৭৭)*। ফলে ইহুদী-খৃষ্টান সহ সকল ধর্মমতের লোকেরা নূহ (আঃ)-কে তাদের পিতা হিসাবে মর্যাদা দিয়ে থাকে। সাম ছিলেন তিন পুত্রের মধ্যে বড়। তিনি ছিলেন أبو العرب বা আরব জাতির পিতা। তাঁর বংশধরগণের মধ্যেই ছিলেন হযরত ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক এবং ইসমাঈলের বংশধর ছিলেন মানবজাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)। ইসহাকের বংশধরগণের মধ্যে ছিলেন ইয়াকূব, ইউসুফ, মূসা, দাঊদ, সুলায়মান, ইউনুস, ইলিয়াস, ঈসা প্রমুখ নবী ও রাসূলগণ। হাম ও ইয়াফেছ-এর বংশধরগণের নিকটে প্রেরিত নবীগণের নাম

---

৪৩. দ্রঃ কুরতুবী টীকা সূরা হূদ ৩৮-৪০ আয়াত।

৪৪. তাফসীর ইবনে কাছীর সূরা ছাফফাত ৭৭ আয়াতের ব্যাখ্যা।

৪৫. তিরমিযী হা/৩২৩০-৩১; আলবানী সনদ 'যঈফ' বলেছেন; আহমাদ হা/১৯৯৮২ তাহকীকঃ হামযাহ আহমাদ; হাকেম ২/৫৪৬ পৃঃ; তিনি একে 'ছহীহ' বলেছেন ও যাহাবী তাকে সমর্থন করেছেন।

৪৬. ঐ।

জানা যায়নি। তবে আরবদের মধ্যকার চারজন নবী ছিলেন হূদ, ছালেহ, শু‘আয়েব ও মুহাম্মাদ (ছাঃ)।[৪৭] অধিকাংশ ছাহাবীর মতে নূহ (আঃ) ছিলেন ইদরীস (আঃ)-এর পূর্বেকার নবী।[৪৮] তিনিই ছিলেন জগতের প্রথম রাসূল।[৪৯] ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, তিনি চল্লিশ বছর বয়সে নবুঅত প্রাপ্ত হন এবং মহাপ্লাবনের পর ষাট বছর জীবিত ছিলেন।[৫০] ফলে সুদীর্ঘকাল যাবত তিনি নবী হিসাবে শিরকে নিমজ্জিত হঠকারী কওমকে দাওয়াত দেন। প্লাবনের পর তাঁর সাথে নৌকারোহী মুমিন নর-নারীদের মাধ্যমে পৃথিবীতে নতুনভাবে আবাদ শুরু হয় এবং তাদেরকে তিনি সত্যের পথে পরিচালিত করেন। এ কারণে তাঁকে ‘মানব জাতির দ্বিতীয় পিতা’ বলা হয়।

আদম (আঃ) ৯৬০ বছর বেঁচে ছিলেন[৫১] এবং নূহ (আঃ) ৯৫০ বছর জীবন পেয়েছিলেন *(আনকাবূত ২৯/১৪)*। উল্লেখ্য যে, আদম ও নূহ (আঃ)-এর দীর্ঘ বয়স আল্লাহ্র বিশেষ দান ও তাঁদের মু‘জেযা স্বরূপ ছিল। নূহ (আঃ)-এর পুরুষানুক্রমিক বয়স তাঁর ন্যায় দীর্ঘ ছিল না। নূহ (আঃ) ইরাকের মূছেল নগরীতে স্বীয় সম্প্রদায়ের সাথে বসবাস করতেন। তারা বাহ্যতঃ সভ্য হ’লেও শিরকের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। তিনি তাদের হেদায়াতের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন।

উল্লেখ্য যে, হযরত নূহ (আঃ) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ২৮টি সূরায় ৮১টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।[৫২]

---

৪৭. মুহাম্মাদ সালামাহ জাবর, তারীখুল আম্বিয়া (কুয়েত : মাকতাবা ছাহওয়াহ ১৪১৩/১৯৯৩), পৃঃ ১৪৩-৪৪, ছহীহ ইবনু হিব্বান, আবু যর গেফারী হ’তে মরফূ সূত্রে; সনদ যঈফ।

৪৮. বাহরে মুহীত-এর বরাতে তাফসীর মা‘আরেফুল কুরআন পৃঃ ৪৫২ সূরা আ‘রাফ ৫৯-৬৪ আয়াত।

৪৯. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৭২, ‘ক্বিয়ামতের অবস্থা’ অধ্যায় ‘হাউয ও শাফা‘আত’ অনুচ্ছেদ।

৫০. কুরতুবী, ইবনু কাছীর; সূরা আনকাবূত ১৪-১৫ আয়াত।

৫১. তিরমিযী, মিশকাত হা/১১৮ ‘তাক্বদীরে বিশ্বাস’ অনুচ্ছেদ; তিরমিযী অত্র হাদীছকে ‘হাসান ছহীহ’ বলেছেন। অতঃপর ‘সালাম’ অনুচ্ছেদে বর্ণিত ৪৬৬২ নং হাদীছটিকে তিনি ‘হাসান গরীব’ বলেছেন। যেখানে আদম (আঃ)-এর বয়স ৯৪০ বলা হয়েছে। ছাহেবে মিরক্বাত ও ছাহেবে তুহফা প্রথমোক্ত হাদীছকে ‘অগ্রগণ্য’ (أرجح) বলেছেন।

৫২. যথাক্রমে আলে ইমরান ৩/৩৩-৩৪; নিসা ৪/১৬৩; আন‘আম ৬/৬, ৮৪; আ‘রাফ ৭/৫৯, ৬৯, ১৩৩= ৩; তওবা ৯/৭০; ইউনুস ১০/৭১; হূদ ১১/২৫, ৩২, ৩৬, ৪২, ৪৫, ৪৬, ৪৮,

তৎকালীন সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা :

আদম (আঃ)-এর সময়ে ঈমানের সাথে শিরক ও কুফরের মুকাবিলা ছিল না। তখন সবাই তওহীদের অনুসারী একই উম্মতভুক্ত ছিল *(বাক্বারাহ ২/২১৩)*। তাঁর শরী'আতের অধিকাংশ বিধানই ছিল পৃথিবী আবাদকরণ ও মানবীয় প্রয়োজনাদির সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু কালের বিবর্তনে মানুষের মধ্য শিরকের অনুপ্রবেশ ঘটে। নূহের কওম ওয়াদ, সুওয়া', ইয়াগূছ, ইয়াঊক্ব ও নাস্‌র প্রমুখ মৃত নেককার লোকদের অসীলায় আখেরাতে মুক্তি পাবার আশায় তাদের পূজা শুরু করে। এই পূজা তাদের কবরেও হ'তে পারে, কিংবা তাদের মূর্তি বানিয়েও হ'তে পারে। মুহাম্মাদ ইবনু ক্বায়েস বলেন, আদম ও নূহ (আঃ)-এর মধ্যবর্তী সময়কালের এই পাঁচজন ব্যক্তি নেককার ও সৎকর্মশীল বান্দা হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁদের মৃত্যুর পর ভক্ত অনুসারীগণকে শয়তান এই বলে প্ররোচনা দেয় যে, এইসব নেককার মানুষের মূর্তি সামনে থাকলে তাদের দেখে আল্লাহ্‌র প্রতি ইবাদতে অধিক আগ্রহ সৃষ্টি হবে। ফলে তারা তাদের মূর্তি বানায়। অতঃপর উক্ত লোকদের মৃত্যুর পরে তাদের পরবর্তীগণ শয়তানের ধোঁকায় পড়ে ঐ মূর্তিগুলিকেই সরাসরি উপাস্য হিসাবে পূজা শুরু করে দেয়। তারা এইসব মূর্তির অসীলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করত'।[৫৩] আর এভাবেই পৃথিবীতে প্রথম মূর্তিপূজার শিরকের সূচনা হয়।

ইমাম বুখারী (রহঃ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, এই লোকগুলি হযরত নূহ (আঃ)-এর যুগের নেককার ব্যক্তি ছিলেন। তাদের মৃত্যুর পর শয়তান তাদের অনুসারীদের এই মর্মে ধোঁকা দিল যে, এঁদের বসার স্থানগুলিতে এক একটি মূর্তি বানাও ও তাদের নামে নামকরণ কর। লোকেরা তাই করল। ...

৮৯= ৮; ইবরাহীম ১৪/৯; ইসরা ১৭/৩, ১৭; মারিয়াম ১৯/৫৮; আম্বিয়া ২১/৭৬; হজ্জ ২২/৪২; মুমিনূন ২৩/২৩; ফুরক্বান ২৫/৩৭; শো'আরা ২৬/১০৫, ১০৬, ১১৬; আনকাবূত ২৯/১৪-১৫; আহযাব ৩৩/৭; ছাফফাত ৩৭/৭৫, ৭৯; ছোয়াদ ৩৮/১২; গাফের/মুমিন ৪০/৫, ৩১-৩৩= ৪; শূরা ৪২/১৩; ক্বাফ ৫০/১২; যারিয়াত ৫১/৪৬; নাজম ৫৩/৫২; ক্বামার ৫৪/৯-১৬= ৮; হাদীদ ৫৭/২৬; তাহরীম ৬৬/১০; নূহ ৭১/১-২৮= ২৮। সর্বমোট = ৮১ টি।

৫৩. ইবনু কাছীর, সূরা নূহ। বুখারী মওকুফ সূত্রে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে এটি বর্ণনা করেন 'তাফসীর' অধ্যায় হা/৪৯২০।

এই মূর্তিগুলি পরবর্তীকালে আরবদের মধ্যেও চালু ছিল। 'ওয়াদ' ছিল বনু কালবের জন্য দূমাতুল জান্দালে, সুওয়া' ছিল বনু হোযায়েলের জন্য, ইয়াগূছ ছিল বনু গুত্বায়েফ-এর জন্য জুরুফ নামক স্থানে, ইয়া'ঊক্ব ছিল বনু হামদানের জন্য এবং নাস্র ছিল হিমইয়ার গোত্রের বনু যি-কালা এর জন্য'।[৫৪]

ইবনু আবী হাতেম-এর বর্ণনায় এসেছে যে, 'ওয়াদ' ছিল এদের মধ্যে প্রথম এবং সর্বাধিক নেককার ব্যক্তি। তিনি মারা গেলে লোকেরা তার প্রতি ভক্তিতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। শয়তান এই সুযোগ গ্রহণ করে এবং লোকদেরকে তার মূর্তি বানাতে প্ররোচনা দেয়। ফলে ওয়াদ-এর মূর্তিই হ'ল পৃথিবীর সর্বপ্রথম মূর্তি, আল্লাহকে বাদ দিয়ে যার পূজা শুরু হয়'।[৫৫]

অতএব পৃথিবীর প্রাচীনতম শিরক হ'ল নেককার মানুষের কবর অথবা তাদের মূর্তিপূজা। যা আজও প্রায় সকল ধর্মীয় সমাজে চালু আছে এবং বর্তমানে যা মুসলিম সমাজে স্থানপূজা, কবর পূজা, ছবি-প্রতিকৃতি, মিনার ও ভাষ্কর্য পূজায় রূপ নিয়েছে। উক্ত পাঁচটি মূর্তির মাহাত্ম্য ও তাদের প্রতি ভক্তি লোকদের হৃদয়ে এমনভাবে প্রোথিত হয়েছিল যে, তারা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এবং পারস্পরিক চুক্তি সম্পাদনকালে তাদের নাম উল্লেখ করত। এতদ্ব্যতীত তারা নানাবিধ সামাজিক অনাচারে ডুবে গিয়েছিল। সম্প্রদায়ের এইরূপ পতন দশায় আল্লাহ তাদের হেদায়াতের জন্য নূহ (আঃ)-কে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেন *(আ'রাফ ৭/৬১)*।

স্বীয় কওমের প্রতি নূহ (আঃ)-এর দাওয়াত :

আল্লাহ বলেন,

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَّأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ، يَغْفِرْ لَكُم مِّنْ

৫৪. বুখারী 'তাফসীর' অধ্যায় হা/৪৯২০; তাফসীর ইবনে কাছীর, সূরা নূহ।
৫৫. তাফসীর ইবনে কাছীর, সূরা নূহ।

ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللهِ إِذَا جَاءَ لاَ يُؤَخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ- (نوح ١-٤)-

'আমরা নূহকে তার কওমের নিকটে প্রেরণ করলাম তাদের উপরে মর্মান্তিক আযাব নাযিল হওয়ার পূর্বেই তাদেরকে সতর্ক করার জন্য'। 'নূহ তাদেরকে বলল, হে আমার জাতি! আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী'। 'এ বিষয়ে যে তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর, তাঁকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর'। 'তাতে আল্লাহ তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিবেন। তবে এটা নিশ্চিত যে, আল্লাহ্র নির্ধারিত সময় যখন এসে যাবে, তখন তা এতটুকুও পিছানো হবে না। যদি তোমরা তা জানতে' *(নূহ ৭১/১-৪)*।

অতঃপর তিনি তাদেরকে শিরক পরিত্যাগ করে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ্র ইবাদতে ফিরিয়ে আনার জন্য বান্দার উপরে আল্লাহ্র অসংখ্য অনুগ্রহ ও অগণিত নে'মতরাজির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন,

أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقا، وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجاً، وَاللهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتاً، ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجاً، وَاللهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطاً، لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلاً فِجَاجاً- (نوح ١٥-٢٠)-

'তোমরা কি লক্ষ্য কর না, আল্লাহ কিভাবে সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন'। 'সেখানে তিনি চন্দ্রকে রেখেছেন আলো রূপে এবং সূর্যকে রেখেছেন প্রদীপ রূপে'। 'আল্লাহ তোমাদেরকে মাটি থেকে উদ্গত করেছেন'। 'অতঃপর তাতে ফিরিয়ে নিবেন ও আবার পুনরুত্থিত করবেন'। 'আল্লাহ তোমাদের জন্য যমীনকে করেছেন বিছানা সদৃশ'। 'যাতে তোমরা চলাফেরা করতে পার প্রশস্ত রাস্তাসমূহে' *(নূহ ৭১/১৫-২০)*।

নূহ (আঃ) স্বীয় কওমকে দিন-রাত দাওয়াত দিতে থাকেন। তিনি তাদেরকে প্রকাশ্যে ও গোপনে বিভিন্ন পন্থায় ও পদ্ধতিতে দাওয়াত দেন। কিন্তু ফলাফল হয় নিতান্ত নৈরাশ্যজনক। তাঁর দাওয়াতে অতিষ্ঠ হয়ে তারা তাঁকে দেখলেই

পালিয়ে যেত। কখনো কানে আঙ্গুল দিত। কখনো তাদের চেহারা কাপড় দিয়ে ঢেকে ফেলতো। তারা তাদের হঠকারিতা ও যিদে অটল থাকত এবং চরম ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করত' *(নূহ ৭১/৬-৯)*। এক সময় কওমের সর্দাররা লোকদের ডেকে বলল, وَقَالُوا لاَ تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلاَ تَذَرُنَّ وَدًّا وَلاَ سُوَاعاً وَّلاَ يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً- (نوح ২১-২৩)- (খবরদার!) 'তোমরা তোমাদের পূর্ব পুরুষদের পূজিত উপাস্য ওয়াদ, সুওয়া', ইয়াগূছ, ইয়াঊক্ব, নাস্র-কে কখনোই পরিত্যাগ করবে না'। (এভাবে) 'তারা বহু লোককে পথভ্রষ্ট করে এবং (তাদের ধনবল ও জনবল দিয়ে) নূহ-এর বিরুদ্ধে ভয়ানক সব চক্রান্ত শুরু করে' *(নূহ ৭১/২১-২৩)*।

নূহ (আঃ)-এর বিরুদ্ধে পাঁচটি আপত্তি :

কওমের অবিশ্বাসী নেতারা জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য নূহ (আঃ)-এর বিরুদ্ধে পাঁচটি আপত্তি উত্থাপন করেছিল। যথাঃ (১) আপনি তো আমাদের মতই একজন মানুষ। নবী হ'লে তো ফেরেশতা হতেন। (২) আপনার অনুসারী হ'ল আমাদের মধ্যকার হীন ও কম বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা (৩) কওমের উপরে আপনাদের কোন প্রাধান্য পরিদৃষ্ট হয় না *(হূদ ১১/২৭)*। (৪) আপনার দাওয়াত আমাদের বাপ-দাদাদের রীতি বিরোধী (৫) আপনি আসলে নেতৃত্বের অভিলাষী *(মুমিনূন ২৩/২৪-২৫)*। অতএব আপনাকে আমরা মিথ্যাবাদী মনে করি *(হূদ ১১/২৭)*।

জনগণকে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্য নূহ-এর দাওয়াতকে ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক আন্দোলন বলে আখ্যায়িত করে কাফের নেতারা বলল,

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ اللهُ لَأَنزَلَ مَلَآئِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِيْ آبَائِنَا الْأَوَّلِيْنَ- (المؤمنون ٢٤-٢٥)-

'এ লোক তো তোমাদের মতই একজন মানুষ। আসলে সে তোমাদের উপরে নেতৃত্ব করতে চায়। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তো একজন ফেরেশতা পাঠাতে পারতেন। তাছাড়া এ লোক যেসব কথা বলছে, তাতো আমরা আমাদের

বাপ-দাদাদের কাছে কখনো শুনিনি'। 'আসলে লোকটার মধ্যে পাগলামী রয়েছে কিংবা তার সাথে কোন জিন রয়েছে। অতএব তোমরা এ ব্যক্তির দিকে ভ্রুক্ষেপ কর না। বরং কিছুদিন অপেক্ষা কর' *(মুমিনূন ২৩/২৪-২৫)*। (এভাবে) 'তারা তাঁকে সরাসরি পাগল বলে এবং (প্রাণে মারার) হুমকি দেয়' *(ক্বামার ৫৪/৯)*।

আপত্তি সমূহের জওয়াব :

(১) গোত্রের নেতাদের উপরোক্ত আপত্তি ও অপবাদ সমূহের জবাবে নূহ (আঃ) বলেন,

قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّيْ وَآتَانِيْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُوْنَ- (هود ٢٨)-

'হে আমার কওম! আমি যদি আমার প্রভুর পক্ষ হ'তে স্পষ্ট দলীলের উপরে থাকি, আর তিনি যদি তাঁর পক্ষ হ'তে আমাকে রহমত দান করেন, আর সেসব থেকে যদি তোমাদের চক্ষু অন্ধ থাকে, তাহ'লে কি আমি তা তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাদের উপরে চাপিয়ে দিতে পারি? *(হূদ ১১/২৮)*। একথা দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, নবুওয়াত ও রিসালাত চেয়ে পাওয়া যায় না। এটা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন। তিনি মানুষের জন্য কোন ফেরেশতাকে নয়, বরং তাঁর মনোনীত কোন মানুষকেই নবী করে পাঠিয়ে থাকেন স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ সহকারে। নূহ (আঃ) তাঁর কওমকে আরও বলেন,

أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ- (الأعراف ٦٤)-

'তোমরা কি এ বিষয়ে আশ্চর্যবোধ করছ যে, তোমাদের পালনকর্তার পয়গাম তোমাদের মধ্য থেকেই একজনের মাধ্যমে তোমাদের কাছে এসেছে, যাতে সে তোমাদের ভীতি প্রদর্শন করে ও তার ফলে তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও' *(আ'রাফ ৭/৬৩)*। আল্লাহ বলেন, 'কিন্তু তারা নূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে। তখন আমরা তাকে ও তার নৌকারোহী সাথীদেরকে মুক্ত করি এবং আমাদের আয়াত সমূহে মিথ্যারোপকারীদের ডুবিয়ে মারি। বস্তুতঃ তারা ছিল জ্ঞানান্ধ' *(আ'রাফ ৭/৬৪)*।

মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে একদল লোক শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে 'নূরের নবী' বলে পরোক্ষভাবে তাঁকে 'ফেরেশতা নবী' বানাতে চায়। এভাবে তারা বিগত যুগের কাফিরদের সন্দেহবাদের অনুসরণ করে মাত্র। অথচ আল্লাহ বলেন,

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلاً وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُوْنَ- (الأنعام ٩)-

'যদি আমরা কোন ফেরেশতাকে রাসূল করে পাঠাতাম, তবে সে মানুষের আকারেই হ'ত। কিন্তু এতেও তারা ঐ সন্দেহই প্রকাশ করত, যা এখন করছে' *(আন'আম ৬/৯)*।

(২) তাদের দ্বিতীয় আপত্তির জবাবে নূহ (আঃ) বলেন,

وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوْا إِنَّهُم مُّلاَقُوْ رَبِّهِمْ وَلَـكِنِّيْ أَرَاكُمْ قَوْماً تَجْهَلُوْنَ، وَيَا قَوْمِ مَن يَّنْصُرُنِي مِنَ اللهِ إِنْ طَرَدتُّهُمْ أَفَلاَ تَذَكَّرُوْنَ؟- (هود ٢٩-٣٠)-

'আমি কোন (গরীব) ঈমানদার ব্যক্তিকে তাড়িয়ে দিতে পারি না। তারা অবশ্যই তাদের পালনকর্তার দীদার লাভে ধন্য হবে। বরং আমি তোমাদেরই মূর্খ দেখছি'। 'হে আমার কওম! আমি যদি ঐসব লোকদের তাড়িয়ে দেই, তাহ'লে কে আমাকে আল্লাহ্র পাকড়াও থেকে রক্ষা করবে? তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না? *(হূদ ১১/২৯-৩০; শো'আরা ২৬/১১১-১১৫)*।

(৩) তৃতীয় আপত্তির জবাবে তিনি বলেন,

وَلاَ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللهُ خَيْراً اللّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذاً لَّمِنَ الظَّالِمِينَ- (هود ٣١)-

'তোমাদের দৃষ্টিতে যারা দীনহীন-অবাঞ্ছিত ব্যক্তি তাদেরকে আল্লাহ কোনরূপ কল্যাণ দান করবেন না। তাদের মনের কথা আল্লাহ ভাল করেই জানেন। সুতরাং এমন কথা বললে আমি অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব' *(হূদ ১১/৩১)*।

অতএব দুনিয়াবী প্রাধান্য মূলতঃ কোন প্রাধান্য নয়। পরকালীন উচ্চ মর্যাদাই হ'ল প্রকৃত মর্যাদা।

Contents

(৪) চতুর্থ আপত্তির জবাবে তিনি পয়গম্বরসুলভ উত্তর দিয়ে বলেন, قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِيْ ضَلاَلَةٌ وَلَكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ، أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّيْ وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ (الأعراف ٦١-٦٢)- 'হে আমার কওম! আমার মধ্যে কোনই পথভ্রষ্টতা নেই। বরং আমি বিশ্বপালকের পক্ষ হ'তে প্রেরিত রাসূল'। 'আমি তোমাদের নিকটে আমার প্রভুর রিসালাত পৌঁছে দেই এবং আমি তোমাদেরকে সদুপদেশ দিয়ে থাকি। কেননা আমি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এমন বিষয় জানি, যা তোমরা জানো না' *(আ'রাফ ৭/৬১-৬২)*।

অতএব আল্লাহ প্রদত্ত রিসালাত তথা অহী-র বিধান পালন করা ও তা জনগণের নিকটে পৌঁছে দেওয়াই আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য- পিতৃধর্ম পালন করা নয়। বস্তুতঃ বাপ-দাদার ধর্মের দোহাই নূহ (আঃ) থেকে শুরু করে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত সবাইকে দেওয়া হয়েছিল। আর সেকারণে প্রায় সকল নবীকেই স্ব স্ব জাতির নিকট থেকে চরম নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছিল।

(৫) অতঃপর নেতৃত্ব লাভের আশায় নূহ (আঃ) লোকদের নিকটে দাওয়াত দিচ্ছেন মর্মে তাদের পঞ্চম আপত্তির জবাবে তিনি স্পষ্টভাষায় বলে দেন যে,

وَيَا قَوْمِ لاَ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ- (الشعراء ١٠٩)-

'এই দাওয়াতের বিনিময়ে আমি তোমাদের কাছে কোন মাল-দৌলত বা কোন বিনিময় কামনা করি না। আমার পুরষ্কার তো কেবল বিশ্বপালকের (আল্লাহ্র) নিকটেই রয়েছে' *(শো'আরা ২৬/১০৯; ইউনুস ১০/৭২; হূদ ১১/২৯)*।

বস্তুতঃপক্ষে সকল নবীই একথা বলেছেন। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর কাছে এসে তাঁর কওমের নেতারা যখন নেতৃত্ব গ্রহণের অথবা মাল-দৌলতের বিনিময়ে তাওহীদের দাওয়াত পরিত্যাগের প্রস্তাব দিয়েছিল, তখন তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন, 'যদি তোমরা আমার ডানহাতে সূর্য ও বামহাতে চন্দ্র এনে দাও, তথাপি আমি যে সত্য নিয়ে আগমন করেছি, তা পরিত্যাগ করব না' *(আর-রাহীক্ব পৃঃ ৯৭)*।

বস্তুতঃ শিরকের মাধ্যমে দুনিয়া অর্জন সহজলভ্য হয় বিধায় যুগ যুগ ধরে দুনিয়াপূজারী এক শ্রেণীর বকধার্মিক লোক মূর্তি, কবর ও মাযার নিয়ে পড়ে

আছে। লোকেরা তাদেরকে আল্লাহ্র অলী ভাবে। অথচ ওরা মূলতঃ শয়তানের অলী। ইবরাহীম (আঃ) এদের উদ্দেশ্যেই বলেছিলেন,

رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِيْ فَإِنَّهُ مِنِّيْ وَمَنْ عَصَانِيْ فَإِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ- (إبراهيم ٣٦)-

'হে প্রভু! এ মূর্তিগুলি বহু লোককে পথভ্রষ্ট করেছে। এক্ষণে যারা আমার অনুগামী হয়েছে, কেবল তারাই আমার দলভুক্ত। আর যারা আমার অবাধ্যতা করেছে (তাদের ব্যাপারে আপনিই সবকিছু), নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(ইবরাহীম ১৪/৩৬)*। নিঃসন্দেহে যারা শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সত্যিকারের অনুসারী হবে, কেবল তারাই আখেরাতে মুক্তি পাবে। যেহেতু 'শিরকপন্থীদের জন্য আল্লাহ জান্নাতকে হারাম করেছেন' *(মায়েদাহ ৫/৭২)*, সেহেতু শিরকের মাধ্যমে দুনিয়া অর্জনকারী লোকেরা এবং মুশরিক ব্যক্তিরা মুখে আল্লাহকে স্বীকার করলেও ওরা চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামের অধিবাসী হবে। অতএব হে মানুষ! শিরক হ'তে সাবধান হও!!

নূহ (আঃ)-এর দাওয়াতের ফলশ্রুতি :

আল্লাহ তা'আলা নূহ (আঃ)-কে সাড়ে নয়শত বছরের সুদীর্ঘ জীবন দান করেছিলেন। তিনি এক পুরুষের পর দ্বিতীয় পুরুষকে অতঃপর তৃতীয় পুরুষকে শুধু এই আশায় দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছিলেন যে, তারা ঈমান আনবে। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী অক্লান্তভাবে দাওয়াত দেওয়া সত্ত্বেও তারা ঈমান আনেনি। মূলতঃ এই সময় নূহ (আঃ)-এর কওম জনবল ও অর্থবলে বিশ্বে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। সংখ্যাধিক্যের কারণে ইরাকের ভূখণ্ড ও পাহাড়েও তাদের আবাস সংকুলান হচ্ছিল না। আল্লাহ্র চিরন্তন নীতি এই যে, তিনি অবাধ্য জাতিকে সাময়িকভাবে অবকাশ দেন *(বাক্বারাহ ২/১৫)*। নূহের কওম সংখ্যাশক্তি ও ধনাঢ্যতার শিখরে উপনীত হয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। তারা নূহ (আঃ)-এর দাওয়াতকে তাচ্ছিল্য ভরে প্রত্যাখ্যান করেছিল। নূহ (আঃ) তাদেরকে দিবারাত্রি দাওয়াত দেন। কখনো গোপনে কখনো প্রকাশ্যে অর্থাৎ সকল পন্থা অবলম্বন করে তিনি নিজ কওমকে দ্বীনের পথে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেন *(নূহ ৭১/৫-৯)*। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এই সুদীর্ঘ দাওয়াতী যিন্দেগীতে তিনি যেমন কখনো চেষ্টায় ক্ষান্ত হননি, তেমনি কখনো নিরাশও হননি। সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে নানাবিধ নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েও তিনি ছবর করেন। কওমের নেতারা বলল,

قَالُوْا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا نُوْحُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ- (الشعراء ١١٦)-

‘হে নূহ! যদি তুমি বিরত না হও, তবে পাথর মেরে তোমার মস্তক চূর্ণ করে দেওয়া হবে’ *(শো‘আরা ২৬/১১৬)*। তবুও বারবার আশাবাদী হয়ে তিনি সবাইকে দাওয়াত দিতে থাকেন। আর তাদের জন্য দো‘আ করে বলতে থাকেন, رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِيْ إِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ- ‘হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমার কওমকে ক্ষমা কর। কেননা তারা জানে না’ *(তাফসীর কুরতুবী, সূরা নূহ)*।

ওদিকে তাঁর সম্প্রদায়ের অনীহা, অবজ্ঞা, তাচ্ছিল্য এবং ঔদ্ধত্য ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্ব বলেন, و لم يلق نبى من قومه من الأذى مثل نوح إلا نبى قُتل ‘নিহত কোন নবী ব্যতীত অন্য কোন নবী তার কওমের নিকট থেকে নূহের মত নির্যাতন ভোগ করেননি’ *(ইবনু কাছীর, সূরা আ‘রাফ ৫৯-৬২)*। বলা চলে যে, তাদের অহংকার ও অত্যাচার চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল এবং পাপ ষোলকলায় পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। ফলে এক পর্যায়ে নূহ (আঃ) স্বীয় কওমকে ডেকে বললেন,

يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِيْ وَتَذْكِيْرِيْ بِآيَاتِ اللّهِ فَعَلَى اللّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوْا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوْا إِلَيَّ وَلاَ تُنْظِرُوْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، فَكَذَّبُوْهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلاَئِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ- (يونس ٧١-٧٣)-

‘হে আমার কওম! যদি তোমাদের মাঝে আমার অবস্থিতি ও আল্লাহ্র আয়াত সমূহের মাধ্যমে তোমাদের উপদেশ দেওয়া ভারি বলে মনে হয়, তবে আমি আল্লাহ্র উপরে ভরসা করছি। এখন তোমরা তোমাদের যাবতীয় শক্তি একত্রিত কর ও তোমাদের শরীকদের সমবেত কর, যাতে তোমাদের মধ্যে কোনরূপ দ্বিধা-সংকোচ না থাকে। অতঃপর আমার ব্যাপারে একটা ফায়ছালা করে ফেল এবং আমাকে মোটেও অবকাশ দিয়ো না’। ‘এরপরেও যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। তবে জেনে রেখ, আমি তোমাদের কাছে কোনরূপ বিনিময় কামনা করি না। আমার বিনিময় কেবলমাত্র আল্লাহ্র নিকটেই

রয়েছে। আর আমার প্রতি নির্দেশ রয়েছে যেন আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই'। 'কিন্তু তারপরও তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল...' *(ইউনুস ১০/৭১-৭৩)*। বলা বাহুল্য যে, এটা ছিল কওমের দুরাচার নেতাদের প্রতি নূহ (আঃ)-এর ছুঁড়ে দেওয়া চ্যালেঞ্জ, যার মুকাবিলা করা তাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব ছিল না।

এ সময় আল্লাহ পাক অহী নাযিল করে বলেন,

أَنَّهُ لَن يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلاَّ مَنْ قَدْ آمَنَ فَلاَ تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ– (هود ٣٦)–

'তোমার কওমের যারা ইতিমধ্যে ঈমান এনেছে, তারা ব্যতীত আর কেউ ঈমান আনবে না। অতএব তুমি ওদের কার্যকলাপে বিমর্ষ হয়ো না' *(হূদ ১১/৩৬)*। এভাবে আল্লাহ্র অহী মারফত তিনি যখন জেনে নিলেন যে, এরা কেউ আর ঈমান আনবে না। বরং কুফর, শিরক ও পথভ্রষ্টতার উপরেই ওরা যিদ করে থাকবে, তখন নিরাশ হয়ে তিনি প্রার্থনা করলেন,

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُوْنِ– (مؤمنون ٢٦)– 'হে আমার পালনকর্তা! আমাকে সাহায্য কর। কেননা ওরা আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছে' *(মুমিনূন ২৩/২৬)*। فَافْتَحْ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِيْ وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ– (الشعراء ١١٨)– 'অতএব তুমি আমার ও তাদের মাঝে চূড়ান্ত ফয়ছালা করে দাও এবং আমাকে ও আমার সাথী মুমিনদেরকে তুমি (ওদের হাত থেকে) মুক্ত কর' *(শো'আরা ২৬/১১৮)*। তিনি স্বীয় প্রভুকে আহ্বান করে বললেন, فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّيْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ– (القمر ١٠)– 'আমি অপারগ হয়ে গেছি। এক্ষণে তুমি ওদের বদলা নাও' *(ক্বামার ৫৪/১০)*। তিনি অতঃপর চূড়ান্তভাবে বদ দো'আ করে বললেন, وَقَالَ نُوْحٌ رَّبِّ لاَ تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دَيَّارًا، إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلاَ يَلِدُوْا إِلاَّ فَاجِرًا كَفَّارًا– (نوح ٢٦-٢٧)– 'হে প্রভু! পৃথিবীতে একজন কাফের গৃহবাসীকেও তুমি ছেড়ে দিয়ো না'। 'যদি তুমি ওদের রেহাই দাও, তাহ'লে ওরা তোমার বান্দাদের পথভ্রষ্ট করবে এবং ওরা কোন সন্তান জন্ম দিবে না পাপাচারী ও কাফের ব্যতীত' *(নূহ ৭১/২৬-২৭)*।

বলা বাহুল্য, নূহ (আঃ)-এর এই দো‘আ আল্লাহ সাথে সাথে কবুল করেন। যার ফলে তারা ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হ’ল এবং কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় মুমিন নর-নারী মুক্তি পেলেন। বর্তমান পৃথিবীর সবাই তাদের বংশধর। আল্লাহ বলেন, ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْداً شَكُوْراً– ‘তোমরা তাদের বংশধর, যাদেরকে আমরা নূহের সাথে (নৌকায়) সওয়ার করিয়েছিলাম। বস্তুতঃ সে ছিল একজন কৃতজ্ঞ বান্দা’ *(ইসরা ১৭/৩; ছাফফাত ৩৭/৭৭)*।

গযবের কারণ : আল্লাহ বলেন, مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوْا فَأُدْخِلُوْا نَاراً فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُم مِّن دُوْنِ اللَّهِ أَنصَاراً– ‘তাদের পাপরাশির কারণে তাদেরকে (প্লাবনে) ডুবিয়ে মারা হয়েছিল। অতঃপর তাদেরকে (কবরের) অগ্নিতে প্রবেশ করানো হয়েছিল। কিন্তু নিজেদের জন্য আল্লাহ্র মুকাবেলায় কাউকে তারা সাহায্যকারী পায়নি’ *(নূহ ৭১/২৫)*। উপরোক্ত আয়াতে বুঝা যায় যে, পথভ্রষ্ট সমাজনেতাদের সাথে পুরা সমাজটাই পাপে নিমজ্জিত হয়েছিল। যেজন্য সর্বগ্রাসী প্লাবনের গযবে তাদেরকে ডুবিয়ে ধ্বংস করা হয়। এমনকি মৃত্যুর পর বরযখী জীবনে তাদেরকে কবর আযাবের অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করানো হয়েছে, সেকথাও আল্লাহ বলে দিয়েছেন। এতদ্ব্যতীত ক্বিয়ামতের দিন তাদের জন্য জাহান্নাম যে সুনিশ্চিত, সেকথাও বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেননা তারা সেদিন মুক্তির জন্য কোন সুফারিশকারী পাবেনা।

শিক্ষণীয় বিষয় : সমাজপরিচালনার জন্য সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ ব্যাপারে দল ও প্রার্থীবিহীন ইসলামী নেতৃত্ব নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরণ করা আবশ্যক।

নূহের প্লাবন ও গযবের কুরআনী বিবরণ :

এ বিষয়ে সূরা হূদে পরপর ১২টি আয়াত নাযিল হয়েছে। যেমন, চূড়ান্ত গযব আসার পূর্বে আল্লাহ নূহ (আঃ)-কে বললেন,

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلاَ تُخَاطِبْنِيْ فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا إِنَّهُم مُّغْرَقُوْنَ، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوْا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَّأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيْهِ

وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلٌ، وَقَالَ ارْكَبُوْا فِيهَا بِسْمِ اللهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِيْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلاَ تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ، قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاء قَالَ لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِلاَّ مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاء أَقْلِعِي وَغِيْضَ الْمَاء وَقُضِيَ الأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْداً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، وَنَادَى نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابُنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، قَالَ يَا نُوْحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلاَ تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلاَّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلاَمٍ مِّنَّا وَبَركَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ- (هود ٣٧-٤٨)-

‘তুমি আমার সম্মুখে আমারই নির্দেশনা মোতাবেক একটা নৌকা তৈরী কর এবং (স্বজাতির প্রতি দয়া পরবশ হয়ে) যালেমদের ব্যাপারে আমাকে কোন কথা বলো না। অবশ্যই ওরা ডুবে মরবে’ *(হূদ ১১/৩৭)*। আল্লাহ বলেন, ‘অতঃপর নূহ নৌকা তৈরী শুরু করল। তার কওমের নেতারা যখন পাশ দিয়ে যেত, তখন তারা তাকে বিদ্রূপ করত। নূহ তাদের বলল, তোমরা যদি আমাদের উপহাস করে থাক, তবে জেনে রেখো তোমরা যেমন আমাদের উপহাস করছ, আমরাও তেমনি তোমাদের উপহাস করছি’ *(৩৮)*। ‘অচিরেই তোমরা জানতে পারবে লাঞ্ছনাকর আযাব কাদের উপরে আসে এবং কাদের উপরে নেমে আসে চিরস্থায়ী গযব’ *(৩৯)*। আল্লাহ বলেন, ‘অবশেষে যখন আমার হুকুম এসে গেল এবং চুলা উদ্বেলিত হয়ে উঠল, (অর্থাৎ রান্নার চুলা

হ'তে পানি উথলে উঠলো), তখন আমি বললাম, সর্বপ্রকার জোড়ার দু'টি করে এবং যাদের উপরে পূর্বেই হুকুম নির্ধারিত হয়ে গেছে, তাদের বাদ দিয়ে তোমার পরিবারবর্গ ও সকল ঈমানদারগণকে নৌকায় তুলে নাও। বলা বাহুল্য, অতি অল্প সংখ্যক লোকই তার সাথে ঈমান এনেছিল' *(৪০)*। 'নূহ তাঁদের বলল, তোমরা এতে আরোহণ কর। আল্লাহ্‌র নামেই এর গতি ও স্থিতি। নিশ্চয়ই আমার প্রভু অতীব ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(৪১)*। 'অতঃপর নৌকাখানি তাদের বহন করে নিয়ে চলল পর্বতপ্রমাণ তরঙ্গমালার মাঝ দিয়ে। এ সময় নূহ তার পুত্রকে (ইয়ামকে) ডাক দিল- যখন সে দূরে ছিল, হে বৎস! আমাদের সাথে আরোহণ কর, কাফেরদের সাথে থেকো না' *(৪২)*। 'সে বলল, অচিরেই আমি কোন পাহাড়ে আশ্রয় নেব। যা আমাকে প্লাবনের পানি হ'তে রক্ষা করবে'। নূহ বলল, 'আজকের দিনে আল্লাহ্‌র হুকুম থেকে কারু রক্ষা নেই, একমাত্র তিনি যাকে দয়া করবেন সে ব্যতীত। এমন সময় পিতা-পুত্র উভয়ের মাঝে বড় একটা ঢেউ এসে আড়াল করল এবং সে ডুবে গেল' *(৪৩)*। অতঃপর নির্দেশ দেওয়া হ'ল, হে পৃথিবী! তোমার পানি গিলে ফেল (অর্থাৎ হে প্লাবনের পানি! নেমে যাও)। হে আকাশ! ক্ষান্ত হও (অর্থাৎ তোমার বিরামহীন বৃষ্টি বন্ধ কর)। অতঃপর পানি হ্রাস পেল ও গযব শেষ হ'ল। ওদিকে জূদী পাহাড়ে গিয়ে নৌকা ভিড়ল এবং ঘোষণা করা হ'ল, যালেমরা নিপাত যাও' *(৪৪)*। 'এ সময় নূহ তার প্রভুকে ডেকে বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমার পুত্র তো আমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, আর তোমার ওয়াদাও নিঃসন্দেহে সত্য, আর তুমিই সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ ফায়ছালাকারী *(৪৫)*। 'আল্লাহ বললেন, হে নূহ! নিশ্চয়ই সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়। নিশ্চয়ই সে দুরাচার। তুমি আমার নিকটে এমন বিষয়ে আবেদন কর না, যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই। আমি তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি যেন জাহিলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না' *(৪৬)*। 'নূহ বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমার অজানা বিষয়ে আবেদন করা হ'তে আমি তোমার নিকটে পানাহ চাচ্ছি। তুমি যদি আমাকে ক্ষমা না কর ও অনুগ্রহ না কর, তাহ'লে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব' *(৪৭)*। 'বলা হ'ল, হে নূহ! এখন (নৌকা থেকে) অবতরণ কর আমাদের পক্ষ হ'তে নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি সহকারে তোমার উপর ও তোমার সঙ্গী দলগুলির উপর এবং সেই (ভবিষ্যৎ) সম্প্রদায়গুলির উপর- যাদেরকে

আমরা সত্বর সম্পদরাজি দান করব। অতঃপর তাদের উপরে আমাদের পক্ষ হ'তে মর্মান্তিক আযাব স্পর্শ করবে' *(হূদ ১১/৩৭-৪৮)*।

মাক্কী জীবনের চরম আতংক ও উৎকণ্ঠার মধ্যে সূরা হূদ নাযিল করে সেখানে যথাক্রমে নূহ, হূদ, ছালেহ, ইব্রাহীম, লূত, শু'আয়েব ও মূসা প্রমুখ বিগত নবী ও রাসূলগণের ও তাদের সম্প্রদায়ের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর সাথীদেরকে আল্লাহ সান্ত্বনা দিয়েছেন। যেমন প্রথমে নূহ (আঃ)-এর কাহিনী বর্ণনা শেষে আল্লাহ বলেন, تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَـــذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ- (هود ٤٩)- 'এটি গায়েবের খবর যা আমরা আপনার নিকটে অহী করেছি। যা ইতিপূর্বে আপনি বা আপনার সম্প্রদায় জানতো না। অতএব আপনি ধৈর্য ধারণ করুন। নিশ্চয়ই শুভ পরিণাম কেবল আল্লাহভীরুদের জন্যই' *(হূদ ১১/৪৯)*। বস্তুতঃ কুরআনের মাধ্যমেই পৃথিবীবাসী সর্বপ্রথম বিগত যুগের এই সব ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির খবর জানতে পেরেছে।

অন্যান্য বিবরণ :

সূরা হূদে বর্ণিত উপরোক্ত আয়াত সমূহে নূহ (আঃ)-এর প্লাবনের নাতিদীর্ঘ ঘটনা বিবৃত হয়েছে। কুরআন তার বাকরীতি অনুযায়ী কেবল প্রয়োজনীয় কথাগুলিই বলে দিয়েছে। বাদবাকী ব্যাখ্যা সমূহ মোটামুটি নিম্নরূপঃ

(১) কিশতী : নূহ (আঃ)-কে যখন নৌকা তৈরীর নির্দেশ দেওয়া হয়, তখন তিনি নৌকাও চিনতেন না, তৈরী করতেও জানতেন না। আর সেকারণেই আল্লাহ নির্দেশ দিলেন, 'তুমি নৌকা তৈরী কর আমাদের চোখের সম্মুখে ও আমাদের অহী অনুসারে' *(হূদ ১১/৩৭; মুমিনূন ২৩/২৭)*। এর দ্বারা বুঝা যায়. যে, নৌকা তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সমূহ ও নির্মাণ কৌশল জিবরীল (আঃ) নূহ (আঃ)-কে শিক্ষা দিয়েছিলেন। এভাবে সরাসরি অহীর মাধ্যমে নূহ (আঃ)-এর হাতে নৌকা ও জাহায নির্মাণ শিল্পের গোড়াপত্তন হয়। অতঃপর যুগে যুগে তার উন্নতি সাধিত হয়েছে এবং মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্যের মালামাল ও যাত্রী পরিবহনে নতুন যুগে প্রবেশ করেছে। আধুনিক বিশ্ব সভ্যতা যার উপরে দাঁড়িয়ে আছে।

একথা ধারণা করা মোটেই অমূলক হবে না যে, উক্ত নৌকা তৈরী করতে নূহ (আঃ)-এর বহুদিন সময় লেগেছিল। নৌকাটি অবশ্যই বিরাটায়তনের ছিল। যাতে মানুষ, পশু ও পাখি পৃথকভাবে থাকতে পারে। কিন্তু এজন্য নৌকাটি কয় তলা বিশিষ্ট ছিল, কি কাঠের ছিল, কত গজ লম্বা ও চওড়া ছিল, এসব কাহিনীর কোন সঠিক ভিত্তি নেই। নদীবিহীন মরু এলাকায় বিনা কারণে নৌকা তৈরী করাকে পশুশ্রম ও নিছক পাগলামি বলে 'কওমের নেতারা নূহ (আঃ)-কে ঠাট্টা করত' *(হূদ ৩৮)*। এ ব্যাপরে নূহ (আঃ) বলতেন, তোমাদের ঠাট্টার জবাব সত্বর তোমরা জানতে পারবে *(হূদ ৩৯)*। দীর্ঘ দিন ধরে নৌকা তৈরী শেষ হবার পরেই আল্লাহ্র চূড়ান্ত ফায়ছালা নেমে আসে এবং গযবের প্রাথমিক আলামত হিসাবে চুলা থেকে পানি বের হ'তে থাকে।

(২) তান্নূর ও তূফান : 'তান্নূর' বলা হয় মূলতঃ উনুন বা চুলাকে। এটি অনারব শব্দ, যাকে আরবী করা হয়েছে *(কুরতুবী)*। সহজ-সরল ও প্রকাশ্য অর্থ অনুযায়ী ইরাকের মূছেল নগরীতে অবস্থিত নূহ (আঃ)-এর পারিবারিক চুলা থেকে পানি উথলে বের হওয়ার আলামতের মাধ্যমেই নূহের তুফানের সূচনা হয়। অর্থাৎ এটি ছিল প্লাবনের প্রাথমিক আলামত মাত্র *(কুরতুবী)*। 'তূফান' অর্থ যেকোন বস্তুর অত্যাধিক্য। প্লাবনকে 'তূফান' বলা হয় পানির আধিক্যের কারণে, যা সব কিছুকে ডুবিয়ে দেয়। আল্লাহ বলেন, 'আমরা নূহকে প্রেরণ করেছিলাম তার সম্প্রদায়ের নিকট। সে তাদের মধ্যে পঞ্চাশ কম এক হাযার বছর অবস্থান করেছিল। অতঃপর তাদেরকে 'তূফান' (অর্থাৎ মহাপ্লাবন) গ্রাস করেছিল। আর তারা ছিল অত্যাচারী *(আনকাবূত ২৯/১৪)*। যদিও অনেকে এর নানারূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যার সবকিছুই ইস্রাঈলিয়াত এবং ভিত্তিহীন।[৫৬]

ভূতলের উত্থিত পানি ছাড়াও তার সাথে যুক্ত হয়েছিল অবিরাম ধারে আকাশবন্যা। যেমন আল্লাহ বলেন, 'অবশেষে যখন আমার হুকুম এসে পৌঁছল এবং চুলা উচ্ছ্বসিত হ'ল (অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠ পানিতে উদ্বেলিত হয়ে উঠল)- *(হূদ ৪০)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

---

৫৬. কুরতুবী, হূদ ৪০ আয়াতের টীকা দ্রষ্টব্য।

فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ، وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوْناً فَالْتَقَى الْمَاءَ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، تَجْرِيْ بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ، وَلَقَدْ تَّرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ–

'তখন আমরা খুলে দিলাম আকাশের দুয়ার সমূহ প্রবল বারিপাতের মাধ্যমে'। 'এবং ভূমি থেকে প্রবাহিত করলাম নদী সমূহকে। অতঃপর উভয় পানি মিলিত হ'ল একটি পূর্ব নির্ধারিত কাজে (অর্থাৎ ডুবিয়ে মারার কাজে)'। 'আমি নূহকে আরোহন করালাম এক কাষ্ঠ ও পেরেক নির্মিত জলযানে'। 'যা চলত আমার দৃষ্টির সম্মুখে। এটা তার (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র) পক্ষ থেকে প্রতিশোধ ছিল, যাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল'। 'আমরা একে নিদর্শন হিসাবে রেখে দিয়েছি। অতএব কোন চিন্তাশীল আছে কি'? *(ক্বামার ৫৪/১১-১৫)*। যে কারণে নূহ-পুত্র 'ইয়াম' পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েও রেহাই পায়নি *(হূদ ৪৩)*। ঐ সময় কোন কোন ঢেউ পাহাড়ের চূড়া হ'তেও উঁচু ছিল। অতঃপর প্লাবন বিধ্বংসীরূপ ধারণ করে এবং পাহাড়ের মত ঢেউয়ের মধ্য দিয়ে নৌকা চলতে থাকে' *(হূদ ৪২)*।

২০০৪ সালের ২৬শে ডিসেম্বর ইন্দোনেশিয়ার সাগরতলে সংঘটিত ভূমিকম্পের সুনামিতে উত্থিত ৩৩ ফুট উঁচু ঢেউ নূহের তূফানকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

নৌকার আরোহীগণ :

তূফানের আলামত প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে নূহ (আঃ)-কে হুকুম দেওয়া হ'ল, قُلْنَا احْمِلْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ 'জোড় বিশিষ্ট প্রত্যেক প্রাণীর এক এক জোড়া করে নৌকায় তুলে নাও' *(হূদ ১১/৪০; মুমিনূন ২৩/২৭)*। এর দ্বারা কেবল ঐসব প্রাণী বুঝানো হয়েছে, যা নর ও মাদীর মিলনে জন্মলাভ করে এবং যা মানুষের দৈনন্দিন জীবনে অতীব প্রয়োজনীয়। যেমন গরু-ছাগল, ঘোড়া-গাধা ও হাঁস-মুরগী ইত্যাদি পশু-পক্ষী।

এরপর নূহ (আঃ)-কে নির্দেশ দেওয়া হয় কেবল তাঁর পরিবারসহ ঈমানদার নর-নারীকে নৌকায় তুলে নিতে। যাদের সংখ্যা অতীব নগণ্য ছিল *(হূদ ৪০)*। কিন্তু সঠিক সংখ্যা কুরআন বা হাদীছে উল্লেখিত হয়নি। তবে আব্দুল্লাহ ইবনে

আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের সংখ্যা ছিল চল্লিশ জন করে পুরুষ ও নারী মোট আশি জন। প্লাবনের পর তারা ইরাকের মূছেল নগরীর যে স্থানটিতে বসতি স্থাপন করেন, তা 'ছামানূন' বা আশি নামে খ্যাত হয়ে যায়।[৫৭] প্লাবনে মুক্তিপ্রাপ্তদের 'সূমর' (سومر) জাতি বলা হ'ত। 'জূদী' (جودى) পাহাড়ে গিয়ে নৌকা নোঙর করে *(হূদ ১১/৪৪)*। এ পাহাড়টি আজও ঐ নামেই পরিচিত। এটি নূহ (আঃ)-এর মূল আবাস ভূমি ইরাকের মূছেল নগরীর উত্তরে 'ইবনে ওমর' দ্বীপের অদূরে আর্মেনিয়া সীমান্তে অবস্থিত। বস্তুতঃ এটি একটি পবর্তমালার অংশ বিশেষের নাম। এর অপর এক অংশের নাম 'আরারাত' পর্বত। প্রাচীন ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে যে, ইরাকের বিভিন্ন স্থানে উক্ত কিশতীর ভগ্ন টুকরা সমূহ অনেকের কাছে সংরক্ষিত আছে। যা বরকত মনে করা হয় এবং বিভিন্ন রোগ-ব্যধিতে আরোগ্যের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়।

উল্লেখ্য যে, নূহের পুত্র কাফিরদের দলভুক্ত হওয়ায় মহাপ্লাবনে ধ্বংস হয়েছিল। কিন্তু নূহের স্ত্রী সম্পর্কে এখানে কিছু বলা হয়নি। এতে স্পষ্ট হয় যে, তিনি আগেই মারা গিয়েছিলেন *(ইবনু কাছীর, হূদ ১১/৪০)*। তিনি গোপনে কুফরী পোষণ করতেন ও কাফিরদের সমর্থন করতেন। নূহের স্ত্রী ও লূত্বের স্ত্রী স্ব স্ব স্বামীর নবুঅতের উপরে বিশ্বাস স্থাপনের ক্ষেত্রে খেয়ানত করেছিল বলে স্বয়ং আল্লাহ বর্ণনা করেছেন। নবীদের স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও কুফরীর কারণে তারা জাহান্নামবাসী হয়েছেন *(তাহরীম ৬৬/১০)*। সম্ভবতঃ মহাপ্লাবনের সময় নূহের স্ত্রী জীবিত ছিলেন না। সেকারণ গযবের ঘটনা বর্ণনায় কেবল পুত্র ইয়ামের কথা এসেছে। কিন্তু তার মায়ের কথা আসেনি।

নূহ (আঃ)-এর জীবনী থেকে শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ :

১. প্রথম রাসূল নূহ (আঃ)-এর সত্যতার বিরুদ্ধে যে পাঁচটি আপত্তি তোলা হয়েছিল, সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সত্যতার বিরুদ্ধেও ঐ অভিযোগগুলি তোলা হয়েছিল। শেষনবীর প্রকৃত দ্বীনী উত্তরাধিকারী হিসাবে সমাজ সংস্কারক মুত্তাক্বী আলেমগণের উপরে নবুঅতের বিষয়টি বাদে বাকী চারটি অভিযোগ যুগে যুগে উত্থাপিত হওয়াটাই স্বাভাবিক।

---

৫৭. কুরতুবী, ইবনু কাছীর; হূদ ৪০ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

২. নূহ (আঃ) যেমন দীর্ঘকাল যাবত নিজ জাতির পক্ষ হ'তে অবর্ণনীয় নির্যাতন ভোগ করা সত্ত্বেও তাদের হেদায়াতের ব্যাপারে নিরাশ হ'তেন না, প্রকৃত সমাজ হিতৈষী আলেম ও নেতাগণেরও তেমনি নিরাশ হওয়া উচিত নয়।

৩. নবী পরিবারের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও ঈমান না থাকার কারণে নূহের স্ত্রী ও পুত্র যেমন নাজাত লাভে ব্যর্থ হয়েছে, তেমনি এ যুগেও হওয়া সম্ভব। কাফির ও মুশরিক সন্তান বা কোন নিকটাত্মীয়ের মাগফেরাতের জন্য আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করা জায়েয নয়।

৪. ঈমানী সম্পদই বড় সম্পদ। আল্লাহ্র নিকটে ঈমানদারের মর্যাদা সর্বপেক্ষা বেশী। যদিও সে দুনিয়াবী জীবনে দীনহীন গরীব হয়।

৫. ঈমানহীন সমাজ নেতা ও ধনী লোকদের খুশী করার জন্য ঈমানদার গরীবদের দূরে সরিয়ে দেওয়া যাবে না।

৬. মৃত নেককার মানুষের অসীলায় পরকালে মুক্তি পাওয়ার ধারণার ভিত্তিতে সৃষ্ট মূর্তিপূজার শিরক বিশ্ব ইতিহাসের প্রাচীনতম শিরক। এই শিরকের কারণেই নূহের কওম আল্লাহ্র গযবে ধ্বংস হয়েছিল। তাই যাবতীয় প্রকারের শিরক থেকে তওবা করা কর্তব্য। সাথে সাথে এই মহাপাপ থেকে জাতিকে রক্ষা করার জন্য আলেমদের এবং সমাজ ও রাষ্ট্র নেতাদের এগিয়ে আসা যরূরী।

৭. সমাজ নেতাদের পথভ্রষ্টতার কারণেই দেশে আল্লাহ্র গযব নেমে আসে। অতএব তাদেরকেই সবার আগে হুঁশিয়ার হওয়া কর্তব্য।

৮. বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করার সাথে সাথে সাধ্যমত বাস্তব প্রচেষ্টা চালাতে হয়। যেমন নূহ (আঃ) প্রথমে আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করেন। অতঃপর গযব থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ্র হুকুমে নৌকা তৈরী করেন।

৯. আল্লাহ পাক স্বীয় অহী দ্বারা বিভিন্ন নবীর মাধ্যমে যুগে যুগে বিভিন্ন শিল্পকর্মের সূচনা করেছেন, যেমন আদম (আঃ)-এর মাধ্যমে কৃষিকর্ম ও চাকার প্রচলন করেছেন এবং নূহ (আঃ)-এর মাধ্যমে জাহায শিল্পের সূচনা করেছেন।

১০. দুনিয়াবী জৌলুস সত্ত্বেও যালেমরা সর্বযুগেই নিন্দিত ও ধিকৃত হয়। পক্ষান্তরে নির্যাতিত হওয়া সত্ত্বেও ঈমানদারগণ সর্বযুগে নন্দিত ও প্রশংসিত হন।

১১. কিসে মানুষের প্রকৃত মঙ্গল নিহিত রয়েছে, মানুষ নিজে তা নির্ণয় করতে পারে না। তাকে সর্বদা আল্লাহ্র রহমতের মুখাপেক্ষী থাকতে হয়। তাই 'আল্লাহ্র অহি' তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের হেদায়াতই প্রকৃত হেদায়াত এবং চূড়ান্ত সত্যের মাপকাঠি।

১২. পূর্বতন সকল নবীর দাওয়াত ছিল এক ও অভিন্ন এবং তা ছিল নির্ভেজাল তাওহীদের প্রতি দাওয়াত। মানুষের সার্বিক জীবনে তাওহীদ প্রতিষ্ঠাই হ'ল প্রকৃত অর্থে ইক্বামতে দ্বীন।

১৩. আল্লাহ স্বীয় নেককার বান্দাগণের পক্ষে তাদের শত্রুদের থেকে প্রতিশোধ নিয়ে থাকেন এবং নেক বান্দাদের মুক্ত করেন। যেমন নূহের শত্রুদের থেকে আল্লাহ বদলা নিয়েছিলেন এবং নূহ ও তাঁর ঈমানদার সাথীদের মুক্ত করেছিলেন।

১৪. ঈমানদারগণের বিরুদ্ধে বিশ্ব ইতিহাসের প্রথম তোহমত ছিল এই যে, তারা হ'ল সমাজের দীনহীন ও স্বল্পবুদ্ধির লোক (هم أَرَاذِلُنَا بَادِىَ الرأى -হূদ ২৭)। এ যুগেও তার ব্যতিক্রম নয়।

১৫. নবী-রাসূল ও তাঁদের অনুসারী সমাজ সংস্কারকগণ সমাজের গালমন্দ খেয়েও সমাজ ত্যাগ করেন না। কিন্তু তাঁরা বদ দো'আ করলে আল্লাহ্র গযব নেমে আসে।

৩. হযরত ইদরীস *(আলাইহিস সালাম)*

আল্লাহ বলেন, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيْسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا– ‘তুমি এই কিতাবে ইদরীসের কথা আলোচনা কর। নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন সত্যবাদী ও নবী’। ‘আমরা তাকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছিলাম’ *(মারিয়াম ১৯/৫৬-৫৭)*।

ইদরীস (আঃ)-এর পরিচয়: তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত নবী। তাঁর নামে বহু উপকথা তাফসীরের কিতাবসমূহে বর্ণিত হয়েছে। যে কারণে জনসাধারণ্যে তাঁর ব্যাপক পরিচিতি রয়েছে। হযরত ইদরীস (আঃ) হযরত নূহ (আঃ)-এর পূর্বের নবী ছিলেন, না পরের নবী ছিলেন এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে অধিকাংশ ছাহাবীর মতে তিনি নূহ (আঃ)-এর পরের নবী ছিলেন।[৫৮]

সূরা মারিয়ামে হযরত ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক্ব, ইয়াকূব, হারূণ, মূসা, যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া, ঈসা ইবনে মারিয়াম ও ইদরীস (আঃ)-এর আলোচনা শেষে আল্লাহ বলেন,

أُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَن خَرُّوْا سُجَّداً وَبُكِيّاً–

‘এঁরাই হ’লেন সেই সকল নবী, যাদেরকে নবীগণের মধ্য হ’তে আল্লাহ বিশেষভাবে অনুগৃহীত করেছেন। এঁরা আদমের বংশধর এবং যাদেরকে আমরা নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম তাদের বংশধর এবং ইবরাহীম ও ইসরাঈল (ইয়াকূব)-এর বংশধর এবং যাদেরকে আমরা (ইসলামের) সুপথ প্রদর্শন করেছি ও (ঈমানের জন্য) মনোনীত করেছি

---

৫৮. তাফসীর মা‘আরেফুল কুরআন পৃঃ ৪৫২।

তাদের বংশধর। তাদের কাছে যখন দয়াময় আল্লাহ্‌র আয়াত সমূহ পাঠ করা হ'ত, তখন তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ত ও ক্রন্দন করত' *(মারিয়াম ১৯/৫৮)*। অত্র আয়াতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, ইদরীস (আঃ) হযরত নূহ (আঃ)-এর পরের নবী ছিলেন। তবে নূহ ও ইদরীস হযরত আদম (আঃ)-এর নিকটবর্তী নবী ছিলেন, যেমন ইবরাহীম (আঃ) হযরত নূহ (আঃ)-এর নিকটবর্তী এবং ইসমাঈল, ইসহাক্ব ও ইয়াকূব হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর নিকটবর্তী নবী ছিলেন।[৫৯] নূহ পরবর্তী সকল মানুষ হ'লেন নূহের বংশধর।[৬০]

উল্লেখ্য যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস, কা'ব আল-আহবার, সুদ্দী প্রমুখের বরাতে হযরত ইদরীস (আঃ)-এর জান্নাত দেখতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ফেরেশতার মাধ্যমে সশরীরে আসমানে উত্থান ও ৪র্থ আসমানে মালাকুল মউত কর্তৃক তাঁর জান কবয করা, অতঃপর সেখানেই অবস্থান করা ইত্যাদি বিষয়ে যেসব বর্ণনা তাফসীরের কিতাব সমূহে দেখতে পাওয়া যায়, তার সবই ভিত্তিহীন ইস্রাঈলিয়াত মাত্র।[৬১]

উল্লেখ্য যে, পবিত্র কুরআনে হযরত ইদরীস (আঃ) সম্পর্কে সূরা মারিয়াম ৫৬, ৫৭ এবং সূরা আম্বিয়া ৮৫ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

কুরতুবী বলেন, ইদরীস (আঃ)-এর নাম 'আখনূখ' ছিল এবং তিনি হযরত নূহ (আঃ)-এর পরদাদা ছিলেন বলে বংশবিশারদগণ যে কথা বলেছেন, তা ধারণা মাত্র। এমনিভাবে অন্যান্য নবীদের যে দীর্ঘ বংশধারা সাধারণতঃ বর্ণনা করা হয়ে থাকে, সে সবের কোন সঠিক ভিত্তি নেই। এসবের প্রকৃত ইল্‌ম কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র নিকটে রয়েছে। ইদরীস (আঃ)-কে ৩০টি ছহীফা প্রদান করা হয়েছিল বলে হযরত আবু যর গেফারী (রাঃ) থেকে ইবনু হিব্বানে *(নং ৩৬১)* যে বর্ণনা এসেছে, তার সনদ যঈফ।[৬২]

কুরতুবী বলেন, তিনি যে নূহের পূর্বেকার নবী ছিলেন না, তার বড় প্রমাণ হ'ল এই যে, মি'রাজে যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ১ম আসমানে আদম

---

৫৯. কুরতুবী, মারিয়াম ৫৮-এর ব্যাখ্যা।

৬০. কুরতুবী, আ'রাফ ৫৯-এর ব্যাখ্যা; ইবনু কাছীর, ঐ।

৬১. কুরতুবী, মারিয়াম ৫৭ আয়াতের টীকা।

৬২. কুরতুবী, মারিয়াম ৫৬ আয়াতের টীকা দ্রষ্টব্য।

(আঃ)-এর সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি রাসূলকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলেন, مرحبا بالابن الصالح والنبى الصالح ‘নেককার সন্তান ও নেককার নবীর জন্য সাদর সম্ভাষণ’। অতঃপর ৪র্থ আসমানে হযরত ইদরীস (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হ’লে তিনি রাসূলকে বলেন, مرحبا بالاخ الصالح والنبى الصالح ‘নেককার ভাই ও নেককার নবীর জন্য সাদর সম্ভাষণ’।[৬৩] ক্বাযী আয়ায বলেন, যদি ইদরীস (আঃ) নূহ (আঃ)-এর পূর্বেকার নবী হ’তেন, তাহ’লে তিনি শেষনবী (ছাঃ)-কে ‘নেককার ভাই’ না বলে ‘নেককার সন্তান’ বলে সম্ভাষণ জানাতেন। যেমন আদম, নূহ ও ইবরাহীম বলেছিলেন। তিনি বলেন, নূহ ছিলেন সকল মানুষের প্রতি প্রেরিত প্রথম রাসূল। যেমন শেষনবী ছিলেন সকল মানুষের প্রতি প্রেরিত শেষ রাসূল। আর ইদরীস (আঃ) ছিলেন স্বীয় কওমের প্রতি প্রেরিত নবী। যেমন ছিলেন হূদ, ছালেহ প্রমুখ নবী’।[৬৪] উল্লেখ্য যে, এখানে আদম, নূহ ও ইবরাহীমকে ‘পিতা’ হিসাবে খাছ করার কারণ এই যে, আদম হ’লেন মানবজাতির আদি পিতা। নূহ হ’লেন মানবজাতির দ্বিতীয় পিতা এবং ইবরাহীম হ’লেন তাঁর পরবর্তী সকল নবীর পিতা ‘আবুল আম্বিয়া’।

বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইদরীস (আঃ) হ’লেন প্রথম মানব, যাঁকে মু‘জেযা হিসাবে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও অংকবিজ্ঞান দান করা হয়েছিল। তিনিই সর্বপ্রথম মানব, যিনি আল্লাহ্র ইলহাম মতে কলমের সাহায্যে লিখন পদ্ধতি ও বস্ত্র সেলাই শিল্পের সূচনা করেন। তাঁর পূর্বে মানুষ সাধারণতঃ পোশাক হিসাবে জীবজন্তুর চামড়া ব্যবহার করত। ওযন ও পরিমাপের পদ্ধতি তিনিই সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন এবং লোহা দ্বারা অস্ত্র-শস্ত্র তৈরীর পদ্ধতি আবিষ্কার ও তার ব্যবহার তাঁর আমল থেকেই শুরু হয়। তিনি অস্ত্র নির্মাণ করে ক্বাবীল গোত্রের বিরুদ্ধে জেহাদ করেন।[৬৫]

---

৬৩. কুরতুবী, সূরা আ‘রাফ ৫৯-এর ব্যাখ্যা; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮৬২ ‘মি‘রাজ’ অনুচ্ছেদ।

৬৪. কুরতুবী, সূরা আ‘রাফ ৫৯-এর ব্যাখ্যা।

৬৫. কুরতুবী, মারিয়াম ৫৬; তাফসীর মা‘আরেফুল কুরআন পৃঃ ৮৩৮।

৪. হযরত হূদ *(আলাইহিস সালাম)*

হূদ (আঃ)-এর পরিচয় :

হযরত হূদ (আঃ) দুর্ধর্ষ ও শক্তিশালী ‘আদ জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। আল্লাহ্‌র গযবে ধ্বংসপ্রাপ্ত বিশ্বের প্রধান ছয়টি জাতির মধ্যে কওমে নূহ-এর পরে কওমে ‘আদ ছিল দ্বিতীয় জাতি। হূদ (আঃ) ছিলেন এদেরই বংশধর। ‘আদ ও ছামূদ ছিল নূহ (আঃ)-এর পুত্র সামের বংশধর এবং নূহের পঞ্চম অথবা অষ্টম অধঃস্তন পুরুষ। ইরামপুত্র ‘আদ-এর বংশধরগণ ‘আদ ঊলা’ বা প্রথম ‘আদ এবং অপর পুত্রের সন্তান ছামূদ-এর বংশধরগণ ‘আদ ছানী বা দ্বিতীয় ‘আদ বলে খ্যাত।[৬৬] ‘আদ ও ছামূদ উভয় গোত্রই ইরাম-এর দু’টি শাখা। সেকারণ ‘ইরাম’ কথাটি ‘আদ ও ছামূদ উভয় গোত্রের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। এজন্য কুরআনে কোথাও ‘আদ ঊলা’ *(নাজম ৫০)* এবং কোথাও ‘ইরাম যাতিল ‘ইমাদ’ *(ফজর ৭)* শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

‘আদ সম্প্রদায়ের ১৩টি পরিবার বা গোত্র ছিল। আম্মান হ’তে শুরু করে হাযারামাউত ও ইয়ামন পর্যন্ত তাদের বসতি ছিল।[৬৭] তাদের ক্ষেত-খামারগুলো ছিল অত্যন্ত সজীব ও শস্যশ্যামল। তাদের প্রায় সব ধরনের বাগ-বাগিচা ছিল। তারা ছিল সুঠামদেহী ও বিরাট বপু সম্পন্ন। আল্লাহ তা‘আলা তাদের প্রতি অনুগ্রহের দুয়ার খুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু বক্রবুদ্ধির কারণে এসব নে‘মতই তাদের কাল হয়ে দাঁড়ালো। তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছিল ও অন্যকে পথভ্রষ্ট করেছিল। তারা শক্তি মদমত্ত হয়ে ‘আমাদের চেয়ে শক্তিশালী আর কে আছে’ *(ফুছছিলাত/হামীম সাজদাহ ১৫)* বলে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করতে শুরু করেছিল। তারা আল্লাহ্‌র ইবাদত পরিত্যাগ করে নূহ (আঃ)-এর আমলে ফেলে আসা মূর্তিপূজার শিরক-এর পুনরায় প্রচলন ঘটালো। মাত্র কয়েক পুরুষ আগে ঘটে যাওয়া নূহের সর্বগ্রাসী প্লাবনের কথা তারা বেমালুম ভুলে গেল। ফলে আল্লাহ পাক তাদের হেদায়াতের জন্য

---

৬৬. ইবনু কাছীর, সূরা আ‘রাফ ৬৫, ৭৩।

৬৭. কুরতুবী, আ‘রাফ ৬৫।

তাদেরই মধ্য হ'তে হূদ (আঃ)-কে নবী হিসাবে প্রেরণ করলেন। উল্লেখ্য যে, নূহের প্লাবনের পরে এরাই সর্বপ্রথম মূর্তিপূজা শুরু করে।

হযরত হূদ (আঃ) ও কওমে 'আদ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ১৭টি সূরায় ৭৩টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।[৬৮]

হূদ (আঃ)-এর দাওয়াত :

সূরা আ'রাফ ৬৫-৭২ আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوْداً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـــهٍ غَيْرُهُ أَفَلاَ تَتَّقُوْنَ؟ قَالَ الْمَلأُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِيْ سَفَاهَةٍ وِإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ، قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِيْ سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّيْ رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ، أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّيْ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِيْنٌ، أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوْا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوْا آلآءَ اللهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ، قَالُوْا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ، قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُوْنَنِيْ فِيْ أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوْهَا أَنتُمْ وَآبَآؤُكُم مَّا نَزَّلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانتَظِرُوْا إِنِّيْ مَعَكُم مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ، فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ- (الأعراف ٦٥-٧٢)-

---

৬৮. যথাক্রমে: (১) আ'রাফ ৭/৬৫-৭২, (২) তওবা ৯/৭০, (৩) হূদ ১১/৫০-৬০, ৮৯, (৪) ইবরাহীম ১৪/৯, (৫) হজ্জ ২২/৪২, (৬) ফুরক্বান ২৫/৩৮, ৩৯, (৭) শো'আরা ২৬/১২৩-১৪০, (৮) আনকাবূত ২৯/৩৮, (৯) ছোয়াদ ৩৮/১২, (১০) গাফের/মুমিন ৪০/৩১, (১১) ফুছছিলাত/হামীম সাজদাহ ৪১/১৩-১৬, (১২) আহক্বাফ ৪৬/২১-২৬, (১৩) ক্বাফ ৫০/১৩, (১৪) যারিয়াত ৫১/৪১, ৪২, (১৫) ক্বামার ৫৪/১৮-২২, (১৬) হা-ক্বক্বাহ ৬৯/৪-৮, (১৭) ফাজ্র ৮৯/৬-৮। সর্বমোট ৭৩।

অনুবাদঃ আর ‘আদ সম্প্রদায়ের নিকটে (আমরা প্রেরণ করেছিলাম) তাদের ভাই হূদকে। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। অতঃপর তোমরা কি আল্লাহভীরু হবে না? *(আ'রাফ ৭/৬৫)*। ‘তার সম্প্রদায়ের কাফের নেতারা বলল, আমরা তোমাকে নির্বুদ্ধিতায় লিপ্ত দেখতে পাচ্ছি এবং আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত মনে করি’ (৬৬)। ‘হূদ বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আমার মধ্যে কোন নির্বুদ্ধিতা নেই। বরং আমি বিশ্বপালকের প্রেরিত একজন রাসূল মাত্র’ (৬৭)। ‘আমি তোমাদের নিকটে প্রতিপালকের পয়গাম সমূহ পৌঁছে দেই এবং আমি তোমাদের হিতাকাংখী ও বিশ্বস্ত’ (৬৮)। ‘তোমরা কি আশ্চর্য বোধ করছ যে, তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ হ’তে তোমাদের থেকেই একজনের নিকটে অহী (যিকর) এসেছে, যাতে সে তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করে? তোমরা স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তোমাদেরকে কওমে নূহের পরে নেতৃত্বে অভিষিক্ত করলেন ও তোমাদেরকে বিশালবপু করে সৃষ্টি করলেন। অতএব তোমরা আল্লাহ্র নে‘মত সমূহ স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও’ (৬৯)। ‘তারা বলল, তুমি কি আমাদের কাছে কেবল এজন্য এসেছ যে, আমরা শুধুমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করি, আর আমাদের বাপ-দাদারা যাদের পূজা করত, তাদেরকে পরিত্যাগ করি? তাহ’লে নিয়ে এস আমাদের কাছে (সেই আযাব), যার দুঃসংবাদ তুমি আমাদের শুনাচ্ছ, যদি তুমি সত্যবাদী হও’ (৭০)। ‘হূদ বলল, তোমাদের উপরে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হ’তে শাস্তি ও ক্রোধ অবধারিত হয়ে গেছে। তোমরা কেন আমার সাথে ঐসব নাম সম্পর্কে বিতর্ক করছ, যেগুলোর নামকরণ তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা করেছ? ঐসব উপাস্যদের সম্পর্কে আল্লাহ কোন প্রমাণ (সুলতান) নাযিল করেননি। অতএব অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি’ (৭১)। ‘অনন্তর আমরা তাকে ও তার সাথীদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে রক্ষা করলাম এবং যারা আমাদের আয়াত সমূহে মিথ্যারোপ করেছিল, তাদের মূলোৎপাটন করে দিলাম। বস্তুতঃ তারা বিশ্বাসী ছিল না’ *(আ'রাফ ৭/৬৫-৭২)*।

অতঃপর সূরা হূদ ৫০-৬০ আয়াতে আল্লাহ উক্ত ঘটনা বর্ণনা করেছেন নিম্নরূপেঃ

وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ مُفْتَرُوْنَ، يَا قَوْمِ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى الَّذِيْ فَطَرَنِي أَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلاَ تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ، قَالُوْا يَا هُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَّمَا نَحْنُ بِتَارِكِيْ آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ، إِن نَّقُوْلُ إِلاَّ اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوْءٍ قَالَ إِنِّيْ أُشْهِدُ اللّهَ وَاشْهَدُوْا أَنِّيْ بَرِيْءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ، مِنْ دُوْنِهِ فَكِيْدُونِيْ جَمِيْعًا ثُمَّ لاَ تُنْظِرُوْنِ، إِنِّيْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ رَبِّيْ وَرَبِّكُم مَّا مِنْ دَآبَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّيْ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّيْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّوْنَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّيْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ، وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُوْدًا وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ، وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوْا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوْا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ، وَأُتْبِعُوْا فِيْ هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلآ إِنَّ عَادًا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ أَلآ بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُوْدٍ- (هود ٥٠-٦٠)-

অনুবাদঃ আর ‘আদ জাতির প্রতি (আমরা) তাদের ভাই হূদকে (প্রেরণ করেছিলাম)। সে তাদেরকে বলল, হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন মা‘বূদ নেই। বস্তুতঃ তোমরা সবাই এ ব্যাপারে মিথ্যারোপ করছ’ *(হূদ ১১/৫০)*। ‘হে আমার জাতি! (আমার এ দাওয়াতের জন্য) আমি তোমাদের কাছে কোনরূপ বিনিময় চাই না। আমার পারিতোষিক তাঁরই কাছে রয়েছে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমরা কি বুঝ না’? *(৫১)*। ‘হে আমার কওম! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাঁরই দিকে ফিরে যাও। তিনি আসমান থেকে তোমাদের উপর বারিধারা প্রেরণ করবেন এবং তোমাদের শক্তির উপর শক্তি বৃদ্ধি করবেন। তোমরা অপরাধীদের ন্যায় মুখ ফিরিয়ে

নিয়ো না' *(৫২)*। 'তারা বলল, হে হূদ! তুমি আমাদের কাছে কোন প্রমাণ নিয়ে আসনি, আর আমরাও তোমার কথা মত আমাদের উপাস্যদের বর্জন করতে পারি না। বস্তুতঃ আমরা তোমার প্রতি বিশ্বাসী নই' *(৫৩)*। 'বরং আমরা তো একথাই বলতে চাই যে, আমাদের কোন উপাস্য-দেবতা (তোমার অবিশ্বাসের ফলে ক্রুদ্ধ হয়ে) তোমার উপরে অশুভ আছর করেছেন। হূদ বলল, আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখছি, আর তোমরাও সাক্ষী থাক যে, তাদের থেকে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত, যাদেরকে তোমরা শরীক করে থাক' *(৫৪)* 'তাঁকে ছাড়া। অতঃপর তোমরা সবাই মিলে আমার অনিষ্ট করার প্রয়াস চালাও এবং আমাকে কোনরূপ অবকাশ দিয়ো না' *(৫৫)*। 'আমি আল্লাহ্র উপরে ভরসা করেছি। যিনি আমার ও তোমাদের পালনকর্তা। ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই, যা তাঁর আয়ত্তাধীন নয়। আমার পালনকর্তা সরল পথে আছেন' (অর্থাৎ সরল পথের পথিকগণের সাথে আছেন)' *(৫৬)*। 'এরপরেও যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে (জেনে রেখ যে,) আমি তোমাদের নিকটে পৌঁছে দিয়েছি যা নিয়ে আমি তোমাদের নিকটে প্রেরিত হয়েছি। আমার প্রভু অন্য কোন জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন, তখন তোমরা তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। নিশ্চয়ই আমার পালনকর্তা প্রতিটি বস্তুর হেফাযতকারী' *(৫৭)*। 'অতঃপর যখন আমাদের আদেশ (গযব) উপস্থিত হ'ল, তখন আমরা নিজ অনুগ্রহে হূদ ও তার সাথী ঈমানদারগণকে মুক্ত করি এবং তাদেরকে এক কঠিন আযাব থেকে রক্ষা করি' *(৫৮)*। 'এরা ছিল 'আদ জাতি। যারা তাদের পালনকর্তার আয়াত সমূহকে (নিদর্শন সমূহকে) অস্বীকার করেছিল ও তাদের নিকটে প্রেরিত রাসূলগণের অবাধ্যতা করেছিল এবং তারা উদ্ধত ও হঠকারী ব্যক্তিদের আদেশ পালন করেছিল' *(৫৯)*। 'এ দুনিয়ায় তাদের পিছে পিছে অভিসম্পাৎ রয়েছে এবং রয়েছে ক্বিয়ামতের দিনেও। জেনে রেখ 'আদ জাতি তাদের পালনকর্তার সাথে কুফরী করেছে। জেনে রেখ হূদের কওম 'আদ জাতির জন্য অভিসম্পাৎ' *(হূদ ১১/৫০-৬০)*।

হূদ (আঃ) তাঁর জাতিকে তাদের বিলাসোপকরণ ও অন্যায় আচরণ সম্পর্কে সতর্ক করেন এবং এতদসত্ত্বেও তাদের প্রতি আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ সমূহ

স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, যেমন সূরা শো‘আরায় ১২৮-১৩৯ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে,

أَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ آيَةً تَعْبَثُوْنَ، وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ، فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيْعُوْنِ، وَاتَّقُوا الَّذِيْ أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُوْنَ، أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَّبَنِيْنَ، وَجَنَّاتٍ وَّعُيُوْنٍ، إِنِّيْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ، قَالُوْا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ الْوَاعِظِيْنَ، إِنْ هَذَا إِلاَّ خُلُقُ الْأَوَّلِيْنَ، وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ، فَكَذَّبُوْهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِيْ ذَلِكَ لَآيَةً وَّمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِيْنَ- (الشعراء ١٢٨-١٣٩)-

অনুবাদঃ ‘তোমরা কি প্রতিটি উঁচু স্থানে অযথা নিদর্শন নির্মাণ করছ (২৬/১২৮)? (যেমন সুউচ্চ টাওয়ার, শহীদ মিনার, স্মৃতিসৌধ ইত্যাদি)। ‘এবং তোমরা বড় বড় প্রাসাদ সমূহ নির্মাণ করছ, যেন তোমরা সেখানে চিরকাল বসবাস করবে’ (১২৯)? (যেমন ধনী ব্যক্তিরা দেশে ও বিদেশে বিনা প্রয়োজনে বড় বড় বাড়ী করে থাকে)। ‘এছাড়া যখন তোমরা কাউকে আঘাত হানো, তখন নিষ্ঠুর-যালেমদের মত আঘাত হেনে থাক (১৩০)’ (বিভিন্ন দেশে পুলিশী নির্যাতনের বিষয়টি স্মরণযোগ্য)। ‘অতএব তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর (১৩১)’। ‘তোমরা ভয় কর সেই মহান সত্তাকে, যিনি তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন ঐসব বস্তু দ্বারা যা তোমরা জানো’ (১৩২)। ‘তিনি তোমাদের সাহায্য করেছেন গবাদি পশু ও সন্তানাদি দ্বারা (১৩৩)’ ‘এবং উদ্যান ও ঝরণা সমূহ দ্বারা (১৩৪)’। (অতঃপর হূদ (আঃ) কঠিন আযাবের ভয় দেখিয়ে বললেন,) ‘আমি তোমাদের জন্য মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করছি’ (১৩৫)। জবাবে কওমের নেতারা বলল, ‘তুমি উপদেশ দাও বা না দাও সবই আমাদের জন্য সমান’ (১৩৬)। ‘তোমার এসব কথাবার্তা পূর্ববর্তী লোকদের রীতি-অভ্যাস বৈ কিছু নয়’ (১৩৭)। ‘আমরা শাস্তিপ্রাপ্ত হব না’ (১৩৮)। (আল্লাহ বলেন,) ‘অতঃপর (এভাবে) তারা তাদের নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। ফলে আমরাও তাদেরকে ধ্বংস করে দিলাম। এর মধ্যে

(শিক্ষণীয়) নিদর্শন রয়েছে। বস্তুতঃ তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী ছিল না' *(শো'আরা ২৬/১২৮-১৩৯)*।

সূরা হা-মীম সাজদার **১৪-১৬** আয়াতে 'আদ জাতির অলীক দাবী, অযথা দম্ভ ও তাদের উপরে আপতিত শাস্তির বর্ণনা সমূহ এসেছে এভাবে,

... قَالُوْا لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلآئِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُوْنَ، فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوْا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوْا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِيْ خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوْا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُوْنَ، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِيْ أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيْقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لاَ يُنْصَرُوْنَ- (حم السجدة ١٤-١٦)-

'...তারা ('আদ ও ছামূদের লোকেরা) বলেছিল, আমাদের প্রভু ইচ্ছা করলে অবশ্যই ফেরেশতা পাঠাতেন। অতএব আমরা তোমাদের আনীত বিষয় অমান্য করলাম' (৪১/১৪)। 'অতঃপর 'আদ-এর লোকেরা পৃথিবীতে অযথা অহংকার করল এবং বলল, আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিধর কে আছে? তারা কি লক্ষ্য করেনি যে, যে আল্লাহ তাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিধর? বস্তুতঃ তারা আমাদের নিদর্শন সমূহ অস্বীকার করত' (১৫)। 'অতঃপর আমরা তাদের উপরে প্রেরণ করলাম ঝঞ্ঝাবায়ু বেশ কয়েকটি অশুভ দিনে, যাতে তাদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনার কিছু আযাব আস্বাদন করানো যায়। আর পরকালের আযাব তো আরও লাঞ্ছনাকর। যেদিন তারা কোনরূপ সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না' *(ফুছছিলাত/হা-মীম সাজদাহ ৪১/১৪-১৬)*।

সূরা আহক্বাফ ২১-২৬ আয়াতে উক্ত আযাবের ধরন বর্ণিত হয়েছে এভাবে, যেমন আল্লাহ বলেন,

وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتْ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلاَّ تَعْبُدُوْا إِلاَّ اللَّهَ إِنِّيْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ، قَالُوْا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ، قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ

اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّيْ أَرَاكُمْ قَوْماً تَجْهَلُوْنَ، فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضاً مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوْا هَذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيْحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيْمٌ، تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوْا لاَ يُرَى إِلاَّ مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ، وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيْمَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيْهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعاً وَّأَبْصَاراً وَّأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلاَ أَبْصَارُهُمْ وَلاَ أَفْئِدَتُهُم مِّنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوْا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ- (الأحقاف ٢١-٢٦)-

‘আর তুমি ‘আদ-এর ভাই (হূদ)-এর কথা বর্ণনা কর, যখন সে তার কওমকে বালুকাময় উঁচু উপত্যকায় সতর্ক করে বলেছিল, অথচ তার পূর্বে ও পরে অনেক সতর্ককারী গত হয়েছিল, (এই মর্মে যে,) তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারু ইবাদত কর না। আমি তোমাদের জন্য এক মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করছি’ *(আহক্বাফ ৪৬/২১)*। ‘তারা বলল, তুমি কি আমাদেরকে আমাদের উপাস্য সমূহ থেকে ফিরিয়ে রাখতে আগমন করেছ? তুমি যদি সত্যবাদী হয়ে থাক, তবে আমাদেরকে যে শাস্তির ভয় দেখাচ্ছ, তা নিয়ে আস দেখি?’ *(২২)*। হূদ বলল, এ জ্ঞান তো স্রেফ আল্লাহ্র কাছেই রয়েছে। আমি যে বিষয় নিয়ে প্রেরিত হয়েছি, তা তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়ে থাকি। কিন্তু আমি দেখছি তোমরা এক মূর্খ সম্প্রদায়’ *(২৩)*। অতঃপর তারা যখন শাস্তিকে মেঘরূপে তাদের উপত্যকা সমূহের অভিমুখী দেখল, তখন বলল, এতো মেঘ, আমাদেরকে বৃষ্টি দেবে। (হূদ বললেন) বরং এটা সেই বস্তু, যা তোমরা তাড়াতাড়ি চেয়েছিলে। এটা এমন বায়ু, যার মধ্যে রয়েছে মর্মন্তুদ আযাব’ *(২৪)*। ‘সে তার প্রভুর আদেশে সবকিছুকে ধ্বংস করে দেবে। অতঃপর ভোর বেলায় তারা এমন অবস্থা প্রাপ্ত হ’ল যে, শূন্য বাস্তুভিটাগুলি ছাড়া আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হ’ল না। আমরা অপরাধী সম্প্রদায়কে এমনি করেই শাস্তি দিয়ে থাকি’ *(২৫)*। ‘আমরা তাদেরকে এমন সব বিষয়ে ক্ষমতা দিয়েছিলাম, যেসব বিষয়ে তোমাদের ক্ষমতা দেইনি। আমরা তাদের দিয়েছিলাম কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয়। কিন্তু সেসব কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় তাদের কোন কাজে আসল না, যখন তারা আল্লাহ্র আয়াত সমূহকে অস্বীকার করল এবং

সেই শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করল, যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত' *(আহক্বাফ ৪৬/২১-২৬)*।

উক্ত বিষয়ে সূরা হা-ক্বক্বাহ ৭-৮ আয়াতে আল্লাহ বলেন,

سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوْمًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ- فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ؟- (الحاقة ٧-٨)-

'তাদের উপরে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু প্রবাহিত হয়েছিল সাত রাত্রি ও আট দিবস ব্যাপী অবিরতভাবে। (হে মুহাম্মাদ!) তুমি দেখলে দেখতে পেতে যে, তারা অসার খর্জুর কাণ্ডের ন্যায় ভূপাতিত হয়ে রয়েছে' (৭)। 'তুমি (এখন) তাদের কোন অস্তিত্ব দেখতে পাও কি'? *(হা-ক্বক্বাহ ৬৯/৭-৮)*।

সূরা ফাজ্র ৬-৮ আয়াতে 'আদ বংশের শৌর্য-বীর্য সম্বন্ধে আল্লাহ তাঁর শেষনবীকে শুনিয়ে বলেন,

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ، اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ، الَّتِىْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِى الْبِلاَدِ-

'আপনি কি জানেন না আপনার প্রভু কিরূপ আচরণ করেছিলেন 'আদে ইরম (প্রথম 'আদ) গোত্রের সাথে'? *(ফজর ৬)* 'যারা ছিল উঁচু স্তম্ভসমূহের মালিক (৭)। 'এবং যাদের সমান কাউকে জনপদ সমূহে সৃষ্টি করা হয়নি' *(ফাজ্র ৮৯/৬-৮)*।

কওমে 'আদ-এর প্রতি হূদ (আঃ)-এর দাওয়াতের সারমর্ম :

কওমে নূহের প্রতি হযরত নূহ (আঃ)-এর দাওয়াতের সারমর্ম এবং কওমে 'আদ-এর প্রতি হযরত হূদ (আঃ)-এর দাওয়াতের সারমর্ম প্রায় একই। হযরত হূদ (আঃ)-এর দাওয়াতের সারকথাগুলি সূরা হূদ-এর ৫০, ৫১ ও ৫২ আয়াতে আল্লাহ বর্ণনা করেছেন, যা এক কথায় বলা যায়- তাওহীদ, তাবলীগ ও ইস্তেগফার। প্রথমে তিনি নিজ কওমকে তাদের কল্পিত উপাস্যদের ছেড়ে একক উপাস্য আল্লাহ্র দিকে ফিরে আসার ও একনিষ্ঠভাবে তাঁর প্রতি ইবাদতের আহ্বান জানান, যাকে বলা হয় 'তাওহীদে ইবাদত'। অতঃপর তিনি জনজীবনকে শিরকের আবিলতা ও নানাবিধ কুসংস্কারের পংকিলতা

হ'তে মুক্ত করার জন্য নিঃস্বার্থভাবে দাওয়াত দিতে থাকেন এবং তাদের নিকট আল্লাহ্র বিধানসমূহ পৌঁছে দিতে থাকেন। তাঁর এই দাওয়াত ও তাবলীগ ছিল নিরন্তর ও অবিরত ধারায় এবং যাবতীয় বস্তুগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে। অতঃপর তিনি জনগণকে নিজেদের কুফরী, শেরেকী ও অন্যান্য কবীরা গোনাহ সমূহ হ'তে তওবা করার ও আল্লাহ্র নিকটে একান্তভাবে ক্ষমা প্রার্থনার আহ্বান জানান।

উপরোক্ত তিনটি বিষয়ে সকল নবীই দাওয়াত দিয়েছেন। মূলতঃ উপরোক্ত তিনটি বিষয়ের মধ্যেই লুকিয়ে আছে মানুষের ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তি। মানুষ যখনই নিজেদের কল্পিত দেব-দেবী ও মূর্তি-প্রতিমাসহ বিভিন্ন উপাস্যের নিকটে মাথা নত করবে ও তাদেরকেই মুক্তির অসীলা কিংবা সরাসরি মুক্তিদাতা ভাববে, তখনই তার শ্রেষ্ঠত্ব ভূলুণ্ঠিত হবে। নিকৃষ্ট সৃষ্টি সাপ ও তুলসী গাছ পর্যন্ত তার পূজা পাবে। মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব ও তার সেবা বাদ দিয়ে সে নির্জীব মূর্তির সেবায় লিপ্ত হবে। একজন ক্ষুধার্ত ভাইকে বা একটি অসহায় প্রাণীকে খাদ্য না দিয়ে সে নিজেদের হাতে গড়া অক্ষম-অনড় মূর্তিকে দুধ-কলার নৈবেদ্য পেশ করবে ও পুষ্পাঞ্জলী নিবেদন করবে। এমনকি কল্পিত দেবতাকে খুশী করার জন্য সে নরবলি বা সতীদাহ করতেও কুণ্ঠিত হবে না। পক্ষান্তরে যখনই একজন মানুষ সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কেবলমাত্র আল্লাহ্কে তার সৃষ্টিকর্তা, রূযীদাতা, বিপদহন্তা, বিধানদাতা, জীবন ও মরণদাতা হিসাবে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করবে, তখনই সে অন্য সকল সৃষ্টির প্রতি মিথ্যা আনুগত্য হ'তে মুক্তি পাবে। আল্লাহ্র গোলামীর অধীনে নিজেকে স্বাধীন ও সৃষ্টির সেরা হিসাবে ভাবতে শুরু করবে। তার সেবার জন্য সৃষ্ট জলে-স্থলে ও অন্তরীক্ষের সবকিছুর উপরে স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠায় সে উদ্বুদ্ধ হবে। তার জ্ঞান ও উপলব্ধি যত বৃদ্ধি পাবে, আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্য ও ভক্তি ততই বৃদ্ধি পাবে। মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্টজীবের প্রতি তার দায়িত্ববোধ তত উচ্চকিত হবে।

দ্বিতীয়তঃ বস্তুগত কোন স্বার্থ ছাড়াই মানুষ যখন কাউকে সৎ পথের দাওয়াত দেয়, তখন তা অন্যের মনে প্রভাব বিস্তার করে। ঐ দাওয়াত যদি তার হৃদয় উৎসারিত হয় এবং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ প্রেরিত অভ্রান্ত সত্যের পথের দাওয়াত

হয়, তাহ'লে তা অন্যের হৃদয়ে রেখাপাত করে। সংশোধন মূলক দাওয়াত প্রথমে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলেও তা অবশেষে কল্যাণময় ফলাফল নিয়ে আসে। নবীগণের দাওয়াতে স্ব স্ব যুগের ধর্মনেতা ও সমাজ নেতাদের মধ্যে বিরুপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হ'লেও দুনিয়া চিরদিন নবীগণকেই সম্মান করেছে, ঐসব দুষ্টমতি ধর্মনেতা ও সমাজ নেতাদের নয়।

তৃতীয়তঃ মানুষ যখন অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে ও আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমাপ্রার্থী হয়, তখন তার দুনিয়াবী জীবনে যেমন কল্যাণ প্রভাব বিস্তার করে, তেমনি তার পরকালীন জীবন সুখময় হয় এবং সে আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ লাভে ধন্য হয়। হূদ (আঃ) স্বীয় জাতিকে বিশেষভাবে বলেছিলেন, 'হে আমার কওম! তোমরা আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাঁর দিকে ফিরে যাও। তাহ'লে তিনি আসমান থেকে তোমাদের জন্য বৃষ্টিধারা প্রেরণ করবেন এবং তোমাদের শক্তির উপর শক্তি বৃদ্ধি করবেন' *(হূদ ১১/৫২)*। এখানে 'শক্তি' বলতে দৈহিক বল, জনবল ও ধনবল সবই বুঝানো হয়েছে। তওবা ও ইস্তে গফারের ফলে এসবই লাভ করা সম্ভব, এটাই অত্র আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

হূদ (আঃ)-এর দাওয়াতের ফলশ্রুতি :

হযরত হূদ (আঃ) স্বীয় কওমে 'আদকে শিরক পরিত্যাগ করে সার্বিক জীবনে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান। তিনি তাদেরকে মূর্তিপূজা ত্যাগ করার এবং যুলুম ও অত্যাচার পরিহার করে ন্যায় ও সুবিচারের পথে চলার উদাত্ত আহ্বান জানান। কিন্তু নিজেদের ধনৈশ্বর্যের মোহে এবং দুনিয়াবী শক্তির অহংকারে মদমত্ত হয়ে তারা নবীর দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে। তারা বলল, তোমার ঘোষিত আযাব কিংবা তোমার কোন মু'জেযা না দেখে কেবল তোমার মুখের কথায় আমরা আমাদের বাপ-দাদার আমল থেকে চলে আসা উপাস্য দেব-দেবীদের বর্জন করতে পারি না। বরং আমরা সন্দেহ করছি যে, আমাদের দেবতাদের নিন্দাবাদ করার কারণে তাদের অভিশাপে তোমাকে ভূতে ধরেছে ও মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে তুমি উন্মাদের মত কথাবার্তা বলছ। তাদের এসব কথার উত্তরে হযরত হূদ (আঃ) পয়গম্বর সুলভ নির্ভীক কণ্ঠে জবাব দেন যে, তোমরা যদি আমার কথা না মানো, তবে তোমরা সাক্ষী থাক যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া তোমাদের ঐসব অলীক উপাস্যদের আমি মানি

না। তোমরা ও তোমাদের দেবতারা সবাই মিলে আমার অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা কর। তাতে আমার কিছুই হবে না আল্লাহ্র হুকুম ছাড়া। তিনিই আমার পালনকর্তা। তাঁর উপরেই আমি ভরসা রাখি। যারা সরল পথে চলে, আল্লাহ তাদের সাহায্য করেন।

অহংকারী ও শক্তি মদমত্ত জাতির বিরুদ্ধে একাকী এমন নির্ভীক ঘোষণা দেওয়া সত্ত্বেও তারা তাঁর কেশাগ্র স্পর্শ করার সাহস করেনি। বস্তুতঃ এটা ছিল তাঁর একটি মু'জেযা বিশেষ। এর দ্বারা তিনি দেখিয়ে দিলেন যে, তাদের কল্পিত দেব-দেবীদের কোন ক্ষমতা নেই। অতঃপর তিনি বললেন, আমাকে যে সত্য পৌঁছানোর দায়িত্ব আল্লাহ পাক দিয়েছেন, সে সত্য আমি তোমাদের নিকটে পৌঁছে দিয়েছি। এক্ষণে যদি তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করতেই থাক এবং হঠকারিতার উপরে যিদ করতে থাক, তাহ'লে জেনে রেখ এর অনিবার্য পরিণতি হিসাবে তোমাদের উপরে আল্লাহ্র সেই কঠিন শাস্তি নেমে আসবে, যার আবেদন তোমরা আমার নিকটে বারবার করেছ। অতএব তোমরা সাবধান হও। এখনো তওবা করে আল্লাহ্র পথে ফিরে এসো।

কিন্তু হতভাগার দল হযরত হূদ (আঃ)-এর কোন কথায় কর্ণপাত করল না। তারা বরং অহংকারে স্ফীত হয়ে বলে উঠলো, 'আমাদের চেয়ে বড় শক্তিধর (এ পৃথিবীতে) আর কে আছে'? *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/১৫)*। ফলে তাদের উপরে এলাহী গযব অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠলো।

কওমে 'আদ-এর উপরে আপতিত গযব-এর বিবরণ :

মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক বলেন, কওমে 'আদ-এর অমার্জনীয় হঠকারিতার ফলে প্রাথমিক গযব হিসাবে উপর্যুপরি তিন বছর বৃষ্টিপাত বন্ধ থাকে। তাদের শস্যক্ষেত সমূহ শুষ্ক বালুকাময় মরুভূমিতে পরিণত হয়। বাগ-বাগিচা জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। এতদসত্ত্বেও তারা শিরক ও মূর্তিপূজা ত্যাগ করেনি। কিন্তু অবশেষে তারা বাধ্য হয়ে আল্লাহ্র কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করে। তখন আসমানে সাদা, কালো ও লাল মেঘ দেখা দেয় এবং গায়েবী আওয়ায আসে যে, তোমরা কোনটি পসন্দ করো? লোকেরা কালো মেঘ কামনা করল। তখন

কালো মেঘ এলো। লোকেরা তাকে স্বাগত জানিয়ে বলল, هَذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ‘এটি আমাদের বৃষ্টি দেবে’। জবাবে তাদের নবী হূদ (আঃ) বললেন,

بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ، تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِرَبِّهَا... (الأحقاف ٢٤-٢٥)-

‘বরং এটা সেই বস্তু যা তোমরা তাড়াতাড়ি চেয়েছিলে। এটা এমন বায়ু যার মধ্যে রয়েছে মর্মন্তুদ আযাব’। ‘সে তার প্রভুর আদেশে সবাইকে ধ্বংস করে দেবে...’।[৬৯] ফলে অবশেষে পরদিন ভোরে আল্লাহ্র চূড়ান্ত গযব নেমে আসে। সাত রাত্রি ও আট দিন ব্যাপী অনবরত ঝড়-তুফান বইতে থাকে। মেঘের বিকট গর্জন ও বজ্রাঘাতে বাড়ী-ঘর সব ধ্বসে যায়, প্রবল ঘুর্ণিঝড়ে গাছ-পালা সব উপড়ে যায়, মানুষ ও জীবজন্তু শূন্যে উত্থিত হয়ে সজোরে যমীনে পতিত হয় *(ক্বামার ৫৪/২০; হাক্বক্বাহ ৬৯/৬-৮)* এবং এভাবেই শক্তিশালী ও সুঠাম দেহের অধিকারী বিশালবপু ‘আদ জাতি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন, এছাড়াও তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী অভিসম্পাৎ দুনিয়া ও আখেরাতে *(হূদ ১১/৬০)*।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মেঘ বা ঝড় দেখতেন, তখন তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে যেত এবং বলতেন হে আয়েশা! এই মেঘ ও তার মধ্যকার ঝঞ্ঝাবায়ু দিয়েই একটি সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা হয়েছে। যারা মেঘ দেখে খুশী হয়ে বলেছিল, ‘এটি আমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করবে’।[৭০] রাসূলের এই ভয়ের তাৎপর্য ছিল এই যে, কিছু লোকের অন্যায়ের কারণে সকলের উপর এই ব্যাপক গযব নেমে আসতে পারে। যেমন ওহোদ যুদ্ধের দিন কয়েকজনের ভুলের কারণে সকলের উপর বিপদ নেমে আসে। যেদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেন,

---

৬৯. আহক্বাফ ৪৬/২৪, ২৫; ইবনু কাছীর, সূরা আ'রাফ ৭১।

৭০. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১৫১৩ ‘ছালাত’ অধ্যায়, ‘ঝঞ্ঝা-বায়ু’ অনুচ্ছেদ।

وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لاَّتُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوْآ أَنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ- (الأنفال ٢٥)-

'আর তোমরা ঐসব ফেৎনা থেকে বেঁচে থাক, যা বিশেষভাবে কেবল তাদের উপর পতিত হবে না, যারা তোমাদের মধ্যে যালেম। আর জেনে রাখো যে, আল্লাহ্র শাস্তি অত্যন্ত কঠোর' *(আনফাল ৮/২৫)*।

উল্লেখ্য যে, গযব নাযিলের প্রাক্কালেই আল্লাহ স্বীয় নবী হূদ ও তাঁর ঈমানদার সাথীদের উক্ত এলাকা ছেড়ে চলে যাবার নির্দেশ দেন ও তাঁরা উক্ত আযাব থেকে রক্ষা পান *(হূদ ১১/৫৮)*। অতঃপর তিনি মক্কায় চলে যান ও সেখানেই ওফাত পান।[৭১] তবে ইবনু কাছীর হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন যে, হূদ (আঃ) ইয়ামনেই কবরস্থ হয়েছেন।[৭২] আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

কওমে 'আদ-এর ধ্বংসের প্রধান কারণ সমূহ :

১. মনস্তাত্ত্বিক কারণ সমূহ :

(ক) তারা আল্লাহ্র অনুগ্রহ সমূহের অবমূল্যায়ন করেছিল। যার ফলে তারা আল্লাহ্র আনুগত্য হ'তে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল এবং শয়তানের আনুগত্য বরণ করে স্বেচ্ছাচারী হয়ে গিয়েছিল (খ) আল্লাহ্র নে'মত সমূহকে তাদের জন্য চিরস্থায়ী ভেবেছিল (গ) আল্লাহ্র গযব থেকে বাঁচার জন্য বিভিন্ন কল্পিত উপাস্যের অসীলা পূজা শুরু করেছিল (ঘ) তারা আল্লাহ্র নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল (ঙ) তারা আল্লাহ্র গযব থেকে নির্ভীক হয়ে গিয়েছিল। যদিও তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করত।

২. বস্তুগত কারণসমূহ : প্রধানত: তিনটি :

(ক) তারা অযথা উঁচু স্থান সমূহে সুউচ্চ টাওয়ার ও নিদর্শন সমূহ নির্মাণ করত। যা স্রেফ অপচয় ব্যতীত কিছুই ছিল না *(শো'আরা ১২৮)*।

---

৭১. *তাফসীর কুরতুবী, আ'রাফ ৬৫।*

৭২. *তাফসীর ইবনে কাছীর, সূরা আ'রাফ ৬৫।*

(খ) তারা অহেতুক মযবূত প্রাসাদ রাজি তৈরী করত এবং ভাবত যেন তারা সেখানে চিরকাল বসবাস করবে *(ঐ, ১২৯)*।

(গ) তারা দুর্বলদের উপর নিষ্ঠুরভাবে আঘাত হানতো এবং মানুষের উপর অবর্ণনীয় নির্যাতন চালাতো *(ঐ, ১৩০)*।

শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ :

উপরোক্ত বিষয়গুলির মধ্যে বর্তমান যুগের অত্যাচারী সমাজনেতা ও যালেম সরকার সমূহ এবং সভ্যতাগর্বী মানুষের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ নিহিত রয়েছে। যেমন:

(১) অহি-র বিধানকে অস্বীকার করা এবং অন্যায়ের উপর যিদ ও অহংকার প্রদর্শন করাই হ'ল পৃথিবীতে আল্লাহ্র গযব নাযিলের প্রধান কারণ।

(২) আল্লাহ প্রেরিত গযবের ধরন বিভিন্ন রূপ হ'তে পারে। কিন্তু সেই গযবকে ঠেকানোর ক্ষমতা মানুষের থাকে না।

(৩) বিলাসী, অপচয়কারী ও অত্যাচারী নেতাদের কারণেই জাতি আল্লাহ্র গযবের শিকার হয়ে থাকে।

(৪) আল্লাহ্র গযব যাদের উপর আপতিত হয়, তারা সকল যুগে নিন্দিত হয় এবং কখনোই তারা আর মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না।

(৫) আল্লাহ্র বিধান লংঘনকারী ব্যক্তি বা সম্প্রদায় চূড়ান্ত বিচারে দুনিয়াতেই আল্লাহ্র গযবের শিকার হয়। উপরন্তু আখেরাতের আযাব তো থাকেই এবং তা হয় আরো কঠোর *(ক্বলম ৬৮/৩৩)*।

৫. হযরত ছালেহ *(আলাইহিস সালাম)*

'আদ জাতির ধ্বংসের প্রায় ৫০০ বছর পরে হযরত ছালেহ (আঃ) কওমে ছামূদ-এর প্রতি নবী হিসাবে প্রেরিত হন।[৭৩] কওমে 'আদ ও কওমে ছামূদ একই দাদা 'ইরাম'-এর দু'টি বংশধারার নাম। এদের বংশ পরিচয় ইতিপূর্বে হূদ (আঃ)-এর আলোচনায় বিধৃত হয়েছে। কওমে ছামূদ আরবের উত্তর-পশ্চিম এলাকায় বসবাস করত। তাদের প্রধান শহরের নাম ছিল 'হিজ্র' যা শামদেশ অর্থাৎ সিরিয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্তমানে একে সাধারণভাবে 'মাদায়েনে ছালেহ' বলা হয়ে থাকে। 'আদ জাতির ধ্বংসের পর ছামূদ জাতি তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়। তারাও 'আদ জাতির মত শক্তিশালী ও বীরের জাতি ছিল। তারা প্রস্তর খোদাই ও স্থাপত্য বিদ্যায় খুবই পারদর্শী ছিল। সমতল ভূমিতে বিশালকায় অট্টালিকা নির্মাণ ছাড়াও পর্বতগাত্র খোদাই করে তারা নানা রূপ প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করত। তাদের স্থাপত্যের নিদর্শনাবলী আজও বিদ্যমান রয়েছে। এগুলোর গায়ে ইরামী ও ছামূদী বর্ণমালার শিলালিপি খোদিত রয়েছে। অভিশপ্ত অঞ্চল হওয়ার কারণে এলাকাটি আজও পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। কেউ সেখানে বসবাস করে না। ৯ম হিজরীতে তাবূক যুদ্ধে যাওয়ার পথে মুসলিম বাহিনী হিজ্রে অবতরণ করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে সেখানে প্রবেশ করতে নিষেধ করে বলেন,

لاَ تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِيْنَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ-

'তোমরা ঐসব অভিশপ্তদের এলাকায় প্রবেশ করো না ক্রন্দনরত অবস্থায় ব্যতীত। যদি ক্রন্দন করতে না পার, তাহ'লে প্রবেশ করো না। তাহ'লে তোমাদের উপর ঐ গযব আসতে পারে, যা তাদের উপর এসেছিল'।[৭৪] রাসূলের এই বক্তব্যের মধ্যে সুক্ষ্ম তাৎপর্য এই যে, এগুলি দেখে যদি মানুষ

---

৭৩. *তারীখুল আম্বিয়া ১/৪৯ পৃঃ।*

৭৪. *বুখারী হা/৪৩৩; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫১২৫ 'শিষ্টাচার' অধ্যায় 'যুলুম' অনুচ্ছেদ।*

আল্লাহর গযবে ভীত না হয়, তাহ'লে তাদের অন্তর শক্ত হয়ে যাবে এবং ঐসব অভিশপ্তদের মত অহংকারী ও হঠকারী আচরণ করবে। ফলে তাদের উপর অনুরূপ গযব নেমে আসবে, যেরূপ ইতিপূর্বে ঐসব অভিশপ্তদের উপর নেমে এসেছিল।

পার্থিব বিত্ত-বৈভব ও ধনৈশ্বর্যের পরিণতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অশুভ হয়ে থাকে। বিত্তশালীরা আল্লাহ ও আখেরাতকে ভুলে গিয়ে ভ্রান্ত পথে পা বাড়ায়। ছামূদ জাতির বেলায়ও তাই হয়েছিল। অথচ কওমে নূহের কঠিন শাস্তির ঘটনাবলী তখনও লোকমুখে আলোচিত হ'ত। আর কওমে 'আদ-এর নিশ্চিহ্ন হওয়ার ঘটনা তো তাদের কাছে একপ্রকার টাটকা ঘটনাই ছিল। অথচ তাদের ভাইদের ধ্বংসস্তুপের উপরে বড় বড় বিলাসবহুল অট্টালিকা নির্মাণ করে ও বিত্ত বৈভবের মালিক হয়ে তারা পিছনের কথা ভুলে গেল। এমনকি তারা 'আদ জাতির মত অহংকারী কার্যকলাপ শুরু করে দিল। তারা শিরক ও মূর্তিপূজায় লিপ্ত হ'ল। এমতাবস্থায় তাদের হেদায়াতের জন্য তাদেরই বংশের মধ্য হ'তে ছালেহ (আঃ)-কে আল্লাহ নবী মনোনীত করে পাঠালেন।

কওমে ছামূদ-এর প্রতি হযরত ছালেহ (আঃ)-এর দাওয়াত :

পথভোলা জাতিকে হযরত ছালেহ (আঃ) সর্বপ্রথম তাওহীদের দাওয়াত দিলেন। তিনি তাদেরকে মূর্তিপূজাসহ যাবতীয় শিরক ও কুসংস্কার ত্যাগ করে এক আল্লাহ্র ইবাদত ও তাঁর প্রেরিত বিধান সমূহের প্রতি আনুগত্যের আহ্বান জানালেন। তিনি যৌবনকালে নবুঅতপ্রাপ্ত হন। তখন থেকে বার্ধক্যকাল অবধি তিনি স্বীয় কওমকে নিরন্তর দাওয়াত দিতে থাকেন। কওমের দুর্বল শ্রেণীর লোকেরা তাঁর উপরে ঈমান আনলেও শক্তিশালী ও নেতৃস্থানীয় লোকেরা তাঁকে অস্বীকার করে। ছালেহ (আঃ)-এর দাওয়াত সম্পর্কে সূরা আ'রাফের ৭৩-৭৯ আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَإِلَى ثَمُوْدَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـــهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَـــذِهِ نَاقَةُ اللهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوْهَا تَأْكُلْ فِيْ أَرْضِ اللهِ وَلاَ تَمَسُّوْهَا بِسُوْءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ، وَاذْكُرُوْا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الأَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْراً وَتَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ بُيُوْتاً

فَاذْكُرُوْا آلآءَ اللهِ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ، قَالَ الْمَلأُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُوْنَ أَنَّ صَالِحاً مُّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ قَالُوْا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُوْنَ، قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا إِنَّا بِالَّذِيْ آمَنتُمْ بِهِ كَافِرُوْنَ، فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جَاثِمِيْنَ، فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لاَّ تُحِبُّوْنَ النَّاصِحِيْنَ- (الأعراف ٧٣-٧٩)-

অনুবাদ: ‘ছামূদ জাতির নিকটে (আমরা প্রেরণ করেছিলাম) তাদের ভাই ছালেহকে। সে বলল, হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ হ’তে একটি প্রমাণ এসে গেছে। এটি আল্লাহ্র উষ্ট্রী, তোমাদের জন্য নিদর্শন স্বরূপ। অতএব তোমরা একে ছেড়ে দাও আল্লাহ্র যমীনে চরে বেড়াবে। তোমরা একে অন্যায়ভাবে স্পর্শ করবে না। তাতে মর্মান্তিক শাস্তি তোমাদের পাকড়াও করবে’ *(আ‘রাফ ৭/৭৩)*। ‘তোমরা স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তোমাদেরকে ‘আদ জাতির পরে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে ঠিকানা করে দেন। সেমতে তোমরা সমতল ভূমিতে অট্টালিকা সমূহ নির্মাণ করেছ এবং পাহাড়ের গায়ে খোদাই করে প্রকোষ্ঠ সমূহ নির্মাণ করেছ। অতএব তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ সমূহ স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করো না’ (৭৪)। কিন্তু তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক নেতারা ঈমানদার দুর্বল শ্রেণীর উদ্দেশ্যে বলল, ‘তোমরা কি জানো যে, ছালেহ তার প্রভুর পক্ষ হ’তে প্রেরিত নবী? তারা বলল, আমরা তো তার আনীত বিষয় সমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী’ (৭৫)। ‘(জবাবে) দাম্ভিক নেতারা বলল, তোমরা যে বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করেছ, আমরা সে বিষয়ে অস্বীকারকারী’ (৭৬)। ‘অতঃপর তারা উষ্ট্রীকে হত্যা করল এবং তাদের প্রভুর আদেশ অমান্য করল। তারা বলল, হে ছালেহ! তুমি নিয়ে এস যদ্বারা তুমি আমাদের ভয় দেখাতে, যদি তুমি আল্লাহ্র প্রেরিত নবীদের একজন হয়ে থাক’ (৭৭)। ‘অতঃপর ভূমিকম্প তাদের পাকড়াও করল এবং সকাল বেলা

নিজ নিজ গৃহে সবাই উপুড় হয়ে পড়ে রইল' (৭৮)। 'ছালেহ তাদের কাছ থেকে প্রস্থান করল এবং বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের কাছে আমার প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদের কল্যাণ কামনা করেছি। কিন্তু তোমরা কল্যাণকামীদের ভালবাস না' *(আ'রাফ ৭/৭৩-৭৯)*।

ছালেহ (আঃ)-এর উপরোক্ত দাওয়াত ও তাঁর কওমের আচরণ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ২২টি সূরায় ৮৭টি আয়াতে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে।[৭৫]

ছালেহ (আঃ)-এর দাওয়াতের ফলশ্রুতি :

ইতিপূর্বেকার ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলির ন্যায় কওমে ছামূদও তাদের নবী হযরত ছালেহ (আঃ)-কে অমান্য করে। তারা বিগত 'আদ জাতির ন্যায় পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করতে থাকে। নবী তাদেরকে যতই দাওয়াত দিতে থাকেন, তাদের অবাধ্যতা ততই সীমা লংঘন করতে থাকে। 'তারা বলল,

قَالُوْا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِيْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَا إِلَيْهِ مُرِيْبٍ- (هود ٦٢)-

হে ছালেহ! ইতিপূর্বে আপনি আমাদের কাছে আকাংখিত ব্যক্তি ছিলেন। আপনি কি বাপ-দাদার আমল থেকে চলে আসা উপাস্যদের পূজা করা থেকে আমাদের নিষেধ করছেন? অথচ আমরা আপনার দাওয়াতের বিষয়ে যথেষ্ট সন্দিহান' *(হূদ ১১/৬২)*। তারা কওমের দুর্বল ও দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের জমা করে বলল, أَتَعْلَمُوْنَ أَنَّ صَالِحاً مُّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ- 'তোমরা কি বিশ্বাস কর যে, ছালেহ তার প্রভুর পক্ষ হ'তে প্রেরিত ব্যক্তি'? তারা জবাব দিল, إِنَّابِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُوْنَ- 'আমরা তো তাঁর আনীত বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী'।

---

৭৫. যথাক্রমে: (১) সূরা আ'রাফ ৭/৭৩-৭৯ (২) তওবা ৯/৭০ (৩) হূদ ১১/৬১-৬৮, ৮৯ (৪) ইবরাহীম ১৪/৯ (৫) হিজর ১৫/৮০-৮৪ (৬) ইসরা ১৭/৫৯ (৭) হজ্জ ২২/৪২ (৮) ফুরক্বান ২৫/৩৮-৩৯ (৯) শো'আরা ২৬/১৪১-১৫৯ (১০) নামল ২৭/৪৫-৫৩ (১১) আনকাবূত ২৯/৩৮ (১২) ছোয়াদ ৩৮/১৩ (১৩) গাফের/মুমিন ৪০/৩১-৩৩ (১৪) ফুছছিলাত/হা-মীম সাজদাহ ৪১/১৩, ১৭-১৮ (১৫) ক্বাফ ৫০/১২ (১৬) যারিয়াত ৫১/৪৩-৪৫ (১৭) নাজম ৫৩/৫১ (১৮) ক্বামার ৫৪/২৩-৩১ (১৯) আল-হা-ক্বক্বাহ ৬৯/৪-৫ (২০) বুরূজ ৮৫/১৮ (২১) ফাজ্র ৮৯/৯ (২২) শাম্স ৯১/১১-১৫। সর্বমোট ৮৭।

একথা শুনে দাম্ভিক নেতারা ক্ষিপ্ত হয়ে বলে উঠল, 'তোমরা যে বিষয়ে ঈমান এনেছ, আমরা ঐসব কিছুকে অস্বীকার করি' *(আ'রাফ ৭/৭৫)*। তারা আরও বলল,

فَقَالُوا أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِيْ ضَلاَلٍ وَسُعُرٍ- أَؤُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ- (القمر ٢٤-٢٥)-

'আমরা কি আমাদেরই একজনের অনুসরণ করব? তাহ'লে তো আমরা বিপথগামী ও বিকারগ্রস্ত বলে গণ্য হব'। 'আমাদের মধ্যে কি কেবল তারই উপরে অহী নাযিল করা হয়েছে? আসলে সে একজন মহা মিথ্যাবাদী ও দাম্ভিক' *(ক্বামার ৫৪/২৪-২৫)*। তারা ছালেহকে বলল, قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ –... 'আমরা তোমাকে ও তোমার সাথে যারা আছে তাদেরকে অকল্যাণের প্রতীক মনে করি'... *(নামল ২৭/৪৭)*। এইভাবে সমাজের শক্তিশালী শ্রেণী তাদের নবীকে অমান্য করল এবং মূর্তিপূজা সহ নানাবিধ শিরক ও কুসংস্কারে লিপ্ত হ'ল এবং সমাজে অনর্থ সৃষ্টি করতে থাকল। আল্লাহ্র ভাষায়, فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُوْنِ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ– 'তারা হেদায়াতের চাইতে অন্ধত্বকেই পসন্দ করে নিল। অতঃপর তাদের কৃতকর্মের ফলে অবমাননাকর শাস্তির গর্জন এসে তাদের পাকড়াও করল' *(ফুছছিলাত/হামীম সাজদাহ ৪১/১৭)*।

কওমে ছামূদ-এর উপরে আপতিত গযবের বিবরণ :

ইবনু কাছীর বর্ণনা করেন যে, হযরত ছালেহ (আঃ)-এর নিরন্তর দাওয়াতে অতিষ্ঠ হয়ে সম্প্রদায়ের নেতারা স্থির করল যে, তাঁর কাছে এমন একটা বিষয় দাবী করতে হবে, যা পূরণ করতে তিনি ব্যর্থ হবেন এবং এর ফলে তাঁর দাওয়াতও বন্ধ হয়ে যাবে। সেমতে তারা এসে তাঁর নিকটে দাবী করল যে, আপনি যদি আল্লাহ্র সত্যিকারের নবী হন, তাহ'লে আমাদেরকে নিকটবর্তী 'কাতেবা' পাহাড়ের ভিতর থেকে একটি দশ মাসের গর্ভবতী সবল ও স্বাস্থ্যবতী উষ্ট্রী বের করে এনে দেখান।

এ দাবী শুনে হযরত ছালেহ (আঃ) তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলেন যে, যদি তোমাদের দাবী পুরণ করা হয়, তবে তোমরা আমার নবুঅতের প্রতি ও আমার দাওয়াতের প্রতি ঈমান আনবে কি-না। জেনে রেখ, উক্ত মু'জেযা প্রদর্শনের পরেও যদি তোমরা ঈমান না আনো, তাহ'লে আল্লাহ্র গযবে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে'। এতে সবাই স্বীকৃত হ'ল ও উক্ত মর্মে অঙ্গীকার করল। তখন ছালেহ (আঃ) ছালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ পাক তার দো'আ কবুল করলেন এবং বললেন, إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ 'আমরা তাদের পরীক্ষার জন্য একটি উষ্ট্রী প্রেরণ করব। তুমি তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখ এবং ধৈর্য ধারণ কর' *(ক্বামার ৫৪/২৭)*। কিছুক্ষণের মধ্যেই পাহাড়ের গায়ে কম্পন দেখা দিল এবং একটি বিরাট প্রস্তর খণ্ড বিস্ফোরিত হয়ে তার ভিতর থেকে কওমের নেতাদের দাবীর অনুরূপ একটি গর্ভবতী ও লাবণ্যবতী তরতাযা উষ্ট্রী বেরিয়ে এল।

ছালেহ (আঃ)-এর এই বিস্ময়কর মু'জেযা দেখে গোত্রের নেতা সহ তার সমর্থক লোকেরা সাথে সাথে মুসলমান হয়ে গেল। অবশিষ্টরাও হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করল। কিন্তু প্রধান ধর্মনেতা ও অন্যান্য সমাজ নেতাদের বাধার কারণে হ'তে পারল না। তারা উল্টা বলল, قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ ...– 'আমরা তোমাকে ও তোমার সাথে যারা আছে তাদেরকে অকল্যাণের প্রতীক মনে করি...' *(নামল ২৭/৪৭)*। হযরত ছালেহ (আঃ) কওমের নেতাদের এভাবে অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে দেখে এবং পাল্টা তাঁকেই দায়ী করতে দেখে দারুণভাবে শংকিত হ'লেন যে, যেকোন সময়ে এরা আল্লাহ্র গযবে ধ্বংস হয়ে যাবে। তিনি তাদেরকে সাবধান করে বললেন, قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ– 'দেখ, তোমাদের মঙ্গলামঙ্গল আল্লাহ্র নিকটে রয়েছে। বরং তোমরা এমন সম্প্রদায়, যাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে' *(নামল ২৭/৪৭)*। অতঃপর পয়গম্বরসূলভ দয়া প্রকাশ করে বললেন,

هَـــذِهِ نَاقَةُ اللّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوْهَا تَأْكُلْ فِيْ أَرْضِ اللّهِ وَلاَ تَمَسُّوْهَا بِسُوْءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ– (هود ٦٤)–

‘এটি আল্লাহ্র উষ্ট্রী। তোমাদের জন্য নিদর্শন স্বরূপ। একে আল্লাহ্র যমীনে স্বাধীনভাবে চরে বেড়াতে দাও। সাবধান! একে অসৎ উদ্দেশ্যে স্পর্শ করো না। তাহ’লে তোমাদেরকে সত্বর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পাকড়াও করবে’ *(হূদ ১১/৬৪)*।

আল্লাহ উক্ত উষ্ট্রীর জন্য এবং লোকদের জন্য পানি বণ্টন করে দিয়েছিলেন। তিনি নবীকে বলে দেন, نَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ ‘হে ছালেহ! তুমি ওদেরকে বলে দাও যে, কূপের পানি তাদের মধ্যে বণ্টিত হয়েছে। প্রত্যেক পালায় তারা হাযির হবে’ *(ক্বামার ৫৪/২৮)*।

لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ– ‘একদিন উষ্ট্রীর ও পরের দিন তোমাদের (পানি পানের) জন্য পালা নির্ধারিত হয়েছে’ *(ক্বামার ৫৪/২৮; শো‘আরা ২৬/১৫৫)*।

আল্লাহ তা‘আলা কওমে ছামূদ-এর জন্য উক্ত উষ্ট্রীকেই সর্বশেষ পরীক্ষা হিসাবে নির্ধারণ করেছিলেন। তিনি বলেন, وَآتَيْنَا ثَمُوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوْا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلاَّ تَخْوِيْفًا– ‘আর আমরা ছামূদকে উষ্ট্রী দিয়েছিলাম স্পষ্ট নিদর্শন হিসাবে। কিন্তু তারা তার প্রতি যুলুম করেছিল। বস্তুতঃ আমরা ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই নিদর্শন সমূহ প্রেরণ করে থাকি’ *(ইসরা ১৭/৫৯)*।

ছামূদ জাতির লোকেরা যে কূপ থেকে পানি পান করত ও তাদের গবাদি পশুদের পানি পান করাত, এ উষ্ট্রীও সেই কূপ থেকে পানি পান করত। উষ্ট্রী যেদিন পানি পান করত, সেদিন কূয়ার পানি নিঃশেষে পান করে ফেলত। অবশ্য ঐদিন লোকেরা উষ্ট্রীর দুধ পান করত এবং বাকী দুধ দ্বারা তাদের সব পাত্র ভরে নিত। কিন্তু এই হতভাগাদের কপালে এত সুখ সহ্য হ’ল না। তারা একদিন পানি না পাওয়াকে অসুবিধার কারণ হিসাবে গণ্য করল। তাছাড়া উষ্ট্রী যখন ময়দানে চরে বেড়াত, তখন তার বিশাল দেহ ও অপরূপ চেহারা দেখে অন্যান্য গবাদি পশু ভয় পেত। ফলে তারা উষ্ট্রীকে মেরে ফেলতে মনস্থ করল। কিন্তু আল্লাহ্র গযবের ভয়ে কেউ সাহস করল না।

ইবনু জারীর প্রমুখ মুফাসসিরগণের বর্ণনা মতে, অবশেষে শয়তান তাদেরকে সর্ববৃহৎ কুমন্ত্রণা দিল। আর তা হ’ল নারীর প্রলোভন। ছামূদ গোত্রের দু’জন পরমা সুন্দরী মহিলা, যারা ছালেহ (আঃ)-এর প্রতি দারুণ বিদ্বেষী ছিল, তারা

তাদের রূপ-যৌবন দেখিয়ে দু'জন পথভ্রষ্ট যুবককে উষ্ট্রী হত্যায় রাযী করালো। অতঃপর তারা তীর ও তরবারির আঘাতে উষ্ট্রীকে পা কেটে হত্যা করে ফেলল। হত্যাকারী যুবকদ্বয়ের প্রধানকে লক্ষ্য করেই কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا 'যখন তাদের সবচেয়ে হতভাগা লোকটি তৎপর হয়ে উঠেছিল' *(শাম্স ৯১/১২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা খুৎবায় উক্ত আয়াত পাঠ করে বলেন, ঐ লোকটি ছিল কঠোর হৃদয় ও দুশ্চরিত্র (رجل عزيز عارم)।[৭৬] কেননা তার কারণেই গোটা ছামূদ জাতি গযবে পতিত হয়। আল্লাহ বলেন,

فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوْا كَهَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ-

'অতঃপর তারা তাদের প্রধান ব্যক্তিকে ডাকল। অতঃপর সে উষ্ট্রীকে ধরল ও বধ করল' *(২৯)*। 'অতঃপর কেমন কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও ভীতি প্রদর্শন! *(৩০)*। 'আমরা তাদের প্রতি প্রেরণ করলাম একটিমাত্র নিনাদ। আর তাতেই তারা হয়ে গেল খোয়াড় মালিকের চূর্ণিত শুষ্ক খড়কুটো সদৃশ' *(ক্বামার ৫৪/২৯-৩১)*।

উল্লেখ্য যে, উষ্ট্রী হত্যার ঘটনার পর ছালেহ (আঃ) স্বীয় কওমকে আল্লাহ্র নির্দেশ জানিয়ে দিলেন যে, تَمَتَّعُوْا فِيْ دَارِكُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٍ- 'এখন থেকে তিনদিন তোমরা তোমাদের ঘরে আরাম করে নাও (এর পরেই আযাব নেমে আসবে)। এ ওয়াদার (অর্থাৎ এ সময়সীমার) কোন ব্যতিক্রম হবে না' *(হূদ ১১/৬৫)*। কিন্তু এই হতভাগারা এরূপ কঠোর হুঁশিয়ারির কোন গুরুত্ব না দিয়ে বরং তাচ্ছিল্যভরে বলল, يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ 'হে ছালেহ! তুমি যার ভয় দেখাচ্ছ, তা নিয়ে আস দেখি, যদি তুমি সত্যিকারের নবী হয়ে থাক' *(আ'রাফ ৭/৭৭)*। তারা বলল, আমরা জানতে চাই, এ শাস্তি কিভাবে আসবে, কোত্থেকে আসবে, এর লক্ষণ কি

---

৭৬. মুসলিম, হা/২৮৫৫; কুরতুবী হা/৩১০৬; আ'রাফ ৭৭-৭৯; ইবনু কাছীর, ঐ।

হবে? ছালেহ (আঃ) বললেন, আগামীকাল বৃহস্পতিবার তোমাদের সকলের মুখমণ্ডল হলুদ হয়ে যাবে। পরের দিন শুক্রবার তোমাদের সবার মুখমণ্ডল লালবর্ণ ধারণ করবে। অতঃপর শনিবার দিন সবার মুখমণ্ডল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হয়ে যাবে। এটাই হবে তোমাদের জীবনের শেষ দিন।[৭৭]

একথা শোনার পর হঠকারী জাতি আল্লাহ্র নিকটে তওবা করে ক্ষমা প্রার্থনার পরিবর্তে স্বয়ং ছালেহ (আঃ)-কেই হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা ভাবল, যদি আযাব এসেই যায়, তবে তার আগে একেই শেষ করে দিই। কেননা এর নবুঅতকে অস্বীকার করার কারণেই গযব আসছে। অতএব এই ব্যক্তিই গযবের জন্য মূলতঃ দায়ী। আর যদি গযব না আসে, তাহ'লে সে মিথ্যার দণ্ড ভোগ করুক'। কওমের নয়জন নেতা এ নিকৃষ্ট ষড়যন্ত্রের নেতৃত্ব দেয়। তাদের এই চক্রান্তের বিষয় সূরা নমলে বর্ণিত হয়েছে এভাবে যে,

وَكَانَ فِي الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُوْنَ فِي الْأَرْضِ وَلاَ يُصْلِحُوْنَ، قَالُوْا تَقَاسَمُوْا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّــــهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُوْنَ-(نمل ٤٨-٤٩)-

'সেই শহরে ছিল এমন নয় ব্যক্তি, যারা জনপদে অনর্থ সৃষ্টি করে বেড়াত এবং কোনরূপ সংশোধনমূলক কাজ তারা করত না' (৪৮)। 'তারা বলল, তোমরা পরস্পরে আল্লাহ্র নামে শপথ কর যে, আমরা রাত্রিকালে ছালেহ ও তার পরিবার বর্গকে হত্যা করব। অতঃপর তার রক্তের দাবীদারকে আমরা বলে দেব যে, আমরা এ হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করিনি। আর আমরা নিশ্চিতভাবে সত্যবাদী' *(নমল ২৭/৪৮-৪৯)*।

তারা যুক্তি দিল, আমরা আমাদের কথায় অবশ্যই সত্যবাদী প্রমাণিত হব। কারণ রাত্রির অন্ধকারে কে কাকে মেরেছে, তা আমরা নির্দিষ্টভাবে জানতে পারব না। নেতৃবৃন্দের এ সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ও চক্রান্ত অনুযায়ী নয় নেতা তাদের প্রধান ক্বাদার বিন সালেফ-এর নেতৃত্বে রাতের বেলা ছালেহ (আঃ)-কে হত্যা করার জন্য তাঁর বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'ল। কিন্তু আল্লাহ

---

৭৭. তাফসীর ইবনু কাছীর, সূরা আ'রাফ ৭৭-৭৮।

তা‘আলা পথিমধ্যেই তাদেরকে প্রস্তর বর্ষণে ধ্বংস করে দিলেন। আল্লাহ বলেন,

وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لاَ يَشْعُرُوْنَ، فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِيْنَ- (نمل ٥٠-٥١)-

‘তারা ষড়যন্ত্র করল। আমরাও পাল্টা কৌশল করলাম। অথচ তারা কিছুই জানতে পারল না’। ‘তাদের চক্রান্তের পরিণতি দেখ। আমরা অবশ্যই তাদেরকে ও তাদের সম্প্রদায়ের সবাইকে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম’ *(নমল ২৭/৫০-৫১)*।

উল্লেখ্য যে, কুরআনে ঐ নয় ব্যক্তিকে تِسْعَةُ رَهْطٍ বা ‘নয়টি দল’ বলা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, ওরা নয়জন নয়টি দলের নেতা ছিল এবং তারা ছিল হিজ্‌র জনপদের প্রধান নেতৃবৃন্দ *(ইবনু কাছীর, সূরা নমল, ঐ)*।

উপরোক্ত চক্রান্তের ঘটনায় একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, জাতির শীর্ষ দুষ্টমতি নেতারা কুফর, শিরক, হত্যা-সন্ত্রাস ও ডাকাতি-লুণ্ঠনের মত জঘন্য অপরাধ সমূহ নির্বিবাদে করে গেলেও তারা তাদের জনগণের কাছে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হ’তে রাযী ছিল না। আর তাই এক মিথ্যাকে ঢাকার জন্য শত মিথ্যার আশ্রয় নিতেও তারা কখনো কুণ্ঠাবোধ করে না।

যাই হোক নির্ধারিত দিনে গযব নাযিল হওয়ার প্রাক্কালেই আল্লাহ্‌র হুকুমে হযরত ছালেহ (আঃ) স্বীয় ঈমানদার সাথীগণকে নিয়ে এলাকা ত্যাগ করেন। যাওয়ার সময় তিনি স্বীয় কওমকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لاَّ تُحِبُّوْنَ النَّاصِحِيْنَ-

‘হে আমার জাতি! আমি তোমাদের কাছে স্বীয় পালনকর্তার পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি এবং সর্বদা তোমাদের কল্যাণ কামনা করেছি। কিন্তু তোমরা তোমাদের কল্যাণকামীদের ভালবাসো না’ *(আ‘রাফ ৭/৭৯)*।

গযবের ধরন :

হযরত ছালেহ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী বৃহস্পতিবার ভোরে অবিশ্বাসী কওমের সকলের মুখমণ্ডল গভীর হলুদ বর্ণ ধারণ করল। কিন্তু তারা ঈমান আনল না বা তওবা করল না। বরং উল্টা হযরত ছালেহ (আঃ)-এর উপর চটে গেল ও তাঁকে হত্যা করার জন্য খুঁজতে লাগল। দ্বিতীয় দিন সবার মুখমণ্ডল লাল বর্ণ ও তৃতীয় দিন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হয়ে গেল। তখন সবই নিরাশ হয়ে গযবের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। চতুর্থ দিন রবিবার সকালে সবাই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিয়ে সুগন্ধি মেখে অপেক্ষা করতে থাকে।[৭৮] এমতাবস্থায় ভীষণ ভূমিকম্প শুরু হ'ল এবং উপর থেকে বিকট ও ভয়াবহ এক গর্জন শোনা গেল। ফলে সবাই যার যার স্থানে একযোগে অধোমুখী হয়ে ভূতলশায়ী হ'ল *(আ'রাফ ৭/৭৮; হূদ ১১/৬৭-৬৮)* এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হ'ল এমনভাবে, যেন তারা কোনদিন সেখানে ছিল না'। অন্য আয়াতে এসেছে যে, 'আমরা তাদের প্রতি একটিমাত্র নিনাদ পাঠিয়েছিলাম। তাতেই তারা শুষ্ক খড়কুটোর মত হয়ে গেল' *(ক্বামার ৫৪/৩১)*।

কোন কোন হাদীছে এসেছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ছামূদ জাতির উপরে আপতিত গযব থেকে 'আবু রেগাল' নামক জনৈক অবিশ্বাসী নেতা ঐ সময় মক্কায় থাকার কারণে বেঁচে গিয়েছিল। কিন্তু হারাম শরীফ থেকে বেরোবার সাথে সাথে সেও গযবে পতিত হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবায়ে কেরামকে মক্কার বাইরে আবু রেগালের উক্ত কবরের চিহ্ন দেখান এবং বলেন যে, তার সাথে একটা স্বর্ণের ছড়িও দাফন হয়ে গিয়েছিল। তখন কবর খনন করে তারা ছড়িটি উদ্ধার করেন। উক্ত রেওয়ায়াতে একথাও বলা হয়েছে যে, ত্বায়েফের প্রসিদ্ধ ছাক্বীফ গোত্র উক্ত আবু রেগালের বংশধর। তবে হাদীছটি যঈফ।[৭৯]

অন্য হাদীছে এসেছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন যে, 'ছাক্বীফ গোত্রে একজন মিথ্যাবাদী (ভণ্ড নবী) ও একজন রক্ত পিপাসুর জন্ম হবে।[৮০] রাসূলের এ ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হয় এবং এই বংশে মিথ্যা নবী মোখতার ছাক্বাফী এবং

---

৭৮. ইবনু কাছীর, সূরা আ'রাফ ৭৩-৭৮।

৭৯. ইবনু কাছীর, আ'রাফ ৭৮; আলবানী, যঈফ আবুদাঊদ, 'কবর উৎপাটন' অনুচ্ছেদ; যঈফাহ হা/৪৭৩৬।

৮০. মুসলিম, মিশকাত হা/৫৯৯৪ 'কুরায়েশ-এর মর্যাদা' অনুচ্ছেদ।

রক্তপিপাসু কসাই ইরাকের উমাইয়া গবর্ণর হাজ্জাজ বিন ইউসুফের জন্ম হয়। কওমে ছামূদ-এর অভিশপ্ত বংশের রক্তধারার কু-প্রভাব হওয়াটাও এতে বিচিত্র নয়।

অন্য এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, ৯ম হিজরীতে তাবূক যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সিরিয়া ও হেজাযের মধ্যবর্তী 'হিজ্র' নামক সে স্থানটি অতিক্রম করেন, যেখানে ছামূদ জাতির উপরে গযব নাযিল হয়েছিল। তিনি ছাহাবায়ে কেরামকে নির্দেশ দেন, কেউ যেন ঐ গযব বিধ্বস্ত এলাকায় প্রবেশ না করে এবং ওখানকার কূয়ার পানি ব্যবহার না করে'।[৮১] এসব আযাব-বিধ্বস্ত এলাকাগুলিকে আল্লাহ তা'আলা ভবিষ্যৎ মানবজাতির জন্য শিক্ষাস্থল হিসাবে সংরক্ষিত রেখেছেন, যাতে তারা উপদেশ হাছিল করতে পারে এবং নিজেদেরকে আল্লাহ্র অবাধ্যতা হ'তে বিরত রাখে।

আরবরা তাদের ব্যবসায়িক সফরে নিয়মিত সিরিয়া যাতায়াতের পথে এইসব ধ্বংসস্তূপ গুলি প্রত্যক্ষ করত। অথচ তাদের অধিকাংশ তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেনি এবং শেষনবীর উপরে বিশ্বাস স্থাপন করেনি। যদিও পরবর্তীতে সব এলাকাই 'মুসলিম' এলাকায় পরিণত হয়ে গেছে। আল্লাহ বলেন,

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيْشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلاَّ قَلِيلاً وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِيْنَ، وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِيْ أُمِّهَا رَسُولاً يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلاَّ وَأَهْلُهَا ظَالِمُوْنَ- (القصص ٥٨-٥٩)-

'আমরা অনেক জনপদ ধ্বংস করেছি; যেসবের অধিবাসীরা তাদের বিলাসী জীবন যাপনে মত্ত ছিল। তাদের এসব আবাসস্থলে তাদের পরে মানুষ খুব সামান্যই বসবাস করেছে। অবশেষে আমরাই এসবের মালিক রয়েছি'। 'আপনার পালনকর্তা জনপদ সমূহকে ধ্বংস করেন না, যে পর্যন্ত না তার কেন্দ্রস্থলে রাসূল প্রেরণ করেন। যিনি তাদের কাছে আমাদের আয়াত সমূহ পাঠ করেন। আর আমরা জনপদ সমূহকে তখনই ধ্বংস করি, যখন তার বাসিন্দারা (অর্থাৎ নেতারা) যুলুম করে' *(ক্বাছাছ ২৮/৫৮-৫৯)*।

---

৮১. বুখারী হা/৪৩৩, মুসলিম, আহমাদ, ইবনু কাছীর, সূরা আ'রাফ ৭৩।

উল্লেখ্য যে, উপরে বর্ণিত কাহিনীর প্রধান বিষয়গুলি পবিত্র কুরআনের ২২টি সূরায় ৮৭টি আয়াতে এবং কিছু অংশ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। কিছু অংশ এমনও রয়েছে যা তাফসীরবিদগণ বিভিন্ন ইস্রাঈলী বর্ণনা থেকে সংগ্রহ করেছেন, যা সত্য ও মিথ্যা দুই-ই হ'তে পারে। কিন্তু সেগুলি কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় এবং সেগুলির উপরে ঘটনার প্রমাণ নির্ভরশীল নয়।

কওমে ছামূদ-এর ধ্বংস কাহিনীতে শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ :

১. সমাজের মুষ্টিমেয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও শক্তিশালী শ্রেণী সবার আগে শয়তানের পাতানো ফাঁদে পা দেয় ও সমাজকে জাহান্নামের পথে আহ্বান করে এবং তাদেরকে ধ্বংসের পথে পরিচালনা করে। যেমন কওমে ছামূদ-এর প্রধান নয় কুচক্রী নেতা করেছিল *(নামল ২৭/৪৮)*।

২. দুর্বল শ্রেণীর লোকেরা সাধারণতঃ অন্যদের আগে আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী হয় ও এজন্য যেকোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হয়ে যায়।

৩. অবিশ্বাসীরা মূলতঃ দুনিয়াবী স্বার্থে আল্লাহ প্রেরিত শরী'আতে বিশ্বাস ও তদনুযায়ী আমল প্রত্যাখ্যান করে এবং নিজেদের কল্পিত শিরকী আক্বীদায় বিশ্বাস ও তদনুযায়ী আমলে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এবং তারা সর্বদা তাদের বাপ-দাদা ও প্রচলিত প্রথার দোহাই দেয়।

৪. নবী ও সংস্কারকগণ সাধারণতঃ উপদেশদাতা হয়ে থাকেন- শাসক নন।

৫. নবী ও সংস্কারকদের বিরুদ্ধে শাসক ও সমাজ নেতাগণ যুলুম করলে সরাসরি আল্লাহ্র গযব নেমে আসা অবশ্যম্ভাবী।

৬. মানুষকে বিপথে নেওয়ার জন্য শয়তানের সবচাইতে বড় হাতিয়ার হ'ল নারী ও অর্থ-সম্পদ।

৭. হঠকারী ও পদগর্বী নেতারা সাধারণতঃ চাটুকার ও চক্রান্তকারী হয়ে থাকে ও ঈমানদারগণের বিরুদ্ধে সাময়িকভাবে জয়ী হয়। কিন্তু অবশেষে আল্লাহ্র কৌশল বিজয়ী হয় এবং কখনো কখনো তারা দুনিয়াতেই আল্লাহ্র গযবে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। আর আখেরাতের আযাব হয় তার চাইতে কঠিনতর *(ক্বলম ৬৮/৩৩)*।

৮. আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাকে নে'মতরাজি দান করেন তাকে পরীক্ষা করার জন্য। শুকরিয়া আদায় করলে সে আরও বেশী পায়। কিন্তু কুফরী করলে সে ধ্বংস হয় এবং উক্ত নে'মত তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়।

৯. অহংকারীদের অন্তর শক্ত হয়। তারা এলাহী গযব প্রত্যক্ষ করার পরেও তাকে তাচ্ছিল্য করে। যেমন নয় নেতা ১ম দিন গযবে ধ্বংস হ'লেও অন্যেরা তওবা না করে তাচ্ছিল্য করেছিল। ফলে অবশেষে ৪র্থ দিন তারা সবাই ধ্বংস হয়ে যায়।

১০. আল্লাহ যালেম জনপদকে ধ্বংস করেন অন্যদের শিক্ষা গ্রহণের জন্য।

১১. আল্লাহ সংশোধনকামী জনপদকে কখনোই ধ্বংস করেন না।

১২. কখনো মাত্র একজন বা দু'জনের কারণে গোটা সমাজ ধ্বংস হয়ে যায়। ছালেহ (আঃ)-এর উষ্ট্রী হত্যাকারী ছিল মাত্র দু'জন। অতএব মুষ্টিমেয় কুচক্রীদের বিরুদ্ধে বৃহত্তর সমাজকে সদা সতর্ক থাকতে হয়।

১৩. কুচক্রীদের কৌশল আল্লাহ ব্যর্থ করে দেন। কিন্তু তারা বুঝতে পারে না। যেমন ছামূদ কওমের নেতারা বুঝতে না পেরে অযথা দম্ভ করেছিল *(নামল ২৭/৫০-৫১)*।

১৪. আল্লাহ মানুষকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্যই দুনিয়াতে ছোট-খাট শাস্তির আস্বাদন করিয়ে থাকেন ও তাদেরকে ভয় দেখান *(ইসরা ১৭/৫৯; সাজদাহ ৩২/২১)*।

১৫. সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্বে অবশেষে সত্য সেবীদেরই জয় হয়। যেমন হযরত ছালেহ (আঃ) ও তাঁর ঈমানদার দুর্বল শ্রেণীর লোকেরা এলাহী গযব থেকে নাজাত পেয়ে বিজয়ী হয়েছিলেন ও মিথ্যার পূজারী শক্তিশালীরা ধ্বংস হয়েছিল।

৬. হযরত ইবরাহীম *(আলাইহিস সালাম)*

ইবরাহীম *(আলাইহিস সালাম)* ছিলেন হযরত নূহ (আঃ)-এর সম্ভবত: এগারোতম অধঃস্তন পুরুষ। নূহ থেকে ইবরাহীম পর্যন্ত প্রায় ২০০০ বছরের ব্যবধান ছিল। হযরত ছালেহ (আঃ)-এর প্রায় ২০০ বছর পরে ইবরাহীমের আগমন ঘটে। ঈসা থেকে ব্যবধান ছিল ১৭০০ বছর অথবা প্রায় ২০০০ বছরের। তিনি ছিলেন ‘আবুল আম্বিয়া’ বা নবীগণের পিতা এবং তাঁর স্ত্রী ‘সারা’ ছিলেন ‘উম্মুল আম্বিয়া’ বা নবীগণের মাতা। তাঁর স্ত্রী সারার পুত্র হযরত ইসহাক্ব-এর পুত্র ইয়াকূব (আঃ)-এর বংশধর ‘বনু ইসরাঈল’ নামে পরিচিত এবং অপর স্ত্রী হাজেরার পুত্র হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশে জন্ম নেন বিশ্বনবী ও শেষনবী হযরত মুহাম্মাদ*(ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)*। যাঁর অনুসারীগণ ‘উম্মতে মুহাম্মাদী’ বা ‘মুসলিম উম্মাহ’ বলে পরিচিত।

বাবেল হ’তে তিনি কেন‘আনে (ফিলিস্তীন) হিজরত করেন। সেখান থেকে বিবি সারা-র বংশজাত নবীগণের মাধ্যমে আশপাশে সর্বত্র তাওহীদের দাওয়াত বিস্তার লাভ করে। অপর স্ত্রী হাজেরার পুত্র ইসমাঈলের মাধ্যমে বায়তুল্লাহ ও তার আশপাশ এলাকায় তাওহীদের প্রচার ও প্রসার হয় এবং অবশেষে এখানেই সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমন ঘটে। এভাবে ইবরাহীমের দুই স্ত্রীর বংশজাত নবীগণ বিশ্বকে তাওহীদের আলোয় আলোকিত করেন। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর দেহসৌষ্ঠব ও চেহারা মুবারক পিতা ইবরাহীম (আঃ)-এর ন্যায় ছিল। যা তিনি মে‘রাজ থেকে ফিরে এসে উম্মতকে খবর দেন।[৮২]

আবুল আম্বিয়া ও সাইয়েদুল আম্বিয়া :

ইবরাহীম (আঃ) ছিলেন ইহুদী-খৃষ্টান-মুসলমান সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পিতা। কেননা আদম (আঃ) হ’তে ইবরাহীম (আঃ) পর্যন্ত ১০/১২ জন নবী বাদে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত ১ লাখ ২৪ হাযার পয়গম্বরের প্রায়

---

৮২. মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৬৬ ‘মে‘রাজ’ অনুচ্ছেদ।

সকলেই ছিলেন ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশধর। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوْحاً وَآلَ إِبْرَاهِيْمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِيْنَ- (آل عمران ٣٣)-

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ আদম, নূহ, আলে ইবরাহীম ও আলে ইমরানকে বিশ্ববাসীর উপরে নির্বাচিত করেছেন’ *(আলে ইমরান ৩/৩৩)*। এই নির্বাচন ছিল বিশ্ব সমাজে আল্লাহ্র তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আল্লাহ্র দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য। ইবরাহীম ছিলেন নবীগণের পিতা এবং পুত্র মুহাম্মাদ ছিলেন নবীগণের নেতা, এ বিষয়টি সর্বদা মুমিনের মানসপটে জাগরুক রাখার জন্য দৈনিক ছালাতের শেষ বৈঠকে পঠিত দরূদের মধ্যে ইবরাহীম ও মুহাম্মাদের উপরে এবং উভয়ের পরিবার বর্গের উপরে আল্লাহ্র অনুগ্রহ বর্ষণের জন্য দো‘আ করার বিধান রাখা হয়েছে। ইবরাহীমের বংশে বরকত হ’ল নবুঅত ও ঐশী কিতাবের বরকত এবং মুহাম্মাদের ও তাঁর বংশে বরকত হ’ল বিজ্ঞানময় কুরআন ও হাদীছ এবং তার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থার বরকত।

ইবরাহীম ও তাঁর বংশধর সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِيْنَ- (العنكبوت ٢٧)-

‘আমরা তাকে দান করলাম ইসহাক্ব ও ইয়াকূবকে এবং তার বংশধরগণের মধ্যে প্রদান করলাম নবুঅত ও কিতাব। তাকে আমরা দুনিয়াতে পুরস্কৃত করলাম। নিশ্চয়ই পরকালে সে সৎ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে’ *(আনকাবূত ২৯/২৭)*।

অতঃপর শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً- (الأحزاب ٢١)-

'যারা আল্লাহ ও শেষদিবসের (অর্থাৎ আখেরাতে মুক্তির) আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক হারে স্মরণ করে, তাদের জন্য আল্লাহ্র রাসূলের (মুহাম্মাদের) মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে' *(আহযাব ৩৩/২১)*। অতঃপর তাঁর পরিবার সম্পর্কে বলা হয়েছে,

إِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْراً-(الأحزاب ٣٣)-

'হে নবী পরিবারের সদস্যগণ! আল্লাহ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখতে' *(আহযাব ৩৩/৩৩)*। শেষ যামানায় ইমাম মাহদী আসবেন হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর বংশধরগণের মধ্য হ'তে এ বিষয়ে বহু ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।[৮৩] এইভাবে ইবরাহীম ও মুহাম্মাদের নাম পৃথিবীর শেষদিন পর্যন্ত দিকে দিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হ'তে থাকবে। *ফালিল্লাহিল হাম্‌দ*।

নবী ইবরাহীম :

আদম, ইয়াহ্ইয়া, ঈসা প্রমুখ দু'তিন জনের ব্যতিক্রম বাদে নূহ (আঃ) সহ অন্যান্য সকল নবীর ন্যায় ইবরাহীমকেও আমরা ধরে নিতে পারি যে, তিনি ৪০ বছর বয়সে নবুঅত লাভ করেন। উম্মতে মুসলিমার পিতা হযরত ইবরাহীম (আঃ) পশ্চিম ইরাকের বছরার নিকটবর্তী 'বাবেল' শহরে জন্মগ্রহণ করেন। এই শহরটি পরবর্তীতে সুলায়মান (আঃ)-এর সময়ে জাদুর জন্য বিখ্যাত হয় *(বাক্বারাহ ২/১০২)*।

এখানে তখন কালেডীয় (كلدانى) জাতি বসবাস করত। তাদের একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন নমরূদ। যিনি তৎকালীন পৃথিবীতে অত্যন্ত উদ্ধত ও অহংকারী সম্রাট ছিলেন। তিনি প্রায় চারশো বছর রাজত্ব করেন এবং শেষ পর্যন্ত নিজে 'উপাস্য' হবার দাবী করেন।[৮৪] আল্লাহ তারই মন্ত্রী ও প্রধান পুরোহিত 'আযর'-এর ঘরে বিশ্বনেতা ও বিশ্ব সংস্কারক নবী ইবরাহীমকে মুখ্যতঃ

---

৮৩. আবুদাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৪৫৩-৫৪; হাকেম ৪/৫৫৭-৫৮ পৃঃ প্রভৃতি।
৮৪. তারীখুল আম্বিয়া পৃঃ ৬৮।

কালেডীয়দের প্রতি প্রেরণ করেন। ইবরাহীমের নিজ পরিবারের মধ্যে কেবল সহধর্মিনী ‘সারা’ ও ভ্রাতুষ্পুত্র ‘লূত’ মুসলমান হন।

স্ত্রী ‘সারা’ ছিলেন আদি মাতা বিবি হাওয়ার পরে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরী মহিলা। তিনি ১২৭ বছর বয়সে ‘হেবরনে’ মৃত্যু ববণ করেন ও সেখানেই কবরস্থ হন।[৮৫] সারার মৃত্যুর পরে ইবরাহীম ক্বানতূরা বিনতে ইয়াক্বতিন ও হাজূন বিনতে আমীন নামে পরপর দুজন নারীকে বিয়ে করেন এবং ৬+৫=১১টি সন্তান লাভ করেন।[৮৬] তিনি প্রায় দু’শো বছর জীবন পান বলে কথিত আছে।

উল্লেখ্য যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ২৫টি সূরায় ২০৪টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।[৮৭] নিম্নে আমরা আয়াত সমূহ থেকে নিয়ে সাধ্যতম সাজিয়ে কাহিনী আকারে পেশ করার চেষ্টা পাব ইনশাআল্লাহ।-

সামাজিক অবস্থাঃ

ইবরাহীমের আবির্ভাবকালীন সময়ে কালেডীয় সমাজ শিক্ষা ও সভ্যতায় শীর্ষস্থানীয় ছিল। এমনকি তারা সৌরজগত নিয়েও গবেষণা করত। কিন্তু অসীলা পূজার রোগে আক্রান্ত হয়ে তারা আল্লাহকে পাবার জন্য বিভিন্ন মূর্তি ও তারকা সমূহের পূজা করত। হযরত ইবরাহীম উভয় ভ্রান্ত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে প্রেরিত হন।

ইবরাহীম (আঃ)-এর দাওয়াত : মূর্তিপূজারী কওমের প্রতি-

সকল নবীর ন্যায় ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় কওমকে প্রথমে তাওহীদের দাওয়াত দেন। যেমন আল্লাহ বলেন,

---

৮৫. তারীখুল আম্বিয়া, পৃঃ ৭৪।

৮৬. আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ ১/১৬৪ পৃ:।

৮৭. যথাক্রমে সূরা বাক্বারাহ ২/১২৪-১৩৩=১০; ১৩৫, ১৩৬, ১৪০, ২৫৮, ২৬০; আলে ইমরান ৩/৩৩, ৩৪, ৬৫-৬৮=৪; ৮৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭; নিসা ৪/৫৪, ১২৫, ১৬৩; আন‘আম ৬/৭৪-৮৩=১০; ১৬১; তওবাহ ৯/৭০, ১১৪; হূদ ১১/৬৯-৭৬=৮; ইউসুফ ১২/৬, ৩৮; ইবরাহীম ১৪/৩৫-৪১=৭; হিজর ১৫/৫১-৬০=১০; নাহ্ল ১৬/১২০-১২৩=৪; মারিয়াম ১৯/৪১-৫০=১০; ৫৮; আম্বিয়া ২১/৫১-৭৩=২৩; হজ্জ ২২/২৬, ৪৩, ৭৮; শো‘আরা ২৬/৬৯-৮৯=২১; আনকাবূত ২৯/১৬-২৭=১২; ৩১; আহযাব ৩৩/৭; ছাফফাত ৩৭/৮৩-১১৩=৩১; ছোয়াদ ৩৮/৪৫-৪৭=৩; শূরা ৪২/১৩; যুখরুফ ৪৩/২৬, ২৭; যারিয়াত ৫১/২৪-৩৪=১১; নাজম ৫৩/৩৭; হাদীদ ৫৭/২৬, ২৭; মুমতাহানা ৬০/৪-৬=৩; আ‘লা ৮৭/১৯, সর্বমোট = ২০৪টি ॥

وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَاناً وَتَخْلُقُونَ إِفْكاً إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقاً فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ-(العنكبوت ١٦-١٧)-

‘স্মরণ কর ইবরাহীমকে, যখন তিনি তার সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং তাঁকে ভয় কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝ’। ‘তোমরা তো আল্লাহ্‌র পরিবর্তে কেবল প্রতিমারই পূজা করছ এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করছ। তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদের ইবাদত করছ, তারা তোমাদের রিযিকের মালিক নয়। কাজেই আল্লাহ্‌র নিকটে রিযিক তালাশ কর। তাঁর ইবাদত কর এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তাঁরই নিকটে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে’ *(আনকাবূত ৩৩/১৬-১৭)*।

ইবরাহীম (আঃ) উক্ত দাওয়াতের মধ্যে কেবল আল্লাহর স্বীকৃতি কামনা করেননি। বরং স্বীকৃতির ফলাফল (ثمرة الإقرار) আশা করেছিলেন। অর্থাৎ তারা যেন আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধকে মান্য করে এবং কোন অবস্থায় তা লংঘন না করে। কেননা স্বীকৃতির বিপরীত কাজ করা তা লংঘন করার শামিল।

পিতার প্রতি :

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيْقاً نَّبِيًّا، إِذْ قَالَ لِأَبِيْهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لاَ يَسْمَعُ وَلاَ يُبْصِرُ وَلاَ يُغْنِي عَنكَ شَيْئاً، يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءِنِيْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِيْ أَهْدِكَ صِرَاطاً سَوِيّاً، يَا أَبَتِ لاَ تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيّاً، يَا أَبَتِ إِنِّيْ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَن فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيّاً-(مريم ٤١-٤٥)-

‘তুমি এই কিতাবে ইবরাহীমের কথা বর্ণনা কর। নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন সত্যবাদী ও নবী’ *(১৯/৪১)*। ‘যখন তিনি তার পিতাকে বললেন, হে আমার

পিতা! তুমি তার পূজা কেন কর, যে শোনে না, দেখে না এবং তোমার কোন উপকারে আসে না? *(৪২)*। ‘হে আমার পিতা! আমার কাছে এমন জ্ঞান এসেছে, যা তোমার কাছে আসেনি। অতএব তুমি আমার অনুসরণ কর। আমি তোমাকে সরল পথ দেখাব’ *(৪৩)*। ‘হে আমার পিতা! শয়তানের পূজা করো না। নিশ্চয়ই শয়তান দয়াময়ের অবাধ্য’ *(৪৪)*। ‘হে আমার পিতা! আমি আশংকা করছি যে, দয়াময়ের একটি আযাব তোমাকে স্পর্শ করবে, অতঃপর তুমি শয়তানের বন্ধু হয়ে যাবে’ *(মারিয়াম ১৯/৪১-৪৫)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ لأَبِيْهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَاماً آلِهَةً إِنِّيْ أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِيْ ضَلاَلٍ مُّبِيْنٍ- (الأنعام ٧٤)-

‘স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম তার পিতা আযরকে বললেন, তুমি কি প্রতিমা সমূহকে উপাস্য মনে কর? আমি দেখতে পাচ্ছি যে, তুমি ও তোমার সম্প্রদায় স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছ’ *(আন‘আম ৬/৭৪)*।

কিন্তু ইবরাহীমের এই প্রাণভরা আবেদন পিতা আযরের হৃদয় স্পর্শ করল না। রাষ্ট্রের প্রধান পুরোহিত এবং সম্রাটের মন্ত্রী ও প্রিয়পাত্র হওয়ায় সম্ভবত: বিষয়টি তার প্রেস্টিজ ইস্যু হয়। যেমন আল্লাহ বলেন, وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، ‘যখন তাকে বলা হয়, আল্লাহকে ভয় কর, তখন তার সম্মান তাকে পাপে স্ফীত করে। অতএব তার জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট। আর নিঃসন্দেহে তা হ’ল নিকৃষ্টতম ঠিকানা’ *(বাক্বারাহ ২/২০৬)*। বস্তুতঃ অহংকারীদের চরিত্র সর্বত্র ও সর্বযুগে প্রায় একই হয়ে থাকে।

পিতার জবাব :

পুত্রের আকুতিপূর্ণ দাওয়াতের উত্তরে পিতা বলল, قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِيْ يَا إِبْرَاهِيْمُ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِيْ مَلِيًّا- (مريم ٤٦)- ‘হে ইবরাহীম! তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ? যদি তুমি বিরত না

হও, তবে আমি অবশ্যই পাথর মেরে তোমার মাথা চূর্ণ করে দেব। তুমি আমার সম্মুখ হ'তে চিরতরের জন্য দূর হয়ে যাও' *(মারিয়াম ১৯/৪৬)*।

ইবরাহীমের জবাব:

পিতার এই কঠোর ধমকি শুনে পুত্র ইবরাহীম বললেন,

قَالَ سَلاَمٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيّاً، وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلاَّ أَكُونَ بِدُعَاء رَبِّي شَقِيّاً- (مريم ٤٧-٤٨)-

'তোমার উপরে শান্তি বর্ষিত হৌক! আমি আমার পালনকর্তার নিকটে তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। নিশ্চয়ই তিনি আমার প্রতি মেহেরবান'। 'আমি পরিত্যাগ করছি তোমাদেরকে এবং আল্লাহ ব্যতীত যাদের তোমরা পূজা কর তাদেরকে। আমি আমার পালনকর্তাকে আহ্বান করব। আশা করি আমার পালনকর্তাকে আহ্বান করে আমি বঞ্চিত হব না' *(মারিয়াম ১৯/৪৭-৪৮)*।

পিতাকে ও নিজ সম্প্রদায়কে একত্রে দাওয়াত:

আল্লাহ বলেন,

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيْمَ، إِذْ قَالَ لِأَبِيْهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُوْنَ، قَالُوْا نَعْبُدُ أَصْنَاماً فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِيْنَ، قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُوْنَ، أَوْ يَنْفَعُوْنَكُمْ أَوْ يَضُرُّوْنَ، قَالُوْا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُوْنَ، قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ، أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُوْنَ، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلاَّ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ، الَّذِيْ خَلَقَنِيْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ، وَالَّذِيْ هُوَ يُطْعِمُنِيْ وَيَسْقِيْنِ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ، وَالَّذِيْ يُمِيْتُنِيْ ثُمَّ يُحْيِيْنِ، وَالَّذِيْ أَطْمَعُ أَن يَّغْفِرَ لِيْ خَطِيْئَتِيْ يَوْمَ الدِّيْنِ، رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْماً وَأَلْحِقْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ، وَاجْعَل لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِيْنَ، اجْعَلْنِيْ مِن وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ، وَاغْفِرْ لِأَبِيْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّيْنَ، وَلاَ تُخْزِنِيْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ، يَوْمَ لاَ يَنفَعُ مَالٌ وَّلاَ بَنُوْنَ، إِلاَّ مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ،

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْغَاوِيْنَ، وَقِيْلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ، مِنْ دُوْنِ اللهِ هَلْ يَنْصُرُوْنَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُوْنَ، فَكُبْكِبُوْا فِيْهَا هُمْ وَالْغَاوُوْنَ، وَجُنُوْدُ إِبْلِيْسَ أَجْمَعُوْنَ، قَالُوْا وَهُمْ فِيْهَا يَخْتَصِمُوْنَ، تَاللهِ إِنْ كُنَّا لَفِيْ ضَلاَلٍ مُّبِيْنٍ، إِذْ نُسَوِّيْكُم بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَمَا أَضَلَّنَا إِلاَّ الْمُجْرِمُوْنَ، مَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ، وَلاَ صَدِيْقٍ حَمِيْمٍ، فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ، إِنَّ فِيْ ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِيْنَ- (الشعراء ٦٩-١٠٤)-

‘আর তাদেরকে ইবরাহীমের বৃত্তান্ত শুনিয়ে দিন’ *(শো‘আরা ২৬/৬৯)*। ‘যখন সে স্বীয় পিতা ও সম্প্রদায়কে ডেকে বলল, তোমরা কিসের পূজা কর’? *(৭০)*। তারা বলল, আমরা প্রতিমার পূজা করি এবং সর্বদা এদেরকেই নিষ্ঠার সাথে আঁকড়ে থাকি’ *(৭১)*। ‘সে বলল, তোমরা যখন আহ্বান কর, তখন তারা শোনে কি’? *(৭২)*। ‘অথবা তারা তোমাদের উপকার বা ক্ষতি করতে পারে কি’? *(৭৩)*। ‘তারা বলল, না। তবে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি, তারা এরূপই করত’ *(৭৪)*। ইবরাহীম বলল, তোমরা কি তাদের সম্পর্কে ভেবে দেখেছ, যাদের তোমরা পূজা করে আসছ’? *(৭৫)*। ‘তোমরা এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষেরা’ *(৭৬)*। ‘তারা সবাই আমার শত্রু, বিশ্ব পালনকর্তা ব্যতীত’ *(৭৭)*। ‘যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আমাকে পথ প্রদর্শন করেছেন’ *(৭৮)*। ‘যিনি আমাকে আহার দেন ও পানীয় দান করেন’ *(৭৯)*। ‘যখন আমি পীড়িত হই, তখন তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন’ *(৮০)*। ‘যিনি আমার মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর পুনর্জীবন দান করবেন’ *(৮১)*। ‘আশা করি শেষ বিচারের দিন তিনি আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিবেন’ *(৮২)*। ‘হে আমার পালনকর্তা! আমাকে প্রজ্ঞা দান কর এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত কর’ *(৮৩)*। ‘এবং আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে সত্যভাষী কর’ *(৮৪)*। ‘তুমি আমাকে নে‘মতপূর্ণ জান্নাতের উত্তরাধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর’ *(৮৫)*। (হে প্রভু) ‘তুমি আমার পিতাকে ক্ষমা কর। তিনি তো পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত’ *(৮৬)* (হে আল্লাহ) ‘পুনরুত্থান দিবসে তুমি আমাকে লাঞ্ছিত কর না’ *(৮৭)*। ‘যে দিনে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না’ *(৮৮)* ‘কিন্তু যে ব্যক্তি সরল হৃদয় নিয়ে আল্লাহ্র কাছে আসবে’

(৮৯)। ‘(ঐ দিন) জান্নাত আল্লাহভীরুদের নিকটবর্তী করা হবে’ *(৯০)*। ‘এবং জাহান্নাম বিপথগামীদের সামনে উন্মোচিত করা হবে’ *(৯১)*। ‘(ঐ দিন) তাদেরকে বলা হবে, তারা কোথায় যাদেরকে তোমরা পূজা করতে’?*(৯২)* ‘আল্লাহ্র পরিবর্তে। তারা কি (আজ) তোমাদের সাহায্য করতে পারে কিংবা তারা কি কোনরূপ প্রতিশোধ নিতে পারে’? *(৯৩)*। ‘অতঃপর তাদেরকে এবং (তাদের মাধ্যমে) পথভ্রষ্টদেরকে অধোমুখী করে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে’ *(৯৪)* ‘এবং ইবলীস বাহিনীর সকলকে’ *(৯৫)*। ‘তারা সেখানে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে বলবে’ *(৯৬)* ‘আল্লাহ্র কসম! আমরা প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে ছিলাম’ *(৯৭)*, ‘যখন আমরা তোমাদেরকে (অর্থাৎ কথিত উপাস্যদেরকে) বিশ্বপালকের সমতুল্য গণ্য করতাম’*(৯৮)*। ‘আসলে আমাদেরকে পাপাচারীরাই পথভ্রষ্ট করেছিল’ *(৯৯)*। ‘ফলে (আজ) আমাদের কোন সুফারিশকারী নেই’ *(১০০)* ‘এবং কোন সহৃদয় বন্ধুও নেই’ *(১০১)*। ‘হায়! যদি কোনরূপে আমরা পৃথিবীতে ফিরে যাবার সুযোগ পেতাম, তাহ’লে আমরা ঈমানদারগণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম’ *(১০২)*। ‘নিশ্চয়ই এ ঘটনার মধ্যে নিদর্শন রয়েছে। বস্তুতঃ তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী ছিল না’ *(১০৩)*। ‘নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তা পরাক্রান্ত ও দয়ালু’ *(শো‘আরা ২৬/৬৯-১০৪)*।

স্বীয় পিতা ও সম্প্রদায়ের নিকটে ইবরাহীমের দাওয়াত ও তাদের জবাবকে আল্লাহ অন্যত্র নিম্নরূপে বর্ণনা করেন। যেমন-

إِذْ قَالَ لِأَبِيْهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِيْ أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُوْنَ، قَالُوْا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِيْنَ، قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِيْ ضَلاَلٍ مُّبِيْنٍ، قَالُوْا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللاَّعِبِيْنَ، قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِيْ فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِيْنَ، وَتَاللهِ لَأَكِيْدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ- (الأنبياء ٥٢-٥٧)-

ইবরাহীম স্বীয় পিতা ও সম্প্রদায়কে বলল, ‘এই মূর্তিগুলি কী যাদের তোমরা পূজারী হয়ে বসে আছ’? *(আম্বিয়া ২১/৫২)*। ‘তারা বলল, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে এরূপ পূজা করতে দেখেছি’ *(৫৩)*। ‘সে বলল, তোমরা প্রকাশ্য গুমরাহীতে লিপ্ত আছ এবং তোমাদের বাপ-দাদারাও’ *(৫৪)*। ‘তারা বলল,

তুমি কি আমাদের কাছে সত্যসহ এসেছ, না কেবল কৌতুক করছ'? *(৫৫)*। 'সে বলল, না। তিনিই তোমাদের পালনকর্তা, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তা, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন এবং আমি এ বিষয়ে তোমাদের উপর অন্যতম সাক্ষ্যদাতা' *(৫৬)*। 'আল্লাহ্র কসম! যখন তোমরা ফিরে যাবে, তখন আমি তোমাদের মূর্তিগুলোর ব্যাপারে একটা কিছু করে ফেলব' *(আম্বিয়া ২১/৫২-৫৭)*।

দাওয়াতের সারকথা ও ফলশ্রুতি :

মূর্তিপূজারী পিতা ও সম্প্রদায়ের নেতাদের নিকটে ইবরাহীমের দাওয়াত ও তাদের প্রদত্ত জবাবের সার কথাগুলি নিম্নরূপ:

১. ইবরাহীম তাদেরকে এক আল্লাহ্র ইবাদতের দিকে দাওয়াত দেন। তিনি মূর্তি পূজার অসারতার বিষয়টি তাদের সামনে বলে দেন। কেননা এটি ছিল সকলের সহজবোধ্য। কিন্তু তারা মূর্তিপূজার অসীলা ছাড়তে রাযী হয়নি। কারণ শিরকী প্রথার মধ্যে নেতাদের লাভ ছিল মাল-সম্পদ ও দুনিয়াবী সম্মানের নগদ প্রাপ্তি। পক্ষান্তরে আল্লাহ্র ইবাদতের মধ্যে এসবের প্রাপ্তি যোগ নেই। শিরকী পূজা-পার্বনের মধ্যে গরীবদের লাভ ছিল এই যে, এর ফলে তারা নেতাদের কাছ থেকে দুনিয়াবী সহযোগিতা পেত। এ ছাড়াও বিভিন্ন কাল্পনিক ও ভ্রান্ত বিশ্বাস তাদেরকে মূর্তিপূজায় প্ররোচিত করত। পক্ষান্তরে একনিষ্ঠ তাওহীদ বিশ্বাস তাদেরকে এসব থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে। যেখানে এক আল্লাহ্র গোলামীর অধীনে বড়-ছোট সবার জন্য সামাজিক সমানাধিকার নিশ্চিত হয়ে যায়।

২. মূর্তিপূজারীদের কোন সঙ্গত জবাব ছিল না। তারা কেবল একটা কথাই বলেছিল যে, এটা আমাদের বাপ-দাদাদের আমল থেকে চলে আসা প্রথা।

৩. ইবরাহীমের এত কিছু বক্তব্যের পরেও এই অন্ধপূজারীরা বলল, আসলেই তুমি কোন সত্য এনেছ, না আমাদের সাথে কৌতুক করছ? কারণ অদৃশ্য অহীর বিষয়টি তাদের বাস্তব জ্ঞানে আসেনি। কিন্তু মূর্তিকে তারা সামনে দেখতে পায়। সেখানে সেবা ও পূজা করে তারা তৃপ্তি পায়।

৪. পিতা তাঁকে মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার হুমকি দিল এবং বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিল। কিন্তু তিনি পিতার জন্য আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনার ওয়াদা

করলেন। এর মধ্যে পিতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য বোধ ফুটে উঠেছে, যদিও তিনি মুশরিক হন। পরে পিতার কুফরী পরিষ্কার হয়ে গেলে তিনি বিরত হন *(তওবাহ ৯/১১৪)*।

৫. পিতা বহিষ্কার করলেও সম্প্রদায় তখনও বহিষ্কার করেনি। তাই তিনি পুনরায় দাওয়াতে মনোনিবেশ করলেন। যদিও তার ফলশ্রুতি ছিল পূর্বের ন্যায় শূন্য।

তারকা পূজারীদের সাথে বিতর্ক :

মূর্তি পূজারীদের সাথে বিতর্কের পরে তিনি তারকাপূজারী নেতাদের প্রতি তাওহীদের দাওয়াত দেন। কিন্তু তারাও মূর্তি পূজারীদের ন্যায় নিজ নিজ বিশ্বাসে অটল রইল। অবশেষে তাঁর সাথে তাদের নেতাদের তর্কযুদ্ধ আবশ্যিক হয়ে পড়ে। কেউ কেউ বলেছেন, ইবরাহীমের কওমের লোকেরা একই সাথে মূর্তি ও তারকার পূজা করত। সেটাও অসম্ভব কিছু নয়।

পবিত্র কুরআনে এই তর্কযুদ্ধ একটি অভিনব ও নাটকীয় ভঙ্গিতে প্রকাশ করা হয়েছে, যাতে সহজে আরবীয় পাঠক হৃদয়ে রেখাপাত করে। কেননা হযরত ইবরাহীম (আঃ) ছিলেন সমগ্র আরবের লোকদের পিতামহ। তাঁর প্রতি গোটা আরব জাতি সম্মান প্রদর্শন করত। অথচ তাদের পিতামহ যার বিরুদ্ধে জীবনভর লড়াই করলেন জাহিল আরবরা সেই সব শিরকে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল। যে কা‘বা গৃহকে ইবরাহীম (আঃ) নির্মাণ করেন এক আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য। তারা সেখানেই মূর্তিপূজা শুরু করে দিয়েছিল। অথচ মুখে আল্লাহকে স্বীকার করত এবং ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ)-এর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করত। আজকের মুসলমানদের জন্য এর মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। কেননা তারাও মুখে আল্লাহকে স্বীকার করে এবং শেষনবীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করে। অথচ নিজেরা কবর পূজা ও স্থানপূজার শিরকে লিপ্ত রয়েছে। আল্লাহ্র বিধানের অবাধ্যতা ও তার পরিবর্তে নিজেদের মনগড়া বিধান সমূহের আনুগত্য তো রয়েছেই। এক্ষণে আমরা কুরআনে বর্ণিত ইবরাহীমের অপর বিতর্ক যুদ্ধটির বিবরণ পেশ করব।-

আল্লাহ বলেন,

وَكَذَلِكَ نُرِيْ إِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَباً قَالَ هَـــذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُّ الآفِلِيْنَ، فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغاً قَالَ هَـــذَا رَبِّيْ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِيْ رَبِّي لَأَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلِّيْنَ، فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَـــذَا رَبِّيْ هَـــذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّيْ بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ، إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيْفاً وَّمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، وَحَآجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّوْنِّي فِي اللهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِهِ إِلاَّ أَن يَّشَآءَ رَبِّيْ شَيْئاً وَسِعَ رَبِّيْ كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً أَفَلاَ تَتَذَكَّرُوْنَ، وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلاَ تَخَافُوْنَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً فَأَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ أَحَقُّ بِالأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ، الَّذِيْنَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوْا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَـــئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُوْنَ- (الأنعام ٧٥-٨٢)-

'আমি এরূপভাবেই ইবরাহীমকে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অত্যাশ্চর্য বস্তুসমূহ দেখাতে লাগলাম, যাতে সে দৃঢ়বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়' *(আন'আম ৬/৭৫)*। 'অনন্তর যখন রাত্রির অন্ধকার তার উপরে সমাচ্ছন্ন হ'ল, তখন সে তারকা দেখে বলল যে, এটি আমার পালনকর্তা। অতঃপর যখন তা অস্তমিত হ'ল, তখন বলল, আমি অস্তগামীদের ভালবাসি না' *(৭৬)*। 'অতঃপর যখন চন্দ্রকে ঝলমল করতে দেখল, তখন সে বলল, এটি আমার পালনকর্তা। কিন্তু পরে যখন তা অস্তমিত হ'ল, তখন বলল, যদি আমার প্রতিপালক আমাকে পথ প্রদর্শন না করেন, তাহ'লে অবশ্যই আমি পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব' *(৭৭)*। 'অতঃপর যখন উদীয়মান সূর্যকে ডগমগে দেখতে পেল, তখন বলল, এটিই আমার পালনকর্তা এবং এটিই সবচেয়ে বড়। কিন্তু পরে যখন তা ডুবে গেল, তখন বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যেসব বিষয়কে শরীক কর, আমি ওসব থেকে মুক্ত' *(৭৮)*। 'আমি আমার চেহারাকে ঐ সত্তার দিকে একনিষ্ঠ করছি, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং

আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই' *(৭৯)*। '(তখন) তার সম্প্রদায় তার সাথে বিতর্ক করল। সে বলল, তোমরা কি আমার সাথে আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করছ? অথচ তিনি আমাকে সরল পথ দেখিয়েছেন। আর আমি ভয় করিনা তাদের, যাদেরকে তোমরা তাঁর সাথে শরীক কর, তবে আমার পালনকর্তা যদি কিছু (কষ্ট দিতে) চান। আমার প্রভুর জ্ঞান সবকিছুতেই পরিব্যপ্ত। তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না'? *(৮০)*। 'কিভাবে আমি ঐসব বস্তুকে ভয় করব, যাদেরকে তোমরা তাঁর সাথে শরীক করেছ? অথচ তোমরা এ বিষয়ে ভয় পাওনা যে, তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে এমন সব বস্তুকে শরীক করেছ, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তোমাদের প্রতি কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। এক্ষণে উভয় দলের মধ্যে কে বেশী নিরাপত্তা লাভের অধিকারী? যদি তোমরা জ্ঞানী হয়ে থাক' *(৮১)*। 'যারা ঈমান আনে এবং স্বীয় ঈমানকে শিরকের সাথে মিশ্রিত করে না, তাদের জন্যই রয়েছে নিরাপত্তা এবং তারাই হ'ল সুপথপ্রাপ্ত' *(আন'আম ৬/৭৫-৮২)*।

উপরের বর্ণনা ভঙ্গিতে মনে হয় যেন ইবরাহীম ঐ দিনই প্রথম নক্ষত্র, চন্দ্র ও সূর্য দেখলেন এবং 'এটি আমার পালনকর্তা' বলে সাময়িকভাবে মুশরিক হয়েছিলেন। পরে শিরক পরিত্যাগ করে মুসলিম হ'লেন। অথচ ঘটনা মোটেই তা নয়। কেননা ঐ সময় ইবরাহীম (আঃ) অন্যূন সত্তরোর্ধ্ব বয়সের নবী। আর নবীগণ জন্ম থেকেই নিষ্পাপ ও শিরকমুক্ত থাকেন। আসল কথা হ'ল এই যে, মূর্তি পূজার অসারতা বুঝানো যতটা সহজ ছিল, তারকা পূজার অসারতা বুঝানো ততটা সহজ ছিল না। কেননা ওটা মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে। তাই ইবরাহীম (আঃ) এখানে বৈজ্ঞানিক পন্থা বেছে নিলেন এবং জনগণের সহজবোধ্য এমন একটি প্রমাণ উপস্থাপন করলেন, যাতে তাদের লা-জওয়াব হওয়া ব্যতীত কোন উপায় ছিল না। তিনি সৌরজগতের গতি-প্রকৃতি যে আল্লাহ্‌র হুকুমের অধীন, সে কথা না বলে তাদের অস্তমিত হওয়ার বিষয়টিকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন। কারণ এটাই ছিল তাদের জন্যে সহজবোধ্য। তিনি বলেন, যা ক্ষয়ে যায়, ডুবে যায়, হারিয়ে যায়, নিজেকে টিকিয়ে রাখতে পারে না, ধরে রাখতে পারে না, বরং দৈনিক ওঠে আর ডোবে, সে কখনো মানুষের প্রতিপালক হ'তে পারে না। বরং সর্বোচ্চ পালনকর্তা কেবল তিনিই হ'তে পারেন, যিনি এসব কিছুর সৃষ্টিকর্তা ও বিধানদাতা। আর তিনিই হ'লেন 'আল্লাহ'। আমি তাঁর দিকেই ফিরে গেলাম

এবং বাপ-দাদার আমল থেকে তোমরা যে শিরক করে আসছ, আমি তা থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করলাম।

বলা বাহুল্য, এর অন্তর্নিহিত দাওয়াত ছিল এই যে, হে আমার জাতি! তোমরাও আমার মত আল্লাহ্র দিকে ফিরে এসো এবং শিরক হ'তে মুক্ত হও। কিন্তু ইবরাহীমের এই তর্কযুদ্ধ নিষ্ফল হ'ল। সম্প্রদায়ের নেতারা নিজ নিজ মতের উপরে দৃঢ় রইল। কেউ তাঁর আহ্বানে সাড়া দিল না।

একটি সংশয় ও তার জওয়াব :

৭৫ হ'তে ৮২ পর্যন্ত ৮টি আয়াতে যে বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে, এটি ইবরাহীমের শিশুকালে জ্ঞান-বুদ্ধির বয়স হবার সময়কার ঘটনা, নাকি নবী হবার পরের তর্কানুষ্ঠান, এ বিষয়ে বিদ্বানগণ মতভেদ করেছেন। ইবনু জারীর (মৃঃ ৩১০ হিঃ) প্রথমোক্ত মত পোষণ করেন। তিনি এ বিষয়ে আলী ইবনে ত্বালহার সূত্রে ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনা পেশ করেছেন। তবে এই বর্ণনাটির সনদ যঈফ।[৮৮]

মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্ব (৮৫-১৫০ হিঃ) বর্ণিত কিছু অলৌকিক ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে, যা উক্ত মতকে সমর্থন করে। যেমন বাদশাহ নমরূদ যখন জানতে পারেন যে, অচিরেই একটি পুত্র সন্তান জন্মলাভ করবে, যে তার রাজ্য হারানোর কারণ হবে, তখন তিনি নবজাতক সকল পুত্র সন্তানকে হত্যা করার নির্দেশ জারি করেন। ইবরাহীমের মা তখন একটি পাহাড়ের গোপন গুহায় লুকিয়ে ইবরাহীমকে প্রসব করেন এবং ইবরাহীম একাকী সেখানে বড় হন। ইবরাহীমের এক আঙ্গুল দিয়ে দুধ বের হ'ত, এক আঙ্গুল দিয়ে মধু বের হ'ত ও এক আঙ্গুল দিয়ে পানি বের হ'ত। এভাবে তিনি সেখানে তিন বছর কাটান। তারপর তিনি সেখান থেকে বের হয়ে এসে মাকে বলেন, আমার প্রভু কে? মা বললেন, নমরূদ। তিনি বললেন, নমরূদের প্রভু কে? তখন মা তাকে চড় মারলেন এবং তিনি বুঝলেন এটিই হ'ল সেই ছেলে, যার সম্পর্কে বাদশাহ নমরূদ আগেই স্বপ্ন দেখেছেন। সুদ্দী, যাহহাক প্রমুখের বরাতে কাসাঈ স্বীয় ক্বাছাছুল আম্বিয়ার মধ্যে এ ধরনের অনেক অলৌকিক ঘটনা বর্ণনা করেছেন *(ইবনু কাছীর, কুরতুবী)*। অতঃপর ইবরাহীম গুহা থেকে বের হয়ে

---

৮৮. কুরতুবী, আন'আম ৭৬ টীকা।

প্রথম তারকা দেখলেন, তারপর চন্দ্র দেখলেন, তারপর সূর্য দেখলেন। অতঃপর সবকিছুর ডুবে যাওয়া দেখে নিজেই সিদ্ধান্ত নিলেন যে, প্রকৃত পালনকর্তা তিনি, যিনি এগুলিকে সৃষ্টি করেছেন *(কুরতুবী)*। ইবনু জারীর দলীল এনেছেন ইবরাহীমের একথা দ্বারা, যেখানে তিনি বলেছেন, لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، 'যদি আমার প্রতিপালক আমাকে পথ না দেখান, তাহ'লে অবশ্যই আমি পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব' *(আন'আম ৬/৭৭)*।

ইবনু কাছীর (৭০১-৭৭৪ হিঃ) বলেন, বরং সঠিক কথা এই যে, ইবরাহীমের উপরোক্ত ঘটনা ছিল তার কওমের সাথে একটি তর্কানুষ্ঠান মাত্র। এটি কখনোই তার শিশুকালের ঘটনা নয় এবং তিনি ক্ষণিকের তরেও কখনো মুশরিক হননি। কেননা তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِّلّهِ حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، 'নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিলেন একটি উম্মত এবং আল্লাহ্র প্রতি অনুগত ও একনিষ্ঠ। আর তিনি কখনোই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না' *(নাহল ১৬/১২০)*। তাছাড়া প্রত্যেক মানব শিশুই জন্মগতভাবে আল্লাহ্র প্রতি একনিষ্ঠ থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন, خَلَقْتُ عبادى حُنَفَاءَ 'আমি আমার বান্দাদের সৃষ্টি করি আল্লাহ্র প্রতি একনিষ্ঠ হিসাবে'।[৮৯] সাধারণ মানবশিশু যদি এরূপ হয়, তাহ'লে শিশু ইবরাহীম কেন মুশরিক হবেন? আর এটা যে কওমের নেতাদের সাথে তাঁর একটি তর্কানুষ্ঠান ছিল, তার বড় প্রমাণ এই যে, ৮০ নং আয়াতে বলা হয়েছে وَحَآجَّهُ قَوْمُهُ 'তাঁর কওম তাঁর সাথে বিতর্ক করল'। তাছাড়া তর্ক শেষে তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যেসব বিষয়কে শরীক কর, আমি ওসব থেকে মুক্ত' *(আন'আম ৬/৭৮)*।

বলা বাহুল্য তারকা পূজারী নেতাদের সাথে ইবরাহীম (আঃ)-এর বিতর্কের ঘটনাটি কুরআন অত্যন্ত উঁচুমানের আলংকরিক ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছে, যা একটি বাস্তব ও অতুলনীয় বাণীচিত্রের রূপ ধারণ করেছে। যেমন ইবরাহীম

---

৮৯. মুসলিম 'জান্নাত' অধ্যায়; মিশকাত হা/৫৩৭১ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায় ৮ অনুচ্ছেদ।

(আঃ) উক্ত নেতাদের বলছেন, তোমাদের ধারণা অনুযায়ী ধরে নিলাম আকাশের ঐ নক্ষত্র, চন্দ্র ও সূর্য সকলেই 'আমার রব'। কিন্তু ওরা যে ডুবে গেল। যারা নিজেরা ডুবে যায়, তারা আমাকে বা তোমাদেরকে কিভাবে রক্ষা করবে? অতএব আমি তোমাদের শিরকী আক্বীদা হ'তে মুক্ত। আমি এদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র প্রতি একনিষ্ঠ ও অনুগত রইলাম। তোমরাও এদিকে ফিরে এসো। যেমন ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ মুশরিকদের ডেকে বলবেন, أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ 'তোমাদের ধারণা অনুযায়ী আমার শরীকরা কোথায়? *(ক্বাছাছ ২৮/৬২)*। অর্থাৎ তোমাদের দাবী অনুযায়ী ওরা আমার শরীক। অথচ আল্লাহ্‌র কোন শরীক নেই।

ইবরাহীম মূর্তি ভাঙ্গলেন :

জ্ঞানীদের ইশারাই যথেষ্ট। কিন্তু মানুষ যখন কোন কিছুর প্রতি অন্ধভক্তি পোষণ করে, তখন শত যুক্তিও কোন কাজ দেয় না। ফলে ইবরাহীম ভাবলেন, এমন কিছু একটা করা দরকার, যাতে পুরা সমাজ নড়ে ওঠে ও ওদের মধ্যে হুঁশ ফিরে আসে। সাথে সাথে তাদের মধ্যে তাওহীদী চেতনার উন্মেষ ঘটে। সেমতে তিনি সম্প্রদায়ের কেন্দ্রীয় দেবমন্দিরে গিয়ে মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেলার সংকল্প করলেন।

ইবরাহীম (আঃ)-এর সম্প্রদায় বছরের একটা বিশেষ দিনে উৎসব পালন করত ও সেখানে নানারূপ অপচয় ও অশোভন কাজ করত। যেমন আজকাল প্রবৃত্তি পূজারী ও বস্তুবাদী লোকেরা করে থাকে কথিত সংস্কৃতির নামে। এইসব মেলায় সঙ্গত কারণেই কোন নবীর যোগদান করা সম্ভব নয়। কওমের লোকেরা তাকে উক্ত মেলায় যোগদানের আমন্ত্রণ জানালো। কিন্তু তিনি অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে সেখানে যেতে অপারগতা প্রকাশ করলেন *(ছাফফাত ৩৭/৮৯)*। অতঃপর তিনি ভাবলেন, আজকের এই সুযোগে আমি ওদের দেবমন্দিরে প্রবেশ করে মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেব। যাতে ওরা ফিরে এসে ওদের মিথ্যা উপাস্যদের অসহায়ত্বের বাস্তব দৃশ্য দেখতে পায়। হয়তবা এতে তাদের অনেকের মধ্যে হুঁশ ফিরবে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান জাগ্রত হবে ও শিরক থেকে তওবা করবে।

অতঃপর তিনি দেবালয়ে ঢুকে পড়লেন ও দেব-দেবীদের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, (তোমাদের সামনে এত নযর-নেয়ায ও ভোগ-নৈবেদ্য রয়েছে)। অথচ 'তোমরা তা খাচ্ছ না কেন? কি ব্যাপার তোমরা কথা বলছ না কেন? তারপর তিনি ডান হাতে রাখা (সম্ভবতঃ কুড়াল দিয়ে) ভীষণ জোরে আঘাত করে সবগুলোকে গুঁড়িয়ে দিলেন *(ছাফফাত ৩৭/৯১-৯৩)*। তবে বড় মূর্তিটাকে পূর্বাবস্থায় রেখে দিলেন, যাতে লোকেরা তার কাছে ফিরে যায় *(আম্বিয়া ২১/৫৮)*।

মেলা শেষে লোকজন ফিরে এল এবং যথারীতি দেবমন্দিরে গিয়ে প্রতিমাগুলির অবস্থা দেখে হতবাক হয়ে গেল। 'তারা বলাবলি করতে লাগল, এটা নিশ্চয়ই ইবরাহীমের কাজ হবে। কেননা তাকেই আমরা সবসময় মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে বলতে শুনি। অতঃপর ইবরাহীমকে সেখানে ডেকে আনা হ'ল এবং জিজ্ঞেস করল, أَأَنتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ؟ 'হে ইবরাহীম! তুমিই কি আমাদের উপাস্যদের সাথে এরূপ আচরণ করেছ'? *(আম্বিয়া ২১/৬২)*।

ইবরাহীম বললেন, بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُوْنَ– 'বরং এই বড় মূর্তিটাই একাজ করেছে। নইলে এদেরকে জিজ্ঞেস কর, যদি তারা কথা বলতে পারে' *(আম্বিয়া ২১/৬৩)*। সম্প্রদায়ের নেতারা একথা শুনে লজ্জা পেল এবং মাথা নীচু করে বলল, قَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلاَءِ يَنْطِقُوْنَ– 'তুমি তো জানো যে, এরা কথা বলে না'। 'তিনি বললেন, قَالَ أَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لاَ يَنفَعُكُمْ شَيْئاً وَّلاَ يَضُرُّكُمْ– 'তোমরা কি আল্লাহ্র পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত কর, যা তোমাদের উপকারও করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না' *(আম্বিয়া ২১/৬৫-৬৬)*। তিনি আরও বললেন, قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ، وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ– 'তোমরা এমন বস্তুর পূজা কর, যা তোমরা নিজ হাতে তৈরী কর'? 'অথচ আল্লাহ তোমাদেরকে ও তোমাদের কর্মসমূহকে সৃষ্টি করেছেন' *(ছাফফাত ৩৭/৯৫-৯৬)*। أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ– 'ধিক তোমাদের জন্য এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাদের পূজা কর, ওদের জন্য। তোমরা কি বুঝ না'? *(আম্বিয়া ২১/৬৭)*।

তারপর যা হবার তাই হ'ল। যিদ ও অহংকারের বশবর্তী হয়ে সম্প্রদায়ের নেতারা ইবরাহীমকে চূড়ান্ত শাস্তি দেওয়ার পরিকল্পনা করল। তারা সিদ্ধান্ত নিল যে, একে আর বাঁচতে দেওয়া যাবে না। শুধু তাই নয়, একে এমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে মারতে হবে, যেন কেউ এর দলে যেতে সাহস না করে। তারা তাঁকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার প্রস্তাব গ্রহণ করল এবং সেটা বাদশাহ নমরূদের কাছে পেশ করল। সম্রাটের মন্ত্রী ও দেশের প্রধান পুরোহিতের ছেলে ইবরাহীম। অতএব তাকে সরাসরি সম্রাটের দরবারে আনা হ'ল।

নমরূদের সঙ্গে বিতর্ক ও অগ্নিপরীক্ষা :

ইবরাহীম (আঃ) এটাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে তাওহীদের দাওয়াত দেওয়ার সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করলেন। নমরূদ ৪০০ বছর ধরে রাজত্ব করায় সে উদ্ধত ও অহংকারী হয়ে উঠেছিল এবং নিজেকে একমাত্র উপাস্য ভেবেছিল। তাই সে ইবরাহীমকে জিজ্ঞেস করল, বল তোমার উপাস্য কে? নমরূদ ভেবেছিল, ইবরাহীম তাকেই উপাস্য বলে স্বীকার করবে। কিন্তু নির্ভীক কণ্ঠে ইবরাহীম জবাব দিলেন, رَبِّيَ الَّذِيْ يُحْيِـــيْ وَيُمِيْتُ 'আমার পালনকর্তা তিনি, যিনি মানুষকে বাঁচান ও মারেন'। মোটাবুদ্ধির নমরূদ বলল, أَنَا أُحْيِـــيْ وَأُمِيْتُ 'আমিও বাঁচাই ও মারি'। অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীকে খালাস দিয়ে মানুষকে বাঁচাতে পারি। আবার খালাসের আসামীকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারি। এভাবে সে নিজেকেই মানুষের বাঁচা-মরার মালিক হিসাবে সাব্যস্ত করল। ইবরাহীম তখন দ্বিতীয় যুক্তি পেশ করে বললেন, فَإِنَّ اللهَ يَأْتِيْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ 'আমার আল্লাহ সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদিত করেন, আপনি তাকে পশ্চিম দিক হ'তে উদিত করুন'। فَبُهِتَ الَّذِيْ كَفَرَ 'অতঃপর কাফের (নমরূদ) এতে হতবুদ্ধি হয়ে পড়লো' *(বাক্বারাহ ২/২৫৮)*।

কওমের নেতারাই যেখানে পরাজয়কে মেনে নেয়নি, সেখানে দেশের একচ্ছত্র সম্রাট কেন পরাজয়কে মেনে নিবেন। যথারীতি তিনিও অহংকারে ফেটে পড়লেন এবং ইবরাহীমকে জ্বলন্ত হুতাশনে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার নির্দেশ জারি করলেন। সাথে সাথে জনগণকে ধর্মের দোহাই দিয়ে বললেন, حَرِّقُوْهُ

وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنتُمْ فَاعِلِيْنَ 'তোমরা একে পুড়িয়ে মার এবং তোমাদের উপাস্যদের সাহায্য কর, যদি তোমরা কিছু করতে চাও' *(আম্বিয়া ২১/৬৮)*। উল্লেখ্য যে, কুরআন কোথাও নমরূদের নাম উল্লেখ করেনি এবং সে যে নিজেকে 'সর্বোচ্চ উপাস্য' দাবী করেছিল, এমন কথাও স্পষ্টভাবে বলেনি। তবে 'আমিও বাঁচাতে পারি ও মারতে পারি' *(বাক্বারাহ ২/২৫৮)* তার এই কথার মধ্যে তার সর্বোচ্চ অহংকারী হবার এবং ইবরাহীমের 'রব'-এর বিপরীতে নিজেকে এভাবে উপস্থাপন করায় সে নিজেকে 'সর্বোচ্চ রব' হিসাবে ধারণা করেছিল বলে প্রতীয়মান হয়। প্রধানতঃ ইস্রাঈলী বর্ণনাসমূহের উপরে ভিত্তি করেই 'নমরূদ'-এর নাম ও তার রাজত্ব সম্পর্কে জানা যায়। কুরআন কেবল অতটুকুই বলেছে, যতটুকু মানব জাতির হেদায়াতের জন্য প্রয়োজন।

যুক্তিতর্কে হেরে গিয়ে নমরূদ ইবরাহীম (আঃ)-কে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার হুকুম দিল। অতঃপর তার জন্য বিরাটাকারের আয়োজন শুরু হয়ে গেল। আল্লাহ বলেন, وَأَرَادُوْا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِيْنَ، 'তারা ইবরাহীমের বিরুদ্ধে মহা ফন্দি আঁটতে চাইল। অতঃপর আমরা তাদেরকেই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত করে দিলাম' *(আম্বিয়া ২১/৭০)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، 'আমরা তাদেরকে পরাভূত করে দিলাম' *(ছাফফাত ৩৭/৯৮)*।

অতঃপর 'একটা ভিত নির্মাণ করা হ'ল এবং সেখানে বিরাট অগ্নিকুণ্ড তৈরী করা হ'ল। তারপর সেখানে তাকে নিক্ষেপ করা হ'ল' *(ছাফফাত ৩৭/৯৭)*। ছহীহ বুখারীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপের সময় ইবরাহীম (আঃ) বলে ওঠেন, حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، 'আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি কতই না সুন্দর তত্ত্বাবধায়ক'।[৯০]

একই প্রার্থনা শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) করেছিলেন, ওহোদ যুদ্ধে আহত মুজাহিদগণ যখন শুনতে পান যে, আবু সুফিয়ান মক্কায় ফিরে না গিয়ে পুনরায় ফিরে আসছে মদীনায় মুসলিম শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য, তখন 'হামরাউল আসাদে' উপনীত তার পশ্চাদ্ধাবনকারী ৭০ জন আহত ছাহাবীর ক্ষুদ্র দল রাসূলের সাথে সমস্বরে বলে উঠেছিল حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ، 'আমাদের

৯০.বুখারী, হা/৪৫৬৩ তাফসীর অধ্যায়, সূরা আলে-ইমরান ।

জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি কতই না সুন্দর তত্ত্বাবধায়ক' ঘটনাটি কুরআনেও বর্ণিত হয়েছে'।[৯১] এভাবে পিতা ইবরাহীম ও পুত্র মুহাম্মাদের বিপদ মুহূর্তের বক্তব্যে শব্দে শব্দে মিল হয়ে যায়। তবে সার্বিক প্রচেষ্টার সাথেই কেবল উক্ত দো'আ পাঠ করতে হবে। নইলে কেবল দো'আ পড়ে নিষ্ক্রিয় বসে থাকলে চলবে না। যেমন ইবরাহীম (আঃ) সর্বোচ্চ পর্যায়ে দাওয়াত দিয়ে চূড়ান্ত বিপদের সময় এ দো'আ করেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিরোধী পক্ষের সেনাপতি আবু সুফিয়ানের পশ্চাদ্ধাবনের পরেই উক্ত দো'আ পড়েছিলেন।

বস্তুতঃ এই কঠিন মুহূর্তের পরীক্ষায় জয়লাভ করার পুরস্কার স্বরূপ সাথে সাথে আল্লাহ্‌র নির্দেশ এল قُلْنَا يَا نَارُ كُونِيْ بَرْداً وَّسَلاَمَاً عَلَى إِبْرَاهِيمَ، 'হে আগুন! ঠাণ্ডা হয়ে যাও এবং ইবরাহীমের উপরে শান্তিদায়ক হয়ে যাও' *(আম্বিয়া ২১/৬৯)*। অতঃপর ইবরাহীম মুক্তি পেলেন।

অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইবরাহীম (আঃ) ফিরে আসেন এবং এভাবে আল্লাহ কাফিরদের সমস্ত কৌশল বরবাদ করে দেন। এরপর শুরু হ'ল জীবনের আরেক অধ্যায়।

হিজরতের পালা :

ইসলামী আন্দোলনে দাওয়াত ও হিজরত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তৎকালীন পৃথিবীর সমৃদ্ধতম নগরী ছিল বাবেল, যা বর্তমানে 'বাগদাদ' নামে পরিচিত।[৯২] তাওহীদের দাওয়াত দিয়ে এবং মূর্তিপূজারী ও তারকাপূজারী নেতাদের সাথে তর্কযুদ্ধে জয়ী হয়ে অবশেষে অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার ফলে ইবরাহীমের দাওয়াত ও তার প্রভাব সকলের নিকটে পৌঁছে গিয়েছিল। যদিও সমাজপতি ও শাসকদের অত্যাচারের ভয়ে প্রকাশ্যে কেউ ইসলাম কবুলের ঘোষণা দেয়নি। কিন্তু তাওহীদের দাওয়াত তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল এবং তা সাধারণ জনগণের হৃদয়ে আসন গেড়ে নিয়েছিল।

অতএব এবার অন্যত্র দাওয়াতের পালা। ইবরাহীম (আঃ) সত্তরোর্ধ্ব বয়সে অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হন। এই দীর্ঘ দিন দাওয়াত দেওয়ার পরেও নিজের স্ত্রী সারাহ ও ভাতিজা লূত ব্যতীত কেউ প্রকাশ্যে ঈমান আনেনি। ফলে পিতা ও সম্প্রদায় কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে তিনি আল্লাহ্‌র হুকুমে হিজরতের সিদ্ধান্ত নেন। যাওয়ার পূর্বে তিনি নিজ সম্প্রদায়কে ডেকে যে বিদায়ী ভাষণ দেন, তার মধ্যে সকল যুগের তাওহীদবাদী গণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয় লুকিয়ে রয়েছে।

---

৯১. *আলে ইমরান ৩/১৭৩; আর-রাহীক্ব পৃঃ ২৮৬।*

৯২. *কুরতুবী, আন'আম ৭৫-এর টীকা।*

ইবরাহীমের হিজরত-পূর্ব বিদায়ী ভাষণ:

আল্লাহ্‌র ভাষায়, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآؤُا مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوْا بِاللهِ وَحْدَهُ إِلاَّ قَوْلَ إِبْرَاهِيْمَ لِأَبِيْهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ، رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ–

‘তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার সাথীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে। যখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, আমরা সম্পর্ক ছিন্ন করছি তোমাদের সাথে এবং তাদের সাথে যাদেরকে তোমরা পূজা কর আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে। আমরা তোমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করছি এবং আমাদের ও তোমাদের মাঝে স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ বিঘোষিত হ’ল যতদিন না তোমরা কেবলমাত্র এক আল্লাহ্‌র উপরে বিশ্বাস স্থাপন করবে। ... প্রভু হে! আমরা কেবল তোমার উপরেই ভরসা করছি এবং তোমার দিকেই মুখ ফিরাচ্ছি ও তোমার নিকটেই আমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল’ *(মুমতাহানাহ ৬০/৪)*। এরপর তিনি কওমকে উদ্দেশ্য করে বললেন, إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِيْنِ، ‘আমি চললাম আমার প্রভুর পানে, সত্বর তিনি আমাকে পথ দেখাবেন’ *(ছাফফাত ৩৭/৯৯)*। অতঃপর তিনি চললেন দিশাহীন যাত্রাপথে।

আল্লাহ বলেন, وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطاً إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِيْنَ، ‘আর আমরা তাকে ও লূতকে উদ্ধার করে নিয়ে গেলাম সেই দেশে, যেখানে বিশ্বের জন্য কল্যাণ রেখেছি’ *(আম্বিয়া ২১/৭১)*। এখানে তাঁর সাথী বিবি সারা-র কথা বলা হয়নি নারীর গোপনীয়তা রক্ষার শিষ্টাচারের প্রতি খেয়াল করে। আধুনিক নারীবাদীদের জন্য এর মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ তাঁকে এবং তাঁর স্ত্রী সারা ও ভাতিজা লূতকে পথ প্রদর্শন করে নিয়ে গেলেন পার্শ্ববর্তী দেশ শাম বা সিরিয়ার অন্তর্গত বায়তুল মুক্বাদ্দাসের অদূরে কেন‘আন নামক স্থানে, যা এখন তাঁর নামানুসারে ‘খালীল’ (الخليل) নামে পরিচিত হয়েছে। ঐ সময় সেখানে বায়তুল মুক্বাদ্দাসের অস্তিত্ব ছিল না। এখানেই ইবরাহীম (আঃ) বাকী জীবন অতিবাহিত করেন ও এখানেই কবরস্থ হন। এখানে হিজরতের সময় তাঁর বয়স ৮০ থেকে ৮৫-এর মধ্যে ছিল এবং বিবি সারা-র ৭০ থেকে ৭৫-এর মধ্যে। সঙ্গী ভাতিজা লূতকে আল্লাহ নবুঅত দান করেন ও তাকে পার্শ্ববর্তী সমৃদ্ধ নগরী সাদূমসহ

পাঁচটি নগরীর লোকদের হেদায়াতের উদ্দেশ্যে পাঠানো হয় ও তিনি সেখানেই বসবাস করেন। ফলে ইবরাহীমের জীবনে নিঃসঙ্গতার এক কষ্টকর অধ্যায় শুরু হয়।

উল্লেখ্য যে, মানবজাতির প্রথম ফসল ডুমুর (তীন) বর্তমান ফিলিস্তীনেই উৎপন্ন হয়েছিল আজ থেকে এগারো হাযার বছর আগে। সম্প্রতি সেখানে প্রাপ্ত শুকনো ডুমুর পরীক্ষা করে এ তথ্য জানা গেছে।[৯৩]

কেন'আনের জীবন :

জন্মভূমি বাবেল শহরে জীবনের প্রথমাংশ অতিবাহিত করার পর হিজরত ভূমি শামের কেন'আনে তিনি জীবনের বাকী অংশ কাটাতে শুরু করেন। তাঁর জীবনের অন্যান্য পরীক্ষা সমূহ এখানেই অনুষ্ঠিত হয়। কিছু দিন অতিবাহিত করার পর এখানে শুরু হয় দুর্ভিক্ষ। মানুষ সব দলে দলে ছুটতে থাকে মিসরের দিকে। মিসর তখন ফেরাঊনদের শাসনাধীনে ছিল। উল্লেখ্য যে, মিসরের শাসকদের উপাধি ছিল 'ফেরাঊন'। ইবরাহীম ও মূসার সময় মিসর ফেরাঊনদের শাসনাধীনে ছিল। মাঝখানে ইউসুফ-এর সময়ে ২০০ বছরের জন্য মিসর হাকসূস (الهكسوس) রাজাদের অধীনস্থ ছিল। যা ছিল ঈসা (আঃ)-এর আবির্ভাবের প্রায় ২০০০ বছর আগেকার ঘটনা'।[৯৪]

মিসর সফর :

দুর্ভিক্ষ তাড়িত কেন'আন হ'তে অন্যান্যদের ন্যায় ইবরাহীম (আঃ) সস্ত্রীক মিসরে রওয়ানা হ'লেন। ইচ্ছা করলে আল্লাহ তাঁর জন্য এখানেই রূযী পাঠাতে পারতেন। কিন্তু না। তিনি মিসরে কষ্টকর সফরে রওয়ানা হ'লেন। সেখানে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল এক কঠিন ও মর্মান্তিক পরীক্ষা এবং সাথে সাথে একটি নগদ ও অমূল্য পুরষ্কার।

ঐ সময় মিসরের ফেরাঊন ছিল একজন নারী লোলুপ মদ্যপ শাসক। তার নিয়োজিত লোকেরা রাস্তার পথিকদের মধ্যে কোন সুন্দরী মহিলা পেলেই তাকে ধরে নিয়ে বাদশাহকে পৌঁছে দিত। যদিও বিবি 'সারা' ঐ সময় ছিলেন বৃদ্ধা মহিলা, তথাপি তিনি ছিলেন সৌন্দর্য্যের রাণী। মিসরীয় সম্রাটের নিয়ম ছিল এই যে, যে মহিলাকে তারা অপহরণ করত, তার সাথী পুরুষ লোকটি যদি স্বামী হ'ত, তাহ'লে তাকে হত্যা করে মহিলাকে নিয়ে যেত। আর যদি ভাই বা পিতা হ'ত, তাহ'লে তাকে ছেড়ে দিত। তারা ইবরাহীমকে জিজ্ঞেস করলে তিনি সারাকে তাঁর 'বোন' পরিচয় দিলেন। নিঃসন্দেহে 'সারা' তার ইসলামী বোন ছিলেন। ইবরাহীম তাকে আল্লাহ্‌র যিম্মায় ছেড়ে দিয়ে ছালাতে

---

৯৩. ঢাকা, দৈনিক ইনকিলাব তাং ৭/৬/০৬ পৃঃ ১৩।

৯৪. তারীখুল আম্বিয়া, পৃঃ ১২৪।

দাঁড়িয়ে গেলেন ও আল্লাহ্র নিকটে স্বীয় স্ত্রীর ইয্যতের হেফাযতের জন্য আকুলভাবে প্রার্থনা করতে থাকলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ নিশ্চয়ই তার স্ত্রীর ইয্যতের হেফাযত করবেন।

সারাকে যথারীতি ফেরাঊনের কাছে আনা হ'ল। অতঃপর পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

فلمَّا دَخلتْ سارةُ على الْمَلِكِ قامَ إليها فأَقبلتْ تتوضأُ و تُصَلىِّ وتقولُ: أللَّهم إِنْ كنتَ تعلمُ أَنِّي آمنتُ بِكَ وبرسولكَ وأَحْصنتُ فَرْجِي إلا على زوجي فلا تُسلِّطْ عليَّ الكافرَ – رواه البخاريُّ و أحمد بإِسنادٍ صحيحٍ–

'যখন সারা সম্রাটের নিকটে নীত হ'লেন এবং সম্রাট তার দিকে এগিয়ে এল, তখন তিনি ওযূ করার জন্য গেলেন ও ছালাতে রত হয়ে আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করে বললেন, হে আল্লাহ! যদি তুমি জেনে থাক যে, আমি তোমার উপরে ও তোমার রাসূলের উপরে ঈমান এনেছি এবং আমি আমার একমাত্র স্বামীর জন্য সতীত্ব বজায় রেখেছি, তাহ'লে তুমি আমার উপরে এই কাফিরকে বিজয়ী করো না'।[৯৫]

সতীসাধ্বী স্ত্রী সারার দো'আ সঙ্গে সঙ্গে কবুল হয়ে গেল। সম্রাট এগিয়ে আসার উপক্রম করতেই হাত-পা অবশ হয়ে পড়ে গিয়ে গোঙাতে লাগলো। তখন সারাহ প্রার্থনা করে বললেন, হে আল্লাহ! লোকটি যদি এভাবে মারা যায়, তাহ'লে লোকেরা ভাববে আমি ওকে হত্যা করেছি'। তখন আল্লাহ সম্রাটকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন। কিন্তু শয়তান আবার এগিয়ে যেতে চাইল। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে আবার মরার মত পড়ে রইল।

এভাবে সে দুই অথবা তিনবার বেহুঁশ হয়ে পড়লো আর সারা-র দো'আয় বাঁচলো। অবশেষে সে বলল, তোমরা আমার কাছে একটা শয়তানীকে পাঠিয়েছ। যাও একে ইবরাহীমের কাছে ফেরত দিয়ে আসো এবং এর খেদমতের জন্য হাজেরাকে দিয়ে দাও। অতঃপর সারাহ তার খাদেমা হাজেরাকে নিয়ে সসম্মানে স্বামী ইবরাহীমের কাছে ফিরে এলেন' *(ঐ)*। এই সময় ইবরাহীম ছালাতের মধ্যে সারার জন্য প্রার্থনায় রত ছিলেন। সারা ফিরে এলে তিনি আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করেন। আল-হামদুলিল্লাহ! যে আল্লাহ তাঁর বান্দা ইবরাহীমকে নমরূদের প্রজ্জ্বলিত হুতাশন থেকে বাঁচিয়ে এনেছেন, সেই আল্লাহ ইবরাহীমের ঈমানদার স্ত্রীকে ফেরাঊনের লালসার আগুন থেকে

---

৯৫. বুখারী হা/২২১৭ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়; আহমাদ, সনদ ছহীহ।

কেন বাঁচিয়ে আনবেন না? অতএব সর্বাবস্থায় যাবতীয় প্রশংসা কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য।

'আবুল আম্বিয়া' (أبو الأنبياء) হিসাবে আল্লাহ পাক যেভাবে ইবরাহীমের পরীক্ষা নিয়েছেন, উম্মুল আম্বিয়া (أم الأنبياء) হিসাবে তিনি তেমনি বিবি সারা-র পরীক্ষা নিলেন এবং উভয়ে পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হ'লেন। *ফালিল্লাহিল হাম্‌দ।*

ধারণা করা চলে যে, ফেরাঊন কেবল হাজেরাকেই উপহার স্বরূপ দেয়নি। বরং অন্যান্য রাজকীয় উপঢৌকনাদিও দিয়েছিল। যাতে ইবরাহীমের মিসর গমনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যায় এবং বিপুল মাল-সামান ও উপঢৌকনাদি সহ তিনি কেন'আনে ফিরে আসেন।

শিক্ষণীয় বিষয় :

উপরোক্ত ঘটনার মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, বান্দা যখন নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র উপরে সোপর্দ করে দেয় এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির লক্ষ্যেই সকল কাজ করে, তখন আল্লাহ তার পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে নেন। তার জান-মাল-ইয্‌যত সবকিছু তিনিই হেফাযত করেন। আলোচ্য ঘটনায় ইবরাহীম ও সারাহ ছিলেন একেবারেই অসহায়। তারা স্রেফ আল্লাহ্‌র উপরেই নির্ভর করেছেন, তাঁর কাছেই কেঁদেছেন, তাঁর কাছেই চেয়েছেন। ফলে আল্লাহ তাঁদের ডাকে সাড়া দিয়েছেন।

দ্বিতীয় শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, বান্দার দায়িত্ব হ'ল, যেকোন মূল্যে হক-এর উপরে দৃঢ় থাকা ও অন্যকে হক-এর পথে দাওয়াত দেওয়া। ইবরাহীম দারিদ্র্যের তাড়নায় কাফেরের দেশ মিসরে গিয়েছিলেন। কিন্তু নিজেরা যেমন 'হক' থেকে বিচ্যুত হননি, তেমনি অন্যকে দাওয়াত দিতেও পিছপা হননি। ফলে আল্লাহ তাঁকে মর্মান্তিক বিপদের মধ্যে ফেলে মহা পুরস্কারে ভূষিত করলেন।

ইবরাহীমের কথিত তিনটি মিথ্যার ব্যাখ্যা :

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন যে, لم يَكْذِبْ إبراهيمُ عليه الصلاةُ والسلام إلاّ ثلاثَ كَذَباتٍ، 'ইবরাহীম (আঃ) তিনটি ব্যতীত কোন মিথ্যা বলেননি'। উক্ত তিনটি মিথ্যা ছিল- (১) মেলায় না যাবার অজুহাত হিসাবে তিনি বলেছিলেন إِنِّيْ سَقِيْمٌ 'আমি অসুস্থ' *(ছাফফাত ৩৭/৮৯)*। (২) মূর্তি ভেঙ্গেছে কে? এরূপ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا 'বরং এই বড়

মূর্তিটাই এ কাজ করেছে’ *(আম্বিয়া ২১/৬৩)*। (৩) মিসরের লম্পট রাজার হাত থেকে বাঁচার জন্য স্ত্রী সারা-কে তিনি বোন হিসাবে পরিচয় দেন।[৯৬]

হাদীছে উক্ত তিনটি বিষয়কে ‘মিথ্যা’ শব্দে উল্লেখ করা হ’লেও মূলতঃ এগুলির একটাও প্রকৃত অর্থে মিথ্যা ছিল না। বরং এগুলি ছিল আরবী অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায় ‘তাওরিয়া’ (التورية) বা দ্ব্যর্থ বোধক পরিভাষা। যেখানে শ্রোতা বুঝে এক অর্থ এবং বক্তার নিয়তে থাকে অন্য অর্থ। যেমন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন হযরত আয়েশার কাছে তার এক বৃদ্ধা খালাকে দেখে বললেন, কোন বৃদ্ধা জান্নাতে যাবে না। একথা শুনে খালা কান্না শুরু করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তারা তখন সবাই যুবতী হয়ে যাবে’।[৯৭] হিজরতের সময় পথিমধ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সম্পর্কে জনৈক ব্যক্তির প্রশ্নের জওয়াবে আবুবকর (রাঃ) বলেন, هذا الرجلُ يَهْدِيني الطريقَ ‘ইনি আমাকে পথ দেখিয়ে থাকেন’।[৯৮] এতে লোকটি ভাবল, উনি একজন সাধারণ পথপ্রদর্শক ব্যক্তি মাত্র। অথচ আবুবকরের উদ্দেশ্য ছিল তিনি আমাদের নবী অর্থাৎ ধর্মীয় পথপ্রদর্শক (يهديني الى طريق الجنة)। অনুরূপভাবে যুদ্ধকালে রাসূল (ছাঃ) একদিকে বেরিয়ে অন্য দিকে চলে যেতেন। যাতে তাঁর গন্তব্য পথ গোপন থাকে। এগুলি হ’ল উক্তিগত ও কর্মগত তাওরিয়ার উদাহরণ।

তাওরিয়া ও তাক্বিয়াহ ঃ

উল্লেখ্য যে, এই তাওরিয়া ও শী‘আদের তাক্বিয়াহ্র (تقية) মধ্যে পার্থক্য এই যে, সেখানে পুরাটাই মিথ্যা বলা হয় ও সেভাবেই কাজ করা হয়। যেমন উদাহরণ স্বরূপ, (১) শী‘আদের ৬ষ্ঠ ইমাম আবু আব্দুল্লাহ জাফর, যিনি আছ-ছাদিক্ব বা সত্যবাদী বলে উপাধিপ্রাপ্ত, একদিন তাঁর নিকটতম শিষ্য মুহাম্মাদ বিন মুসলিম তাঁর নিকটে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার জন্য আমার জীবন উৎসর্গীত হৌক! গতরাতে আমি একটি অদ্ভূত স্বপ্ন দেখেছি। তখন তিনি বললেন, তোমার স্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণনা কর। এখানে একজন স্বপ্ন বিশেষজ্ঞ মওজূদ আছেন। বলে তিনি সেখানে উপবিষ্ট অন্যতম শিষ্য ইমাম আবু হানীফার দিকে ইঙ্গিত করলেন। অতঃপর শিষ্য মুহাম্মাদ বিন মুসলিম তার স্বপ্ন বর্ণনা করলেন এবং আবু হানীফা তার ব্যাখ্যা দিলেন। ব্যাখ্যা শুনে

---

৯৬. ছহীহ বুখারী হা/৩৩৫৮ ‘নবীদের কাহিনী’ অধ্যায়।

৯৭. শামায়েলে তিরমিযী; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৯৮৭।

৯৮. বুখারী (দেওবন্দ ১৯৮৫) ১/৫৫৬ পৃঃ হা/৩৯১১ ‘নবীর হিজরত’ অনুচ্ছেদ ; আর-রাহীক্ব পৃঃ ১৬৮।

ইমাম জাফর ছাদেক খুশী হয়ে বললেন, আল্লাহ্র কসম! আপনি সঠিক বলেছেন হে আবু হানীফা। রাবী বলেন, অতঃপর আবু হানীফা সেখান থেকে চলে গেলে আমি ইমামকে বললাম, আপনার প্রতি আমার জীবন উৎসর্গীত হৌক! এই বিধর্মীর (নাছেবী) স্বপ্ন ব্যাখ্যা আমার মোটেই পসন্দ হয়নি। তখন ইমাম বললেন, হে ইবনু মুসলিম! এতে তুমি মন খারাব করো না। এদের ব্যাখ্যা আমাদের ব্যাখ্যা থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে। আবু হানীফা যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা সঠিক নয়। আমি বললাম, তাহ'লে আমি আল্লাহ্র কসম করে তার ব্যাখ্যাকে সঠিক বললেন কেন? ইমাম বললেন, نعم حلفت عليه انه اصاب الخطأ হ্যাঁ, আমি কসম করে এটাই বলেছি যে, উনি যথাযর্থভাবেই ভুল বলেছেন।'

অথচ এই মিথ্যা বলার জন্য সেখানে কোন ভয়-ভীতির কারণ ছিল না। কেননা উভয়ে ইমামের শিষ্য ছিলেন। উপরন্তু আবু হানীফা তখন সরকারের অপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন।'[৯৯] এটাই হ'ল শী'আদের তাক্বিয়া নীতি, যা স্রেফ মিথ্যা ব্যতীত কিছুই নয় এবং যার মাধ্যমে তারা মানুষকে ধোঁকা দিয়ে থাকে ও প্রতারণা করে থাকে। এই মিথ্যাচারকে ইমাম জাফর ছাদেক তাদের দ্বীনের ১০ ভাগের নয় ভাগ মনে করেন। তিনি বলেন, ঐ ব্যক্তির দ্বীন নেই, যার তাক্বিয়া নেই *(ঐ, পৃঃ ১৫৩)।* (২) ব্যাকরণবিদ হুসায়েন বিন মু'আয বিন মুসলিম বলেন, আমাকে একদিন ইমাম জাফর ছাদিক বললেন, শুনছি তুমি নাকি জুম'আ মসজিদে বসছ এবং লোকদের ফৎওয়া দিচ্ছ? আমি বললাম, হাঁ। তবে আপনার কাছ থেকে বের হবার আগেই আমি আপনাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলাম যে, আমি জুম'আ মসজিদে বসি, তারপর লোকেরা এসে আমাকে প্রশ্ন করে। আমি যখন বুঝি যে, লোকটি আমার ইচ্ছার বিরোধী, তখন আমি তাকে তার চাহিদা অনুযায়ী ফৎওয়া দেই।' একথা শোনার পর ইমাম জাফর ছাদিক আমাকে বললেন, اصنع كذا فانى اصنع كذا 'তুমি এভাবেই করো। কেননা আমিও এভাবে করে থাকি' *(ঐ, পৃঃ ১৭১-৭২)।* অথচ সত্য কখনোই মিথ্যার সঙ্গে মিশ্রিত হয় না এবং সত্য সংখ্যক সর্বদা একটিই হয়, তা কখনোই বহু হয় না। আল্লাহ বলেন, যদি সত্য তাদের প্রবৃত্তির অনুগামী হ'ত, তাহ'লে আকাশ ও পৃথিবী এবং এর মধ্যস্থিত সবকিছু ধ্বংস হয়ে যেত' *(মুমিনূন ২৩/৭১)*। বস্তুত: এই তাক্বিয়া নীতি

---

৯৯. ইহসান ইলাহী যহীর, আশ-শী'আহ ওয়াস সুন্নাহ (লাহোর, পাকিস্তান : ইদারা তারজুমানুস সুন্নাহ, তাবি), পৃঃ ১৬৪-৬৫।

শী'আদের ধর্মীয় বিশ্বাসের অঙ্গীভূত। যা ইসলামের মৌল নীতির ঘোর বিরোধী। কিন্তু তাওরিয়ায় বক্তা যে অর্থে উক্ত কথা বলেন তা সম্পূর্ণ সত্য হয়ে থাকে। যেমন- (১) ইবরাহীম নিজেকে سقيم (অসুস্থ) বলেছিলেন, কিন্তু مريض (পীড়িত) বলেননি। নিজ সম্প্রদায়ের শিরকী কর্মকাণ্ডে এমনিতেই তিনি ত্যক্ত-বিরক্ত ও বিতৃষ্ণ ছিলেন। তদুপরি শিরকী মেলায় যাওয়ার আবেদন পেয়ে তাঁর পক্ষে মানসিকভাবে অসুস্থ (سقيم من عملهم) হয়ে পড়াটাই স্বাভাবিক ছিল। এরপরেও তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকতেও পারেন। (২) সব মূর্তি ভেঙ্গে তিনি বড় মূর্তিটার গলায় বা হাতে কুড়াল ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। যাতে প্রমাণিত হয় যে, সেই-ই একাজ করেছে। এর দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কওমের মূর্খতাকে হাতে নাতে ধরিয়ে দেওয়া এবং তাদের মূর্তিপূজার অসারতা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া। তাই মূর্তি ভাঙ্গার কাজটি তিনি বড় মূর্তির দিকে সম্বন্ধ করেন রূপকভাবে। তাছাড়া ঐ বড় মূর্তিটির প্রতিই লোকেদের ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল সর্বাধিক। এর কারণেই মানুষ পথভ্রষ্ট হয়েছিল বেশী। ফলে সেই-ই মূলতঃ ইবরাহীমকে মূর্তি ভাঙ্গায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। অতএব একদিক দিয়ে সেই-ই ছিল মূল দায়ী।

(৩) সারা-কে বোন বলা। নিঃসন্দেহে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে দ্বীনী ভাই-বোন। স্ত্রীর ইযযত ও নিজের জীবন রক্ষার্থে এটুকু বলা মোটেই মিথ্যার মধ্যে পড়ে না।

এক্ষণে প্রশ্ন হ'ল, তবুও হাদীছে একে 'মিথ্যা' বলে অভিহিত করা হ'ল কেন? এর জবাব এই যে, নবী-রাসূলগণের সামান্যতম ত্রুটিকেও আল্লাহ বড় করে দেখেন তাদেরকে সাবধান করার জন্য। যেমন ভুলক্রমে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়াকে আল্লাহ আদমের 'অবাধ্যতা ও পথভ্রষ্টতা' (وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى)[১০০] বলে অভিহিত করেছেন। অথচ ভুলক্রমে কৃত অপরাধ ক্ষমার যোগ্য। উল্লেখ্য যে, মাওলানা মওদূদীর ন্যায় কোন কোন মুফাসসির এখানে হাদীছের রাবী আবু হুরায়রাকেই উক্ত বর্ণনার জন্য দায়ী করেছেন, যা নিতান্ত অন্যায়।

কেন'আনে প্রত্যাবর্তন :

ইবরাহীম (আঃ) যথারীতি মিসর থেকে কেন'আনে ফিরে এলেন। বন্ধ্যা স্ত্রী সারা তার খাদেমা হাজেরাকে প্রাণপ্রিয় স্বামী ইবরাহীমকে উৎসর্গ করলেন। ইবরাহীম তাকে স্ত্রীত্বে বরণ করে নিলেন। পরে দ্বিতীয়া স্ত্রী হাজেরার গর্ভে

---

১০০. ত্বোয়াহা ২০/১২১।

জন্ম গ্রহণ করেন তার প্রথম সন্তান ইসমাঈল (আঃ)। এই সময় ইবরাহীমের বয়স ছিল অন্যূন ৮৬ বছর। নিঃসন্তান পরিবারে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। শুষ্ক মরুতে যেন প্রাণের জোয়ার এলো। বস্তুত: ইসমাঈল ছিলেন নিঃসন্তান ইবরাহীমের দো'আর ফসল। কেননা তিনি বৃদ্ধ বয়সে আল্লাহর নিকটে 'নেককার সন্তান' কামনা করেছিলেন। যেমন আল্লাহ বলেন, رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِيْنَ، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلاَمٍ حَلِيْمٍ– '(ইবরাহীম বললেন,) হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি সৎকর্মশীল সন্তান দাও। অতঃপর আমরা তাকে একটি ধৈর্য্যশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।' *(ছাফফাত ৩৭/১০০-১০১)*।

ইবরাহীমী জীবনের পরীক্ষা সমূহ :

ইবরাহীমী জীবন মানেই পরীক্ষার জীবন। নবী হবার পর থেকে আমৃত্যু তিনি পরীক্ষা দিয়েই জীবনপাত করেছেন। এভাবে পরীক্ষার পর পরীক্ষা নিয়ে তাঁকে পূর্ণত্বের সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করা হয়েছে। অবশেষে তাঁকে 'বিশ্বনেতা' ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ– (البقرة ١٢٤)–

'যখন ইবরাহীমকে তার পালনকর্তা কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন, অতঃপর তিনি তাতে উত্তীর্ণ হ'লেন, তখন আল্লাহ বললেন, আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা করব। তিনি বললেন, আমার বংশধর থেকেও। তিনি বললেন, আমার অঙ্গীকার যালেমদের পর্যন্ত পৌঁছবে না' *(বাক্বারাহ ২/১২৪)*। বস্তুতঃ আল্লাহ ইবরাহীম ও তাঁর বংশধরগণের মধ্যেই বিশ্ব নেতৃত্ব সীমিত রেখেছেন। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ– ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ– (آل عمران ٣٣-٣٤)–

'নিশ্চয়ই আল্লাহ আদম, নূহ, ইবরাহীম-এর বংশধর ও ইমরানের বংশধরকে নির্বাচিত করেছেন'। 'যারা ছিল পরস্পরের বংশজাত। আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ' *(আলে ইমরান ৩/৩৩, ৩৪)*।

বস্তুতঃ ইবরাহীম (আঃ)-এর পরবর্তী সকল নবী তাঁর বংশধর ছিলেন। আলে ইমরান বলতে ইমরান-পুত্র মূসা ও হারূণ ও তাঁদের বংশধর দাঊদ,

সুলায়মান, ঈসা প্রমুখ নবীগণকে বুঝানো হয়েছে। যাঁরা সবাই ছিলেন ইবরাহীমের পুত্র ইসহাকের বংশধর। অপরপক্ষে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ছিলেন ইবরাহীমের জ্যেষ্ঠ পুত্র ইসমাঈলের বংশধর। সে হিসাবে আল্লাহ ঘোষিত ইবরাহীমের বিশ্বনেতৃত্ব যেমন বহাল রয়েছে, তেমনি নবীদের প্রতি অবাধ্যতা, বংশীয় অহংকার এবং যিদ ও হঠকারিতার জন্য যালেম ইহুদী-নাছারাগণ আল্লাহ্র অভিশাপ কুড়িয়ে বিশ্বের সর্বত্র ধিকৃত ও লাঞ্ছিত হয়েছে। এক্ষণে 'নবীদের পিতা' ও মিল্লাতে ইসলামিয়াহ্র নেতা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে কি কি বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল, আমরা সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করব।

ইবরাহীম (আঃ)-এর পরীক্ষা সমূহ ছিল দু'ভাগে বিভক্ত। (এক) বাবেল জীবনের পরীক্ষা সমূহ এবং (দুই) কেন'আন জীবনের পরীক্ষা সমূহ। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জীবনের সঙ্গে পিতা ইবরাহীম (আঃ)-এর জীবনের সুন্দর একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। মুহাম্মাদী জীবনের প্রথমাংশ কেটেছে মক্কায় ও শেষাংশ কেটেছে মদীনায় এবং সেখানেই তিনি পূর্ণতা লাভ করেন ও মৃত্যুবরণ করেন। ইবরাহীমী জীবনের প্রথমাংশ কেটেছে বাবেল শহরে এবং শেষাংশ কেটেছে কেন'আনে। সেখানেই তিনি পূর্ণতা পেয়েছেন ও সেখানেই মৃত্যুবরণ করেছেন।

বাবেল জীবনের পরীক্ষা সমূহ :

ইবরাহীম (আঃ)-এর বাবেল জীবনের পরীক্ষা সমূহের মধ্যে (১) মূর্তিপূজারী নেতাদের সাথে তর্কযুদ্ধের পরীক্ষা (২) পিতার পক্ষ থেকে বহিষ্কারাদেশ প্রাপ্তির পরীক্ষা (৩) স্ত্রী ও ভাতিজা ব্যতীত কেউ তাঁর দাওয়াত কবুল না করা সত্ত্বেও তীব্র সামাজিক বিরোধিতার মুখে একাকী দাওয়াত চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অটল থাকার মাধ্যমে আদর্শ নিষ্ঠার কঠিন পরীক্ষা (৪) তারকাপূজারীদের সাথে যুক্তিগর্ভ তর্কযুদ্ধের পরীক্ষা (৫) কেন্দ্রীয় দেবমন্দিরে ঢুকে মূর্তি ভাঙ্গার মত দুঃসাহসিক পরীক্ষা (৬) অবশেষে রাজদরবারে পৌঁছে সরাসরি সম্রাটের সাথে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পরীক্ষা এবং বিনিময়ে (৭) জ্বলন্ত হুতাশনে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করার মর্মান্তিক শাস্তি হাসিমুখে বরণ করে নেবার অতুলনীয় অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া। এছাড়াও সমাজ সংস্কারক হিসাবে জীবনের প্রতি পদে পদে যে অসংখ্য পরীক্ষার সম্মুখীন তাঁকে হর-হামেশা হ'তে হয়েছে, তা বলাই বাহুল্য।

উপরে বর্ণিত পরীক্ষাগুলির সবটিতেই ইবরাহীম (আঃ) জয়লাভ করেছিলেন এবং সেগুলির আলোচনা আমরা ইতিপূর্বে করে এসেছি। এক্ষণে আমরা তাঁর কেন‘আনী জীবনের প্রধান পরীক্ষাসমূহ বিবৃত করব ইনশাআল্লাহ।

কেন‘আনী জীবনের পরীক্ষা সমূহ :

১ম পরীক্ষা: দুর্ভিক্ষে পতিত হয়ে মিসর গমন : কেন‘আনী জীবনে তাঁর প্রথম পরীক্ষা হ’ল কঠিন দুর্ভিক্ষে তাড়িত হয়ে জীবিকার সন্ধানে মিসরে হিজরত করা। এ বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

২য় পরীক্ষা: সারাকে অপহরণ : মিসরে গিয়ে সেখানকার লম্পট সম্রাট ফেরাঊনের কুদৃষ্টিতে পড়ে স্ত্রী সারাকে অপহরণের মর্মান্তিক পরীক্ষা। এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

৩য় পরীক্ষা: হাজেরাকে মক্কায় নির্বাসন : মিসর থেকে ফিরে কেন‘আনে আসার বৎসরাধিককাল পরে প্রথম সন্তান ইসমাঈলের জন্ম লাভ হয়। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই তিনি শিশু সন্তান ও তার মা হাজেরাকে মক্কার বিজন পাহাড়ী উপত্যকায় নিঃসঙ্গভাবে রেখে আসার এলাহী নির্দেশ লাভ করেন। বস্তুতঃ এটা ছিল অত্যন্ত মর্মান্তিক পরীক্ষা। এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নরূপ:

হযরত ইবরাহীম (আঃ) যখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে শিশু পুত্র ইসমাঈল ও তার মাকে মক্কায় নির্বাসনে রেখে আসার নির্দেশ পান, তখনই তার অন্তরে বিশ্বাস জন্মেছিল যে, নিশ্চয়ই এ নির্দেশের মধ্যে আল্লাহ্র কোন মহতী পরিকল্পনা লুক্কায়িত আছে এবং নিশ্চয়ই তিনি ইসমাঈল ও তার মাকে ধ্বংস করবেন না।

অতঃপর এক থলে খেজুর ও এক মশক পানি সহ তাদের বিজনভূমিতে রেখে যখন ইবরাহীম (আঃ) একাকী ফিরে আসতে থাকেন, তখন বেদনা-বিস্মিত স্ত্রী হাজেরা ব্যাকুলভাবে তার পিছে পিছে আসতে লাগলেন। আর স্বামীকে এর কারণ জিজ্ঞেস করতে থাকেন। কিন্তু বুকে বেদনার পাষাণ বাঁধা ইবরাহীমের মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুলো না। তখন হাজেরা বললেন, আপনি কি আল্লাহ্র হুকুমে আমাদেরকে এভাবে ফেলে যাচ্ছেন? ইবরাহীম ইশারায় বললেন, হ্যাঁ। তখন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে অটল বিশ্বাস ও দৃঢ় মনোবল নিয়ে হাজেরা বলে উঠলেন, إِذَنْ لاَيُضَيِّعُنَا اللهُ ‘তাহ’লে আল্লাহ আমাদের ধ্বংস করবেন না’। ফিরে এলেন তিনি সন্তানের কাছে। দু’একদিনের মধ্যেই ফুরিয়ে যাবে পানি ও খেজুর। কি হবে উপায়? খাদ্য ও পানি বিহনে বুকের দুধ শুকিয়ে গেলে কচি বাচ্চা কি খেয়ে বাঁচবে। পাগলপরা হয়ে তিনি মানুষের সন্ধানে দৌড়াতে থাকেন ছাফা ও মারওয়া পাহাড়ের এ মাথা আর ও মাথায়।

এভাবে সপ্তমবারে তিনি দূর থেকে দেখেন যে, বাচ্চার পায়ের কাছ থেকে মাটির বুক চিরে বেরিয়ে আসছে ঝর্ণার ফল্গুধারা, জিব্রীলের পায়ের গোড়ালি বা তার পাখার আঘাতে যা সৃষ্টি হয়েছিল। ছুটে এসে বাচ্চাকে কোলে নিলেন অসীম মমতায়। স্নিগ্ধ পানি পান করে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করলেন। হঠাৎ অদূরে একটি আওয়ায শুনে তিনি চমকে উঠলেন। উনি জিবরীল। বলে উঠলেন, لا تخافوا الضَّيعةَ، إنَّ هذا بيتُ الله يَبْنِى هذا الغلامُ و أبوه وإن الله لايُضيعُ أهلَه– 'আপনারা ভয় পাবেন না। এখানেই আল্লাহ্র ঘর। এই সন্তান ও তার পিতা এ ঘর সত্বর পুনর্নির্মান করবেন। আল্লাহ তাঁর ঘরের বাসিন্দাদের ধ্বংস করবেন না'। বলেই শব্দ মিলিয়ে গেল'।

অতঃপর শুরু হ'ল ইসমাঈলী জীবনের নব অধ্যায়। পানি দেখে পাখি আসলো। পাখি ওড়া দেখে ব্যবসায়ী কাফেলা আসলো। তারা এসে পানির মালিক হিসাবে হাজেরার নিকটে অনুমতি চাইলে তিনি এই শর্তে মনযুর করলেন যে, আপনাদের এখানে বসতি স্থাপন করতে হবে। বিনা পয়সায় এই প্রস্তাব তারা সাগ্রহে কবুল করল। এরাই হ'ল ইয়ামন থেকে আগত বনু জুরহুম গোত্র। বড় হয়ে ইসমাঈল এই গোত্রে বিয়ে করেন। এঁরাই কা'বা গৃহের খাদেম হন এবং এদের শাখা গোত্র কুরায়েশ বংশে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমন ঘটে।

ওদিকে ইবরাহীম (আঃ) যখন স্ত্রী ও সন্তানকে রেখে যান তখন হাজেরার দৃষ্টির আড়ালে গিয়ে আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করেন এই বলে,

رَّبَّنَا إِنِّيْ أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلاَةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْ إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ– (ابراهيم ٣٧)–

'হে আমাদের পালনকর্তা! আমি আমার পরিবারের কিছু সদস্যকে তোমার মর্যাদামণ্ডিত গৃহের সন্নিকটে চাষাবাদহীন উপত্যকায় বসবাসের জন্য রেখে যাচ্ছি। প্রভুহে! যাতে তারা ছালাত কায়েম করে। অতএব কিছু লোকের অন্তরকে তুমি এদের প্রতি আকৃষ্ট করে দাও এবং তাদেরকে ফল-ফলাদি দ্বারা রূযী দান কর। সম্ভবত: তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে'।[১০১]

---

১০১. ইবরাহীম ১৪/৩৭; বুখারী ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত দীর্ঘ হাদীছের সারসংক্ষেপ; 'নবীদের কাহিনী' অধ্যায় হা/৩৩৬৪।

শিক্ষণীয় বিষয়ঃ

(১) ইবরাহীম (আঃ) তাঁর স্ত্রী ও দুগ্ধপোষ্য সন্তানকে জনমানব শূন্য ও চাষাবাদহীন এক শুষ্ক মরু উপত্যকায় রেখে আসলেন, কোন সুস্থ বিবেক এ কাজকে সমর্থন করতে পারে না। কিন্তু যারা আল্লাহতে বিশ্বাসী, তাদের জন্য বিষয়টি মোটেই আশ্চর্যজনক নয়। আর সেকারণেই হাজেরা গভীর প্রত্যয়ে বলে উঠেছিলেন, إِذَنْ لا يُضَيِّعُنِيَ اللهُ ‘তাহ’লে আল্লাহ আমাকে ধ্বংস করবেন না’। আল্লাহ যে কেবল বিশ্বাসের বস্তু নয়, বরং তিনি সার্বক্ষণিকভাবে বান্দার তত্ত্বাবধায়ক, ইবরাহীমের উক্ত কর্মনীতির মধ্যে তার স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। অতি যুক্তিবাদী ও বস্তুবাদীদের জন্য এর মধ্যে রয়েছে বড় ধরনের এক শিক্ষণীয় বিষয়।

(২) ইবরাহীমের দো‘আ আল্লাহ এমন দ্রুত কবুল করেছিলেন যে, দু’একদিনের মধ্যেই সেখানে সৃষ্টি হয় পানির ফোয়ারা, যা যমযম কূয়া নামে পরিচিত হয় এবং যার উৎসধারা বিগত প্রায় সোয়া চার হাযার বছর ধরে আজও সমভাবে বহমান। কিন্তু এই পানির রূপ-রস-গন্ধ কিছুরই কোন পরিবর্তন হয়নি। এ পানির কোন হ্রাস-বৃদ্ধি নেই। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, এ পানিতে এমন সব উপাদান রয়েছে, যা মানুষের জন্য খাদ্য ও পানীয় উভয় চাহিদা মেটাতে সক্ষম। পৃথিবীর অন্য কোন পানিতে এ গুণ নেই। দৈনিক লাখ লাখ গ্যালন পানি ব্যয় হওয়া সত্ত্বেও এ পানির কোন ক্ষয় নেই, লয় নেই, কমতি নেই। এর কারণ অনুসন্ধানে বছরের পর বছর চেষ্টা করেও বৈজ্ঞানিকেরা ব্যর্থ হয়েছেন। *ফালিল্লা-হিল হাম্‌দ।*

(৩) তখন থেকে অদ্যাবধি মক্কা মু‘আয্‌যমায় চাষাবাদের তেমন কোন ব্যবস্থা নেই। কিন্তু সারা পৃথিবী হ’তে তাবৎ ফল-ফলাদি সর্বদা সেখানে আমদানী হয়ে থাকে এবং সর্বদা অধিকহারে মওজূদ থাকে। আধুনিক বিশ্বের কোন শহরই এর সাথে তুলনীয় নয়। নিঃসন্দেহে এটা হ’ল ইবরাহীমের দো‘আর অন্যতম ফসল।

(৪) ইবরাহীম (আঃ)-এর দো‘আয় বলা হয়েছিল, ‘আমি আমার সন্তানকে এখানে রেখে যাচ্ছি যেন তারা এখানে ছালাত কায়েম করে’। আল্লাহ্‌র রহমতে সেদিন থেকে অদ্যাবধি এখানে ছালাত, ত্বাওয়াফ ও অন্যান্য ইবাদত সর্বদা জারি আছে।

(৫) দো‘আয় তিনি বলেছিলেন, ‘মানব সমাজের কিছু অংশের হৃদয়কে তুমি এদের প্রতি ঝুঁকিয়ে দাও’। নিঃসন্দেহে সেই অংশটি হ’ল সারা বিশ্বের মুসলিম সমাজ। ইবরাহীম (আঃ) জানতেন যে, বিশ্বের সমস্ত লোক কখনো মুমিন হবে না। তাছাড়া তাবৎ বিশ্ব যদি কা‘বার প্রতি ঝুঁকে পড়ত, তাহ’লে সেখানে বসবাস, স্থান সংকুলান ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার সংকট দেখা দেওয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল। তখন থেকে এযাবত সর্বদা একদল শক্তিশালী ও ধর্মপরায়ণ মানুষ মক্কার সুরক্ষা ও নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত রয়েছে। দেড় হাযার বছর পূর্বে খৃষ্টান গভর্ণর আবরাহার সকল প্রচেষ্টা যেমন ব্যর্থ হয়েছিল, ক্বিয়ামত অবধি শত্রুদের সকল চক্রান্ত এভাবেই ব্যর্থ হবে ইনশাআল্লাহ।

৪র্থ পরীক্ষা: খাৎনা করণ :

ইবরাহীমের প্রতি আদেশ হ’ল খাৎনা করার জন্য। এসময় তাঁর বয়স ছিল অন্যূন ৮০ বছর। হুকুম পাওয়ার সাথে সাথে দেরী না করে নিজেই নিজের খাৎনার কাজ সম্পন্ন করলেন।[১০২] বিনা দ্বিধায় এই কঠিন ও বেদনাদায়ক কাজ সম্পন্ন করার মধ্যে আল্লাহ্র হুকুম দ্রুত পালন করার ও এ ব্যাপারে তাঁর কঠোর নিষ্ঠার প্রমাণ পাওয়া যায়।

খাৎনার এই প্রথা ইবরাহীমের অনুসারী সকল ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে আজও চালু আছে। বস্তুতঃ খাৎনার মধ্যে যে অফুরন্ত কল্যাণ নিহিত রয়েছে, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানীগণ তা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেছেন। এর ফলে খাৎনাকারীগণ অসংখ্য অজানা রোগ-ব্যাধি হ’তে মুক্ত রয়েছেন এবং সুস্থ জীবন লাভে ধন্য হয়েছেন। এটি মুসলিম এবং অমুসলিমের মধ্যে একটি স্থায়ী পার্থক্যও বটে।

৫ম পরীক্ষা: পুত্র কুরবানী :

একমাত্র শিশু পুত্র ও তার মাকে মক্কায় রেখে এলেও ইবরাহীম (আঃ) মাঝে-মধ্যে সেখানে যেতেন ও দেখা-শুনা করতেন। এভাবে ইসমাঈল ১৩/১৪ বছর বয়সে উপনীত হ’লেন এবং পিতার সঙ্গে চলাফেরা করার উপযুক্ত হ’লেন। বলা চলে যে, ইসমাঈল যখন বৃদ্ধ পিতার সহযোগী হ’তে চলেছেন এবং পিতৃহৃদয় পুরোপুরি জুড়ে বসেছেন, ঠিক সেই সময় আল্লাহ ইবরাহীমের মহব্বতের কুরবানী কামনা করলেন। বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র নয়নের পুত্তলী

---

১০২. বুখারী, আবু হুরায়রা হ’তে হা/৩৩৫৬, ৬২৯৭; কুরতুবী হা/৬৫১-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

ইসমাঈলের মহব্বত ইবরাহীমকে কাবু করে ফেলল কি-না, আল্লাহ যেন সেটাই যাচাই করতে চাইলেন। ইতিপূর্বে অগ্নিপরীক্ষা দেবার সময় ইবরাহীমের কোন পিছুটান ছিল না। কিন্তু এবার রয়েছে প্রচণ্ড রক্তের টান।

দ্বিতীয়তঃ অগ্নি পরীক্ষায় বাদশাহ তাকে বাধ্য করেছিল। কিন্তু এবারের পরীক্ষা স্বেচ্ছায় ও স্বহস্তে সম্পন্ন করতে হবে। তাই এ পরীক্ষাটি ছিল পূর্বের কঠিন অগ্নি পরীক্ষার চেয়ে নিঃসন্দেহে কঠিনতর। সূরা ছাফফাত ১০২ আয়াত হ'তে ১০৯ আয়াত পর্যন্ত এ বিষয়ে বর্ণিত ঘটনাটি নিম্নরূপ:

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَآءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ- (الصافات ١٠٢)-

'যখন (ইসমাঈল) পিতার সাথে চলাফেরা করার মত বয়সে উপনীত হ'ল, তখন (ইবরাহীম) তাকে বললেন, হে আমার বেটা! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে যবহ করছি। এখন বল তোমার অভিমত কি? সে বলল, হে পিতা! আপনাকে যা নির্দেশ করা হয়েছে, আপনি তা কার্যকর করুন। আল্লাহ চাহেন তো আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত দেখতে পাবেন' *(ছাফফাত ৩৭/১০২)*।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, মক্কা থেকে বের করে ৮ কিঃ মিঃ দক্ষিণ-পূর্বে মিনা প্রান্তরে নিয়ে যাওয়ার পথে বর্তমানে যে তিন স্থানে হাজীগণ শয়তানকে পাথর মেরে থাকেন, ঐ তিন স্থানে ইবলীস তিনবার ইবরাহীম (আঃ)-কে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছিল। আর তিনবারই ইবরাহীম (আঃ) শয়তানের প্রতি ৭টি করে কংকর নিক্ষেপ করেছিলেন।[১০৩] সেই স্মৃতিকে জাগরুক রাখার জন্য এবং শয়তানের প্রতারণার বিরুদ্ধে মুমিনকে বাস্তবে উদ্বুদ্ধ করার জন্য এ বিষয়টিকে হজ্জ অনুষ্ঠানের ওয়াজিবাতের অন্ত র্ভুক্ত করা হয়েছে। এখানেই অনতিদূরে পূর্ব দিকে 'মসজিদে খায়েফ' অবস্থিত।

অতঃপর পিতা-পুত্র আল্লাহ নির্দেশিত কুরবানগাহ 'মিনায়' উপস্থিত হ'লেন। সেখানে পৌঁছে পিতা পুত্রকে তাঁর স্বপ্নের কথা বর্ণনা করলেন এবং পুত্রের

---

১০৩. ইবনু আব্বাস হ'তে মুসনাদে আহমাদ হা/২৭০৭, ২৭৯৫, সনদ ছহীহ, শো'আয়েব আরনাউত্ব।

অভিমত চাইলেন। পুত্র তার অভিমত ব্যক্ত করার সময় বললেন, ‘ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে ছবরকারীদের অন্তর্ভুক্ত দেখতে পাবেন’। ইনশাআল্লাহ না বললে হয়ত তিনি ধৈর্য ধারণের তাওফীক পেতেন না। এরপর তিনি নিজেকে ‘ছবরকারী’ না বলে ‘ছবরকারীদের অন্তর্ভুক্ত’ বলেছেন এবং এর মাধ্যমে নিজের পিতা সহ পূর্বেকার বড় বড় আত্মোৎসর্গকারীদের মধ্যে নিজেকে শামিল করে নিজেকে অহমিকা মুক্ত করেছেন। যদিও তাঁর ন্যায় তরুণের এরূপ স্বেচ্ছায় আত্মোৎসর্গের ঘটনা ইতিপূর্বে ঘটেছিল বলে জানা যায় না। আল্লাহ বলেন,

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَ تَلَّهُ لِلْجَبِينِ، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَّآ إِبْرَاهِيْمُ، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلآَءُ الْمُبِيْنُ، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِيْنَ، سَلاَمٌ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ- (الصافات ١٠٣-١٠٩)-

‘অতঃপর (পিতা-পুত্র) উভয়ে যখন আত্মসমর্পণ করল এবং পিতা পুত্রকে উপুড় করে শায়িত করল’। ‘তখন আমরা তাকে ডাক দিয়ে বললাম, হে ইবরাহীম’! ‘তুমি তোমার স্বপ্ন সত্যে পরিণত করেছ। আমরা এভাবেই সৎকর্মশীলগণের প্রতিদান দিয়ে থাকি’। ‘নিশ্চয়ই এটি একটি সুস্পষ্ট পরীক্ষা’। ‘আর আমরা তার পরিবর্তে একটি মহান যবহ প্রদান করলাম’ ‘এবং আমরা এ বিষয়টি পরবর্তীদের মধ্যে রেখে দিলাম’। ‘ইবরাহীমের উপর শান্তি বর্ষিত হৌক’ *(ছাফফাত ৩৭/১০৩-১০৯)*। বর্তমানে উক্ত মিনা প্রান্তরেই হাজীগণ কুরবানী করে থাকেন এবং বিশ্ব মুসলিম ঐ সুন্নাত অনুসরণে ১০ই যুলহিজ্জাহ বিশ্বব্যাপী শরী‘আত নির্ধারিত পশু কুরবানী করে থাকেন।

শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ :

(১) ইবরাহীমকে আল্লাহ স্বপ্নাদেশ করেছিলেন, সরাসরি আদেশ করেননি। এর মধ্যে পরীক্ষা ছিল এই যে, স্বপ্নের বিভিন্ন ব্যাখ্যা হ’তে পারত। যেমন নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা মহাপাপ। অধিকন্তু পিতা হয়ে নির্দোষ পুত্রকে নিজ হাতে হত্যা করা আরও বড় মহাপাপ। নিশ্চয়ই এমন অন্যায় কাজের নির্দেশ আল্লাহ দিতে পারেন না। অতএব এটা মনের কল্পনা-নির্ভর স্বপ্ন (أضغاث أحلام) হ’তে পারে। কিন্তু ইবরাহীম ঐসব ব্যাখ্যায় যাননি। তিনি

নিশ্চিত ছিলেন যে, এটা 'অহি'। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি পরপর তিনদিন একই স্বপ্ন দেখেন। প্রশ্ন হ'তে পারে, আল্লাহ জিব্রীল মারফত সরাসরি নির্দেশ না পাঠিয়ে স্বপ্নের মাধ্যমে নির্দেশ পাঠালেন কেন? এর জবাব এই যে, তাহ'লে তো পরীক্ষা হ'ত না, কেবল নির্দেশ পালন হ'ত। ইবরাহীমকে তার স্বপ্নের কাল্পনিক ব্যাখ্যার ফাঁদে ফেলার জন্যই তো শয়তান মাঝপথে বন্ধু সেজে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। এর দ্বারা আরেকটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্র নির্দেশ পালনের সময় অহেতুক প্রশ্ন সমূহ উত্থাপন ও অধিক যুক্তিবাদের আশ্রয় নেওয়া যাবে না। বরং সর্বদা তার প্রকাশ্য অর্থের উপরে সহজ-সরলভাবে আমল করে যেতে হবে।

(২) আল্লাহ্র মহব্বত ও দুনিয়াবী কোন মহব্বত একত্রিত হ'লে সর্বদা আল্লাহ্র মহব্বতকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং দুনিয়াবী মহব্বতকে কুরবানী দিতে হবে। ইবরাহীম এখানে সন্তানের গলায় ছুরি চালাননি। বরং সন্তানের মহব্বতের গলায় ছুরি চালিয়েছিলেন। আর এটাই ছিল পরীক্ষা। যদি কেউ আল্লাহ্র মহব্বতের উপরে দুনিয়াবী মহব্বতকে অগ্রাধিকার দেয়, তখন সেটা হয়ে যায় الإشراك في المحبة বা ভালোবাসায় শিরক। ইবরাহীম ও ইসমাঈল দু'জনেই উক্ত শিরক হ'তে মুক্ত ছিলেন।

(৩) পিতা ও পুত্রের বিশ্বাসগত সমন্বয় ব্যতীত কুরবানীর এই গৌরবময় ইতিহাস রচিত হ'ত না। ইসমাঈল যদি পিতার অবাধ্য হ'তেন এবং দৌড়ে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে যেতেন, তাহ'লে আল্লাহ্র হুকুম পালন করা ইবরাহীমের পক্ষে হয়তবা আদৌ সম্ভব হ'ত না। তাই এ ঘটনার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সমাজের প্রবীণদের কল্যাণময় নির্দেশনা এবং নবীনদের আনুগত্য ও উদ্দীপনা একত্রিত ও সমন্বিত না হ'লে কখনোই কোন উন্নত সমাজ গঠন করা সম্ভব নয়।

(৪) এখানে মা হাজেরার অবদানও ছিল অসামান্য। যদি তিনি ঐ বিজন ভূমিতে কচি সন্তানকে তিলে তিলে মানুষ করে না তুলতেন এবং স্রেফ আল্লাহ্র উপরে ভরসা করে বুকে অসীম সাহস নিয়ে সেখানে বসবাস না

করতেন, তাহ'লে পৃথিবী পিতা-পুত্রের এই মহান দৃশ্য অবলোকন করতে পারত না। এজন্যেই বাংলার বুলবুল কাজী নজরুল ইসলাম গেয়েছেন,

মা হাজেরা হৌক মায়েরা সব
যবীহুল্লাহ হৌক ছেলেরা সব
সবকিছু যাক সত্য রৌক
বিধির বিধান সত্য হৌক।

বলা চলে যে, এই কঠিনতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর ইবরাহীম (আঃ) বিশ্ব নেতৃত্বের সম্মানে ভূষিত হন। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيْمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّيْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً، (بقرة ١٢٤)-

'যখন ইবরাহীমকে তার পালনকর্তা কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন, অতঃপর তিনি তাতে উত্তীর্ণ হ'লেন, তখন আল্লাহ বললেন, আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা করলাম' *(বাক্বারাহ ২/১২৪)*।

উপরোক্ত আয়াতে পরীক্ষাগুলির সংখ্যা কত ছিল, তা বলা হয়নি। তবে ইবরাহীমের পুরো জীবনটাই যে ছিল পরীক্ষাময়, তা ইতিপূর্বেকার আলোচনায় প্রতিভাত হয়েছে।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী :

বাবেল জীবনে ৭টি ও কেন'আন জীবনে ৫টি বড় বড় পরীক্ষা বর্ণনার পর এবারে আমরা ইবরাহীম (আঃ)-এর জীবনের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ও শিক্ষণীয় ঘটনাবলী বিবৃত করব।-

(১) ইসহাক জন্মের সুসংবাদ :

পুত্র কুরবানীর ঘটনার পরে ইবরাহীম (আঃ) কেন'আনে ফিরে এলেন। এসময় বন্ধ্যা স্ত্রী সারাহ্-র গর্ভে ভবিষ্যৎ সন্তান ইসহাক জন্মের সুসংবাদ নিয়ে ফেরেশতাদের শুভাগমন ঘটে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, উক্ত ফেরেশতাগণ ছিলেন হযরত জিবরাঈল, মীকাঈল ও ইসরাফীল। তারা মানুষের রূপ ধারণ করে এসেছিলেন। এ বিষয়ে কুরআনী বক্তব্য নিম্নরূপ:

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيْمَ بِالْبُـــشْرَى قَالُوْا سَلاَماً قَالَ سَلاَمٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ- (هود ٦٩)-

‘আর আমাদের প্রেরিত সংবাদবাহকগণ (অর্থাৎ ফেরেশতাগণ) ইবরাহীমের নিকটে সুসংবাদ নিয়ে এল এবং বলল, সালাম। সেও বলল, সালাম। অতঃপর অল্পক্ষণের মধ্যেই সে একটা ভূণা করা বাছুর এনে (তাদের সম্মুখে) পেশ করল’ *(হূদ ১১/৬৯)*। ‘কিন্তু সে যখন দেখল যে, মেহমানদের হাত সেদিকে প্রসারিত হচ্ছে না, তখন সে সন্দেহে পড়ে গেল ও মনে মনে তাদের সম্পর্কে ভয় অনুভব করতে লাগল (কারণ এটা তখনকার যুগের খুনীদের নীতি ছিল যে, যাকে তারা খুন করতো, তার বাড়ীতে তারা খেত না)। তারা বলল, আপনি ভয় পাবেন না। আমরা লূত্বের কওমের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। তার স্ত্রী (সারা) নিকটেই দাঁড়িয়েছিল, সে হেসে ফেলল। আমরা তাকে ইসহাকের জন্মের সুখবর দিলাম এবং ইসহাকের পরে (তার পুত্র) ইয়াকূবেরও। সে বলল, হায় কপাল! আমি সন্তান প্রসব করব? অথচ আমি বার্ধক্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি। আর আমার স্বামীও বৃদ্ধ। এতো ভারী আশ্চর্য কথা! তারা বলল, আপনি আল্লাহ্র নির্দেশের বিষয়ে আশ্চর্য বোধ করছেন? হে গৃহবাসীগণ! আপনাদের উপরে আল্লাহ্র রহমত ও প্রভূত বরকত রয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রশংসিত ও মহিমময়’ *(হূদ ১১/৭০-৭৩)*। একই ঘটনা আলোচিত হয়েছে সূরা হিজর ৫২-৫৬ ও সূরা যারিয়াত ২৪-৩০ আয়াত সমূহে।

উল্লেখ্য যে, অধিক মেহমানদারীর জন্য ইবরাহীমকে ‘আবুয যায়ফান’ (ابو الضيفان) বা মেহমানদের পিতা বলা হ’ত। এই সময় বিবি সারাহ্র বয়স ছিল অন্যূন ৯০ ও ইবরাহীমের ছিল ১০০ বছর। সারাহ নিজেকে বন্ধ্যা মনে করতেন এবং সেকারণেই সেবিকা হাজেরাকে স্বামীর জন্য উৎসর্গ করেছিলেন ও তাঁর সাথে বিবাহ দিয়েছিলেন সন্তান লাভের জন্য। অথচ সেই ঘরে ইসমাঈল জন্মের পরেও তাকে তার মা সহ মক্কায় নির্বাসনে রেখে আসতে হয় আল্লাহ্র হুকুমে। ফলে সংসার ছিল আগের মতই নিরানন্দময়। কিন্তু আল্লাহ্র কি অপূর্ব লীলা! তিনি শুষ্ক নদীতে বান ডাকাতে পারেন। তাই নিরাশ সংসারে তিনি আশার বন্যা ছুটিয়ে দিলেন। যথাসময়ে ইসহাকের জন্ম হ’ল। যিনি পরে নবী হ’লেন এবং তাঁরই পুত্র ইয়াকূবের বংশধারায় ঈসা পর্যন্ত বিশ্বের

বিভিন্ন প্রান্তে হাযার হাযার নবী প্রেরিত হ'লেন। ফলে হতাশ ও বন্ধ্যা নারী সারাহ এখন কেবল ইসহাকের মা হ'লেন না। বরং তিনি হ'লেন হাযার হাযার নবীর মা বা 'উম্মুল আম্বিয়া' (ام الأنبياء)। ওদিকে মক্কায় ইসমাঈলের বয়স তখন ১৩/১৪ বৎসর। যাকে বলা হয়ে থাকে 'আবুল আরব' (ابو العرب) বা আরব জাতির পিতা।

(২) মৃতকে জীবিত করার দৃশ্য প্রত্যক্ষকরণ :

বন্ধ্যা স্ত্রী সারাহ্র বৃদ্ধ বয়সে সন্তান লাভের মাধ্যমে আল্লাহ যেভাবে তাদের ঈমান বর্ধিত ও মযবূত করেছিলেন। সম্ভবত: তাতে উৎসাহিত হয়ে ইবরাহীম (আঃ) একদিন আল্লাহ্র কাছে দাবী করে বসলেন, আপনি কিভাবে মৃতকে জীবিত করেন, তা আমাকে একটু দেখান, যাতে হৃদয়ে প্রশান্তি আসে। এ বিষয়ে কুরআনী বর্ণনা নিম্নরূপ:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ رَبِّ أَرِنِيْ كَيْفَ تُحْيِـــي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَـــكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيْنَكَ سَعْياً وَاعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ- (البقرة ٢٦٠)-

'আর স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে দেখাও কিভাবে তুমি (ক্বিয়ামতের দিন) মৃতকে জীবিত করবে। আল্লাহ বললেন, তুমি কি বিশ্বাস কর না? (ইবরাহীম) বলল, অবশ্যই করি। কিন্তু দেখতে চাই কেবল এজন্য, যাতে হৃদয়ে প্রশান্তি লাভ করতে পারি। বললেন, তাহ'লে চারটি পাখি ধরে নাও এবং সেগুলিকে নিজের পোষ মানিয়ে নাও। অতঃপর সেগুলোকে (যবেহ করে) সেগুলির দেহের একেকটি অংশ বিভিন্ন পাহাড়ের উপরে রেখে আস। তারপর সেগুলিকে ডাক দাও। (দেখবে) তোমার দিকে দৌড়ে চলে আসবে (উড়তে উড়তে নয়। কেননা তাতে অন্যান্য পাখির সাথে মিশে গিয়ে তোমার দৃষ্টি বিভ্রম ঘটতে পারে যে, সেই চারটি পাখি কোন্ কোন্টি)। জেনে রেখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রান্ত ও জ্ঞানময়' *(বাক্বারাহ ২/২৬০)*।

উপরোক্ত ঘটনার মাধ্যমে আল্লাহ মুশরিক ও নাস্তিক সমাজকে দেখিয়ে দিলেন যে, কিভাবে মাটিতে মিশে যাওয়া মৃত মানুষকে তিনি ক্বিয়ামতের দিন পুনর্জীবন দান করবেন।

(৩) বায়তুল্লাহ নির্মাণঃ

বায়তুল্লাহ প্রথমে ফেরেশতাগণ নির্মাণ করেন। অতঃপর হযরত আদম (আঃ) পুনর্নির্মাণ করেন জিব্রীলের ইঙ্গিত মতে। তারপর নূহের তূফানের সময় বায়তুল্লাহ্র প্রাচীর বিনষ্ট হ'লেও ভিত্তি আগের মতই থেকে যায়। পরবর্তীতে আল্লাহ্র হুকুমে একই ভিত্তিভূমিতে ইবরাহীম তা পুনর্নির্মাণ করেন। এই নির্মাণকালে ইবরাহীম (আঃ) কেন‘আন থেকে মক্কায় এসে বসবাস করেন। ঐ সময় মক্কায় বসতি গড়ে উঠেছিল এবং ইসমাঈল তখন বড় হয়েছেন এবং বাপ-বেটা মিলেই কা‘বা গৃহ নির্মাণ করেন। আল্লাহ্র ইচ্ছায় তখন থেকে অদ্যাবধি কা‘বা গৃহে অবিরত ধারায় হজ্জ ও ত্বাওয়াফ চালু আছে এবং হরম ও তার অধিবাসীগণ পূর্ণ শান্তি, নিরাপত্তা ও মর্যাদা সহকারে সেখানে বসবাস করে আসছেন। এ বিষয়ে কুরআনী বর্ণনা সমূহ নিম্নরূপ:

আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لاَّ تُشْرِكْ بِيْ شَيْئاً وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْقَائِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ- (الحج ٢٦)-

‘আর যখন আমরা ইবরাহীমকে বায়তুল্লাহ্র স্থান ঠিক করে দিয়ে বলেছিলাম যে, আমার সাথে কাউকে শরীক করো না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রাখো তাওয়াফকারীদের জন্য, ছালাতে দণ্ডায়মানদের জন্য ও রুকূ-সিজদাকারীদের জন্য’ *(হজ্জ ২২/২৬)*। আল্লাহ বলেন,

وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ- لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ- (الحج ٢٧-٢٨)-

‘আর তুমি মানুষের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা জারি করে দাও। তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং (দীর্ঘ সফরের কারণে) সর্বপ্রকার কৃশকায় উটের পিঠে সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্ত হ’তে। যাতে তারা তাদের কল্যাণের স্থান পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং (কুরবানীর) নির্দিষ্ট দিনগুলিতে *(১০, ১১, ১২ই যিলহাজ্জ)* তাঁর দেওয়া চতুষ্পদ পশু সমূহ যবেহ করার সময় তাদের উপরে আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করে। অতঃপর তোমরা তা থেকে আহার কর এবং আহার করাও অভাবী ও দুস্থদেরকে’ *(হজ্জ ২২/২৭-২৮)*।

উপরোক্ত আয়াতগুলিতে কয়েকটি বিষয় জানা যায়। যেমন- (১) বায়তুল্লাহ ও তার সন্নিকটে কোনরূপ শিরক করা চলবে না (২) এটি স্রেফ তাওয়াফকারী ও আল্লাহ্‌র ইবাদতকারীদের জন্য নির্দিষ্ট হবে (৩) এখানে কেবল মুমিন সম্প্রদায়কে হজ্জের আদেশ দেওয়া হয়েছে।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) মাক্বামে ইবরাহীমে দাঁড়িয়ে এবং কোন কোন বর্ণনা মতে আবু কুবায়েস পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে দুই কানে আঙ্গুল ভরে সর্বশক্তি দিয়ে উচ্চ কণ্ঠে চারদিকে ফিরে বারবার হজ্জের উক্ত ঘোষণা জারি করেন।

ইমাম বাগাভী হযরত ইবনু আব্বাসের সূত্রে বলেন যে, ইবরাহীমের উক্ত ঘোষণা আল্লাহ পাক সাথে সাথে বিশ্বের সকল প্রান্তে মানুষের কানে কানে পৌঁছে দেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ইবরাহীমী আহ্বানের জওয়াবই হচ্ছে হাজীদের ‘লাব্বায়েক আল্লা-হুম্মা লাব্বায়েক’ (হাযির, হে প্রভু আমি হাযির) বলার আসল ভিত্তি। সেদিন থেকে এযাবত বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত হ’তে মানুষ চলেছে কা‘বার পথে কেউ পায়ে হেঁটে, কেউ উটে, কেউ গাড়ীতে, কেউ বিমানে, কেউ জাহাযে ও কেউ অন্য পরিবহনে করে। আবরাহার মত অনেকে চেষ্টা করেও এ স্রোত কখনো ঠেকাতে পারেনি। পারবেও না কোনদিন ইনশাআল্লাহ। দিন-রাত, শীত-গ্রীষ্ম উপেক্ষা করে সর্বদা চলছে বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ ও ছাফা-মারওয়ার সাঈ। আর হজ্জের পরে চলছে কুরবানী। এভাবে ইবরাহীম ও ইসমাঈলের স্মৃতি চির অম্লান হয়ে আছে মানব ইতিহাসে যুগ যুগ ধরে। এক কালের চাষাবাদহীন বিজন পাহাড়ী উপত্যকা ইবরাহীমের দো‘আর বরকতে হয়ে উঠলো বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের সম্মিলন স্থল হিসাবে। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخِذُوْا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمَاعِيْلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعَاكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ- (البقرة ١٢٥)-

'যখন আমরা কা'বা গৃহকে লোকদের জন্য সম্মিলনস্থল ও শান্তিধামে পরিণত করলাম (আর বললাম,) তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়ানোর স্থানটিকে ছালাতের স্থান হিসাবে গ্রহণ কর। অতঃপর আমরা ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করলাম, তোমরা আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, ই'তেকাফকারী ও রুকূ-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র কর' *(বাক্বারাহ ২/১২৫)*।

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هَـــذَا بَلَداً آمِناً وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيْلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ- (البقرة ١٢٦)-

'(স্মরণ কর) যখন ইবরাহীম বলল, পরওয়ারদেগার! এ স্থানকে তুমি শান্তির নগরীতে পরিণত কর এবং এর অধিবাসীদেরকে তুমি ফল-ফলাদি দ্বারা রূযী দান কর- যারা তাদের মধ্যে আল্লাহ ও ক্বিয়ামত দিবসের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করে। (আল্লাহ) বললেন, যারা অবিশ্বাস করে, আমি তাদেরকেও কিছু ভোগের সুযোগ দেব। অতঃপর তাদেরকে আমি যবরদস্তি জাহান্নামের আযাবে ঠেলে দেব। কতই না মন্দ ঠিকানা সেটা' *(বাক্বারাহ ২/১২৬)*।

ইবরাহীমের উপরোক্ত প্রার্থনা অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে সামান্য শাব্দিক পার্থক্য সহকারে। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هَـــذَا الْبَلَدَ آمِناً وَاجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ أَنْ نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ- رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّيْ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ- (إبراهيم ٣٥-٣٦)-

‘যখন ইবরাহীম বলল, হে আমার পালনকর্তা! এ শহরকে তুমি শান্তিময় করে দাও এবং আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততিকে মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখ’ *(ইবরাহীম ৩৫)*। ‘হে আমার পালনকর্তা! এরা (মূর্তিগুলো) অনেক মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে। অতএব যে আমার অনুসরণ করে, সে আমার দলভুক্ত। আর যে আমার অবাধ্যতা করে, নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল ও দয়াবান’ *(ইবরাহীম ১৪/৩৬)*।

অতঃপর কা‘বা গৃহ নির্মাণ শেষে পিতা-পুত্র মিলে যে প্রার্থনা করেন, তা যেমন ছিল অন্তরভেদী, তেমনি ছিল সুদূরপ্রসারী ফলদায়ক। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيْلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ- رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ- رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ- (البقرة ١٢٧-١٢٩)-

‘স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কা‘বা গৃহের ভিত নির্মাণ করল এবং দো‘আ করল- ‘প্রভু হে! তুমি আমাদের (এই খিদমত) কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ’। ‘হে প্রভু! তুমি আমাদের উভয়কে তোমার আজ্ঞাবহে পরিণত কর এবং আমাদের বংশধরগণের মধ্য থেকেও তোমার প্রতি একটা অনুগত দল সৃষ্টি কর। তুমি আমাদেরকে হজ্জের নীতি-নিয়ম শিখিয়ে দাও এবং আমাদের তওবা কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি তওবা কবুলকারী ও দয়াবান’। ‘হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি এদের মধ্য থেকেই এদের নিকটে একজন রাসূল প্রেরণ কর, যিনি তাদের নিকটে এসে তোমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনাবেন, তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবেন এবং তাদের পবিত্র করবেন। নিশ্চয়ই তুমি পরাক্রমশালী ও দূরদৃষ্টিময়’ *(বাক্বারাহ ২/১২৭-১২৯)*।

ইবরাহীম ও ইসমাঈলের উপরোক্ত দো'আ আল্লাহ কবুল করেছিলেন। যার ফলশ্রুতিতে তাদের বংশে চিরকাল একদল মুত্তাকী পরহেযগার মানুষের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। তাঁদের পরের সকল নবী তাঁদের বংশধর ছিলেন। কা'বার খাদেম হিসাবেও চিরকাল তাদের বংশের একদল দ্বীনদার লোক সর্বদা নিয়োজিত ছিল। কা'বার খেদমতের কারণেই তাদের সম্মান ও মর্যাদা সারা আরবে এমনকি আরবের বাইরেও বিস্তার লাভ করেছিল। আজও সঊদী বাদশাহদের লক্বব হ'ল 'খাদেমুল হারামায়েন আশ-শারীফায়েন' (দুই পবিত্র হরমের সেবক)। কেননা বাদশাহীতে নয়, হারামায়েন-এর সেবক হওয়াতেই গৌরব বেশী।

ইবরাহীমের দো'আর ফসল হিসাবেই মক্কায় আগমন করেন বিশ্বনবী ও শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)। তিনি বলতেন, أَنَا دَعْوَةُ أَبِيْ إِبْرَاهِيْمَ وَبُشْرَى عِيْسَى– 'আমি আমার পিতা ইবরাহীমের দো'আর ফসল ও ঈসার সুসংবাদ'।[১০৪]

এই মহানগরীটি সেই ইবরাহীমী যুগ থেকেই নিরাপদ ও কল্যাণময় নগরী হিসাবে অদ্যাবধি তার মর্যাদা বজায় রেখেছে। জাহেলী আরবরাও সর্বদা একে সম্মান ও মর্যাদার চোখে দেখত। এমনকি কোন হত্যাকারী এমনকি কোন পিতৃহন্তাও এখানে এসে আশ্রয় নিলে তারা তার প্রতিশোধ নিত না। হরমের সাথে সাথে এখানকার অধিবাসীরাও সর্বত্র সমাদৃত হ'তেন এবং আজও হয়ে থাকেন।

পরীক্ষা সমূহের মূল্যায়ন :

ইবরাহীমের পরীক্ষা সমূহ তাঁর যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য ছিল না বা তাঁর কোন অপরাধের সাজা হিসাবে ছিল না। বরং এর উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে লালন করে পূর্ণত্বের মহান স্তরে পৌছে দেওয়া এবং তাঁকে আগামী দিনে বিশ্বনেতার মর্যাদায় সমাসীন করা। সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে এটা দেখিয়ে দেওয়া যে, আল্লাহ্র নিকটে প্রিয় ও সম্মানিত বান্দাগণকে দুনিয়াতে

১০৪. আহমাদ ও ছহীহ ইবনে হিব্বান, সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৫৪৫।

বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে হয়। আল্লাহ্র সুন্দর গুণাবলীর মধ্যে رَبُّهُ ('তার পালনকর্তা') গুণটিকে খাছ করে বলার মধ্যে স্বীয় বন্ধুর প্রতি স্নেহ ও তাকে বিশেষ অনুগ্রহে লালন করার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। এক্ষণে তাঁর পরীক্ষার সংখ্যা কত ছিল সে বিষয়ে কুরআন নির্দিষ্টভাবে কিছু উল্লেখ করেনি। কেবল বলেছে, بِكَلِمَاتٍ 'অনেকগুলি বাণী দ্বারা' *(বাক্বারাহ ২/১২৪)*। অর্থাৎ শরী'আতের বহুবিধ আদেশ ও নিষেধ সমূহ দ্বারা। 'কালেমাত' শব্দটি বিবি মারিয়ামের জন্যেও ব্যবহৃত হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে, وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا 'মারিয়াম তার পালনকর্তার বাণী সমূহকে সত্যে পরিণত করেছিল' *(তাহরীম ৬৬/১২)*।

ইবরাহীমের জীবনে পরীক্ষার সংখ্যা কত ছিল এরূপ এক প্রশ্নের জবাবে ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ইসলামের ৩০টি অংশ রয়েছে। যার ১০টি সূরা তওবায় *(১১২ আয়াতে)*, ১০টি সূরা মুমিনূনে *(১-৯ আয়াতে)* ও সূরা মা'আরিজে *(২২-৩৪ আয়াতে)* এবং বাকী ১০টি সূরা আহযাবে *(৩৫ আয়াতে)* বর্ণিত হয়েছে। যার সব ক'টি ইবরাহীম (আঃ) পূর্ণ করেন। অতঃপর আল্লাহ তাকে সনদ দিয়ে বলেন, وَإِبْرَاهِيْمَ الَّذِىْ وَفَّى 'এবং ইবরাহীমের ছহীফায়, যিনি (আনুগত্যের অঙ্গীকার) পূর্ণ করেছিলেন' *(নাজম ৫৩/৩৭)*।[১০৫] তবে ইবনু জারীর ও ইবনু কাছীর উভয়ে বলেন, ইবরাহীমের জীবনে যত সংখ্যক পরীক্ষাই আসুক না কেন আল্লাহ বর্ণিত 'কালেমাত' বহু বচনের শব্দটি সবকিছুকে শামিল করে' *(ইবনু কাছীর)*।

বস্তুতঃ পরীক্ষা সমূহের সংখ্যা বর্ণনা করা কিংবা ইবরাহীমের সুক্ষ্মদর্শিতা ও জ্ঞানের গভীরতা যাচাই করা এখানে মুখ্য বিষয় নয়, বরং আল্লাহ্র প্রতি তাঁর আনুগত্যশীলতা ও নিখাদ আত্মসমর্পণ এবং কার্যক্ষেত্রে তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা যাচাই করাই ছিল মুখ্য বিষয়।

---

১০৫. হাকেম ২/৫৫২ সনদ ছহীহ; তাফসীর ইবনে কাছীর, বাক্বারাহ ১১৪-এর টীকা দ্রষ্টব্য।

শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ :

(১) ইবরাহীমী জীবন থেকে প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় হ'ল সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র নিকটে আত্মসমর্পণ। যাকে বলা হয় 'ইসলাম'। যেমন আল্লাহ বলেন,

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيْمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ- (البقرة ١٣١-١٣٢)-

'স্মরণ কর যখন তাকে তার পালনকর্তা বললেন, তুমি আত্মসমর্পণ কর। তখন সে বলল, আমি আত্মসমর্পণ করলাম বিশ্ব চরাচরের প্রতিপালকের নিকট'। 'এবং একই বিষয়ে সন্তানদেরকে অছিয়ত করে যান ইবরাহীম ও ইয়াকূব' *(বাক্বারাহ ২/১৩১-৩২)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, مَا كَانَ إِبْرَاهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَلاَ نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا- (آل عمران ٦٧)- 'ইবরাহীম ইহুদী বা নাছারা ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন একনিষ্ঠরূপে 'মুসলিম' বা আত্মসমর্পিত' (*আলে ইমরান ৩/৬৭*)।

অতএব ইহুদী, নাছারা ইত্যাদি দলীয় রং দিয়ে তাঁকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করা বাতুলতা মাত্র। বরং তিনি ছিলেন নিখাদ আল্লাহ প্রেমিক। আর সেকারণ সকল আল্লাহভীরু মানুষের তিনি নেতা ছিলেন।

(২) আল্লাহ্র কাছে বড় হ'তে গেলে তাকে আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই বড় বড় পরীক্ষায় ফেলা হয়। আর তাতে উত্তীর্ণ হওয়ার মধ্যেই থাকে ইহকালীন ও পরকালীন সফলতা।

(৩) পরীক্ষা এলে সাহসিকতার সাথে মুকাবিলা করতে হয়। শয়তানী প্ররোচনায় পিছিয়ে গেলেই ব্যর্থ হ'তে হয়। যেমন পুত্র যবহের পূর্বে শয়তানী ধোঁকার বিরুদ্ধে ইবরাহীম (আঃ) কংকর নিক্ষেপ করেছিলেন ও পরে সফলকাম হয়েছিলেন।

উপসংহার :

ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রায় দু'শো বছরের পুরা জীবনটাই ছিল পরীক্ষার জীবন। সুখে-দুখে, আনন্দে-বিষাদে সর্বাবস্থায় তিনি ছিলেন আল্লাহ্র উপরে একান্ত নির্ভরশীল। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রশক্তির বিরোধিতা তাঁকে তাঁর বিশ্বাস থেকে এক চুল টলাতে পারেনি। অবশেষে জন্মভূমি ত্যাগ করে হিজরত করে আসতেও তিনি পিছপা হননি। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনায় বৃদ্ধ বয়সের নয়নের মণি একমাত্র শিশু পুত্রকে তার মা সহ মক্কার বিজনভূমিতে নির্বাসনে দিয়ে আসতেও তাঁর হৃদয় টলেনি। অবশেষে ঐ সন্তানকে যবেহ করার মত কঠিনতম উদ্যোগ নিতেও তাঁর হাত কেঁপে ওঠেনি। এভাবে জীবনভর অগণিত পরীক্ষার চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে পূর্ণ-পরিণত ইবরাহীম পেলেন 'বিশ্বনেতা' হবার মত বিরল দুনিয়াবী পুরস্কারের মহান এলাহী ঘোষণা। হ'লেন ভবিষ্যৎ নবীগণের পিতা 'আবুল আম্বিয়া' এবং মিল্লাতে ইসলামিয়াহ্র নেতা হবার মত দুর্লভ সম্মান। আজও যদি পৃথিবীর দিকে দিকে ইবরাহীমী ঈমানের জ্যোতি বিকীরিত হয়, আবার মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে সে ঈমান ফিরে আসে, তবে বর্তমান অশান্ত পৃথিবীর নমরূদী হুতাশন আবারও পুষ্পকাননে পরিণত হবে ইনশাআল্লাহ। ইকবাল তাই গেয়েছেন,

اگر هو پهر ابراهيم كا ايماں پيدا

آگ كرسكتي هے پهر انداز گلستاں پيدا

'বিশ্বে যদি সৃষ্টি হয় ফের ইবরাহিমী ঈমান

হুতাশনে তবে সৃষ্টি হবে ফের পুষ্পের কানন'॥

Contents

৭. হযরত লূত *(আলাইহিস সালাম)*

হযরত লূত (আঃ) ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ভাতিজা। চাচার সাথে তিনিও জন্মভূমি ‘বাবেল’ শহর থেকে হিজরত করে বায়তুল মুক্বাদ্দাসের অদূরে কেন‘আনে চলে আসেন। আল্লাহ লূত (আঃ)-কে নবুঅত দান করেন এবং কেন‘আন থেকে অল্প দূরে জর্ডান ও বায়তুল মুক্বাদ্দাসের মধ্যবর্তী ‘সাদূম’ অঞ্চলের অধিবাসীদের পথ প্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করেন। এ এলাকায় সাদূম, আমূরা, দূমা, ছা‘বাহ ও ছা‘ওয়াহ [১০৬] নামে বড় বড় পাঁচটি শহর ছিল। কুরআন মজীদ বিভিন্ন স্থানে এদের সমষ্টিকে ‘মু’তাফেকাহ’ *(নাজম ৫৩/৫৩)* বা ‘মু’তাফেকাত’ *(তওবাহ ৯/৭০, হাক্বক্বাহ ৬৯/৯)* শব্দে বর্ণনা করেছে। যার অর্থ ‘জনপদ উল্টানো শহরগুলি’। এ পাঁচটি শহরের মধ্যে সাদূম (سدوم) ছিল সবচেয়ে বড় এবং সাদূমকেই রাজধানী মনে করা হ’ত। হযরত লূত (আঃ) এখানেই অবস্থান করতেন। এখানকার ভূমি ছিল উর্বর ও শস্য-শ্যামল। এখানে সর্বপ্রকার শস্য ও ফলের প্রাচুর্য ছিল। এসব ঐতিহাসিক তথ্য বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। ‘সাদূম’ সম্পর্কে সকলে একমত। বাকী শহরগুলির নাম কি, সেগুলির সংখ্যা তিনটি, চারটি না ছয়টি, সেগুলিতে বসবাসকারী লোকজনের সংখ্যা কয়শত, কয় হাযার বা কয় লাখ ছিল, সেসব বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। এগুলি ইস্রাঈলী বর্ণনা, যা কেবল ইতিহাসের বস্তু হিসাবে গ্রহণ করা যায়। কুরআন ও হাদীছে শুধু মূল বিষয়বস্তুর বর্ণনা এসেছে, যা মানবজাতির জন্য শিক্ষণীয়।

উল্লেখ্য যে, লূত (আঃ) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ১৫টি সূরায় ৮৭টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।[১০৭]

---

১০৬. কুরতুবী, ইবনু কাছীর, হূদ ৮৩।

১০৭. যথাক্রমে সূরা আ‘রাফ ৭/৮০-৮৪=৫; তওবাহ ৯/৭০; হূদ ১১/৭০, ৭৪, ৭৬-৮৩=৮; ৮৯; হিজর ১৫/৫৮-৭৭=২০; আম্বিয়া ২১/৭৪-৭৫; হজ্জ ২২/৪৩; শো‘আরা ২৬/১৬০-১৭৫=১৬; নমল ২৭/৫৪-৫৮=৫; আনকাবূত ২৯/৩১-৩৫=৫; ছাফফাত ৩৭/১৩৩-১৩৮=৬; ছোয়াদ ৩৮/১৩-১৫=৩; ক্বাফ ৫০/১৩-১৪; যারিয়াত ৫১/৩১-৩৭=৭; তাহরীম ৬৬/১০; হা-ক্বক্বাহ ৬৯/৯-১০। সর্বমোট = ৮৭টি ॥

লূত (আঃ)-এর দাওয়াত :

লূত (আঃ)-এর কওম আল্লাহ্র ইবাদত ছেড়ে শিরক ও কুফরীতে লিপ্ত হয়েছিল। দুনিয়াবী উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত হওয়ার কারণে তারা সীমা লঙ্ঘনকারী জাতিতে পরিণত হয়েছিল। পূর্বেকার ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলির ন্যায় তারা চূড়ান্ত বিলাস-ব্যসনে গা ভাসিয়ে দিয়েছিল। অন্যায়-অনাচার ও নানাবিধ দুষ্কর্ম তাদের মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। এমনকি পুংমৈথুন বা সমকামিতার মত নোংরামিতে তারা লিপ্ত হয়েছিল, যা ইতিপূর্বেকার কোন জাতির মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়নি। জন্তু-জানোয়ারের চেয়ে নিকৃষ্ট ও হঠকারী এই কওমের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ লূত (আঃ)-কে প্রেরণ করলেন। কুরআনে লূতকে 'তাদের ভাই' *(শো'আরা ২৬/১৬১)* বলা হ'লেও তিনি ছিলেন সেখানে মুহাজির। নবী ও উম্মতের সম্পর্কের কারণে তাঁকে 'তাদের ভাই' বলা হয়েছে। তিনি এসে পূর্বেকার নবীগণের ন্যায় প্রথমে তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিয়ে বললেন,

إِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ أَمِيْنٌ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيْعُوْنِ، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، (الشعراء ١٦٢-١٦٤)-

'আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত রাসূল। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি এর জন্য তোমাদের নিকটে কোনরূপ প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্বপ্রভু আল্লাহ দিবেন' *(শো'আরা ২৬/১৬২-১৬৫)*। অতঃপর তিনি তাদের বদভ্যাসের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, أَتَأْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِيْنَ- 'বিশ্ববাসীর মধ্যে কেন তোমরাই কেবল পুরুষদের নিকটে (কুকর্মের উদ্দেশ্যে- *আ'রাফ ৭/৮১*) এসে থাক'? 'আর তোমাদের স্ত্রীগণকে বর্জন কর, যাদেরকে তোমাদের জন্য তোমাদের পালনকর্তা সৃষ্টি করেছেন? নিঃসন্দেহে তোমরা সীমা লঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়' *(শো'আরা ২৬/১৬৫-১৬৬)*। জবাবে কওমের নেতারা বলল,

لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَا لُوْطُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ، قَالَ إِنِّيْ لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِيْنَ- (الشعراء ١٦٧-١٦٨)-

‘হে লূত! যদি তুমি (এসব কথাবার্তা থেকে) বিরত না হও, তাহ’লে তুমি অবশ্যই বহিষ্কৃত হবে’। তিনি বললেন, ‘আমি তোমাদের এইসব কাজকে ঘৃণা করি’ *(শো‘আরা ২৬/১৬৭-১৬৮)*। তিনি তাদের তিনটি প্রধান নোংরামির কথা উল্লেখ করে বলেন,

وَلُوْطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ وَتَأْتُوْنَ فِيْ نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ، قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ- (العنكبوت ٢٨-٣٠)-

‘তোমরা এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে পৃথিবীর কেউ কখনো করেনি’। ‘তোমরা কি পুংমৈথুনে লিপ্ত আছ, রাহাজানি করছ এবং নিজেদের মজলিসে প্রকাশ্যে গর্হিত কর্ম করছ’? জবাবে তাঁর সম্প্রদায় কেবল একথা বলল যে, আমাদের উপরে আল্লাহ্র গযব নিয়ে এসো, যদি তুমি সত্যবাদী হও’। তিনি তখন বললেন, ‘হে আমার পালনকর্তা! এই দুষ্কৃতিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তুমি আমাকে সাহায্য কর’ *(আনকাবূত ২৯/২৮-৩০; আ‘রাফ ৭/৮০)*।

লূত (আঃ)-এর দাওয়াতের ফলশ্রুতি :

নিজ কওমের প্রতি হযরত লূত (আঃ)-এর দাওয়াতের ফলশ্রুতি মর্মান্তিক রূপে প্রতিভাত হয়। তারা এতই হঠকারী ও নিজেদের পাপকর্মে অন্ধ ও নির্লজ্জ ছিল যে, তাদের কেবল একটাই জবাব ছিল, তুমি যে গযবের ভয় দেখাচ্ছ, তা নিয়ে আস দেখি? কিন্তু কোন নবীই স্বীয় কওমের ধ্বংস চান না। তাই তিনি ছবর করেন ও তাদেরকে বারবার উপদেশ দিতে থাকেন। তখন তারা অধৈর্য হয়ে বলে যে,-أَخْرِجُوْهُم مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ- ‘এদেরকে তোমাদের শহর থেকে বের করে দাও। এই লোকগুলি সর্বদা পবিত্র থাকতে চায়’ *(আ‘রাফ ৭/৮২; নমল ২৭/৫৬)*। তারা আল্লাহভীতি থেকে বেপরওয়া হয়ে অসংখ্য পাপকর্মে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। কুরআন তাদের তিনটি প্রধান পাপ কর্মের উল্লেখ করেছে। (১) পুংমৈথুন (২) রাহাজানি এবং (৩) প্রকাশ্য মজলিসে কুকর্ম করা *(আনকাবূত ২৯/২৯)*।

বলা বাহুল্য, সাদূমবাসীদের পূর্বে পৃথিবীতে কখনো এরূপ কুকর্ম কেউ করেছে বলে শোনা যায়নি। এমনকি অতি বড় মন্দ ও নোংরা লোকদের মধ্যেও কখনো এরূপ নিকৃষ্টতম চিন্তার উদ্রেক হয়নি। উমাইয়া খলীফা অলীদ ইবনে আবদুল মালেক *(৮৬-৯৭/৭০৫-৭১৬ খৃঃ)* বলেন, কুরআনে লূত (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের ঘটনা উল্লেখ না থাকলে আমি কল্পনাও করতে পারতাম না যে, কোন মানুষ এরূপ নোংরা কাজ করতে পারে'।[১০৮] তাদের এই দুষ্কর্মের বিষয়টি দু'টি কারণে ছিল তুলনাহীন। এক- এ কুকর্মের কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত ছিল না এবং একাজ সম্পূর্ণ নতুনভাবে তারা চালু করেছিল। দুই- এ কুকর্ম তারা প্রকাশ্য মজলিসে করত, যা ছিল বেহায়াপনার চূড়ান্ত রূপ।

বস্তুতঃ মানুষ যখন দেখে যে, সে কারু মুখাপেক্ষী নয়, তখন সে বেপরওয়া হয়' *(আলাক্ব ৯৬/৬-৭)*। সাদূমবাসীদের জন্য আল্লাহ স্বীয় নে'মত সমূহের দুয়ার খুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা তার শুকরিয়া আদায় না করে কুফরী করে এবং ধনৈশ্বর্যের নেশায় মত্ত হয়ে বিলাস-ব্যসন, কাম-প্রবৃত্তি ও লোভ-লালসার জালে এমনভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়ে যে, লজ্জা-শরম ও ভাল-মন্দের স্বভাবজাত পার্থক্যবোধটুকুও তারা হারিয়ে ফেলে। তারা এমন প্রকৃতি বিরুদ্ধ নির্লজ্জ কাজে লিপ্ত হয়, যা হারাম ও কবীরা গোনাহ তো বটেই, কুকুর-শূকরের মত নিকৃষ্ট জন্তু-জানোয়ারও এর নিকটবর্তী হয় না। তারা এমন বদ্ধ নেশায় মত্ত হয় যে, লূত (আঃ)-এর উপদেশবাণী ও আল্লাহ্র গযবের ভীতি প্রদর্শন তাদের হৃদয়ে কোন রেখাপাত করেনি। উল্টা তারা তাদের নবীকেই শহর থেকে বের করে দেবার হুমকি দেয় এবং বলে যে, 'তোমার প্রতিশ্রুত আযাব এনে দেখাও, যদি তুমি সত্যবাদী হও' *(আনকাবূত ২৯/২৯)*। তখন লূত (আঃ) বিফল মনোরথ হয়ে আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করলেন। ফলে যথারীতি গযব নেমে এল। উল্লেখ্য যে, বর্তমান বিশ্বে মহামারী আকারে যে মরণ ব্যাধি এইড্সের বিস্তৃতি ঘটেছে, তার মূল কারণ হ'ল পুংমৈথুন, পায়ু মৈথুন ও সমকামিতা। ইসলামী শরী'আতে এই কুকর্মের একমাত্র শাস্তি হ'ল উভয়ের মৃত্যুদণ্ড (যদি উভয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে একাজ করে)।[১০৯]

---

১০৮. তাফসীরে ইবনে কাছীর, আ'রাফ ৮০।

১০৯. তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত, সনদ হাসান হা/৩৫৭৫ 'দণ্ডবিধি সমূহ' অধ্যায়।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ملعونٌ منْ عَمِلَ عَمَلَ قومِ لوط অভিশপ্ত ঐ ব্যক্তি, যে লূতের কওমের মত কুকর্ম করে।[১১০] অন্যত্র তিনি বলেন, لاينظرُ اللهُ عزَّ وجلَّ إِلى رجلٍ أتى رجُلاً أو امرأةً فى دُبرها আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির প্রতি ফিরে তাকাবেন না, যে ব্যক্তি কোন পুরুষ বা নারীর মলদ্বারে মৈথুন করে'।[১১১] তিনি বলেন, إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِى عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ আমি আমার উম্মতের জন্য সবচেয়ে (ক্ষতিকর হিসাবে) ভয় পাই লূত জাতির কুকর্মের'।[১১২] এইড্সের আতংকে ভয়ার্ত মানবজাতি শেষনবীর উক্ত বাণীগুলির প্রতি দৃষ্টি দিবে কি?

গযবের বিবরণ :

আল্লাহ্র হুকুমে কয়েকজন ফেরেশতা মানুষের রূপ ধারণ করে প্রথমে হযরত ইবরাহীমের বাড়ীতে পদার্পণ করলেন। তিনি তাদেরকে মেহমানদারীর জন্য একটা আস্ত বাছুর গরু যবেহ করে ভুনা করে তাদের সামনে পরিবেশন করলেন। কিন্তু তারা তাতে হাত দিলেন না। এতে ইবরাহীম (আঃ) ভয় পেয়ে গেলেন *(হূদ ১১/৬৯-৭০)*। কেননা এটা ঐ সময়কার দস্যু-ডাকাতদেরই স্বভাব ছিল যে, তারা যে বাড়ীতে ডাকাতি করত বা যাকে খুন করতে চাইত, তার বাড়ীতে খেত না। ফেরেশতাগণ নবীকে অভয় দিয়ে নিজেদের পরিচয় দিয়ে বললেন, 'আমরা এসেছি অমুক শহরগুলি ধ্বংস করে দিতে। ইবরাহীম একথা শুনে তাদের সাথে 'তর্ক জুড়ে দিলেন' *(হূদ ১১/৭৪)* এবং বললেন, 'সেখানে যে লূত আছে। তারা বললেন, সেখানে কারা আছে, আমরা তা ভালভাবেই জানি। আমরা অবশ্যই তাকে ও তার পরিবারকে রক্ষা করব, তবে তাঁর স্ত্রী ব্যতীত। সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আনকাবূত ২৯/৩১-৩২)*। অতঃপর তারা ইবরাহীম দম্পতিকে ইসহাক-এর জন্মের সুসংবাদ শুনালেন।

---

১১০. রাযীন, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৩৫৮৩।

১১১. তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৫৮৫।

১১২. তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৫৭৭।

বিবি সারা ছিলেন নিঃসন্তান। অতি বৃদ্ধ বয়সে এই সময় তাঁকে হযরত ইসহাকের জন্মের সুসংবাদ দেওয়া হয়। শুধু তাই নয় ইসহাকের পরে তার ঔরসে যে ইয়াকূবের জন্ম হবে সেটাও জানিয়ে দেওয়া হ'ল *(হূদ ১১/৭১-৭২)*। উল্লেখ্য যে, ইয়াকূবের অপর নাম ছিল 'ইস্রাঈল' এবং তাঁর বংশধরগণকে বনু ইস্রাঈল বলা হয়। যে বংশে হাযার হাযার নবীর আগমন ঘটে।

কেন'আনে ইবরাহীম (আঃ)-এর নিকট থেকে বিদায় হয়ে ফেরেশতাগণ সাদূম নগরীতে 'লূত (আঃ)-এর গৃহে উপস্থিত হ'লেন' *(হিজর ১৫/৬১)*। এ সময় তাঁরা অনিন্দ্য সুন্দর নওজোয়ান রূপে আবির্ভূত হন। কেননা আল্লাহ তা'আলা যখন কোন জাতিকে ধ্বংস করেন, তখন শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাদের পরীক্ষা নেন। সাদূম জাতি তাদের এই চূড়ান্ত পরীক্ষায় ব্যর্থকাম হ'ল। তারা যখন জানতে পারল যে, লূত-এর বাড়ীতে অতীব সুদর্শন কয়েকজন নওজোয়ান এসেছে, 'তখন তারা খুশীতে আত্মহারা হয়ে সেদিকে ছুটে এল' *(হূদ ১১/৭৮)*। এ দৃশ্য দেখে লূত (আঃ) তাদেরকে অনুরোধ করে বললেন, فَاتَّقُوا اللهَ وَلاَ تُخْزُوْنِ فِيْ ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيْدٌ– 'তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। অতিথিদের ব্যাপারে তোমরা আমাকে লজ্জিত করো না। তোমাদের মধ্যে কি একজনও ভাল মানুষ নেই'? *(হূদ ১১/৭৮)*। কিন্তু তারা কোন কথাই শুনলো না। তারা দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢোকার উপক্রম করল। লূত (আঃ) বললেন, হায়! وَقَالَ هَـــذَا يَوْمٌ عَصِيْبٌ– 'আজকে আমার জন্য বড়ই সংকটময় দিন' *(হূদ ১১/৭৭)*। তিনি বললেন, لَوْ أَنَّ لِيْ بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيْدٍ– 'হায়! যদি তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোন শক্তি থাকত, অথবা আমি কোন সুদৃঢ় আশ্রয় পেতাম' *(হূদ ১১/৮০)*। এবার ফেরেশতাগণ আত্মপরিচয় দিলেন এবং লূতকে অভয় দিয়ে বললেন, يَا لُوْطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَّصِلُوْا إِلَيْكَ 'হে লূত! আমরা আপনার প্রভুর প্রেরিত ফেরেশতা। ওরা কখনোই আপনার নিকটে পৌঁছতে পারবে না' *(হূদ ১১/৮১)*।

এজন্যেই আমাদের রাসূল (ছাঃ) বলেন, يَرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا ، لَقَدْ كَانَ يَأْوِى إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ 'আল্লাহ রহম করুন লূতের উপরে, তিনি সুদৃঢ় আশ্রয় প্রার্থনা

করেছিলেন' (অর্থাৎ আল্লাহ্র আশ্রয়)।[১১৩] অতঃপর জিবরীল তাদের দিকে পাখার ঝাপটা মারতেই বীর পুঙ্গরেরা সব অন্ধ হয়ে ভেগে গেল। আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ رَاوَدُوْهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِيْ وَنُذُرِ 'ওরা লূতের কাছে তার মেহমানদের দাবী করেছিল। তখন আমি তাদের দৃষ্টি বিলুপ্ত করে দিলাম। অতএব আস্বাদন কর আমার শাস্তি ও হুঁশিয়ারী' *(ক্বামার ৫৪/৩৭)*।

অতঃপর ফেরেশতাগণ হযরত লূত (আঃ)-কে স্বীয় পরিবারবর্গসহ *(ক্বামার ৫৪/৩৪)* 'কিছু রাত থাকতেই' এলাকা ত্যাগ করতে বললেন এবং বলে দিলেন যেন 'কেউ পিছন ফিরে না দেখে। তবে আপনার বৃদ্ধা স্ত্রী ব্যতীত'। নিশ্চয়ই তার উপর ঐ গযব আপতিত হবে, যা ওদের উপরে হবে। ভোর পর্যন্তই ওদের মেয়াদ। ভোর কি খুব নিকটে নয়'? *(হূদ ১১/৮১; শো'আরা ২৬/১৭১)*। লূত (আঃ)-এর স্ত্রী ঈমান আনেননি এবং হয়তবা স্বামীর সঙ্গে রওয়ানাই হননি। তারা আরও বললেন, وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوْا حَيْثُ تُؤْمَرُوْنَ– 'আপনি তাদের পিছে অনুসরণ করুন। আর কেউ যেন পিছন ফিরে না তাকায়। আপনারা আপনাদের নির্দেশিত স্থানে চলে যান' *(হিজর ১৫/৬৫)*। এখানে আল্লাহ লূতকে হিজরতকারী দলের পিছনে থাকতে বলা হয়েছে। বস্তুতঃ এটাই হ'ল নেতার কর্তব্য।

অতঃপর আল্লাহ্র হুকুমে অতি প্রত্যুষে গযব কার্যকর হয়। লূত ও তাঁর সাথীগণ যখন নিরাপদ দূরত্বে পৌছেন, তখন জিবরীল (আঃ) আল্লাহ্র নির্দেশ পাওয়া মাত্র ছুবহে ছাদিক-এর সময় একটি প্রচণ্ড নিনাদের মাধ্যমে তাদের শহরগুলিকে উপরে উঠিয়ে উপুড় করে ফেলে দিলেন এবং সাথে সাথে প্রবল বেগে ঘুর্ণিবায়ুর সাথে প্রস্তর বর্ষণ শুরু হয়। যেমন আল্লাহ বলেন,

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ بِبَعِيدٍ– (هود ٨٢–٨٣)–

---

১১৩. *বুখারী হা/৩১৩৫; মুসলিম হা/২১৬; মিশকাত হা/৫৭০৫ 'ক্বিয়ামতের অবস্থা' অধ্যায়, 'সৃষ্টির সূচনা ও নবীগণের আলোচনা' অনুচ্ছেদ।*

‘অবশেষে যখন আমাদের হুকুম এসে পৌঁছল, তখন আমরা উক্ত জনপদের উপরকে নীচে করে দিলাম এবং তার উপরে ক্রমাগত ধারায় মেটেল প্রস্তর বর্ষণ করলাম’। ‘যার প্রতিটি তোমার প্রভুর নিকটে চিহ্নিত ছিল। আর ঐ ধ্বংসস্থলটি (বর্তমান আরবীয়) যালেমদের থেকে বেশী দূরে নয়’ *(হূদ ১১/৮২-৮৩)*।

এটা ছিল তাদের কুকর্মের সাথে সামঞ্জস্যশীল শাস্তি। কেননা তারা যেমন আল্লাহ্র আইন ও প্রাকৃতিক বিধানকে উল্টিয়েছিল অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গ বাদ দিয়ে মানুষের স্বভাববিরুদ্ধ ভাবে পুংমৈথুনে ও সমকামিতায় লিপ্ত হয়েছিল, ঠিক তেমনি তাদেরকে মাটি উল্টিয়ে উপুড় করে শাস্তি দেওয়া হ’ল।

ডঃ জামু বলেন, তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন আকারের এক হাযার উল্কাপিণ্ড সংগ্রহ করেন। তন্মধ্যে সবচেয়ে বড়টির ওযন ছিল ৩৬ টন। এর মধ্যে অনেকগুলি আছে নুড়ি পাথর, যাতে গ্রানাইট ও কাঁচা অক্সাইড লৌহ মিশ্রিত। তাতে লাল বর্ণের চিহ্ন অংকিত ছিল এবং ছিল তীব্র মর্মভেদী। বিস্তর গবেষণার পরে স্থির হয় যে, এগুলি সেই প্রস্তর, যা লূত জাতির উপরে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল’ (সংক্ষেপায়িত)।[১১৪] ইতিহাস-বিজ্ঞান বলে, সাদূম ও আমুরার উপরে গন্ধক (Sulpher)-এর আগুন বর্ষিত হয়েছিল।[১১৫]

হযরত লূত (আঃ)-এর নাফরমান কওমের শোচনীয় পরিণতি বর্ণনা করার পর দুনিয়ার অপরাপর জাতিকে সতর্ক করার জন্য আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, وَمَا هِيَ مِنَ الظَّٰلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ ‘(জনপদ উল্টানো ও প্রস্তর বর্ষণে নিশ্চিহ্ন ঐ ধ্বংসস্থলটি) বর্তমান কালের যালেমদের থেকে খুব বেশী দূরে নয়’ *(হূদ ১১/৮৩)*। মক্কার কাফেরদের জন্য উক্ত ঘটনাস্থল ও ঘটনার সময়কাল খুব বেশী দূরের ছিল না। মক্কা থেকে ব্যবসায়িক সফরে সিরিয়া যাতায়াতের পথে সর্বদা সেগুলো তাদের চোখে পড়ত। কিন্তু তা থেকে তারা শিক্ষা গ্রহণ করতো না। বরং শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে অবিশ্বাস করত ও তাঁকে অমানুষিক কষ্ট দিত। আনাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

---

১১৪. মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, স্রষ্টা ও সৃষ্টিতত্ত্ব পৃঃ ২৫৬।
১১৫. স্রষ্টা ও সৃষ্টিতত্ত্ব, পৃঃ ২৫৮।

إذا استحلت أمتي خمسا فعليهم الدمار: إذا ظهر التلاعن وشربوا الخمور ولبسوا الحرير واتخذوا القيان واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، رواه البيهقي–

‘যখন আমার উম্মত পাঁচটি বিষয়কে হালাল করে নেবে, তখন তাদের উপর ধ্বংস নেমে আসবে। (১) যখন পরস্পরে অভিসম্পাৎ ব্যাপক হবে (২) যখন তারা মদ্যপান করবে (৩) রেশমের কাপড় পরিধান করবে (৪) গায়িকা-নর্তকী গ্রহণ করবে (৫) পুরুষ-পুরুষে ও নারী-নারীতে সমকামিতা করবে’।[১১৬]

ধ্বংসস্থলের বিবরণ :

কওমে লূত-এর বর্ণিত ধ্বংসস্থলটি বর্তমানে ‘বাহরে মাইয়েত’ বা ‘বাহরে লূত’ অর্থাৎ ‘মৃত সাগর’ বা ‘লূত সাগর’ নামে খ্যাত। যা ফিলিস্তীন ও জর্ডান নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে বিশাল অঞ্চল জুড়ে নদীর রূপ ধারণ করে আছে।[১১৭] যেটি সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে বেশ নীচু। এর পানিতে তৈলজাতীয় পদার্থ বেশী। এতে কোন মাছ, ব্যাঙ এমনকি কোন জলজ প্রাণী বেঁচে থাকতে পারে না। এ কারণেই একে ‘মৃত সাগর’ বা ‘মরু সাগর’ বলা হয়েছে। সাদূম উপসাগর বেষ্টক এলাকায় এক প্রকার অপরিচিত বৃক্ষ ও উদ্ভিদের বীজ পাওয়া যায়, সেগুলো মাটির স্তরে স্তরে সমাধিস্থ হয়ে আছে। সেখানে শ্যামল-তাজা উদ্ভিদ পাওয়া যায়, যার ফল কাটলে তার মধ্যে পাওয়া যায় ধূলি-বালি ও ছাই। এখানকার মাটিতে প্রচুর পরিমাণে গন্ধক পাওয়া যায়। Natron ও পেট্রোল তো আছেই। এই গন্ধক উল্কা পতনের অকাট্য প্রমাণ।[১১৮] আজকাল সেখানে সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পক্ষ হ’তে পর্যটকদের জন্য আশপাশে কিছু হোটেল-রেস্তোঁরা গড়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু এ ঘটনা থেকে শিক্ষা হাছিলের জন্য কুরআনী তথ্যাদি উপস্থাপন করে বিভিন্ন ভাষায় উক্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ

---

১১৬. *বায়হাক্বী, শু‘আবুল ঈমান, ত্বাবারানী, সনদ হাসান; আলবানী, ছহীহুত তারগীব হা/২৩৮৬।*

১১৭. *সর্বশেষ হিসাব মতে উক্ত অঞ্চলটির আয়তন দৈর্ঘ্যে ৭৭ কিলোমিটার (প্রায় ৫০ মাইল), প্রস্থে ১২ কিঃ মিঃ (প্রায় ৯ মাইল) এবং গভীরতায় ৪০০ মিটার (প্রায় কোয়ার্টার মাইল)। -ঢাকা, দৈনিক ইনকিলাব ২৮ এপ্রিল ২০০৯ পৃঃ ৮।*

১১৮. *স্রষ্টা ও সৃষ্টিতত্ত্ব, পৃঃ ২৫৮।*

করে তা থেকে উপদেশ গ্রহণের জন্য পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই হ'ত সবচাইতে যরূরী বিষয়। আজকের এইড্স আক্রান্ত বিশ্বের নাফরমান রাষ্ট্রনেতা, সমাজপতি ও বিলাসী ধনিক শ্রেণী তা থেকে শিক্ষা গ্রহণে সক্ষম হ'ত। কেননা এগুলি মূলতঃ মানুষের জন্য শিক্ষাস্থল হিসাবে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন,

إِنَّ فِيْ ذَالِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِيْنَ، ... إِنَّ فِيْ ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ–

'নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন সমূহ রয়েছে চিন্তাশীলদের জন্য' ... এবং বিশ্বাসীদের জন্য' *(হিজর ১৫/৭৫, ৭৭)*। একই ঘটনা বর্ণনা শেষে অন্যত্র তিনি বলেন, وَلَقَدْ تَّرَكْنَا مِنْهَآ آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ– 'জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আমরা অত্র ঘটনার মধ্যে স্পষ্ট নিদর্শন রেখে দিয়েছি' *(আনকাবূত ২৯/৩৫)*।

মুক্তিপ্রাপ্ত লোকদের সংখ্যা :

তখন উক্ত জনপদে লূত-এর পরিবারটি ব্যতীত মুসলমান ছিল না। আল্লাহ বলেন, فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ– 'আমরা সেখানে একটি বাড়ী ব্যতীত কোন মুসলমান পাইনি' *(যারিয়াত ৫১/৩৬)*। কুরআনী বর্ণনা অনুযায়ী উক্ত গযব হ'তে মাত্র লূত-এর পরিবারটি নাজাত পেয়েছিল। তাঁর স্ত্রী ব্যতীত' *(আ'রাফ ৭/৮৩)*। তাফসীরবিদগণ বলেন, লূত-এর পরিবারের মধ্যে কেবল তাঁর দু'মেয়ে মুসলমান হয়েছিল। তবে লূত-এর কওমের নেতারা লূত-কে সমাজ থেকে বের করে দেবার যে হুমকি দেয়, সেখানে তারা বহুবচন ব্যবহার করে বলেছিল أَخْرِجُوْهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ. 'এদেরকে তোমাদের শহর থেকে বের করে দাও। কেননা এই লোকগুলি সর্বদা পবিত্র থাকতে চায়' *(আ'রাফ ৭/৮২; নমল ২৭/৫৬)*। এতদ্ব্যতীত শহর থেকে বের হবার সময় আল্লাহ লূতকে 'সবার পিছনে' থাকতে বলেন *(হিজর ১৫/৬৫)*। অন্যত্র বলা হয়েছে فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ 'অতঃপর আমরা তাকে ও তার পরিবার সবাইকে নাজাত দিলাম' *(শো'আরা ২৬/১৭০)*। এখানে أجمعين বা 'সবাইকে' শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, ঈমানদারগণের সংখ্যা বেশ কিছু ছিল। অতএব এখানে লূত-এর 'আহ্ল' *(আ'রাফ ৮৩; হূদ ৮১; নমল ৫৭;*

ক্বামার ৩৪) বা পরিবার বলতে লূত-এর দাওয়াত কবুলকারী ঈমানদারগণকে সম্মিলিতভাবে 'আহলে ঈমান' বা 'একটি ঈমানদার পরিবার' গণ্য করা যেতে পারে। তবে প্রকৃত ঘটনা যেটাই হৌক না কেন, কেবলমাত্র নবীর অবাধ্যতা করলেই আল্লাহ্র গযব আসাটা অবশ্যম্ভাবী। তার উপরে কেউ ঈমান আনুক বা না আনুক। হাদীছে এসেছে, 'ক্বিয়ামতের দিন অনেক নবীর একজন উম্মতও থাকবে না'।[১১৯] এখানে লক্ষণীয় যে, নবীপত্নী হয়েও লূতের স্ত্রী গযব থেকে রেহাই পাননি। আল্লাহ নূহ পত্নী ও লূত পত্নীকে ক্বিয়ামতের দিন বলবেন- وَقِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، 'যাও জাহান্নামীদের সাথে জাহান্নামে চলে যাও' *(তাহরীম ৬৬/১০)*।

শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ :

১. বান্দার প্রতিটি ভাল কিংবা মন্দ কর্ম আল্লাহ্র সরাসরি দৃষ্টিতে রয়েছে। বান্দার সৎকর্মে তিনি খুশী হন ও মন্দ কর্মে নাখোশ হন।

২. নবী কিংবা সংস্কারক পাঠিয়ে উপদেশ না দেওয়া পর্যন্ত আল্লাহ কোন অবাধ্য কওমকে ধ্বংসকারী আযাবে গ্রেফতার করেন না।

৩. কওমের নেতারা ও ধনিক শ্রেণী প্রথমে পথভ্রষ্ট হয় ও সমাজকে বিপথে নিয়ে যায়। তারা সর্বদা পূর্বেকার রীতি-নীতির দোহাই দেয় এবং তাদের হঠকারিতা ও অহংকারী কার্যকলাপের ফলেই আল্লাহ্র চূড়ান্ত গযব নেমে আসে *(ইসরা ১৭/১৬; যুখরুফ ৪৩/২৩)*। অতএব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সর্বদা দূরদর্শী ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করা আবশ্যক।

৪. পুংমৈথুন বা পায়ুমৈথুন এমন একটি নিকৃষ্টতম স্বভাব, যা আল্লাহ্র ক্রোধকে ত্বরান্বিত করে। ব্যক্তিগত এই কুকর্ম কেবল ব্যক্তিকেই ধ্বংস করে না, তা সমাজকে বিধ্বস্ত করে। বর্তমান এইড্স আক্রান্ত বিশ্ব তার বাস্তব প্রমাণ।

৫. ঈমান না থাকলে কেবল বংশ বা আত্মীয়তার সম্পর্ক মানুষকে আল্লাহ্র গযব থেকে মুক্তি দিতে পারে না। যেমন লূত (আঃ)-এর স্ত্রী গযব থেকে রক্ষা পাননি।

---

১১৯. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫২৯৬ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায় 'তাওয়াক্কুল ও ছবর' অনুচ্ছেদ।

৮. হযরত ইসমাঈল *(আলাইহিস সালাম)*

আল্লাহ বলেন,

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَّبِياًّ– وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا–

'এই কিতাবে আপনি ইসমাঈলের কথা বর্ণনা করুন। তিনি ছিলেন ওয়াদা রক্ষায় সত্যাশ্রয়ী এবং তিনি ছিলেন রাসূল ও নবী'। 'তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে ছালাত ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিতেন এবং তিনি স্বীয় পালনকর্তার নিকট পসন্দনীয় ছিলেন' *(মারিয়াম ১৯/৫৪-৫৫)*।

হযরত ইসমাঈল (আঃ) ছিলেন পিতা ইবরাহীম (আঃ)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং মা হাজেরার গর্ভজাত একমাত্র সন্তান। ঐ সময়ে ইবরাহীমের বয়স ছিল ৮৬ বছর।[১২০] শিশু বয়সে তাঁকে ও তাঁর মাকে পিতা ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্র নির্দেশে মক্কার বিজন ভূমিতে রেখে আসেন। সেখানে ইবরাহীমের দো'আর বরকতে আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহে যমযম কূপের সৃষ্টি হয়। অতঃপর ইয়ামনের ব্যবসায়ী কাফেলা বনু জুরহুম গোত্র কর্তৃক মা হাজেরার আবেদনক্রমে সেখানে আবাদী শুরু হয়। ১৪ বছর বয়সে আল্লাহ্র হুকুমে মক্কার অনতিদূরে মিনা প্রান্তরে সংঘটিত হয় বিশ্ব ইতিহাসের বিস্ময়কর ত্যাগ ও কুরবানীর ঘটনা। পিতা ইবরাহীম কর্তৃক পুত্র ইসমাঈলকে স্বহস্তে কুরবানীর উক্ত ঘটনায় শতবর্ষীয় পিতা ইবরাহীমের ভূমিকা যাই-ই থাকুক না কেন চৌদ্দ বছরের তরুণ ইসমাঈলের ঈমান ও আত্মত্যাগের একমাত্র নমুনা ছিলেন তিনি নিজেই। তিনি স্বেচ্ছায় নিজেকে সমর্পণ না করলে পিতার পক্ষে পুত্র কুরবানীর ঘটনা সম্ভব হ'ত কি-না সন্দেহ। তাই ঐ সময় নবী না হ'লেও নবীপুত্র ইসমাঈলের আল্লাহভক্তি ও দৃঢ় ঈমানের পরিচয় ফুটে উঠেছিল তাঁর

---

১২০. আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ ১/১৭৯ পৃঃ।

কথায় ও কর্মে। এরপর পিতার সহযোগী হিসাবে তিনি কা‘বা গৃহ নির্মাণে শরীক হন এবং কা‘বা নির্মাণ শেষে পিতা-পুত্র মিলে যে প্রার্থনা করেন, আল্লাহ পাক তা নিজ যবানীতে পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করে বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিয়েছেন *(বাক্বারাহ ২/১২৭-১২৯)*।

এভাবে ইসমাঈল স্বীয় পিতার ন্যায় বিশ্বের তাবৎ মুমিন হৃদয়ে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন। আল্লাহ তাঁর প্রশংসায় সূরা মারিয়াম ৫৪ আয়াতে বলেন, তিনি ছিলেন ওয়াদা রক্ষায় সত্যাশ্রয়ী’ যা তিনি যবহের পূর্বে পিতাকে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন,

يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَآءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ، ‘হে পিতা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, তা কার্যকর করুন। আল্লাহ চাহেন তো আপনি আমাকে ছবরকারীদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন’ *(ছাফফাত ৩৭/১০২)*।

অতঃপর কা‘বা নির্মাণকালে পিতা-পুত্রের দো‘আর *(বাক্বারাহ ১২৭-২৯)* বরকতে প্রথমতঃ কা‘বা গৃহে যেমন হাযার হাযার বছর ধরে চলছে তাওয়াফ ও ছালাত এবং হজ্জ ও ওমরাহ্‌র ইবাদত, তেমনি চলছে ঈমানদার মানুষের ঢল। দ্বিতীয়তঃ সেখানে সারা পৃথিবী থেকে সর্বদা আমদানী হচ্ছে ফল-ফলাদীর বিপুল সম্ভার। তাঁদের দো‘আর তৃতীয় অংশ মক্কার জনপদে নবী প্রেরণের বিষয়টি বাস্তবায়িত হয় তাঁদের মৃত্যুর প্রায় আড়াই হাযার বছর পরে ইসমাঈলের বংশে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আবির্ভাবের মাধ্যমে। ইসমাঈল (আঃ) মক্কায় আবাদকারী ইয়ামনের বনু জুরহুম গোত্রে বিবাহ করেন। তাদেরই একটি শাখা গোত্র কুরায়েশ বংশ কা‘বা গৃহ তত্ত্বাবধানের মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত হয়। এই মহান বংশেই শেষনবীর আগমন ঘটে।

উল্লেখ্য যে, হযরত ইসমাঈল (আঃ) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ৯টি সূরায় ২৫টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।[১২১]

---

১২১. *যথাক্রমে সূরা বাক্বারাহ ২/১২৫, ১২৭-১২৯, ১৩২, ১৩৩, ১৩৬, ১৪০=৮; আলে ইমরান ৩/৮৪; নিসা ৪/১৬৩; আন‘আম ৬/৮৬; ইবরাহীম ১৪/৩৯; মারিয়াম ১৯/৫৪-৫৫; আম্বিয়া ২১/৮৫-৮৬; ছাফফাত ৩৭/১০১-১০৮=৮; ছোয়াদ ৩৮/৪৮। সর্বমোট =২৫ টি ॥*

পিতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের দৃষ্টান্ত :

তিনি পিতার প্রতি কেমন শ্রদ্ধাশীল ও অনুগত ছিলেন, তা নিম্নোক্ত ঘটনা দ্বারা বুঝা যায়। হাজেরার মৃত্যুর পর ইবরাহীম (আঃ) যখন ইসমাঈলকে দেখতে যান, তখন তার স্ত্রীকে কুশলাদি জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'আমরা খুব অভাবে ও কষ্টের মধ্যে আছি'। জবাবে তিনি বলেন, তোমার স্বামী এলে তাকে আমার সালাম দিয়ে বলো যে, তিনি যেন দরজার চৌকাঠ পাল্টে ফেলেন'। পরে ইসমাঈল বাড়ী ফিরলে ঘটনা শুনে বলেন, উনি আমার আব্বা এবং তিনি তোমাকে তালাক দিতে বলেছেন। ফলে ইসমাঈল স্ত্রীকে তালাক দেন ও অন্য স্ত্রী গ্রহণ করেন। পরে একদিন পিতা এসে একই প্রশ্ন করলে স্ত্রী বলেন, আমরা ভাল ও সচ্ছলতার মধ্যে আছি এবং তিনি আল্লাহ্র প্রশংসা করেন। ইবরাহীম তাদের সংসারে বরকতের জন্য আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করলেন। অতঃপর তাকে বলেন, তোমার স্বামী ফিরলে তাকে বলো যেন দরজার চৌকাঠ ঠিক রাখেন ও মযবূত করেন'। ইসমাঈল ফিরে এলে ঘটনা শুনে তার ব্যাখ্যা দেন ও বলেন, উনি আমার পিতা। তোমাকে স্ত্রীত্বে বহাল রাখার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। এই ঘটনার কিছু দিন পর ইবরাহীম পুনরায় আসেন। অতঃপর পিতা-পুত্র মিলে কা'বা গৃহ নির্মাণ করেন।[১২২]

প্রথম বিশুদ্ধ আরবী ভাষী :

ইসমাঈল সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

أَوَّلُ مَنْ فَتَقَ لِسَانَهُ بِالْعَرَبِيَّةِ الْبَيِّنَةِ إِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ اَرْبَعَ عَشَرَةَ سَنَةً–

'সর্বপ্রথম 'স্পষ্ট আরবী' ভাষা ব্যক্ত করেন ইসমাঈল। যখন তিনি ছিলেন মাত্র ১৪ বছর বয়সের তরুণ'।[১২৩] এখানে 'স্পষ্ট আরবী' অর্থ 'বিশুদ্ধ আরবী ভাষা' (العربية الفصيحة البليغة) এটাই ছিল কুরায়শী ভাষা (لغة قريش), যে ভাষায় পরে কুরআন নাযিল হয়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সকল ভাষাই আল্লাহ

---

১২২. *বুখারী ইবনু আব্বাস হ'তে হা/৩৩৬৪ 'নবীগণের কাহিনী' অধ্যায়।*

১২৩. *ত্বাবারানী, আওয়ায়েল; ছহীহুল জামে' হা/৪৩৪৬; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/১৮০।*

কর্তৃক ইলহামের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে। ইসমাঈল ছিলেন বিশুদ্ধ কুরায়শী আরবী ভাষার প্রথম ইলহাম প্রাপ্ত মনীষী। এটি ইসমাঈলের জন্য একটি গৌরবময় বৈশিষ্ট্য। এজন্য তিনি ছিলেন 'আবুল আরব' (أبوالعرب) বা আরবদের পিতা।

অন্যান্য নবীগণের ন্যায় যদি ইসমাঈল ৪০ বছর বয়সে নবুঅত পেয়ে থাকেন, তাহ'লে বলা চলে যে, ইসমাঈলের নবুঅতী মিশন আমৃত্যু মক্কা কেন্দ্রিক ছিল। তিনি বনু জুরহুম গোত্রে তাওহীদের দাওয়াত দেন। ইস্রাঈলী বর্ণনানুসারে তিনি ১৩৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন ও মা হাজেরার পাশে কবরস্থ হন'।[১২৪] কা'বা চত্বরে রুকনে ইয়ামানীর মধ্যে তাঁর কবর হয়েছিল বলে জনশ্রুতি আছে। তবে মক্কাতেই যে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল, এটা নিশ্চিতভাবে ধারণা করা যায়।

ইসমাঈলের বড় মহত্ত্ব এই যে, তিনি ছিলেন 'যবীহুল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহ্র রাহে স্বেচ্ছায় জীবন উৎসর্গকারী এবং তিনি হ'লেন শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মহান পূর্বপুরুষ। আল্লাহ তাঁর উপরে শান্তি বর্ষণ করুন। তাঁর সম্পর্কে ইবরাহীমের জীবনীতে আলোচিত হয়েছে।

যবীহুল্লাহ কে?

উক্ত বিষয়ে মূলত: কোন মতভেদ নেই। কেননা মুসলিম ও আহলে কিতাব প্রায় সকল বিদ্বান এ বিষয়ে একমত যে, তিনি ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আঃ)। কেননা তিনিই ইবরাহীমের প্রথম পুত্র এবং হাজেরার গর্ভে জন্ম। তিনি মক্কাতেই বড় হন। সেখানেই বসবাস করেন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। কুরবানীর মহান ঘটনা মক্কাতেই ঘটে। তিনি কখনোই কেন'আনে আসেননি। পিতা ইবরাহীম তাকে নিয়ে মক্কায় কা'বা গৃহ নির্মাণ করেন।

পক্ষান্তরে ইসহাকের জন্ম হয় কেন'আনে বিবি সারাহ্র গর্ভে ইসমাঈলের প্রায় চৌদ্দ বছর পরে। শৈশবে তিনি মক্কায় এসেছেন বলে জানা যায় না। পবিত্র

১২৪. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/১৮০।

কুরআনের সূরা বাক্বারায় ১৩৩,৩৬, ৪০; সূরা আলে ইমরান ৮৪, নিসা ১৬৩, ইবরাহীম ৩৯, ছাফফাত ১০০-১১৩ আয়াতগুলিতে সর্বত্র ইসমাঈলের পরেই ইসহাক ও ইয়াকূবের আলোচনা এসেছে। এব্যাপারে সকল ইস্রাঈলী বর্ণনা একমত যে, ইসমাঈলের জন্মের সময় ইবরাহীমের বয়স ছিল ৮৬ বছর। পক্ষান্তরে ইসহাক জন্মের সময় ইবরাহীমের বয়স ছিল অন্যূন ১০০ বছর এবং সারাহ্র বয়স ছিল অন্যূন ৯০ বছর।

নিঃসন্তান ইবরাহীম বৃদ্ধ বয়সে আল্লাহ্র নিকট একটি 'নেককার সন্তান' প্রার্থনা করেছিলেন। যেমন رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি সৎকর্মশীল সন্তান দান কর।' 'অতঃপর আমরা তাকে একটি ধৈর্যশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।' *(ছাফফাত ৩৭/১০০-০১)*। আর তিনিই ছিলেন প্রথম সন্তান ইসমাঈল। অতঃপর ইসমাঈলের কুরবানীর ঘটনা শেষে যখন ইবরাহীম কেন'আনে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন সেখানে ফেরেশতাদের আগমন ঘটে। যারা লূত-এর কওমকে ধ্বংস করতে যাওয়ার পথে তাঁর বাড়ীতে যাত্রা বিরতি করেন এবং সারাহ্র গর্ভে ইসহাক জন্মের ও তার ঔরসে পরবর্তীতে ইয়াকূব জন্মের সুসংবাদ প্রদান করেন *(হূদ ১১/৭১)*। সূরা ছাফফাত ১০১ আয়াতে ইবরাহীমকে একটি ধৈর্য্যশীল সন্তানের সুসংবাদ শুনানোর পরে কুরবানীর ঘটনা বর্ণনা শেষে ১১২ আয়াতে বলা হয়েছে وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيّاً مِّنَ الصَّالِحِينَ 'অতঃপর আমরা তাকে ইসহাক জন্মের সুসংবাদ দিলাম যিনি নবী হবেন ও সৎকর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত হবেন' *(ছাফফাত ৩৭/১১২)*। উক্ত আয়াতগুলির বর্ণনা পরম্পরায় স্পষ্ট বুঝা যায় যে, প্রথম সুসংবাদ প্রাপ্ত সন্তানটি ছিলেন ইসমাঈল, যাকে কুরবানী করা হয়। অতঃপর সুসংবাদ প্রাপ্ত সন্তান ছিলেন ইসহাক। যেমন ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে দো'আ করেন الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِيْ وَهَبَ لِيْ عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيْلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّيْ لَسَمِيْعُ الدُّعَاءِ– 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য যিনি আমাকে বৃদ্ধ বয়সে দান করেছেন ইসমাঈল ও ইসহাককে। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক অবশ্যই দো'আ কবুলকারী' *(ইবরাহীম*

১৪/৩৯)। এখানে তিনি ইসমাঈলের পরে ইসহাকের নাম উল্লেখ করেছেন। উপরোক্ত আলোচনায় একথা স্পষ্ট হয় যে, যবীহুল্লাহ ছিলেন ইবরাহীমের প্রথম সন্তান ইসমাঈল।

এক্ষণে পূর্বের ও পরের যে সকল বিদ্বান ইসহাককে যবীহুল্লাহ বলেছেন, তারা মূলতঃ ইসরাঈলী বর্ণনাসমূহের উপর নির্ভর করেছেন। যার প্রায় সবগুলিই কা'ব আল-আহবারের বর্ণনা থেকে নেওয়া হয়েছে। এই ইহুদী পণ্ডিত হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাওরাত বিশেষজ্ঞ হিসাবে খ্যাত এই ব্যক্তি নানা বিকৃত বর্ণনা পরিবেশন করেন। এটা ছিল আরবদের প্রতি ইহুদীদের চিরন্তন বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। কেননা ইসমাঈল ছিলেন আরব জাতির পিতা। যিনি হেজাযে বসবাস করতেন। আর তার বংশেই এসেছিলেন শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)। পক্ষান্তরে ইসহাক ছিলেন ইয়াকূবের পিতা। যিনি কেন'আনে বসাবস করতেন। আর ইয়াকূবের অপর নাম ছিল ইস্রাঈল। যার দিকেই বনু ইস্রাঈলকে সম্বন্ধ করা হয়। ফলে হিংসুক ইস্রাঈলীরা আরবদের সম্মান ছিনিয়ে নেয়ার জন্য আল্লাহ্র বাণীকে পরিবর্তন করতে চেয়েছে এবং ইসমাঈলের বদলে ইসহাকের নাম যবীহুল্লাহ বলে প্রচার করেছে। যা স্রেফ মিথ্যা ও অপবাদ মাত্র।[১২৫]

১২৫. *বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : তাফসীর ইবনে কাছীর, সূরা ছাফফাত ১০০-১১৩।*

৯. হযরত ইসহাক্ব *(আলাইহিস সালাম)*

হযরত ইসহাক ছিলেন ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রথমা স্ত্রী সারাহ-এর গর্ভজাত একমাত্র পুত্র। তিনি ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর চৌদ্দ বছরের ছোট। এই সময় সারাহ্র বয়স ছিল ৯০ এবং ইবরাহীমের বয়স ছিল ১০০। অতি বার্ধ্যক্যের হতাশ বয়সে বন্ধ্যা নারী সারাহ্-কে ইসহাক জন্মের সুসংবাদ নিয়ে ফেরেশতা আগমনের ঘটনা আমরা ইতিপূর্বে বিবৃত করেছি। পবিত্র কুরআনে আকর্ষণীয় ভঙ্গীতে এ বিষয়ে আলোচিত হয়েছে সূরা হূদ ৭১-৭৩ আয়াতে, হিজর ৫১-৫৬ আয়াতে এবং যারিয়াত ২৪-৩০ আয়াতে- যা আমরা ইবরাহীমের জীবনীতে বর্ণনা করেছি। আল্লাহ ইসমাঈলকে দিয়ে যেমন মক্কার জনপদকে তাওহীদের আলোকে উদ্ভাসিত করেছিলেন, তেমনি ইসহাক্বকে নবুঅত দান করে তার মাধ্যমে শাম-এর বিস্তীর্ণ এলাকা আবাদ করেছিলেন।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় জীবদ্দশায় পুত্র ইসহাক্বকে বিয়ে দিয়েছিলেন রাফক্বা বিনতে বাতওয়াঈল (رفقا بنت بتوائيل)-এর সাথে। কিন্তু তিনিও বন্ধ্যা ছিলেন। পরে ইবরাহীমের খাছ দো'আর বরকতে তিনি সন্তান লাভ করেন এবং তাঁর গর্ভে ঈছ ও ইয়াকূব নামে পরপর দু'টি পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করে।[১২৬] তার মধ্যে ইয়াকূব নবী হন। পরে ইয়াকূবের বংশধর হিসাবে বনু ইস্রাঈলের হাযার হাযার নবী পৃথিবীকে তাওহীদের আলোকে আলোকিত করেন। কিন্তু ইহুদী নেতাদের হঠকারিতার কারণে তারা আল্লাহ্র গযবে পতিত হয় এবং অভিশপ্ত জাতি হিসাবে নিন্দিত হয়। যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

ইসহাক্ব (আঃ) ১৮০ বছর বয়স পান। তিনি কেন'আনে মৃত্যুবরণ করেন এবং পুত্র ঈছ ও ইয়াকূবের মাধ্যমে হেবরনে পিতা ইবরাহীমের কবরের পাশে সমাহিত হন। স্থানটি এখন 'আল-খালীল' নামে পরিচিত'।[১২৭]

উল্লেখ্য যে, হযরত ইসহাক্ব (আঃ) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ১৪টি সূরায় ৩৪টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।[১২৮]

---

১২৬. *আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ ১/১৮১।*

১২৭ . *আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ ১/১৮৪।*

১২৮ . *যথাক্রমে সূরা বাক্বারাহ ২/১৩২, ১৩৩, ১৩৬, ১৪০; আলে ইমরান ৩/৮৪; নিসা ৪/১৬৩; আন'আম ৬/৮৪; হূদ ১১/৭১-৭৩; ইউসুফ ১২/৬; ইবরাহীম ১৪/৩৯; হিজর ১৫/৫১-৫৬=৭; মারিয়াম ১৯/৪৯-৫০; আম্বিয়া ২১/৭২-৭৩; আনকাবূত ২৯/২৭; ছাফফাত ৩৭/১১৩; ছোয়াদ ৩৮/৪৫-৪৭; যারিয়াত ৫১/২৪-৩০=৭। সর্বমোট =৩৪টি ॥*

১০. হযরত ইয়াকূব *(আলাইহিস সালাম)*

ইসহাক্ব (আঃ)-এর দুই যমজ পুত্র ঈছ ও ইয়াকূব-এর মধ্যে ছোট ছেলে ইয়াকূব নবী হন। ইয়াকূবের অপর নাম ছিল 'ইস্রাঈল'।[১২৯] যার অর্থ আল্লাহ্র দাস। নবীগণের মধ্যে কেবল ইয়াকূব ও মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর দু'টি করে নাম ছিল। মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অপর নাম ছিল 'আহমাদ' *(ছফ ৬১/৬)*। ইয়াকূব তার মামুর বাড়ী ইরাকের হারান (حران) যাবার পথে রাত হয়ে গেলে কেন'আনের অদূরে একস্থানে একটি পাথরের উপরে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। সে অবস্থায় স্বপ্ন দেখেন যে, একদল ফেরেশতা সেখান থেকে আসমানে উঠানামা করছে। এরি মধ্যে আল্লাহ তাকে উদ্দেশ্য করে বলছেন,

إني سأبارك عليك واكثر ذريتك واجعل لك هذه الأرض ولعقبك من بعدك–

'অতিসত্ত্বর আমি তোমার উপরে বরকত নাযিল করব, তোমার সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধি করে দেব, তোমাকে ও তোমার পরে তোমার উত্তরসূরীদের এই মাটির মালিক করে দেব'। তিনি ঘুম থেকে উঠে খুশী মনে মানত করলেন, যদি নিরাপদে নিজ পরিবারের কাছে ফিরে আসতে পারেন, তাহ'লে এই স্থানে তিনি একটি ইবাদতখানা প্রতিষ্ঠা করবেন এবং আল্লাহ তাকে যা রূযী দেবেন তার এক দশমাংশ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করবেন'। অতঃপর তিনি ঐ স্থানে পাথরটির উপরে একটি চিহ্ন এঁকে দিলেন যাতে তিনি ফিরে এসে সেটাকে চিনতে পারেন। তিনি স্থানটির নাম রাখলেন, بيت إيل অর্থাৎ আল্লাহ্র ঘর।[১৩০] এই স্থানেই বর্তমানে 'বায়তুল মুক্বাদ্দাস' অবস্থিত, যা পরবর্তীতে প্রায় ১০০০ বছর পরে হযরত সুলায়মান (আঃ) পুনর্নির্মাণ করেন। মূলতঃ

---

১২৯. *আলে-ইমরান ৩/৯৩ ; মারিয়াম ১৯/৫৮।*
১৩০. *ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ ১/১৮২।*

এটিই ছিল ‘বায়তুল মুক্বাদ্দাসের’ মূল ভিত্তি ভূমি, যা কা‘বা গৃহের চল্লিশ বছর পরে ফেরেশতাদের দ্বারা কিংবা আদম পুত্রদের হাতে কিংবা ইসহাক্ব (আঃ) কর্তৃক নির্মিত হয়। নিশ্চিহ্ন হওয়ার কারণে আল্লাহ ইয়াকূব (আঃ)-কে স্বপ্নে দেখান এবং তাঁর হাতে সেখানে পুনরায় ইবাদতখানা তৈরী হয়।

ইস্রাঈলী বর্ণনা অনুযায়ী ইয়াকূব হারানে মামুর বাড়ীতে গিয়ে সেখানে তিনি তার মামাতো বোন ‘লাইয়া’ (لَيَّا) ও পরে ‘রাহীল’ (راحيل)-কে বিবাহ করেন এবং দু’জনের মোহরানা অনুযায়ী ৭+৭=১৪ বছর মামুর বাড়ীতে দুম্বা চরান। ইবরাহীমী শরী‘আতে দু’বোন একত্রে বিবাহ করা জায়েয ছিল। পরে মূসা (আঃ)-এর শরী‘আতে এটা নিষিদ্ধ করা হয়। শেষোক্ত স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন বিশ্বসেরা সুন্দর পুরুষ ‘ইউসুফ’। অতঃপর দ্বিতীয় পুত্র বেনিয়ামীনের জন্মের পরেই তিনি মারা যান। তাঁর কবর বেথেলহামে (بيت لحم) অবস্থিত এবং ‘ক্বররে রাহীল’ নামে পরিচিত। পরে তিনি আরেক শ্যালিকাকে বিবাহ করেন। ইয়াকূবের ১২ পুত্রের মধ্যে ইউসুফ নবী হন। প্রথমা স্ত্রীর পুত্র লাভী (لاوى)-এর পঞ্চম অধঃস্তন পুরুষ মূসা ও হারূণ নবী হন। এভাবে ইয়াকূব (আঃ)-এর বংশেই নবীদের সিলসিলা জারি হয়ে যায়। ইয়াকূব-এর অপর নাম ‘ইসরাঈল’ অনুযায়ী তাঁর বংশধরগণ ‘বনু ইস্রাঈল’ নামে পরিচিত হয়। হঠকারী ইহুদী-নাছারাগণ যাতে তারা ‘আল্লাহ্র দাস’ একথা বারবার স্মরণ করে, সেকারণ আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তাদেরকে ‘বনু ইস্রাঈল’ বলেই স্মরণ করেছেন।

হারান থেকে ২০ বছর পর ইয়াকূব তাঁর স্ত্রী-পরিজন সহ জন্মস্থান ‘হেবরনে’ ফিরে আসেন। যেখানে তাঁর দাদা ইবরাহীম ও পিতা ইসহাক্ব বসবাস করতেন। যা বর্তমানে ‘আল-খলীল’ নামে পরিচিত। পূর্বের মানত অনুসারে তিনি যথাস্থানে বায়তুল মুক্বাদ্দাস মসজিদ নির্মাণ করেন *(ঐ)*।

কেন‘আন-ফিলিস্তীন তথা শাম এলাকাতেই তাঁর নবুঅতের মিশন সীমায়িত থাকে। ইউসুফ কেন্দ্রিক তাঁর জীবনের বিশেষ ঘটনাবলী ইউসুফ (আঃ)-এর

জীবনীতে আলোচিত হবে। তিনি ১৪৭ বছর বয়সে মিসরে মৃত্যুবরণ করেন এবং হেবরনে পিতা ইসহাক (আঃ)-এর কবরের পাশে সমাধিস্থ হন।

উল্লেখ্য যে, হযরত ইয়াকূব (আঃ) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ১০টি সূরায় ৫৭টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।[১৩১]

ইয়াকূবের অছিয়ত:

কেন‘আন থেকে মিসরে আসার ১৭ বছর পর মতান্তরে ২৩ বছরের অধিক কাল পরে ইয়াকূবের মৃত্যু ঘনিয়ে এলে তিনি সন্তানদের কাছে ডেকে অছিয়ত করেন। সে অছিয়তটির মর্ম আল্লাহ নিজ যবানীতে বলেন,

وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيْمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلاَ تَمُوْتُنَّ إَلاَّ وَأَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ- أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِن بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَـــهَكَ وَإِلَـــهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمَاعِيْلَ وَإِسْحَاقَ إِلَـــهاً وَّاحِداً وَّنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ- (البقرة ١٣٣)-

‘এরই অছিয়ত করেছিল ইবরাহীম তার সন্তানদের এবং ইয়াকূবও যে, হে আমার সন্তানগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য দ্বীনকে মনোনীত করেছেন। অতএব তোমরা অবশ্যই মুসলিম না হয়ে মরো না’ *(বাক্বারাহ ১৩২)*। ‘তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে, যখন ইয়াকূবের মৃত্যু ঘনিয়ে আসে? যখন সে সন্তানদের বলল, আমার পরে তোমরা কার ইবাদত করবে? তারা বলল, আমরা আপনার উপাস্য এবং আপনার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক্বের উপাস্যের ইবাদত করব- যিনি একক উপাস্য এবং আমরা সবাই তাঁর প্রতি সমর্পিত’ *(বাক্বারাহ ২/১৩৩)*।

---

১৩১. যথাক্রমে সূরা বাক্বারাহ ২/১৩২-১৩৩; ১৩৬, ১৪০; আলে ইমরান ৩/৮৪; নিসা ৪/১৬৩; মায়েদাহ ৫/৮৪-৮৫; হূদ ১১/৭১; ইউসুফ ১২/৪-৯=৬; ১১-১৪=৪; ১৫-১৮=৪; ৩৮; ৬৩-৬৮=৬; ৭৮-৮৭=১০; ৯৩-১০০=৮ মোট ৩৯; মারিয়াম ১৯/৬, ৪৯-৫০; আম্বিয়া ২১/৭২-৭৩; আনকাবূত ২৯/২৭; ছোয়াদ ৩৮/৪৫-৪৭=৩। সর্বমোট= ৫৭টি॥

শুরুতে বলা হয়েছে ‘এরই অছিয়ত করেছিলেন ইবরাহীম। কিন্তু সেটা কি ছিল? আল্লাহ বলেন,

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ- (البقرة ١٣١)-

‘স্মরণ কর যখন তাকে তার পালনকর্তা বললেন, আত্মসমর্পণ কর। সে বলল, আমি বিশ্বপালকের প্রতি আত্মসমর্পণ করলাম’ *(বাক্বারাহ ২/১৩১)*। অর্থাৎ ইবরাহীমের অছিয়ত ছিল তাঁর সন্তানদের প্রতি ইসলামের। তাঁর পৌত্র ইয়াকূবেরও অছিয়ত ছিল স্বীয় সন্তানদের প্রতি ইসলামের। এজন্য ইবরাহীম তার অনুসারীদের নাম রেখেছিলেন- ‘মুসলিম’ বা আত্মসমর্পিত *(হজ্জ ২২/৭৮)*। ইবরাহীম তাঁর অপর প্রার্থনায় মুসলিম-এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، ‘যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করল, সে ব্যক্তি আমার দলভুক্ত। কিন্তু যে ব্যক্তি আমার অবাধ্যতা করল, তার বিষয়ে আল্লাহ তুমি ক্ষমাশীল ও দয়াবান’ *(ইবরাহীম ১৪/৩৬)*।

বুঝা গেল যে, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব প্রমুখ নবীগণের ধর্ম ছিল ‘ইসলাম’। তাদের মূল দাওয়াত ছিল তাওহীদ তথা আল্লাহ্র ইবাদতে একত্ব। শুধুমাত্র আল্লাহ্র স্বীকৃতির মধ্যে তা সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং তাঁর বিধানের প্রতি আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের মধ্যেই তার যথার্থতা নিহিত ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে তাদের অনুসারী হবার দাবীদার ইহূদী-নাছারাগণ তাদের নবীগণের সেই অছিয়ত ভুলে যায় এবং অবাধ্যতা, যিদ ও হঠকারিতার চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গিয়ে তারা আল্লাহ্র অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট (المغضوب والضآلين) জাতিতে পরিণত হয়।[১৩২]

ইবরাহীম ও ইয়াকূবের অছিয়তে এটা প্রমাণিত হয় যে, সন্তানের জন্য দুনিয়াবী ধন-সম্পদ রেখে যাওয়ার চাইতে তাদেরকে ঈমানী সম্পদে সম্পদশালী হওয়ার অছিয়ত করে যাওয়াই হ’ল দূরদর্শী পিতার প্রধানতম দায়িত্ব ও কর্তব্য।

---

১৩২. ছহীহ তিরমিযী হা/২৯৫৪ ‘তাফসীর’ অধ্যায়; ছহীহুল জামে‘ হা/৮২০২।

১১. হযরত ইউসুফ *(আলাইহিস সালাম)*

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইউসুফ (আঃ) সম্পর্কে বলেন, الكريمُ بنُ الكريمِ بنِ الكريمِ بنِ الكريمِ يوسفُ بنُ يعقوبَ بنِ اسحاقَ بنِ ابراهيمَ عليهمُ السلامُ– 'নিশ্চয়ই মর্যাদাবানের পুত্র মর্যাদাবান, তাঁর পুত্র মর্যাদাবান, তাঁর পুত্র মর্যাদাবান। তাঁরা হলেন ইবরাহীমের পুত্র ইসহাক, তাঁর পুত্র ইয়াকূব ও তাঁর পুত্র ইউসুফ *'আলাইহিমুস সালাম'* (তাঁদের উপর শান্তি বর্ষিত হৌক!)।[১৩৩]

নবীগণের মধ্যে হযরত ইউসুফ (আঃ) হ'লেন একমাত্র নবী, যাঁর পুরা কাহিনী একটি মাত্র সূরায় ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। সূরা ইউসুফ-এর **১১১**টি আয়াতের মধ্যে ৩ থেকে ১০১ আয়াত পর্যন্ত ৯৯টি আয়াতে ইউসুফের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। এ ছাড়া অন্যত্র কেবল সূরা আন'আম ৮৪ এবং সূরা মুমিন ৩৪ আয়াতে তাঁর নাম এসেছে।

সূরা নাযিলের কারণ : সত্যনবী এবং শেষনবী জেনেও কপট ইহুদীরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে প্রতি পদে পদে কষ্ট দিত এবং পরীক্ষা করার চেষ্টা করত। তাদের সমাজনেতা ও ধর্মনেতাদের কাজই ছিল সর্বদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা ও তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করা। এ সময় মক্কায় কোন আহলে কিতাব বসবাস করত না এবং মক্কার লোকেরা ইউসুফ বা অন্য নবীদের সম্পর্কে কিছু জানতও না। ফলে মদীনার কুচক্রী ইহুদীদের একটি দল মক্কায় এসে একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে প্রশ্ন করল যে, বলুন দেখি, কোন নবী শামে (সিরিয়ায়) ছিলেন। অতঃপর তার ছেলেকে সেখান থেকে মিসরে বহিষ্কার করা হয়। তাতে ঐ ব্যক্তি কেঁদে অন্ধ হয়ে যান? (এটি বানোয়াট কথা। কেননা কেবলমাত্র কেঁদে কারু চোখ অন্ধ হয় না এবং এটি নবীগণের মর্যাদার খেলাফ)। একথার জওয়াবে অতঃপর সূরা ইউসুফ পুরাটা একত্রে নাযিল হয়।[১৩৪] তাদের পণ্ডিতেরা তওরাত-ইঞ্জীলে বর্ণিত উক্ত ঘটনা

---

১৩৩. বুখারী, মিশকাত হা/৪৮৯৪ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১৩।

১৩৪. কুরতুবী, ইউসুফ ৭; ইবনু জারীর হা/১৮৭৮৬ ইবনু আব্বাস হ'তে।

আগে থেকেই জানতো। তাওরাত-যবূর-ইনজীল সবই ছিল হিব্রু ভাষায় রচিত। আমাদের রাসূল নিজের ভাষাতেই লেখাপড়া জানতেন না, অন্যের ভাষা জানা তো দূরের কথা। ইহুদী নেতাদের সূক্ষ্ম পলিসি ছিল এই যে, উক্ত বিষয়ে উম্মী নবী মুহাম্মাদ-এর পক্ষে জবাব দেওয়া আদৌ সম্ভব হবে না। ফলে লোকদের মধ্যে তার নবুঅতের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হবে এবং তার বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা যোরদার করা যাবে।

বস্তুতঃ তাদের প্রশ্নের উত্তরে ইউসুফ (আঃ) ও ইয়াকূব পরিবারের প্রকৃত ঘটনা 'অহি' মারফত ধারাবাহিকভাবে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বর্ণনা করে দেন। যা ছিল রাসূলের জন্য নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ মু'জেযা।[১৩৫] শুধু ইউসুফের ঘটনাই নয়, আদম থেকে ঈসা পর্যন্ত কুরআনে বর্ণিত বাকী ২৪ জন নবী ও তাঁদের কওমের ঘটনাবলী বর্ণনা ছিল শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অন্যতম উল্লেখযোগ্য মু'জেযা। কেননা তাঁদের কারু সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়নি। তাদের সম্পর্কে লিখিত কোন বই-পত্র সে যুগে ছিল না। আর তিনি নিজে কারু কাছে কখনো লেখাপড়া শিখেননি। অথচ বিশ্ব ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন সময়ে ঘটে যাওয়া বিগত যুগের শিক্ষণীয় ঘটনাবলী তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে উম্মতকে শুনিয়ে গেছেন কুরআনের মাধ্যমে। এগুলিই তাঁর নবুঅতের অন্যতম প্রধান দলীল ছিল। এরপরেও খাছ করে ইউসুফ (আঃ) ও তাঁর পিতা ইয়াকূব (আঃ)-এর পরিবারের ঘটনাবলী ছিল বিগত ইতিহাসের এক অনন্য সাধারণ ঘটনা। যার প্রয়োজনীয় অংশগুলি গুছিয়ে একত্রিতভাবে উপস্থাপন করাই হ'ল সূরা ইউসুফের অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য।

সুন্দরতম কাহিনী :

অন্যান্য নবীদের কাহিনী কুরআনের বিভিন্ন স্থানে প্রয়োজন অনুসারে বিক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ইউসুফ নবীর ঘটনাবলী একত্রে সাজিয়ে একটি সূরাতে সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। সম্ভবতঃ সেকারণে এটিকে أَحْسَنُ الْقَصَصِ 'সুন্দরতম কাহিনী' বলা হয়েছে *(ইউসুফ ১২/৩)*। **দ্বিতীয়তঃ** এর মধ্যে যেসব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তা যেমনি অলৌকিক, তেমনি চমকপ্রদ ও

---

১৩৫. উল্লেখ্য যে, ইউসুফ (আঃ)-এর চরিত্র বাইবেলে অত্যন্ত বিকৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে (দ্রঃ সুলায়মান মানছূরপুরী, রহমাতুললিল আলামীন ২/২৪৪-২৪৬।

শিক্ষণীয়। **তৃতীয়তঃ** অন্যান্য নবীদের কাহিনীতে প্রধানতঃ উম্মতের অবাধ্যতা ও পরিণামে তাদের উপরে আপতিত গযবের কাহিনী এবং অন্যান্য উপদেশ ও হিকমত সমূহ প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনীতে রয়েছে দুনিয়ার তিক্ত বাস্তবতা এবং আল্লাহ্র উপরে অকুণ্ঠ নির্ভরতার সমন্বয়ে সৃষ্ট এক অতুলনীয় ও অভাবনীয় এক ট্রাজিক জীবন নাট্য। যা পাঠ করলে যেকোন বোদ্ধা পাঠকের জীবনে সৃষ্টি হবে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র উপরে ভরসা ও তাঁর নিকটে আত্মসমর্পণের এক অনুপম উদ্দীপনা।

আরবী ভাষায় কেন?

আল্লাহ বলেন, 'আমরা একে আরবী কুরআন হিসাবে নাযিল করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পার' *(ইউসুফ ১২/২)*। এর অন্যতম কারণ ছিল এই যে, ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনী যারা জানতে চেয়েছিল, তারা ছিল আরবীয় ইহুদী এবং মক্কার কুরায়েশ নেতৃবৃন্দ। তাই তাদের বোধগম্য হিসাবে আরবী ভাষায় উক্ত কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে এবং আরবীতেই সমগ্র কুরআন নাযিল করা হয়েছে। এতে একদিকে যেমন ভাষাগর্বী আরবরা কুরআনের অপূর্ব ভাষাশৈলীর কাছে হার মেনেছে, অন্যদিকে তেমনি কিতাবধারী ইহুদী-নাছারা পণ্ডিতেরা কুরআনের বিষয়বস্তু ও বক্তব্য সমূহের সত্যতা ও সারবত্তা উপলব্ধি করে নিশ্চুপ হয়েছে।

কাহিনীর সার-সংক্ষেপ :

কাহিনীটি শৈশবে দেখা ইউসুফের একটি স্বপ্ন দিয়ে শুরু হয়েছে এবং তার সমাপ্তি ঘটেছে উক্ত স্বপ্নের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে। মাঝখানের ২২/২৩ বছর মতান্তরে চল্লিশ বছর অনেকগুলি বিয়োগান্ত ও চমকপ্রদ ঘটনায় পূর্ণ। কাহিনী অনুযায়ী ইউসুফ শৈশবকালে স্বপ্ন দেখেন যে, ১১টি নক্ষত্র এবং সূর্য ও চন্দ্র তাকে সিজদা করছে। তিনি এই স্বপ্ন পিতা হযরত ইয়াকূবকে বললে তিনি তাকে সেটা গোপন রাখতে বলেন। কিন্তু তা ফাঁস হয়ে যায়। ফলে এটা তার সুন্দর ভবিষ্যতের হাতছানি ভেবে সৎ ভাইয়েরা হিংসায় জ্বলে ওঠে এবং তারা তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত করে। অতঃপর তারা তাকে জঙ্গলের একটি পরিত্যক্ত অন্ধকূপে নিক্ষেপ করে। তিনদিন পরে পথহারা ব্যবসায়ী কাফেলার নিক্ষিপ্ত বালতিতে করে তিনি উপরে উঠে আসেন। পরে ঐ ব্যবসায়ীরা তাকে মিসরের রাজধানীতে বিক্রি করে দেয়। ভাগ্যক্রমে

মিসরের অর্থ ও রাজস্ব মন্ত্রী ক্বিৎফীর (قطفير) তাকে খরিদ করে বাড়ীতে নিয়ে যান ক্রীতদাস হিসাবে। কয়েক বছরের মধ্যে যৌবনে পদার্পণকারী অনিন্দ্য সুন্দর ইউসুফের প্রতি মন্ত্রীর নিঃসন্তান স্ত্রী যুলায়খার আসক্তি জন্মে। ফলে শুরু হয় ইউসুফের জীবনে আরেক পরীক্ষা। একদিন যুলায়খা ইউসুফকে তার ঘরে ডেকে নিয়ে কুপ্রস্তাব দেয়। তাতে ইউসুফ সম্মত না হয়ে বেরিয়ে আসতে চাইলে পিছন থেকে যুলায়খা তার জামা টেনে ধরলে তা ছিঁড়ে যায়। দরজা খুলে বেরিয়ে আসতেই দু'জনে ধরা পড়ে যায় বাড়ীর মালিক ক্বিৎফীরের কাছে। পরে যুলায়খার সাজানো কথামতে নির্দোষ ইউসুফের জেল হয়। যুলায়খা ছিলেন মিসররাজ রাইয়ান ইবনু অলীদের ভাগিনেয়ী।[১৩৬]

অন্যূন সাত বছর জেল খাটার পর বাদশাহ্র এক স্বপ্নের ব্যাখ্যা দানের পুরস্কার স্বরূপ তাঁর মুক্তি হয়। পরে তিনি বাদশাহ্র অর্থ ও রাজস্ব মন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং বাদশাহর আনুকূল্যে তিনিই হন সমগ্র মিসরের একচ্ছত্র শাসক। ইতিমধ্যে ক্বিৎফীরের মৃত্যু হ'লে বাদশাহ্র উদ্যোগে বিধবা যুলায়খার সাথে তাঁর বিবাহ হয়।[১৩৭] বাদশাহ্র দেখা স্বপ্ন মোতাবেক মিসরে প্রথম সাত বছর ভাল ফসল হয় এবং পরের সাত বছর ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। দুর্ভিক্ষের সময় সুদূর কেন'আন থেকে তাঁর বিমাতা দশ ভাই তাঁর নিকটে খাদ্য সাহায্য নিতে এলে তিনি তাদের চিনতে পারেন। কিন্তু নিজ পরিচয় গোপন রাখেন। পরে তাঁর সহোদর একমাত্র ছোট ভাই বেনিয়ামীনকে আনা হ'লে তিনি তাদের সামনে নিজের পরিচয় দেন এবং নিজের ব্যবহৃত জামাটি ভাইদের মাধ্যমে পিতার নিকটে পাঠিয়ে দেন। বার্ধক্য তাড়িত অন্ধ পিতা ইয়াকূবের মুখের উপরে উক্ত জামা রেখে দেওয়ার সাথে সাথে তাঁর দু'চোখ খুলে যায়। অতঃপর ইউসুফের আবেদন ক্রমে তিনি সপরিবারে মিসর চলে আসেন। ইউসুফ তার ভাইদের ক্ষমা করে দেন। অতঃপর ১১ ভাই ও বাপ-মা তাঁর প্রতি সম্মানের সিজদা করেন। এভাবেই শৈশবে দেখা ইউসুফের স্বপ্ন সার্থক রূপ পায় (অবশ্য ইসলামী শরী'আতে কারু প্রতি সম্মানের সিজদা নিষিদ্ধ)। সংক্ষেপে এটাই হ'ল ইউসুফ (আঃ) ও ইয়াকূব পরিবারের

---

১৩৬. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়াল নিহায়াহ ১/১৯০।

১৩৭. আল-বিদায়াহ ১/১৯৬-১৯৭। তবে মানছূরপুরী বলেন, তাঁর বিবাহ 'আসনাথ' নাম্নী এক মহিলার সাথে হয়েছিল। -রাহমাতুললিল আলামীন ৩/১০৭। হ'তে পারে দু'জনেই তাঁর স্ত্রী ছিলেন।

ফিলিস্তীন হ'তে মিসরে হিজরতের কারণ ও প্রেক্ষাপট, যে বিষয়ে ইহুদীরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে প্রশ্ন করেছিল মূলতঃ তাঁকে ঠকাবার জন্য।

সূরাটি মক্কায় নাযিল হওয়ার কারণ :

মক্কায় কোন ইহুদী-নাছারা বাস করত না। ইউসুফ ও ইয়াকূব পরিবারের ঘটনা মক্কায় প্রসিদ্ধ ছিল না এবং মক্কার কেউ এ বিষয়ে অবগতও ছিল না। তাহ'লে সূরা ইউসুফ কেন মক্কায় নাযিল হ'ল?

এর জবাব এই যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আবির্ভাবের সংবাদ মদীনায় পৌঁছে গেলে সেখানকার ইহুদী-নাছারা নেতৃবর্গ তাওরাত-ইনজীলের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাঁকে ঠিকই চিনে ফেলে *(বাক্বারাহ ২/১৪৬; আন'আম ৬/২০)*। কিন্তু অহংকার বশে মানতে অস্বীকার করে এবং তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের জাল বুনতে শুরু করে। সে মোতাবেক শেষনবী (ছাঃ) যাতে মদীনায় হিজরত করতে না পারেন এবং মক্কাতেই তাঁকে শেষ করে ফেলা যায়, সেই কপট উদ্দেশ্য নিয়ে তাদের একদল ধুরন্ধর লোক মক্কায় প্রেরিত হয়। তারা এসে অস্পষ্ট ভঙ্গিতে প্রশ্ন করতে লাগল যে, বলুন কোন্ নবীর এক পুত্রকে শাম হ'তে মিসরে স্থানান্তরিত করা হয়। কোন্ নবী সন্তানের বিরহ-বেদনায় কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে যান ইত্যাদি।

জিজ্ঞাসার জন্য এ ঘটনাটি বাছাই করার অন্যতম কারণ ছিল এই যে, এ ঘটনাটি মক্কায় ছিল অপরিচিত এবং একটি সম্পূর্ণ নতুন বিষয়। অতএব মক্কার লোকেরাই যে বিষয়ে জানে না, সে বিষয়ে উম্মী নবী মুহাম্মাদ-এর জানার প্রশ্নই ওঠে না। ফলে নিশ্চয়ই তিনি বলতে পারবেন না এবং অবশ্যই তিনি অপদস্থ হবেন। তখন মক্কার কাফেরদের কাছে একথা রটিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে যে, মুহাম্মাদ কোন নবী নন, তিনি একজন ভণ্ড ও মতলববাজ লোক। বাপ-দাদার ধর্মের বিরোধিতা করার কারণে তখন লোকেরা তাকে হয়ত পিটিয়ে মেরে ফেলবে।

যাইহোক ইহুদীদের এ কুটচাল ও কপট উদ্দেশ্য সফল হয়নি। তাদের প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে সূরা ইউসুফ নাযিল হয় এবং তাতে ইউসুফ ও ইয়াকূব-পরিবারের ঘটনাবলী এমন নিখুঁতভাবে পরিবেশিত হয়, যা তওরাত ও ইনজীলেও ছিল না। বস্তুতঃ এটি ছিল শেষনবী (ছাঃ)-এর একটি প্রকাশ্য মু'জেযা।

ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনী :

ইউসুফ (আঃ)-এর পিতা ছিলেন ইয়াকূব ইবনে ইসহাক্ব ইবনে ইবরাহীম (আঃ)। তাঁরা সবাই কেন‘আন বা ফিলিস্তীনের হেবরন এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। ইয়াকূব (আঃ)-এর দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন ইউসুফ ও বেনিয়ামীন। শেষোক্ত সন্তান জন্মের পরপরই তার মা মৃত্যুবরণ করেন। পরে ইয়াকূব (আঃ) তাঁর স্ত্রীর অপর এক বোন লায়লা-কে বিবাহ করেন। ইউসুফ-এর সাথে মিসরে পুনর্মিলনের সময় ইনিই মা হিসাবে সেখানে পিতার সাথে উপস্থিত ছিলেন।[১৩৮]

হযরত ইয়াকূব (আঃ) মিসরে পুত্র ইউসুফের সাথে ১৭ বছর মতান্তরে ২০ বছরের অধিককাল অতিবাহিত করেন। অতঃপর ১৪৭ বছর বয়সে সেখানেই ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে অছিয়ত করে যান যেন তাঁকে বায়তুল মুক্বাদ্দাসের নিকটবর্তী হেবরন মহল্লায় পিতা ইসহাক ও দাদা ইবরাহীম (আঃ)-এর পাশে সমাহিত করা হয় এবং তিনি সেখানেই সমাধিস্থ হন। যা এখন ‘খলীল’ মহল্লা বলে খ্যাত। হযরত ইউসুফ (আঃ) ১১০ বছর বয়সে মিসরে ইন্তেকাল করেন এবং তিনিও হেবরনের একই স্থানে সমাধিস্থ হওয়ার জন্য সন্তানদের নিকটে অছিয়ত করে যান। এর দ্বারা বায়তুল মুক্বাদ্দাস অঞ্চলের বরকত ও উচ্চ মর্যাদা প্রমাণিত হয়। হযরত ইয়াকূব-এর বংশধরগণ সকলে ‘বনু ইসরাঈল’ নামে খ্যাত হয়। তাঁর বারো পুত্রের মধ্যে মাত্র ইউসুফ নবী হয়েছিলেন। তাঁর রূপ-লাবণ্য ছিল অতুলনীয়।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘আমি মি‘রাজ রজনীতে ইউসুফ (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হলে দেখলাম যে, আল্লাহ তাকে সমগ্র বিশ্বের রূপ-সৌন্দর্যের অর্ধেক দান করেছেন’।[১৩৯] উল্লেখ্য যে, ছাহাবী বারা ইবনে আযেব (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চেহারাকে ‘পূর্ণ চন্দ্রের’ সাথে তুলনা করেছেন’।[১৪০] যেদিকে ইঙ্গিত করেই ফারসী কবি গেয়েছেন-

---

১৩৮. আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ ১/২০৪ পৃঃ।

১৩৯. মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৬৩ ‘মি‘রাজ’ অধ্যায়।

১৪০. বুখারী হা/৩৩৮০ ‘নবীর গুণাবলী’ অনুচ্ছেদ।

حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری

آنچه خوبه همه دارند تو تنها داری

‘ইউসুফের সৌন্দর্য, ঈসার ফুঁক ও মূসার দীপ্ত হস্ততালু- সবকিছুই যে হে নবী, তোমার মাঝেই একীভূত’।

যুলায়খা-র গর্ভে ইউসুফ (আঃ)-এর দু’টি পুত্র সন্তান হয়। তাদের নাম ছিল ইফরাঈম ও মানশা। ইফরাঈমের একটি পুত্র ও একটি কন্যা সন্তান হয়। পুত্র ছিলেন ‘নূন’ যার পুত্র ‘ইউশা’ নবী হন এবং কন্যা ছিলেন ‘লাইয়া’ অথবা ‘রাহ্‌মাহ’, যিনি আইয়ূব (আঃ)-এর স্ত্রী ছিলেন’।[১৪১] উল্লেখ্য যে, বিগত নবীদের বংশ তালিকার অধিকাংশ নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত নয়। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

মিসরে ইউসুফের সময়কাল :

মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্ব (৮০-১৫০ হিঃ) বলেন, ঐ সময় মিসরের সম্রাট ছিলেন ‘আমালেক্বা’ জাতির জনৈক রাইয়ান ইবনে ওয়ালীদ। তিনি পরবর্তীকালে ইউসুফের কাছে মুসলমান হন এবং ইউসুফকে মিসরের সর্বময় ক্ষমতায় বসিয়ে বলেন, لستُ أعظَمَ منك إلا بالكرسى ‘আমি আপনার চাইতে বড় নই, সিংহাসন ব্যতীত’। এ সময় ইউসুফের বয়স ছিল মাত্র ৩০ বছর।[১৪২] পক্ষান্তরে তারীখুল আম্বিয়ার লেখক বলেন, ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনীতে মিসরে যুগ যুগ ধরে রাজত্বকারী ফেরাঊন রাজাদের কোন উল্লেখ না থাকায় অনেকে প্রমাণ করেন যে, ঐ সময় ‘হাকসূস’ রাজারা (ملوك الهكسوس) ফেরাঊনদের হটিয়ে মিসর দখল করেন এবং দু’শো বছর যাবত তারা সেখানে রাজত্ব করেন। যা ছিল ঈসা (আঃ)-এর আবির্ভাবের প্রায় দু’হাযার বছর পূর্বের ঘটনা’।[১৪৩]

উল্লেখ্য যে, ইউসুফ (আঃ)-এর সময়কাল ছিল ঈসা (আঃ)-এর অন্যূন আঠারশ’ বছর পূর্বেকার। তবে সুলায়মান মানছূরপুরী বলেন, আনুমানিক

---

১৪১. ইবনু কাছীর, ইউসুফ ৫৬-৫৭।
১৪২. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ ১/১৯৬-১৯৭ পৃঃ।
১৪৩. তারীখুল আম্বিয়া পৃঃ ১/১২৪ পৃঃ।

১৬৮৬ বছর পূর্বের। হ’তে পারে কেউ ইউসুফের সময়কালের শুরু থেকে এবং কেউ তাঁর মৃত্যু থেকে হিসাব করেছেন। তবে তাঁর সময় থেকেই বনু ইস্রাঈলগণ মিসরে বসবাস শুরু করে।

শৈশবে ইউসুফের লালন-পালন ও চুরির ঘটনা :

হাফেয ইবনু কাছীর বর্ণনা করেন যে, ইউসুফ-এর জন্মের কিছুকাল পরেই বেনিয়ামীন জন্মগ্রহণ করেন। বেনিয়ামীন জন্মের পরপরই তাদের মায়ের মৃত্যু ঘটে।[১৪৪] তখন মাতৃহীন দুই শিশুর লালন-পালনের ভার তাদের ফুফুর উপরে অর্পিত হয়। আল্লাহ তা‘আলা ইউসুফকে এত বেশী রূপ-লাবণ্য এবং মায়াশীল ব্যবহার দান করেছিলেন যে, যেই-ই তাকে দেখত, সেই-ই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ত। ফুফু তাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। একদণ্ড চোখের আড়াল হ’তে দিতেন না। এদিকে বিপত্নীক ইয়াকূব (আঃ) মাতৃহীনা দুই শিশু পুত্রের প্রতি স্বাভাবিকভাবেই অধিকতর দুর্বল এবং সর্বদা ব্যাকুল থাকতেন। ইতিমধ্যে ইউসুফ একটু বড় হ’লে এবং হাঁটাচলা করার মত বয়স হ’লে পিতা ইয়াকূব (আঃ) তাকে ফুফুর নিকট থেকে আনতে চাইলেন। কিন্তু ফুফু তাকে ছাড়তে নারায। ওদিকে পিতাও তাকে নিয়ে আসতে সংকল্পবদ্ধ। শুরু হ’ল পিতা ও ফুফুর মধ্যে মহব্বতের টানাপড়েন। ফলে ঘটে গেল এক অঘটন।

অধিক পীড়াপীড়ির কারণে ইউসুফকে যখন তার পিতার হাতে তুলে দিতেই হ’ল, তখন স্নেহান্ধ ফুফু গোপনে এক ফন্দি করলেন। তিনি স্বীয় পিতা হযরত ইসহাক্ব (আঃ)-এর নিকট থেকে যে একটা হাঁসুলি পেয়েছিলেন এবং যেটাকে অত্যন্ত মূল্যবান ও বরকতময় মনে করা হ’ত, ফুফু সেই হাঁসুলিটিকে ইউসুফ-এর কাপড়ের নীচে গোপনে বেঁধে দিলেন।

অতঃপর ইউসুফ তার পিতার সাথে চলে যাওয়ার পর ফুফু জোরেশোরে প্রচার শুরু করলেন যে, তার মূল্যবান হাঁসুলিটি চুরি হয়ে গেছে। পরে তল্লাশী করে তা ইউসুফের কাছে পাওয়া গেল। ইয়াকূবী শরী‘আতের বিধান অনুযায়ী ফুফু ইউসুফকে তার গোলাম হিসাবে রাখার অধিকার পেলেন। ইয়াকূব (আঃ)ও দ্বিরুক্তি না করে সন্তানকে তার ফুফুর হাতে পুনরায় সমর্পণ করলেন। এরপর যতদিন ফুফু জীবিত ছিলেন, ততদিন ইউসুফ তার কাছেই রইলেন।[১৪৫]

---

১৪৪. আল-বিদায়াহ ১/১৮৪ পৃঃ।
১৪৫. তাফসীর ইবনে কাছীর, ইউসুফ ৭৭।

এই ছিল ঘটনা, যাতে ইউসুফ নিজের অজান্তে চুরির অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। এরপর বিষয়টি সবার কাছে দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল যে, তিনি ছিলেন এ ব্যাপারে একেবারেই নির্দোষ। ফুফুর অপত্য স্নেহই তাকে ঘিরে এ চক্রান্ত জাল বিস্তার করেছিল। এ সত্য কথাটি তার সৎভাইদেরও জানা ছিল। কিন্তু এটাকেই তারা ইউসুফের মুখের উপরে বলে দেয় যখন আরেক বানোয়াট চুরির অভিযোগে বেনিয়ামীনকে মিসরে গ্রেফতার করা হয়। ইউসুফ তাতে দারুণ মনোকষ্ট পেলেও তা চেপে রাখেন।

বলা বাহুল্য, শৈশবে যেমন ইউসুফ স্বীয় ফুফুর স্নেহের ফাঁদে পড়ে চোর (?) সাব্যস্ত হয়ে ফুফুর গোলামী করেন, যৌবনে তেমনি যুলায়খার চক্রান্তে পড়ে মিথ্যা অপবাদে অন্যূন সাত বছর জেল খাটেন- যে ঘটনা পরে বর্ণিত হবে।

ইউসুফ-এর স্বপ্ন :

বালক ইউসুফ একদিন তার পিতা ইয়াকূব (আঃ)-এর কাছে এসে বলল,

إِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِأَبِيْهِ يَا أَبتِ إِنِّيْ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِيْ سَاجِدِيْنَ-

‘আমি স্বপ্ন দেখেছি যে, ১১টি নক্ষত্র এবং সূর্য ও চন্দ্র আমাকে সিজদা করছে’। একথা শুনে পিতা বললেন, قَالَ يَا بُنَيَّ لاَ تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُواْ لَكَ كَيْداً إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ- ‘বৎস, তোমার ভাইদের সামনে এ স্বপ্ন বর্ণনা করো না। তাহ’লে ওরা তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু *(ইউসুফ ১২/৪-৫)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) ও ক্বাতাদাহ বলেন, এগারোটি নক্ষত্রের অর্থ হচ্ছে ইউসুফ (আঃ)-এর এগারো ভাই এবং সূর্য ও চন্দ্রের অর্থ পিতা ও মাতা বা খালা’।[১৪৬] বস্তুতঃ এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রকাশ পায় যখন মিসরে পিতা-পুত্রের মিলন হয়।

উল্লেখ্য যে, স্বপ্ন ব্যাখ্যা করা জ্ঞানের একটি পৃথক শাখা। হযরত ইবরাহীম, ইসহাক্ব ও ইয়াকূব সকলে এ বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। সম্ভবতঃ একারণেই ইয়াকূব (আঃ) নিশ্চিত ধারণা করেছিলেন যে, বালক ইউসুফ একদিন নবী

---

১৪৬. কুরতুবী, ইউসুফ ৪, ১০০ আয়াত।

হবে। হযরত ইউসুফকেও আল্লাহ এ ক্ষমতা দান করেছিলেন। যেমন আল্লাহ এদিকে ইঙ্গিত দিয়ে বলেন,

وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيْلِ الأَحَادِيْثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوْبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ- (يوسف ٦)-

‘এমনিভাবে তোমার পালনকর্তা তোমাকে মনোনীত করবেন (নবী হিসাবে) এবং তোমাকে শিক্ষা দিবেন বাণী সমূহের (অর্থাৎ স্বপ্নাদিষ্ট বাণী সমূহের) নিগুঢ় তত্ত্ব এবং পূর্ণ করবেন স্বীয় অনুগ্রহ সমূহ (যেমন মিসরের রাজত্ব, সর্বোচ্চ সম্মান ও ধন-সম্পদ লাভ এবং পিতার সাথে মিলন প্রভৃতি) তোমার প্রতি ও ইয়াকূব-পরিবারের প্রতি, যেমন তিনি পূর্ণ করেছিলেন ইতিপূর্বে তোমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাক্বের প্রতি। নিশ্চয়ই তোমার পালনকর্তা সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়’ *(ইউসুফ ১২/৬)*।

উপরোক্ত ৫ ও ৬ আয়াতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি ফুটে ওঠে। যেমন, (১) ইয়াকূব (আঃ) ইউসুফের দেখা স্বপ্নকে একটি সত্য স্বপ্ন হিসাবে গণ্য করেছিলেন এবং এটাও উপলব্ধি করেছিলেন যে, ইউসুফ-এর জীবনে একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে। সেজন্য তার জীবনে আসতে পারে কঠিন পরীক্ষা সমূহ। (২) ভাল স্বপ্নের কথা এমন লোকের কাছে বলা উচিত নয়, যারা তার হিতাকাংখী নয়। সেজন্যেই ইযাকূব (আঃ) বালক ইউসুফকে তার স্বপ্ন বৃত্তান্ত তার সৎ ভাইদের কাছে বলতে নিষেধ করেছিলেন। (৩) ইউসুফকে আল্লাহ তিনটি নে‘মত দানের সুসংবাদ দেন। (ক) আল্লাহ তাকে মনোনীত করেছেন নবী হিসাবে (খ) তাকে স্বপ্ন বৃত্তান্ত ব্যাখ্যা করার যোগ্যতা দান করবেন (গ) তার প্রতি স্বীয় নে‘মত সমূহ পূর্ণ করবেন। বলা বাহুল্য, এগুলির প্রতিটিই পরবর্তীতে বাস্তবায়িত হয়েছে অত্যন্ত সুন্দরভাবে, যা আমরা পরবর্তী কাহিনীতে অবলোকন করব।

এক্ষণে ইউসুফকে উপরোক্ত ৬ আয়াতে বর্ণিত অহী আল্লাহ কখন নাযিল করেছিলেন, সে বিষয়ে স্পষ্টভাবে কিছু জানা যায় না। তবে ১৫ আয়াতের মর্মে বুঝা যায় যে, তাঁকে কূপে নিক্ষেপ করার আগেই উপরোক্ত অহীর মাধ্যমে তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়। এটি নবুঅতের ‘অহিয়ে কালাম’ ছিল না।

বরং এটি ছিল মূসার মায়ের কাছে অহী করার ন্যায় 'অহিয়ে ইলহাম'। কেননা নবুঅতের 'অহি' সাধারণতঃ চল্লিশ বছর বয়সে হয়ে থাকে।

ভাইদের হিংসার শিকার হলেন :

এটা একটা স্বভাবগত রীতি যে, বিমাতা ভাইয়েরা সাধারণতঃ পরস্পরের বিদ্বেষী হয়ে থাকে। সম্ভবতঃ এই বিদ্বেষ যাতে মাথাচাড়া না দেয়, সেকারণ ইয়াকূব (আঃ) একই শ্বশুরের পরপর তিন মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। এরপরেও শ্বশুর ছিলেন আপন মামু। পরস্পরে রক্ত সম্পর্কীয় এবং ঘনিষ্ঠ নিকটাত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও এবং নবী পরিবারের সার্বক্ষণিক দ্বীনী পরিবেশ ও নৈতিক প্রশিক্ষণ থাকা সত্ত্বেও বৈমাত্রেয় হিংসার কবল থেকে ইয়াকূব (আঃ)-এর দ্বিতীয় পক্ষের সন্তানেরা রক্ষা পায়নি। তাই বলা চলে যে, ইউসুফের প্রতি তার সৎভাইদের হিংসার **প্রথম** কারণ ছিল বৈমাত্রেয় বিদ্বেষ। **দ্বিতীয়** কারণ ছিল- সদ্য মাতৃহীন শিশু হওয়ার কারণে তাদের দু'ভাইয়ের প্রতি পিতার স্বভাবগত স্নেহের আধিক্য। **তৃতীয়** কারণ ছিল, ইউসুফের অতুলনীয় রূপ-লাবণ্য, অনিন্দ্যসুন্দর দেহসৌষ্ঠব, আকর্ষণীয় ব্যবহার-মাধুর্য এবং অনন্য সাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। **চতুর্থ** ইউসুফের স্বপ্নবৃত্তান্তের কথা যেকোন ভাবেই হৌক তাদের কানে পৌঁছে যাওয়া। বলা চলে যে, শেষোক্ত কারণটিই তাদের হিংসার আগুনে ঘৃতাহুতি দেয় এবং তাকে দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দেওয়ার শয়তানী চক্রান্তে তারা প্ররোচিত হয়। কিন্তু শয়তান যতই চক্রান্ত করুক, আল্লাহ বলেন, إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيْفًا- 'শয়তানের চক্রান্ত সর্বদাই দুর্বল হয়ে থাকে' *(নিসা ৪/৭৬)*। ইউসুফের মধ্যে ভবিষ্যৎ নবুঅত লুকিয়ে আছে বুঝতে পেরেই ইয়াকূব (আঃ) তার প্রতি অধিক স্নেহশীল ছিলেন। আর সেকারণে সৎ ভাইয়েরাও ছিল অধিক হিংসাপরায়ণ। বস্তুতঃ এই হিংসাত্মক আচরণের মধ্যেই লুকিয়ে ছিল ইউসুফের ভবিষ্যৎ উন্নতির সোপান।

ইউসুফ অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত হ'লেন :

দশ জন বিমাতা ভাই মিলে ইউসুফকে হত্যার ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের জন্য তাকে জঙ্গলে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রতারণার আশ্রয় নিল। তারা একদিন পিতা ইয়াকূব (আঃ)-এর কাছে এসে ইউসুফকে সাথে নিয়ে পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে

আনন্দ ভ্রমণে যাবার প্রস্তাব করল। তারা পিতাকে বলল যে, 'আপনি তাকে আগামীকাল আমাদের সাথে প্রেরণ করুন। সে আমাদের সঙ্গে যাবে, তৃপ্তিসহ খাবে আর খেলাধূলা করবে এবং আমরা অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষণ করব'। জবাবে পিতা বললেন, আমার ভয় হয় যে, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে, আর কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে তাকে বাঘে খেয়ে ফেলবে'। 'তারা বলল, আমরা এতগুলো ভাই থাকতে তাকে বাঘে খেয়ে ফেলবে, তাহ'লে তো আমাদের সবই শেষ হয়ে যাবে' *(ইউসুফ ১২/১২-১৪)*। উল্লেখ্য যে, কেন'আন অঞ্চলে সে সময়ে বাঘের প্রাদুর্ভাব ছিল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখাত বর্ণিত হয়েছে যে, ইয়াকূব (আঃ) পূর্বরাতে স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, তিনি পাহাড়ের উপরে আছেন। নীচে পাহাড়ের পাদদেশে ইউসুফ খেলা করছে। হঠাৎ দশটি বাঘ এসে তাকে ঘেরাও করে ফেলে এবং আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। কিন্তু তাদের মধ্যকার একটি বাঘ এসে তাকে মুক্ত করে দেয়। অতঃপর ইউসুফ মাটির ভিতরে লুকিয়ে যায়'। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, উক্ত স্বপ্নের ব্যাখ্যা অনুযায়ী ইয়াকূব (আঃ) তার দশ পুত্রকেই দশ ব্যাঘ্র গণ্য করেছিলেন। কিন্তু তাদের কাছে রূপকভাবে সেটা পেশ করেন। যাতে তারা বুঝতে না পারে *(কুরতুবী)*।

যাইহোক ছেলেদের পীড়াপীড়িতে অবশেষে তিনি রাযী হলেন। কিন্তু তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলেন যাতে তারা ইউসুফকে কোনরূপ কষ্ট না দেয় এবং তার প্রতি সর্বদা খেয়াল রাখে। অতঃপর তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র ইয়াহুদা বা রুবীল-এর হাতে ইউসুফকে সোপর্দ করলেন এবং বললেন, তুমিই এর খাওয়া-দাওয়া ও অন্যান্য সকল ব্যাপারে দেখাশুনা করবে। কিন্তু জঙ্গলে পৌঁছেই শয়তানী চক্রান্ত বাস্তবায়নের জন্য তারা তৎপর হয়ে উঠলো। তারা ইউসুফকে হত্যা করার জন্য প্রস্তুত হ'ল। তখন বড় ভাই ইয়াহুদা তাদের বাধা দিল এবং পিতার নিকটে তাদের অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিল। কিন্তু শয়তান তাদেরকে আরও বেশী যেদী করে তুলল। অবশেষে বড় ভাই একা পেরে না উঠে প্রস্তাব করল, বেশ তবে ওকে হত্যা না করে বরং ঐ দূরের একটা পরিত্যক্ত কূয়ায় ফেলে দাও। যাতে কোন পথিক এসে ওকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। তাতে তোমাদের দু'টো লাভ হবে। এক- সে পিতার কাছ থেকে দূরে চলে যাবে ও তোমরা তখন পিতার নিকটবর্তী হবে। দুই- নিরপরাধ বালককে হত্যা করার পাপ থেকে তোমরা বেঁচে যাবে।

ভাইদের এই চক্রান্তের কথা আল্লাহ ব্যক্ত করেছেন নিম্নোক্তভাবে-

لَقَدْ كَانَ فِيْ يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِيْنَ، إِذْ قَالُواْ لَيُوْسُفُ وَأَخُوْهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِيْ ضَلاَلٍ مُّبِيْنٍ، اقْتُلُواْ يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوْهُ أَرْضاً يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُوْنُواْ مِن بَعْدِهِ قَوْماً صَالِحِيْنَ، قَالَ قَآئِلٌ مَّنْهُمْ لاَ تَقْتُلُواْ يُوْسُفَ وَأَلْقُوْهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنتُمْ فَاعِلِيْنَ- (يوسف ٧-١٠)-

‘নিশ্চয়ই ইউসুফ ও তার ভাইদের কাহিনীতে জিজ্ঞাসুদের জন্য রয়েছে নিদর্শনাবলী’ *(৭)*। ‘যখন তারা বলল, অবশ্যই ইউসুফ ও তার ভাই আমাদের পিতার কাছে আমাদের চাইতে অধিক প্রিয়। অথচ আমরা একটা ঐক্যবদ্ধ শক্তি বিশেষ। নিশ্চয়ই আমাদের পিতা স্পষ্ট ভ্রান্তিতে রয়েছেন’ *(৮)*। ‘তোমরা ইউসুফকে হত্যা কর অথবা তাকে কোথাও ফেলে আস। এতে শুধু তোমাদের প্রতিই তোমাদের পিতার মনোযোগ নিবিষ্ট হবে এবং এরপর তোমরাই (পিতার নিকটে) যোগ্য বিবেচিত হয়ে থাকবে’ *(৯)*। ‘তখন তাদের মধ্যেকার একজন (বড় ভাই) বলে উঠল, তোমরা ইউসুফকে হত্যা করো না, বরং ফেলে দাও তাকে অন্ধকূপে, যাতে কোন পথিক তাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়, যদি একান্তই তোমাদের কিছু করতে হয়’ *(ইউসুফ ১২/৭-১০)*।

বড় ভাইয়ের কথায় সবাই একমত হয়ে ইউসুফকে কূয়ার ধারে নিয়ে গেল। এ সময় তারা তার গায়ের জামা খুলে নিল। নিঃসন্দেহে ধরে নেওয়া যায় যে, এ সময় ৬/৭ বছরের কচি বালক ইউসুফ তার ভাইদের কাছে নিশ্চয়ই কান্নাকাটি করে প্রাণভিক্ষা চেয়েছিল। কিন্তু শয়তান তাদেরকে হিংসায় উন্মত্ত করে দিয়েছিল। এই কঠিন মুহূর্তে ইউসুফকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আল্লাহ তার নিকটে অহী নাযিল করেন। নিঃসন্দেহে এটি নবুঅতের অহী ছিল না। কেননা সাধারণতঃ চল্লিশ বছর বয়স হওয়ার পূর্বে আল্লাহ কাউকে নবী করেন না। এ অহী ছিল সেইরূপ, যেরূপ অহী বা ইলহাম এসেছিল শিশু মূসার মায়ের কাছে মূসাকে বাক্সে ভরে নদীতে ভাসিয়ে দেবার জন্য *(ত্বোয়াহা ২০/৩৮-৩৯)*।

এ সময়কার মর্মন্তুদ অবস্থা আল্লাহ বর্ণনা করেন এভাবে,

فَلَمَّا ذَهَبُوْا بِهِ وَأَجْمَعُوْا أَن يَجْعَلُوْهُ فِيْ غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَـــذَا وَهُمْ لاَ يَشْعُرُوْنَ- (يوسف ١٥)-

'যখন তারা তাকে নিয়ে চলল এবং অন্ধকূপে নিক্ষেপ করতে একমত হ'ল, এমতাবস্থায় আমি তাকে (ইউসুফকে) অহী (ইলহাম) করলাম যে, (এমন একটা দিন আসবে, যখন) অবশ্যই তুমি তাদেরকে তাদের এ কুকর্মের কথা অবহিত করবে। অথচ তারা তোমাকে চিনতে পারবে না' *(ইউসুফ ১২/১৫)*।

ইমাম কুরতুবী বলেন যে, কূপে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পূর্বেই অথবা পরে ইউসুফকে সান্ত্বনা ও মুক্তির সুসংবাদ দিয়ে এ অহী নাযিল হয়েছিল। ইউসুফকে তার ভাইয়েরা কূপে নিক্ষেপ করল। সেখানেও আল্লাহ তাকে সাহায্য করলেন। তিনি কূয়ার নীচে একখণ্ড পাথরের উপরে স্বচ্ছন্দে বসে পড়লেন। বড় ভাই ইয়াহুদা গোপনে তার জন্য দৈনিক একটা পাত্রের মাধ্যমে উপর থেকে খাদ্য ও পানীয় নামিয়ে দিত এবং দূর থেকে সর্বক্ষণ তদারকি করত।

পিতার নিকটে ভাইদের কৈফিয়ত :

ইউসুফকে অন্ধকূপে ফেলে দিয়ে একটা ছাগলছানা যবেহ করে তার রক্ত ইউসুফের পরিত্যক্ত জামায় মাখিয়ে তারা সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরল এবং কাঁদতে কাঁদতে পিতার কাছে হাযির হয়ে ইউসুফকে বাঘে নিয়ে গেছে বলে কৈফিয়ত পেশ করল। প্রমাণ স্বরূপ তারা ইউসুফের রক্ত মাখা জামা পেশ করল। হতভাগারা এটা বুঝেনি যে, বাঘে নিয়ে গেলে জামাটা খুলে রেখে যায় না। আর খুললেও বাঘের নখের আঁচড়ে জামা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবার কথা। তাছাড়া যে পিতার কাছে তারা মিথ্যা কৈফিয়ত পেশ করছে, তিনি একজন নবী। অহীর মাধ্যমে তিনি সবই জানতে পারবেন। কিন্তু হিংসায় অন্ধ হয়ে গেলে মানুষ সবকিছু ভুলে যায়।

ইউসুফের ভাইদের দেওয়া কৈফিয়ত ও পিতার প্রতিক্রিয়া আল্লাহ বর্ণনা করেন নিম্নোক্ত রূপে,

وَجَاؤُوْا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَّبْكُوْنَ، قَالُوْا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِيْنَ، وَجَآؤُوْا عَلَى قَمِيْصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُوْنَ- (يوسف ١٦-١٨)-

'তারা (ভাইয়েরা) রাতের বেলায় কাঁদতে কাঁদতে পিতার কাছে এল'। 'এবং বলল, হে পিতা! আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করছিলাম এবং ইউসুফকে আসবাবপত্রের কাছে বসিয়ে রেখেছিলাম। এমতাবস্থায় তাকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে। আপনি তো আমাদেরকে বিশ্বাস করবেন না, যদিও আমরা সত্যবাদী'। 'এ সময় তারা তার মিথ্যা রক্ত মাখানো জামা হাযির করল। (এটা দেখে অবিশ্বাস করে ইয়াকূব বললেন, কখনোই নয়) বরং তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটা কথা তৈরী করে দিয়েছে। (এখন আর করার কিছুই নেই), অতএব 'ছবর করাই শ্রেয়। তোমরা যা কিছু বললে তাতে আল্লাহই আমার একমাত্র সাহায্যস্থল' *(ইউসুফ ১২/১৬-১৮)*।

কাফেলার হাতে ইউসুফ :

সিরিয়া থেকে মিসরে যাওয়ার পথে একটি ব্যবসায়ী কাফেলা পথ ভুলে জঙ্গলের মধ্যে উক্ত পরিত্যক্ত কূয়ার নিকটে এসে তাঁবু ফেলে।[১৪৭] তারা পানির সন্ধানে তাতে বালতি নিক্ষেপ করল। কিন্তু বালতিতে উঠে এল তরতাযা সুন্দর একটি বালক 'ইউসুফ'। সাধারণ দৃষ্টিতে এটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা মনে হ'লেও সবকিছুই ছিল আল্লাহ্র পূর্ব পরিকল্পিত এবং পরস্পর সংযুক্ত অটুট ব্যবস্থাপনারই অংশ। ইউসুফকে উদ্ধার করার জন্যই আল্লাহ উক্ত কাফেলাকে পথ ভুলিয়ে এখানে এনেছেন। তাঁর গোপন রহস্য বুঝবার সাধ্য বান্দার নেই। আবুবকর ইবনু আইয়াশ বলেন, ইউসুফ কূয়াতে তিনদিন ছিলেন।[১৪৮] কিন্তু আহলে কিতাবগণ বলেন, সকালে নিক্ষেপের পর সন্ধ্যার আগেই ব্যবসায়ী কাফেলা তাকে তুলে নেয়।[১৪৯] আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

---

১৪৭. কুরতুবী, ইউসুফ ১৯; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ১/১৮৯।
১৪৮. তাফসীর ইবনে কাছীর, ইউসুফ ১৯।
১৪৯. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ১/১৮৮।

কাফেলার মধ্যকার জনৈক ব্যক্তির নিক্ষিপ্ত বালতিতে ইউসুফ উপরে উঠে আসেন। অনিন্দ্য সুন্দর বালক দেখে সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলে উঠলো ‘কি আনন্দের কথা। এ যে একটি বালক!’ এরপর তারা তাকে মালিকবিহীন পণ্যদ্রব্য মনে করে লুকিয়ে ফেলল। কেননা সেযুগে মানুষ কেনাবেচা হ’ত। কিন্তু তারা গোপন করতে পারল না। কারণ ইতিমধ্যে ইউসুফের বড় ভাই এসে কূয়ায় তাকে না পেয়ে অনতিদূরে কাফেলার খোঁজ পেয়ে গেল। তখন সে কাফেলার কাছে গিয়ে বলল, ছেলেটি আমাদের পলাতক গোলাম। তোমরা ওকে আমাদের কাছ থেকে খরিদ করে নিতে পার’। কাফেলা ভাবল খরিদ করে না নিলে চোর সাব্যস্ত হয়ে যেতে পারি। অতএব তারা দশ ভাইকে হাতে গণা কয়েকটি দিরহাম দিয়ে নিতান্ত সস্তা মূল্যে ইউসুফকে খরিদ করে নিল। এর দ্বারা ইউসুফের ভাইদের দু’টি উদ্দেশ্য ছিল। এক- যাতে ইউসুফ তার বাপ-ভাইদের নাম করে পুনরায় বাড়ী ফিরে আসার সুযোগ না পায়। দুই- যাতে ইউসুফ দেশান্তরী হয়ে যায় ও অন্যের ক্রীতদাস হয়ে জীবন অতিবাহিত করে এবং কখনোই দেশে ফিরতে না পারে। এই সময়কার দৃশ্য কল্পনা করতেও গা শিউরে ওঠে। নিজের ভাইয়েরা ইউসুফকে পরদেশী কাফেলার হাতে তাদের পলাতক গোলাম হিসাবে বিক্রি করে দিচ্ছে। নবীপুত্র ইউসুফের মনের অবস্থা ঐ সময় কেমন হচ্ছিল। কল্পনা করা যায় কি? বালক ইউসুফ ঐ সময় বাড়ী যাওয়ার জন্য কান্নাকাটি করাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু তেমন কোন কথা কুরআনে বর্ণিত হয়নি। তাতে মনে হয়, বিক্রয়ের ঘটনাটি তার অগোচরে ঘটেছিল। ভাইদের সাথে পুনরায় দেখা হয়নি (আল্লাহ সর্বাধিক অবগত)। ইউসুফকে কূয়া থেকে উদ্ধার ও পরে পলাতক গোলাম হিসাবে স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করে দেবার ঘটনা আল্লাহ্‌র ভাষায় নিম্নরূপ-

وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَـــذَا غُلاَمٌ وَأَسَرُّوْهُ بِضَاعَةً وَاللهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ- وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةٍ وَكَانُواْ فِيْهِ مِنَ الزَّاهِدِيْنَ- (يوسف ١٩-٢٠)-

‘অতঃপর একটা কাফেলা এল এবং তারা তাদের পানি সংগ্রহকারীকে পাঠালো। সে বালতি নিক্ষেপ করল। (বালতিতে ইউসুফের উঠে আসা দেখে

সে খুশীতে বলে উঠল) কি আনন্দের কথা! এযে একটি বালক! অতঃপর তারা তাকে পণ্যদ্রব্য গণ্য করে গোপন করে ফেলল। আল্লাহ ভালই জানেন, যা কিছু তারা করেছিল'। 'অতঃপর ওরা (ইউসুফের ভাইয়েরা) তাকে কম মূল্যে বিক্রয় করে দিল হাতে গণা কয়েকটি দিরহামের (রৌপ্যমুদ্রার) বিনিময়ে এবং তারা তার (অর্থাৎ ইউসুফের) ব্যাপারে নিরাসক্ত ছিল' *(ইউসুফ ১২/১৯-২০)*। মূলতঃ ইউসুফকে দূরে সরিয়ে দেওয়াই তাদের উদ্দেশ্য ছিল।

ইউসুফ মিসরের অর্থমন্ত্রীর গৃহে :

অন্ধকূপ থেকে উদ্ধার পাওয়ার পর ব্যবসায়ী কাফেলা তাকে বিক্রির জন্য মিসরের বাজারে উপস্থিত করল। মানুষ কেনা-বেচার সেই হাটে এই অনিন্দ্য সুন্দর বালককে দেখে বড় বড় ধনশালী খরিদ্দাররা রীতিমত প্রতিযোগিতা শুরু করল। কিন্তু আল্লাহ পাক তাকে মর্যাদার স্থানে সমুন্নত করতে চেয়েছিলেন। তাই সব খরিদ্দারকে ডিঙিয়ে মিসরের তৎকালীন অর্থ ও রাজস্বমন্ত্রী ক্বিৎফীর (قطفير) তাকে বহুমূল্য দিয়ে খরিদ করে নিলেন। ক্বিৎফীর ছিলেন নিঃসন্তান।

মিসরের অর্থমন্ত্রীর উপাধি ছিল 'আযীয' বা 'আযীয মিছর'। ইউসুফকে ক্রয় করে এনে তিনি তাকে স্বীয় স্ত্রীর হাতে সমর্পণ করলেন এবং বললেন, একে সন্তানের ন্যায় উত্তম রূপে লালন-পালন কর। এর থাকার জন্য উত্তম ব্যবস্থা কর। ভবিষ্যতে সে আমাদের কল্যাণে আসবে'। বস্তুতঃ ইউসুফের কমনীয় চেহারা ও নম্র-ভদ্র ব্যবহারে তাদের মধ্যে সন্তানের মমতা জেগে ওঠে। ক্বিৎফীর তার দূরদর্শিতার মাধ্যমে ইউসুফের মধ্যে ভবিষ্যতের অশেষ কল্যাণ দেখতে পেয়েছিলেন। আর সেজন্য তাকে সর্বোত্তম যত্ন সহকারে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। মূলতঃ এসবই ছিল আল্লাহ্‌র পূর্ব-নির্ধারিত। এ বিষয়ে কুরআনী বক্তব্য নিম্নরূপঃ

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لاِمْرَأَتِهِ أَكْرِمِيْ مَثْوَاهُ عَسَى أَن يَّنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِي الأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيْلِ الأَحَادِيْثِ وَاللهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَـــكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ- (يوسف ٢١)-

‘মিসরে যে ব্যক্তি তাকে ক্রয় করল, সে তার স্ত্রীকে বলল, একে সম্মানজনকভাবে থাকার ব্যবস্থা কর। সম্ভবতঃ সে আমাদের কল্যাণে আসবে অথবা আমরা তাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করে নেব। এভাবে আমরা ইউসুফকে সেদেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম এবং এজন্যে যে তাকে আমরা বাক্যাদির পূর্ণ মর্ম অনুধাবনের পদ্ধতি বিষয়ে শিক্ষা দেই। আল্লাহ স্বীয় কর্মে সর্বদা বিজয়ী। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না’ *(ইউসুফ ১২/২১)*।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, দুনিয়াতে তিন ব্যক্তি ছিলেন সর্বাধিক সূক্ষ্ম দৃষ্টি সম্পন্ন (أفرس الناس ثلاثة)। **একজন** হ’লেন ‘আযীযে মিছর’ (যিনি ইউসুফের চেহারা দেখেই তাঁকে চিনেছিলেন)। **দ্বিতীয়** শো‘আয়েব (আঃ)-এর ঐ কন্যা, যে মূসা (আঃ) সম্পর্কে স্বীয় পিতাকে বলেছিল, হে পিতা! আপনি এঁকে আপনার কর্মসহযোগী হিসাবে রেখে দিন। কেননা উত্তম সহযোগী সেই-ই, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত হয়’ *(ক্বাছাছ ২৮/২৬)*। **তৃতীয়** হযরত আবুবকর ছিদ্দীক্ব, যিনি ওমর ফারূককে পরবর্তী খলীফা নিয়োগ করেছিলেন’।[১৫০]

ইউসুফ যৌবনে পদার্পণ করলেন

আযীযে মিছরের গৃহে কয়েক বছর পুত্র স্নেহে লালিত পালিত হয়ে ইউসুফ অতঃপর যৌবনে পদার্পণ করলেন। আল্লাহ বলেন,

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْماً وَّعِلْماً وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ- (يوسف ٢٢)-

‘অতঃপর যখন সে পূর্ণ যৌবনে পৌঁছে গেল, তখন আমরা তাকে প্রজ্ঞা ও ব্যুৎপত্তি দান করলাম। আমরা এভাবেই সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দিয়ে থাকি’ *(ইউসুফ ১২/২২)*।

উক্ত আয়াতে দু’টি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। পূর্ণ যৌবন প্রাপ্তি এবং প্রজ্ঞা ও ব্যুৎপত্তি লাভ করা। সকলে এ বিষয়ে একমত যে, প্রজ্ঞা ও ব্যুৎপত্তি লাভের অর্থ হ’ল নবুঅত লাভ করা। আর সেটা সাধারণতঃ চল্লিশ বছর বয়সে হয়ে থাকে। অন্যদিকে পূর্ণ যৌবন লাভ তার পূর্বেই হয়। যা বিশ বছর থেকে ত্রিশ

---

১৫০. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ ১/১৮৯; হাকেম ২/৩৭৬ হা/৩৩২০, হাকেম একে ‘ছহীহ’ বলেছেন এবং যাহাবী তা সমর্থন করেছেন।

বা তেত্রিশের মধ্যে হয়ে থাকে। হযরত ইবনু আব্বাস, মুজাহিদ, ক্বাতাদাহ প্রমুখ বিদ্বান তেত্রিশ বছর বলেছেন এবং যাহহাক বিশ বছর বলেছেন। যাহহাক সম্ভবতঃ প্রথম যৌবন এবং ইবনু আব্বাস পূর্ণ যৌবনের কথা বলেছেন।

এক্ষণে ইউসুফের প্রতি যুলায়খার আসক্তির ঘটনা নবুঅত লাভের পূর্বের না পরের, এ বিষয়ে বিদ্বানগণ একমত নন। আমাদের প্রবল ধারণা এই যে, যদিও যৌবন ও নবুঅতের কথা একই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। তথাপি ঘটনা একই সময়ের নয়। নবুঅত তিনি চল্লিশ বছর বয়সেই পেয়েছেন ধরে নিলে যুলায়খার ঘটনা অবশ্যই তার পূর্বে তার পূর্ণ যৌবনেই ঘটেছে। কারণ ঐ সময় ইউসুফের রূপ-লাবণ্য নিশ্চয়ই শৈশবের ও প্রৌঢ় বয়সের চাইতে বেশী ছিল, যা যুলায়খার ধৈর্যচ্যুতি ঘটায়। অথচ ইউসুফের চরিত্রের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। কেননা নবীগণ ছোটবেলা থেকেই পাপ হ'তে পবিত্র থাকেন।

যৌবনের মহা পরীক্ষায় ইউসুফ :

রূপ-লাবণ্যে ভরা ইউসুফের প্রতি মন্ত্রীপত্নী যুলায়খার অন্যায় আকর্ষণ জেগে উঠলো। সে ইউসুফকে খারাব ইঙ্গিত দিতে লাগল। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন,

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِيْ هُوَ فِيْ بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُوْنَ- وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَن رَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ- وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوْءاً إِلاَّ أَن يُّسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ- قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَّفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيْصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الكَاذِبِيْنَ- وَإِنْ كَانَ قَمِيْصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ- فَلَمَّا رَأَى قَمِيْصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمٌ- يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَـــذَا وَاسْتَغْفِرِيْ لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِيْنَ- (يوسف ٢٣-٢٩)-

‘আর সে যে মহিলার বাড়ীতে থাকত, ঐ মহিলা তাকে ফুসলাতে লাগল এবং (একদিন) দরজা সমূহ বন্ধ করে দিয়ে বলল, কাছে এসো! ইউসুফ বলল, আল্লাহ আমাকে রক্ষা করুন! তিনি (অর্থাৎ আপনার স্বামী) আমার মনিব। তিনি আমার উত্তম বসবাসের ব্যবস্থা করেছেন। নিশ্চয়ই সীমা লংঘনকারীগণ সফলকাম হয় না’ *(২৩)*। ‘উক্ত মহিলা তার বিষয়ে কুচিন্তা করেছিল এবং ইউসুফ তার প্রতি (অনিচ্ছাকৃত) কল্পনা করেছিল। যদি না সে স্বীয় পালনকর্তার প্রমাণ অবলোকন করত’ (অর্থাৎ আল্লাহ নির্ধারিত উপদেশদাতা ‘নফসে লাউয়ামাহ’ তথা শাণিত বিবেক যদি তাকে কঠোরভাবে বাধা না দিত)। এভাবেই এটা এজন্য হয়েছে যাতে আমরা তার থেকে যাবতীয় মন্দ ও নির্লজ্জ বিষয় সরিয়ে দেই। নিশ্চয়ই সে আমাদের মনোনীত বান্দাগণের একজন’ *(২৪)*। ‘তারা উভয়ে ছুটে দরজার দিকে গেল এবং মহিলাটি ইউসুফের জামা পিছন দিক থেকে ছিঁড়ে ফেলল। উভয়ে মহিলার স্বামীকে দরজার মুখে পেল। তখন মহিলাটি তাকে বলল, যে ব্যক্তি তোমার স্ত্রীর সাথে অন্যায় বাসনা করে, তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা অথবা (অন্য কোন) যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেওয়া ব্যতীত আর কি সাজা হ’তে পারে’? *(২৫)*। ‘ইউসুফ বলল, সেই-ই আমাকে (তার কুমতলব সিদ্ধ করার জন্য) ফুসলিয়েছে। তখন মহিলার পরিবারের জনৈক ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল যে, যদি ইউসুফের জামা সামনের দিকে ছেঁড়া হয়, তাহ’লে মহিলা সত্য কথা বলেছে এবং ইউসুফ মিথ্যাবাদী’ *(২৬)*। ‘আর যদি তার জামা পিছন দিক থেকে ছেঁড়া হয়, তবে মহিলা মিথ্যা বলেছে এবং ইউসুফ সত্যবাদী’ *(২৭)*। ‘অতঃপর গৃহস্বামী যখন দেখল যে, ইউসুফের জামা পিছন দিক থেকে ছেঁড়া, তখন সে (স্বীয় স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে) বলল, এটা তোমাদের ছলনা। নিঃসন্দেহে তোমাদের ছলনা খুবই মারাত্মক’ *(২৮)*। (অতঃপর তিনি ইউসুফকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন,) ‘ইউসুফ! এ প্রসঙ্গ ছাড়। আর হে মহিলা! এ পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চিতভাবে তুমিই পাপাচারিনী’ *(ইউসুফ ১২/২৩-২৯)*।

মহিলাদের সমাবেশে ইউসুফ :

গৃহস্বামী দু’জনকে নিরস্ত করে ঘটনা চেপে যেতে বললেও ঘটনা চেপে থাকেনি। বরং নানা ডাল-পালা গজিয়ে শহরময় রাষ্ট্র হয়ে গেল যে, আযীযের স্ত্রী স্বীয় পুত্রসম গোলামের সাথে অন্যায় কর্মে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তখন বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য যুলায়খা শহরের উচ্চশ্রেণীর মহিলাদের নিজ

বাড়ীতে ভোজসভায় দাওয়াত দেবার মনস্থ করল। এ বিষয়ে কুরআনী বর্ণনা নিম্নরূপঃ

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِيْنَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيْزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِيْ ضَلاَلٍ مُّبِيْنٍ- فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْناً وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّهِ مَا هَـذَا بَشَراً إِنْ هَـذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيْمٌ- قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِيْ لُمْتُنَّنِيْ فِيْهِ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسَتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوناً مِّنَ الصَّاغِرِيْنَ- (يوسف ٣٠-٣٢)-

'নগরে মহিলারা বলাবলি করতে লাগল যে, আযীযের স্ত্রী স্বীয় গোলামকে অন্যায় কাজে ফুসলিয়েছে। সে তার প্রতি আসক্ত হয়ে গেছে। আমরা তো তাকে প্রকাশ্য ভ্রষ্টতার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি' *(৩০)*। 'যখন সে (অর্থাৎ যুলায়খা) তাদের চক্রান্তের কথা শুনল, তখন তাদের জন্য একটা ভোজসভার আয়োজন করল এবং (ফল কাটার জন্য) তাদের প্রত্যেককে একটা করে চাকু দিল। অতঃপর ইউসুফকে বলল, এদের সামনে চলে এস। (সেমতে ইউসুফ সেখানে এল) অতঃপর যখন তারা তাকে স্বচক্ষে দেখল, তখন সবাই হতভম্ব হয়ে গেল এবং (ফল কাটতে গিয়ে নিজেদের অজান্তে) স্ব স্ব হাত কেটে ফেলল। (ইউসুফের সৌন্দর্য দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে তারা) বলে উঠল, হায় আল্লাহ! এ তো মানুষ নয়। এ যে মর্যাদাবান ফেরেশতা!' *(৩১)*। '(মহিলাদের এই অবস্থা দেখে উৎসাহিত হয়ে) যুলায়খা বলে উঠল, এই হ'ল সেই যুবক, যার জন্য তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করেছ। আমি তাকে প্ররোচিত করেছিলাম। কিন্তু সে নিজেকে সংযত রেখেছে। এক্ষণে আমি তাকে যা আদেশ দেই, তা যদি সে পালন না করে, তাহ'লে সে অবশ্যই কারাগারে নিক্ষিপ্ত হবে এবং সে অবশ্যই লাঞ্ছিত হবে' *(ইউসুফ ১২/৩০-৩২)*।

উপরোক্ত আয়াতে যুলায়খার প্রকাশ্য দম্ভোক্তি থেকে বুঝা যায় যে, উপস্থিত মহিলারাও ইউসুফের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং যুলায়খার কুপ্রস্তাবের সাথে তারাও ঐক্যমত পোষণ করে। যা ইউসুফের প্রার্থনায় বহুবচন ব্যবহার করায়

বুঝা যায়। যেমন এই কঠিন পরীক্ষার সময়ে ইউসুফ আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করে বলেন,

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِيْ إِلَيْهِ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّيْ كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِيْنَ- فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ- (يوسف ٣٣-٣٤)-

‘হে আমার পালনকর্তা! এরা আমাকে যে কাজের দিকে আহ্বান জানাচ্ছে, তার চাইতে কারাগারই আমার নিকটে অধিক পসন্দনীয়। (হে আল্লাহ!) যদি তুমি এদের চক্রান্তকে আমার থেকে ফিরিয়ে না নাও, তবে আমি (হয়ত) তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং আমি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব’। ‘অতঃপর তার পালনকর্তা তার প্রার্থনা কবুল করলেন ও তাদের চক্রান্ত প্রতিহত করলেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ’ *(ইউসুফ ১২/৩৩-৩৪)*।

শহরের সম্ভ্রান্ত মহিলাদের নিজ বাড়ীতে জমা করে তাদের সামনে যুলায়খার নিজের লাম্পট্যকে প্রকাশ্যে বর্ণনার মাধ্যমে একথাও অনুমিত হয় যে, সে সময়কার মিসরীয় সমাজে বেহায়াপনা ও ব্যভিচার ব্যাপকতর ছিল।

নবীগণ নিষ্পাপ মানুষ ছিলেন :

ইউসুফের প্রার্থনায় ‘আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব’ কথার মধ্যে এ সত্য ফুটে উঠেছে যে, নবীগণ মানুষ ছিলেন এবং মনুষ্যসুলভ স্বাভাবিক প্রবণতা তাদের মধ্যেও ছিল। তবে আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ ও ব্যবস্থাধীনে তাঁরা যাবতীয় কবীরা গোনাহ হ’তে মুক্ত থাকেন এবং নিষ্পাপ থাকেন। বেগানা নারী ও পুরুষের মাঝে চৌম্বিক আকর্ষণ এটা আল্লাহ সৃষ্ট প্রবণতা, যা অপরিহার্য। ফেরেশতাদের মধ্যে আল্লাহ এই প্রবণতা ও ক্ষমতা সৃষ্টি করেননি। তাই তারা এসব থেকে স্বাভাবিকভাবেই মুক্ত।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাদীছে কুদসীতে বলেন, আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় ফেরেশতামণ্ডলীকে বলেন, আমার বান্দা যখন কোন সৎকর্মের আকাংখা করে, তখন তার ইচ্ছার কারণে তার আমলনামায় একটা নেকী লিখে দাও। যদি সে সৎকাজটি সম্পন্ন করে, তবে দশটি নেকী লিপিবদ্ধ কর। পক্ষান্তরে যদি কোন পাপকাজের ইচ্ছা করে, অতঃপর আল্লাহ্র ভয়ে তা পরিত্যাগ করে, তখন

পাপের পরিবর্তে তার আমলনামায় একটি নেকী লিখে দাও। আর যদি পাপকাজটি সে করেই ফেলে, তবে একটির বদলে একটি গোনাহ লিপিবদ্ধ কর'।[১৫১]

অতএব ইউসুফ-এর অন্তরে অনিচ্ছাকৃত অপরাধ প্রবণতা সৃষ্টির আশংকাটি কেবল ধারণার পর্যায়ে ছিল। সেটা ছগীরা বা কবীরা কোনরূপ গোনাহের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। নিঃসন্দেহে ইউসুফ ছিলেন নির্দোষ ও নিষ্পাপ এবং পূত চরিত্রের যুবক।

ইউসুফের সাক্ষী কে ছিলেন?

উপরের আলোচনায় ২৬নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا ‘ঐ মহিলার পরিবারের জনৈক ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল’- কিন্তু কে সেই ব্যক্তি, সে বিষয়ে কুরআনে কিছু বলা হয়নি। তবে ইবনু জারীর, আহমাদ, ত্বাবারাণী, হাকেম প্রমুখ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন, যেখানে বলা হয়েছে যে, চারটি শিশু দোলনায় থাকতে কথা বলেছিল। তন্মধ্যে ‘ইউসুফের সাক্ষী’ (شاهد يوسف) হিসাবে একটি শিশুর কথা এসেছে। শায়খ আলবানী বলেন, হাদীছটি যঈফ।[১৫২] কুরতুবী বলেন, উক্ত ব্যক্তি ছিলেন, গৃহস্বামী ‘আযীযে মিছরের’ সাথী তাঁর একান্ত পরামর্শদাতা দূরদর্শী জ্ঞানী ব্যক্তি। যিনি যুলায়খার চাচাতো ভাই ছিলেন। তিনি ইউসুফের জামা সম্মুখ থেকে বা পিছন থেকে ছেঁড়া কি-না প্রমাণ হিসাবে পেশ করার কথা বলেন *(ইউসুফ ১২/২৬-২৮)*। যদি দোলনার শিশু সাক্ষ্য দিত, তাহ’লে সেটা অলৌকিক ঘটনা হ’ত এবং সেটাই যথেষ্ট হ’ত। অন্য কোন প্রমাণের দরকার হতো না'।[১৫৩]

ইউসুফ জেলে গেলেন :

শহরের বিশিষ্ট মহিলাদের সমাবেশে যুলায়খা নির্লজ্জভাবে বলেছিল, ইউসুফ হয় আমার ইচ্ছা পূরণ করবে, নয় জেলে যাবে’। অন্য মহিলারাও যুলায়খাকে

---

১৫১. বুখারী হা/৬১২৬ ‘রিক্বাক্ব’ অধ্যায় ৩১ অনুচ্ছেদ; মুসলিম হা/১৩১ ‘ঈমান’ অধ্যায় ৬১ অনুচ্ছেদ; মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৬৩ ‘মি‘রাজ’ অনুচ্ছেদ।

১৫২. যঈফুল জামে‘ হা/৪৭৬২, ৪৭৭৫।

১৫৩. তাফসীর কুরতুবী, ইউসুফ ২৬-২৮।

সমর্থন করেছিল। এতে বুঝা যায় যে, সে যুগে নারী স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতা চরমে উঠেছিল। তাদের চক্রান্তের কাছে পুরুষেরা অসহায় ছিল। নইলে স্ত্রীর দোষ প্রমাণিত হওয়ার পরেও মন্ত্রী তার স্ত্রীকে শাস্তি দেওয়ার সাহস না করে নির্দোষ ইউসুফকে জেলে পাঠালেন কেন? অবশ্য লোকজনের মুখ বন্ধ করার জন্য ও নিজের ঘর রক্ষার জন্যও এটা হ'তে পারে।

ইউসুফ যখন বুঝলেন যে, এই মহিলাদের চক্রান্ত থেকে উদ্ধার পাওয়ার কোন উপায় নেই, তখন তিনি আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করে বললেন, আল্লাহ এরা আমাকে যে কাজে আহ্বান করছে, তার চেয়ে কারাগারই আমার জন্য শ্রেয়ঃ। আল্লাহ তার দো'আ কবুল করলেন এবং তাদের চক্রান্তকে হটিয়ে দিলেন *(ইউসুফ ১২/২৩-২৪)*। এতে বুঝা যায় যে, চক্রান্তটা একপক্ষীয় ছিল এবং তাতে ইউসুফের লেশমাত্র সম্পৃক্ততা ছিল না। দ্বিতীয়তঃ ইউসুফ যদি জেলখানাকে 'অধিকতর পসন্দনীয়' না বলতেন এবং শুধুমাত্র আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করতেন, তাহ'লে হয়তবা আল্লাহ তার জন্য নিরাপত্তার অন্য কোন ব্যবস্থা করতেন।

যাইহোক আযীযে মিছরের গৃহে বাস করে চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করা অসম্ভব বিবেচনা করে ইউসুফ যুলায়খার হুমকি মতে জেলখানাকেই অধিকতর শ্রেয়ঃ বলেন। ফলে কারাগারই তার জন্য নির্ধারিত হয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলা মহিলাদের চক্রান্তজাল থেকে ইউসুফকে বাঁচানোর জন্য কৌশল করলেন। 'আযীযে মিছর' ও তার সভাসদগণের মধ্যে ইউসুফের সততা ও সচ্চরিত্রতা সম্পর্কে নিশ্চিত ধারণা জন্মেছিল। তথাপি লোকজনের কানা-ঘুষা বন্ধ করার জন্য এবং সর্বোপরি নিজের ঘর রক্ষা করার জন্য ইউসুফকে কিছুদিনের জন্য কারাগারে আবদ্ধ রাখাকেই তারা সমীচীন মনে করলেন এবং সেমতে ইউসুফ জেলে প্রেরিত হলেন। যেমন আল্লাহ বলেন, ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِيْنٍ– 'অতঃপর এসব (সততার) নিদর্শন দেখার পর তারা (আযীয়ে মিছর ও তার সাথীরা) তাকে (ইউসুফকে) কিছুদিন কারাগারে রাখা সমীচীন মনে করল' *(ইউসুফ ১২/৩৫)*।

কারাগারের জীবন :

বালাখানা থেকে জেলখানায় নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর এক করুণ অভিজ্ঞতা শুরু হ'ল ইউসুফের জীবনে। মনোকষ্ট ও দৈহিক কষ্ট, সাথে সাথে স্নেহান্ধ ফুফু ও সন্তানহারা পাগলপরা বৃদ্ধ পিতাকে কেন‘আনে ফেলে আসার মানসিক কষ্ট সব মিলিয়ে ইউসুফের জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিষহ। কেন‘আনে ভাইয়েরা শত্রু, মিসরে যুলায়খা শত্রু। নিরাপদ আশ্রয় কোথাও নেই। অতএব জেলখানাকেই আপাততঃ জীবনসাথী করে নিলেন এবং নিজেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে সমর্পণ করে কয়েদী সাথীদের মধ্যে দ্বীনের দাওয়াতে মনোনিবেশ করলেন। ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে যে, ইউসুফকে আল্লাহ স্বপ্ন ব্যাখ্যা দানের বিশেষ জ্ঞান দান করেছিলেন *(ইউসুফ ১২/৬)*। দ্বীনের দাওয়াতের ক্ষেত্রে এ বিষয়টিও তাঁর জন্য সহায়ক প্রমাণিত হয়।

জেলখানার সাথীদের নিকটে ইউসুফের দাওয়াত :

ইউসুফ কারাগারে পৌঁছলে সাথে আরও দু'জন অভিযুক্ত যুবক কারাগারে প্রবেশ করে। তাদের একজন বাদশাহকে মদ্য পান করাতো এবং অপরজন বাদশাহ্‌র বাবুর্চি ছিল। ইবনু কাছীর তাফসীরবিদগণের বরাত দিয়ে লেখেন যে, তারা উভয়েই বাদশাহ্‌র খাদ্যে বিষ মিশানোর দায়ে অভিযুক্ত হয়ে জেলে আসে। তখনও মামলার তদন্ত চলছিল এবং চূড়ান্ত রায় বাকী ছিল। তারা জেলে এসে ইউসুফের সততা, বিশ্বস্ততা, ইবাদতগুযারী ও স্বপ্ন ব্যাখ্যা দানের ক্ষমতা সম্পর্কে জানতে পারে। তখন তারা তাঁর নৈকট্য লাভে সচেষ্ট হয় এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হয়।

বন্ধুত্বের এই সুযোগকে ইউসুফ তাওহীদের দাওয়াতে কাজে লাগান। তাতে প্রতীতি জন্মে যে, সম্ভবতঃ কারাগারেই ইউসুফকে ‘নবুঅত’ দান করা হয়। ইউসুফের কারা সঙ্গীদ্বয় এবং তাদের নিকটে প্রদত্ত দাওয়াতের বিবরণ আল্লাহ দিয়েছেন নিম্নোক্তভাবে:

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانَ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْراً وَقَالَ الآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزاً تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ- قَالَ لاَ يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلاَّ نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَا

ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ- وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَآئِـي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ- (يوسف ٣٦-٣٨)-

'ইউসুফের সাথে কারাগারে দু'জন যুবক প্রবেশ করল। তাদের একজন বলল, আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি মদ নিঙড়াচ্ছি। অপরজন বলল, আমি দেখলাম যে, আমি মাথায় করে রুটি বহন করছি। আর তা থেকে পাখি খেয়ে নিচ্ছে। আমাদেরকে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিন। কেননা আমরা আপনাকে সৎকর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত দেখতে পাচ্ছি' *(৩৬)*। 'ইউসুফ বলল, তোমাদেরকে প্রত্যহ যে খাদ্য দান করা হয়, তা তোমাদের কাছে আসার আগেই আমি তার ব্যাখ্যা বলে দিতে পারি। এ জ্ঞান আমার পালনকর্তা আমাকে দান করেছেন। আমি ঐসব লোকদের ধর্ম ত্যাগ করেছি, যারা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে না এবং আখেরাতকে অস্বীকার করে' *(৩৭)*। 'আমি আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক্ব ও ইয়াকূবের ধর্ম অনুসরণ করি। আমাদের জন্য শোভা পায় না যে, কোন বস্তুকে আল্লাহ্র অংশীদার করি। এটা আমাদের প্রতি এবং অন্য সব লোকদের প্রতি আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ। কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না' *(ইউসুফ ১২/৩৬-৩৮)*।

অতঃপর তিনি সাথীদের প্রতি তাওহীদের দাওয়াত দিয়ে বলেন,

يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ أَمِ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ- مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ إِلاَّ أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوْهَا أَنْتُمْ وَآبَآؤُكُمْ مَّا أَنزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ، إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ- (يوسف ٣٩-٤٠)-

'হে কারাগারের সাথীদ্বয়! পৃথক পৃথক অনেক উপাস্য ভাল, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ'? 'তোমরা আল্লাহ্কে ছেড়ে নিছক কতগুলো নামের পূজা করে থাক। যেগুলো তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা সাব্যস্ত করে নিয়েছ।

এদের পক্ষে আল্লাহ কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। আল্লাহ ব্যতীত কারু বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তাঁকে ব্যতীত তোমরা অন্য কারু ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না' *(ইউসুফ ১২/৩৯-৪০)*। এভাবে তাওহীদের দাওয়াত দেওয়ার পর তিনি স্বীয় কারা সাথীদ্বয়ের প্রশ্নের জওয়াব দিতে শুরু করলেন।-

يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْراً وَأَمَّا الآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ قُضِيَ الأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ- وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ- (يوسف ٤١-٤٢)-

'হে কারাগারের সাথীদ্বয়! তোমাদের একজন তার মনিবকে মদ্যপান করাবে এবং দ্বিতীয়জন, তাকে শূলে চড়ানো হবে। অতঃপর তার মস্তক থেকে পাখি (ঘিলু) খেয়ে নিবে। তোমরা যে বিষয়ে জানতে আগ্রহী, তার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে'। 'অতঃপর যে ব্যক্তি সম্পর্কে (স্বপ্নের ব্যাখ্যা অনুযায়ী) ধারণা ছিল যে, সে মুক্তি পাবে, তাকে ইউসুফ বলে দিল যে, তুমি তোমার মনিবের কাছে (অর্থাৎ বাদশাহ্র কাছে) আমার বিষয়ে আলোচনা করবে (যাতে আমাকে মুক্তি দেয়)। কিন্তু শয়তান তাকে তার মনিবের কাছে বলার বিষয়টি ভুলিয়ে দেয়। ফলে তাকে কয়েক বছর কারাগারে থাকতে হ'ল' *(ইউসুফ ১২/৪১-৪২)*।

ইউসুফের দাওয়াতে শিক্ষণীয় বিষয় সমূহঃ

(১) দাওয়াত দেওয়ার সময় নিজের পরিচয় স্পষ্টভাবে তুলে ধরা আবশ্যক। যাতে শ্রোতার মনে কোনরূপ দ্বৈত চিন্তা ঘর না করে। ইউসুফ তাঁর দাওয়াতের শুরুতেই বলে দিয়েছেন যে, আমি ঐসব লোকের ধর্ম পরিত্যাগ করেছি, যারা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে না এবং আখেরাতে জবাবদিহিতায় বিশ্বাস করে না' *(ইউসুফ ১২/৩৭)*।

(২) দাওয়াত দেওয়ার সময় নিজের অভিজাত বংশের পরিচয় তুলে ধরা মোটেই অসমীচীন নয়। এতে শ্রোতার মনে দাওয়াতের প্রভাব দ্রুত বিস্তার

লাভ করে। ইউসুফ (আঃ) সেকারণ নিজের নবী বংশের পরিচয় শুরুতেই তুলে ধরেছেন' *(ইউসুফ ১২/৩৮)*।

(৩) শ্রোতার সম্মুখে অনেক সময় নিজের কোন বাস্তব কৃতিত্ব তুলে ধরাও আবশ্যক হয়। যেমন ইউসুফ (আঃ) স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেওয়ার আগে নিজের আরেকটি মু'জেযার কথা বর্ণনা করেন যে, কয়েদীদের খানা আসার আগেই আমি তার প্রকার, গুণাগুণ, পরিমাণ ও আসার সঠিক সময় বলে দিতে পারি *(ইউসুফ ১২/৩৭)*।

(৪) নিজেকে কোনরূপ অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী কিংবা ভবিষ্যদ্বক্তা বলে পেশ করা যাবে না। সেকারণ ইউসুফ সাথে সাথে বলে দিয়েছিলেন যে, 'এ জ্ঞান আমার পালনকর্তা আমাকে দান করেছেন' *(ইউসুফ ১২/৩৭)*।

(৫) প্রশ্নের জওয়াব দানের পূর্বে প্রশ্নকারীর মন-মানসিকতাকে আল্লাহমুখী করে নেওয়া আবশ্যক। সেকারণ ইউসুফ তাঁর মুশরিক কারাসঙ্গীদের জওয়াব দানের পূর্বে তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন *(১২/৩৯)*।

(৬) প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শ্রোতার মস্তিষ্ক যাচাই করে দাওয়াত দেওয়া একটি উত্তম পদ্ধতি। সেজন্য ইউসুফ (আঃ) তাঁর কারা সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করলেন, 'পৃথক পৃথক অনেক উপাস্য ভাল, না পরাক্রমশালী একক উপাস্য ভাল'? *(ইউসুফ ১২/৩৯)*।

(৭) শিরকের অসারতা হাতেনাতে ধরিয়ে দিয়ে মুশরিককে প্রথমেই লা-জওয়াব করে দেওয়া আবশ্যক। সেকারণ ইউসুফ (আঃ) বললেন, তোমরা আল্লাহ্কে ছেড়ে নিছক কিছু নামের পূজা কর মাত্র। এদের পূজা করার জন্য আল্লাহ কোন আদেশ প্রেরণ করেননি' *(ইউসুফ ১২/৪০)*।

(৮) তাওহীদের মূল কথা সংক্ষেপে বা এক কথায় পেশ করা আবশ্যক, যাতে শ্রোতার মগয সহজে সেটা ধারণ করতে পারে। সেজন্য ইউসুফ (আঃ) সোজাসুজি এক কথায় বলে দিলেন, 'আল্লাহ ছাড়া কারু কোন বিধান নেই... এবং এটাই সরল পথ' *(ইউসুফ ১২/৪০)*।

(৯) বিপদ হ'তে মুক্তি কামনা করা ও সেজন্য চেষ্টা করা আল্লাহ্র উপরে তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়। সেজন্য ইউসুফ (আঃ) কারাগার থেকে মুক্তি চেয়েছেন এবং নিরপরাধ হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে যে কারাগারে দুর্বিষহ জীবন

যাপন করতে হচ্ছে, সে বিষয়টি বাদশাহ্‌র কাছে তুলে ধরার জন্য মুক্তিকামী কারা সাথীকে বলে দিলেন *(ইউসুফ ১২/৪২)*।

(১০) বান্দা চেষ্টা করার মালিক। কিন্তু অবশেষে তাক্বদীর জয়লাভ করে। সেকারণ ইউসুফের মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদী বন্ধু বাদশাহ্‌র কাছে তার কথা বলতে ভুলে গেল এবং কয়েক বছর তাকে কয়েদখানায় থাকতে হ'ল। কুরআনে بضع سنين শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে *(ইউসুফ ১২/৪২)*। যা দ্বারা তিন থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যা বুঝানো হয়। অধিকাংশ তাফসীরবিদগণ তাঁর কারাজীবনের মেয়াদ সাত বছর বলেছেন। এভাবে অবশেষে তাক্বদীর বিজয়ী হ'ল। কারণ আল্লাহ্‌র মঙ্গল ইচ্ছা বান্দা বুঝতে পারেনা।

বাদশাহ্‌র স্বপ্ন ও কারাগার থেকে ইউসুফের ব্যাখ্যা দান:

মিসরের বাদশাহ একটি স্বপ্ন দেখলেন এবং এটিই ছিল আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে ইউসুফের কারামুক্তির অসীলা। অতঃপর বাদশাহ তার সভাসদগণকে ডেকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করেন। কিন্তু কেউ জবাব দিতে পারল না। অবশেষে তারা বাদশাহকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বলল, এগুলি 'কল্পনা প্রসূত স্বপ্ন' (أضغاث أحلام) মাত্র। এগুলির কোন বাস্তবতা নেই। কিন্তু বাদশাহ তাতে স্বস্তি পান না। এমন সময় কারামুক্ত সেই খাদেম বাদশাহ্‌র কাছে তার কারাসঙ্গী ও বন্ধু ইউসুফের কথা বলল। তখন বাদশাহ ইউসুফের কাছে স্বপ্ন ব্যাখ্যা জানার জন্য উক্ত খাদেমকে কারাগারে পাঠালেন। সে স্বপ্নব্যাখ্যা শুনে এসে বাদশাহকে সব বৃত্তান্ত বলল। উক্ত বিষয়ে কুরআনী বর্ণনা নিম্নরূপ:

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلاَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، يَا أَيُّهَا الْمَلأُ أَفْتُوْنِيْ فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُوْنَ- قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلاَمٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الأَحْلاَمِ بِعَالِمِيْنَ- (يوسف ٤٣-٤٤)-

'বাদশাহ বলল, আমি স্বপ্নে দেখলাম, সাতটি মোটা-তাজা গাভী, এদেরকে সাতটি শীর্ণ গাভী খেয়ে ফেলছে এবং সাতটি সবুজ শিষ ও অন্যগুলো শুষ্ক। হে সভাসদবর্গ! তোমরা আমাকে আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দাও, যদি

তোমরা স্বপ্ন ব্যাখ্যায় পারদর্শী হয়ে থাক'। 'তারা বলল, এটি কল্পনা প্রসূত স্বপ্ন মাত্র। এরূপ স্বপ্নের ব্যাখ্যা আমাদের জানা নেই' *(ইউসুফ ১২/৪৩-৪৪)*।

'তখন দু'জন কারাবন্দীর মধ্যে যে ব্যক্তি মুক্তি পেয়েছিল, দীর্ঘকাল পরে তার (ইউসুফের কথা) স্মরণ হ'ল এবং বলল, আমি আপনাদেরকে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দেব, আপনারা আমাকে (জেলখানায়) পাঠিয়ে দিন'। 'অতঃপর সে জেলখানায় পৌঁছে বলল, ইউসুফ হে আমার সত্যবাদী বন্ধু! (বাদশাহ স্বপ্ন দেখেছেন যে,) সাতটি মোটাতাজা গাভী, তাদেরকে খেয়ে ফেলছে সাতটি শীর্ণ গাভী এবং সাতটি সবুজ শিষ ও অন্যগুলি শুষ্ক। আপনি আমাদেরকে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিন, যাতে আমি তাদের কাছে ফিরে গিয়ে তা জানাতে পারি' *(ইউসুফ ১২/৪৫-৪৬)*। জবাবে ইউসুফ বলল,

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَأَباً فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تَأْكُلُونَ- ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تُحْصِنُونَ- ثُمَّ يَأْتِيْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ- (يوسف ٤٧-٤٩)-

'তোমরা সাত বছর উত্তমরূপে চাষাবাদ করবে। অতঃপর যখন ফসল কাটবে, তখন খোরাকি বাদে বাকী ফসল শিষ সমেত রেখে দিবে' *(৪৭)*। 'এরপর আসবে দুর্ভিক্ষের সাত বছর। তখন তোমরা খাবে ইতিপূর্বে যা রেখে দিয়েছিলে, তবে কিছু পরিমাণ ব্যতীত যা তোমরা (বীজ বা সঞ্চয় হিসাবে) তুলে রাখবে' *(৪৮)*। 'এরপরে আসবে এক বছর, যাতে লোকদের উপরে বৃষ্টি বর্ষিত হবে এবং তখন তারা (আঙ্গুরের) রস নিঙড়াবে (অর্থাৎ উদ্বৃত্ত ফসল হবে)' *(ইউসুফ ১২/৪৭-৪৯)*।

ঐ খাদেমটি ফিরে এসে স্বপ্ন ব্যাখ্যা বর্ণনা করলে বাদশাহ তাকে বললেন,

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِيْ بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللاَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ- (يوسف ٥٠)-

'তুমি পুনরায় কারাগারে ফিরে যাও এবং তাকে (অর্থাৎ ইউসুফকে) আমার কাছে নিয়ে এস। অতঃপর যখন বাদশাহ্র দূত তার কাছে পৌঁছলো, তখন ইউসুফ তাকে বলল, তুমি তোমার মনিবের (অর্থাৎ বাদশাহ্র) কাছে ফিরে

যাও এবং তাঁকে জিজ্ঞেস কর যে, নগরীর সেই মহিলাদের খবর কি? যারা নিজেদের হাত কেটে ফেলেছিল। আমার পালনকর্তা তো তাদের ছলনা সবই জানেন' *(ইউসুফ ১২/৫০)*।

বাদশাহ্র দূতকে ফেরৎ দানের শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ:

(১) দীর্ঘ কারাভোগের দুঃসহ যন্ত্রণায় অতিষ্ট হয়ে ইউসুফ (আঃ) নিশ্চয়ই মুক্তির জন্য উন্মুখ ছিলেন। কিন্তু বাদশাহ্র পক্ষ থেকে মুক্তির নির্দেশ পাওয়া সত্ত্বেও তিনি দূতকে ফেরত দিলেন। এর কারণ এই যে, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ কারামুক্তির চাইতে তার উপরে আপতিত অপবাদ মুক্তিকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। ইউসুফ (আঃ) সেকারণেই ঘটনার মূলে যারা ছিল, তাদের অবস্থা জানতে চেয়েছিলেন।

(২) তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, জেল থেকে বের হওয়ার আগেই বাদশাহ বা গৃহস্বামী 'আযীযে মিছর' তাঁর ব্যাপারে সন্দেহ মুক্ত কি-না সেটা জেনে নেওয়া এবং ঐ মহিলাদের মুখ দিয়ে তার নির্দোষিতার বিষয়টি প্রকাশিত হওয়া।

(৩) ইউসুফ তার বক্তব্যে 'মহিলাদের' কথা বলেছেন। আযীয-পত্নী যুলায়খার কথা নির্দিষ্টভাবে বলেননি। অথচ সেই-ই ছিল ঘটনার মূল। এটার কারণ ছিল এই যে, (ক) ঐ মহিলাগণ সবাই যুলায়খার কু-প্রস্তাবের সমর্থক হওয়ায় তারা সবাই একই পর্যায়ে চলে এসেছিল (খ) তাছাড়া আরেকটি কারণ ছিল- সৌজন্যবোধ। কেননা নির্দিষ্টভাবে তার নাম নিলে আযীযের মর্যাদায় আঘাত আসত। এতদ্ব্যতীত আযীয ছিলেন ইউসুফের আশ্রয়দাতা ও লালন-পালনকারী। তার প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধের আধিক্য ইউসুফকে আযীয-পত্নীর নাম নিতে দ্বিধান্বিত করেছে। ইউসুফ (আঃ)-এর এবম্বিধ উন্নত আচরণের মধ্যে যেকোন মর্যাদাবান ব্যক্তির জন্য শিক্ষণীয় বিষয় লুকিয়ে রয়েছে।

(৪) ইউসুফ চেয়েছিলেন এ সত্য প্রমাণ করে দিতে যে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে মন্দপ্রবণতা থাকলেও তা নেককার মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহের কারণে। যদি আমি সেই অনুগ্রহ না পেতাম, তাহ'লে হয়ত আমিও পথভ্রষ্ট হয়ে যেতাম। অতএব আল্লাহ্র আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর অনুগ্রহ লাভে সদা সচেষ্ট থাকাই বান্দার সর্বাপেক্ষা বড় কর্তব্য। বস্তুতঃ এইরূপ পবিত্র হৃদয়কে কুরআনে 'নফসে মুত্বমাইন্নাহ' বা প্রশান্ত হৃদয় বলা হয়েছে *(ফাজর ৮৯/২৭)*। যা অর্জন করার জন্য সকলকেই সচেষ্ট হওয়া

উচিত। নবীগণ সবাই ছিলেন উক্ত প্রশান্ত হৃদয়ের অধিকারী। আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহে ইউসুফ (আঃ)ও অনুরূপ পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন এবং তিনি চেয়েছিলেন বাদশাহও তাঁর পবিত্রতা সম্পর্কে নিশ্চিত হৌন।

(৫) পবিত্রতার অহংকারঃ বাদশাহ্র দূতকে ফিরিয়ে দেবার মধ্যে ইউসুফের হৃদয়ে পবিত্রতার যে অহংকার জন্মেছিল, তা প্রত্যেক নির্দোষ মানুষের মধ্যে থাকা উচিত। ইউসুফের এই সাহসী আচরণে অভিভূত হয়ে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) বলেন,

إنَّ الكريمَ ابنَ الكريمِ ابنِ الكريمِ بنِ الكريمِ: يوسفُ بنُ يعقوبَ بنِ اسحاقَ بنِ إبراهيمَ، وَلَو لبِثْتُ فى السجن مالبثَ ثم جاءنى الرسولُ لأَجَبْتُ ثم قرأ (فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُوْلُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللاَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ) ، رواه الترمذى بسند حسن-

‘নিশ্চয়ই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পুত্র সম্ভ্রান্ত, তার পুত্র সম্ভ্রান্ত, তার পুত্র সম্ভ্রান্ত- (তাঁরা হ’লেন) ইবরাহীমের পুত্র ইসহাক্ব, তাঁর পুত্র ইয়াকূব ও তাঁর পুত্র ইউসুফ। যদি আমি অতদিন কারাগারে থাকতাম, যতদিন তিনি ছিলেন, তাহ’লে বাদশাহ্র দূত প্রথমবার আসার সাথে সাথে আমি তার প্রস্তাব কবুল করতাম’। এ কথা বলার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূরা ইউসুফ ৫০ আয়াতটি পাঠ করেন’।[১৫৪]

বাদশাহ্র দরবারে ইউসুফ (আঃ):

কারাগার থেকে পাঠানো ইউসুফের দাবী অনুযায়ী মহিলাদের কাছে বাদশাহ ঘটনার তদন্ত করলেন। আল্লাহ বলেন, বাদশাহ মহিলাদের ডেকে বলল, قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدتُّنَّ يُوْسُفَ عَن نَّفْسِهِ ‘তোমাদের খবর কি যখন তোমরা ইউসুফকে কুকর্মে ফুসলিয়েছিলে? তারা বলল, حَاشَ لِلّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْءٍ ‘আল্লাহ পবিত্র। আমরা তাঁর (ইউসুফ) সম্পর্কে মন্দ কিছুই জানি না’। আযীয-পত্নী বলল, الآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدتُّهُ عَنْ نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ

১৫৪. তিরমিযী হা/৩৩৩২ ‘তাফসীর’ অধ্যায় ১৩ অনুচ্ছেদ ‘সূরা ইউসুফ’; ছহীহ তিরমিযী হা/২৪৯০ সনদ হাসান; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৭০৫ ‘ক্বিয়ামতের অবস্থা’ অধ্যায়, ‘সৃষ্টির সূচনা ও নবীগণের আলোচনা’ অনুচ্ছেদ।

الصَّادِقِينَ 'এখন সত্য প্রকাশিত হ'ল। আমিই তাকে ফুসলিয়েছিলাম এবং সে ছিল সত্যবাদী' *(ইউসুফ ১২/৫১)*। ইতিপূর্বে একবার শহরের মহিলাদের সম্মুখে যুলায়খা উক্ত স্বীকৃতি দিয়ে বলেছিল, لَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسَتَعْصَمَ 'আমি তাকে ফুসলিয়েছিলাম। কিন্তু সে নিজেকে সংযত রেখেছিল' *(ইউসুফ ১২/৩২)*।

অতঃপর আযীয-পত্নী বলল, ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِيْنَ 'এটা (অর্থাৎ এই স্বীকৃতিটা) এজন্যে যেন গৃহস্বামী জানতে পারেন যে, তার অগোচরে আমি তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। বস্তুতঃ আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র সফল করেন না' *(৫২)*। 'আর আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না। নিশ্চয়ই মানুষের মন মন্দপ্রবণ। কেবল ঐ ব্যক্তি ছাড়া যার প্রতি আমার প্রভু দয়া করেন। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(৫৩)*।

এভাবে আযীয-পত্নী ও নগরীর মহিলারা যখন বাস্তব ঘটনা স্বীকার করল, তখন বাদশাহ নির্দেশ দিলেন, ইউসুফকে আমার কাছে নিয়ে এস। কুরআনের ভাষায়- وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِيْ بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِيْ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مِكِيْنٌ أَمِيْنٌ- (يوسف ٥٤)-

'বাদশাহ বলল, তাকে তোমরা আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাকে আমার নিজের জন্য একান্ত সহচর করে নেব। অতঃপর যখন বাদশাহ ইউসুফের সাথে মতবিনিময় করলেন, তখন তিনি তাকে বললেন, নিশ্চয়ই আপনি আজ থেকে আমাদের নিকট বিশ্বস্ত ও মর্যাদাপূর্ণ স্থানের অধিকারী' *(ইউসুফ ১২/৫৪)*।

ইউসুফের অর্থমন্ত্রীর পদ লাভ এবং সাথে সাথে বাদশাহীর ক্ষমতা লাভঃ

কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ফিরে এসে বাদশাহ্র সাথে কথোপকথনের এক পর্যায়ে বাদশাহ যখন দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় দক্ষ ও বিশ্বস্ত লোক কোথায় পাবেন বলে নিজের অসহায়ত্ব প্রকাশ করছিলেন, তখন ইউসুফ (আঃ) নিজেকে এজন্য পেশ করেন। যেমন আল্লাহ্র ভাষায়-

قَالَ اجْعَلْنِيْ عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ إِنِّيْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ- (يوسف ٥٥)-

'ইউসুফ বলল, আপনি আমাকে দেশের ধন-ভাণ্ডারের দায়িত্বে নিয়োজিত করুন। আমি বিশ্বস্ত রক্ষক ও (এ বিষয়ে) বিজ্ঞ' *(ইউসুফ ১২/৫৫)*।

তাঁর এই পদ প্রার্থনা ও নিজের যোগ্যতা নিজ মুখে প্রকাশ করার উদ্দেশ্য নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও অহংকার প্রকাশের জন্য ছিল না। বরং কুফরী হুকূমতের অবিশ্বস্ত ও অনভিজ্ঞ মন্ত্রী ও আমলাদের হাত থেকে আসন্ন দুর্ভিক্ষ পীড়িত সাধারণ জনগণের স্বার্থ রক্ষার জন্য ও তাদের প্রতি দয়ার্দ্র চিত্ততার কারণে ছিল। ইবনু কাছীর বলেন, এর মধ্যে নেতৃত্ব চেয়ে নেওয়ার দলীল রয়েছে ঐ ব্যক্তির জন্য, যিনি কোন বিষয়ে নিজেকে আমানতদার ও যোগ্য বলে নিশ্চিতভাবে মনে করেন'।[১৫৫] কুরতুবী বলেন, যখন কেউ নিশ্চিতভাবে মনে করবেন যে, এ ব্যাপারে তিনি ব্যতীত যোগ্য আর কেউ নেই, তখন তাকে ঐ পদ বা দায়িত্ব চেয়ে নেওয়া ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে যদি অন্য কেউ যোগ্য থাকে, তবে চেয়ে নেওয়া যাবে না। মিসরে ঐ সময় ইউসুফের চাইতে দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় যোগ্য ও আমানতদার কেউ ছিল না বিধায় ইউসুফ উক্ত দায়িত্ব চেয়ে নিয়ে ছিলেন'।[১৫৬] আত্মস্বার্থ হাছিল বা পাপকাজে সাহায্য করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না।

আহলে কিতাবগণের বর্ণনা মতে এই সময় বাদশাহ তাঁকে কেবল খাদ্য মন্ত্রণালয় নয়, বরং পুরা মিসরের শাসন ক্ষমতা অর্পণ করেন এবং বলেন, আমি আপনার চাইতে বড় নই, কেবল সিংহাসন ব্যতীত'। ইবনু ইসহাকের বর্ণনা মতে এ সময় বাদশাহ তাঁর হাতে মুসলমান হন। একথাও বলা হয়েছে যে, এই সময় 'আযীযে মিছর' ক্বিৎফীর মারা যান। ফলে ইউসুফকে উক্ত পদে বসানো হয় এবং তার বিধবা স্ত্রী যুলায়খাকে বাদশাহ ইউসুফের সাথে বিবাহ দেন।[১৫৭] জ্ঞান ও যুক্তি একথা মেনে নিলেও কুরআন এ বিষয়ে কিছু বলেনি। যেমন রাণী বিলক্বীসের মুসলমান হওয়া সম্পর্কে কুরআন স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে *(নমল ২৭/৪৪)*। যেহেতু কুরআন ও হাদীছ এ বিষয়ে কিছু বলেনি, অতএব আমাদের চুপ থাকা উত্তম। আর আহলে কিতাবগণের বর্ণনা বিষয়ে রাসূলের দেওয়া মূলনীতি অনুসরণ করা উচিত যে, তাওরাত ও ইনজীল বিষয়ে আমরা তাদের কথা সত্যও বলব না, মিথ্যাও বলব না বরং আমাদের নিকটে শেষনবীর মাধ্যমে যে বিধান এসেছে, কেবল তারই অনুসরণ করব।।[১৫৮]

---

১৫৫. আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ ১/১৯৬।
১৫৬. তাফসীরে কুরতুবী, ইউসুফ ৫৫।
১৫৭. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ ১/১৯৬-১৯৭।
১৫৮. বুখারী, মিশকাত হা/১৫৫ 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ; মির'আত ১/২৫২।

নবী হিসাবে সুলায়মান (আঃ)-এর যেমন উদ্দেশ্য ছিল বিলক্বীসের মুসলমান হওয়া ও তার রাজ্য থেকে শিরক উৎখাত হওয়া। অনুরূপভাবে নবী হিসাবে ইউসুফ (আঃ)-এরও উদ্দেশ্য থাকতে পারে বাদশাহ্র মুসলমান হওয়া এবং মিসর থেকে শিরক উৎখাত হওয়া ও সর্বত্র আল্লাহ্র বিধান প্রতিষ্ঠিত হওয়া। বাদশাহ যখন তার ভক্ত ও অনুরক্ত ছিলেন এবং নিজের বাদশাহী তাকে সোপর্দ করেছিলেন, তখন ধরে নেওয়া যায় যে, তিনি শিরকী ধ্যান-ধারণা পরিত্যাগ করে তাওহীদের অনুসারী হয়েছিলেন এবং ইউসুফকে নবী হিসাবে স্বীকার করে তাঁর শরী'আতের অনুসারী হয়ে বাকী জীবন কাটিয়েছিলেন। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

এভাবে আল্লাহ্র ইচ্ছায় ইউসুফ (আঃ) মিসরের সর্বোচ্চ পদে সসম্মানে বরিত হ'লেন এবং অন্ধকূপে হারিয়ে যাওয়া ইউসুফ পুনরায় দীপ্ত সূর্যের ন্যায় পৃথিবীতে বিকশিত হয়ে উঠলেন। আল্লাহ বলেন,

وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيْبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ- (يوسف ٥٦)-

'এমনিভাবে আমরা ইউসুফকে সেদেশে প্রতিষ্ঠা দান করি। সে তথায় যেখানে ইচ্ছা স্থান করে নিতে পারত। আমরা আমাদের রহমত যাকে ইচ্ছা তাকে পৌঁছে দিয়ে থাকি এবং আমরা সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করি না' *(ইউসুফ ১২/৫৬)*। উপরোক্ত আয়াতে স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে ইউসুফের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার এবং মিসরের সর্বত্র বিধান জারি করার। ইবনু কাছীর বলেন, এই সময় তিনি দ্বীনী ও দুনিয়াবী উভয় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন'।[১৫৯]

ইউসুফের দক্ষ শাসন ও দুর্ভিক্ষ মুকাবিলায় অপূর্ব ব্যবস্থাপনা:

সুদ্দী, ইবনু ইসহাক্ব, ইবনু কাছীর প্রমুখ বিদ্বানগণ ইসরাঈলী রেওয়ায়াত সমূহের ভিত্তিতে যে বিবরণ দিয়েছেন, তার সারকথা এই যে, ইউসুফ (আঃ)-এর হাতে মিসরের শাসনভার অর্পিত হওয়ার পর স্বপ্নের ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রথম সাত বছর সমগ্র দেশে ব্যাপক ফসল উৎপন্ন হয়। ইউসুফ (আঃ)-এর

---

১৫৯. আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ ১/১৯৭।

নির্দেশক্রমে উদ্বৃত্ত ফসলের বৃহদাংশ সঞ্চিত রাখা হয়। এতে বুঝা যায় যে, আধুনিক কালের এলএসডি, সিএসডি খাদ্য গুদামের অভিযাত্রা বিগত দিনে ইউসুফ (আঃ)-এর মাধ্যমেই শুরু হয়েছিল।

এরপর স্বপ্নের দ্বিতীয় অংশের বাস্তবতা শুরু হয় এবং দেশে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তিনি জানতেন যে, এ দুর্ভিক্ষ সাত বছর স্থায়ী হবে এবং আশপাশের রাজ্যসমূহে বিস্তৃত হবে। তাই সংরক্ষিত খাদ্যশস্য খুব সতর্কতার সাথে ব্যয় করা শুরু করলেন। তিনি ফ্রি বিতরণ না করে স্বল্পমূল্যে খাদ্য বিতরণের সিদ্ধান্ত নেন। সেই সাথে মাথাপ্রতি খাদ্য বিতরণের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ধারণ করে দেন। তাঁর আগাম হুঁশিয়ারি মোতাবেক মিসরীয় জনগণের অধিকাংশের বাড়ীতে সঞ্চিত খাদ্যশস্য মওজূদ ছিল। ফলে পার্শ্ববর্তী দুর্ভিক্ষপীড়িত রাজ্যসমূহ থেকে দলে দলে লোকেরা মিসরে আসতে শুরু করে। ইউসুফ (আঃ) তাদের প্রত্যেককে বছরে এক উট বোঝাই খাদ্য-শস্য স্বল্প মূল্যের বিনিময়ে প্রদানের নির্দেশ দেন।[১৬০] অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হওয়ার কারণে খাদ্য বিতরণের তদারকি ইউসুফ (আঃ) নিজেই করতেন। এতে ধরে নেওয়া যায় যে, খাদ্য-শস্যের সরকারী রেশনের প্রথা বিশ্বে প্রথম ইউসুফ (আঃ)-এর হাতেই শুরু হয়।

ভাইদের মিসরে আগমন:

মিসরের দুর্ভিক্ষ সে দেশের সীমানা পেরিয়ে পার্শ্ববর্তী দূর-দূরান্ত এলাকা সমূহে বিস্তৃত হয়। ইবরাহীম, ইসহাক্ব ও ইয়াকূবের আবাসভূমি কেন‘আনও দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে পতিত হয়। ফলে ইয়াকূবের পরিবারেও অনটন দেখা দেয়। এ সময় ইয়াকূব (আঃ)-এর কানে এ খবর পৌঁছে যায় যে, মিসরের নতুন বাদশাহ অত্যন্ত সৎ ও দয়ালু। তিনি স্বল্পমূল্যে এক উট পরিমাণ খাদ্যশস্য অভাবী ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরণ করছেন। এ খবর শুনে তিনি পুত্রদের বললেন, তোমরাও মিসরে গিয়ে খাদ্যশস্য নিয়ে এসো। সেমতে দশ ভাই দশটি উট নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেল। বৃদ্ধ পিতার খিদমত ও বাড়ী দেখাশুনার জন্য ছোট ভাই বেনিয়ামীন একাকী রয়ে গেল। কেন‘আন থেকে মিসরের রাজধানী প্রায় ২৫০ মাইলের ব্যবধান।

---

১৬০. তাফসীর ইবনু কাছীর, ইউসুফ ৫৮-৬২।

যথাসময়ে দশভাই কেন‘আন থেকে মিসরে উপস্থিত হ’ল। ইউসুফ (আঃ) তাদেরকে চিনে ফেললেন। কিন্তু তারা তাঁকে চিনতে পারেনি। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوْسُفَ فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُوْنَ- (يوسف ٥٨)-

‘ইউসুফের ভাইয়েরা আগমন করল এবং তার কাছে উপস্থিত হ’ল। ইউসুফ তাদেরকে চিনতে পারল। কিন্তু তারা তাকে চিনতে পারেনি’ *(ইউসুফ ১২/৫৮)*।

ইউসুফের কৌশল অবলম্বন ও বেনিয়ামীনের মিসর আগমন :

সুদ্দী ও অন্যান্যদের বরাতে কুরতুবী ও ইবনু কাছীর বর্ণনা করেন যে, দশ ভাই দরবারে পৌঁছলে ইউসুফ (আঃ) তাদেরকে দোভাষীর মাধ্যমে এমনভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করেন, যেমন অচেনা লোকদের করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল তাদের সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া এবং পিতা ইয়াকূব ও ছোটভাই বেনিয়ামীনের বর্তমান অবস্থা জেনে নেওয়া। যেমন তিনি জিজ্ঞেস করেন, তোমরা ভিন্নভাষী এবং ভিনদেশী। আমরা কিভাবে বুঝব যে, তোমরা শত্রুর গুপ্তচর নও? তারা বলল, আল্লাহ্র কসম! আমরা গুপ্তচর নই। আমরা আল্লাহ্র নবী ইয়াকূব (আঃ)-এর সন্তান। তিনি কেন‘আনে বসবাস করেন। অভাবের তাড়নায় তাঁর নির্দেশে সুদূর পথ অতিক্রম করে আপনার কাছে এসেছি আপনার সুনাম-সুখ্যাতি শুনে। যদি আপনি আমাদের সন্দেহ বশে গ্রেফতার করেন অথবা শূন্য হাতে ফিরিয়ে দেন, তাহ’লে আমাদের অতিবৃদ্ধ পিতা-মাতা ও আমাদের দশ ভাইয়ের পরিবার না খেয়ে মারা পড়বে।[১৬১]

একথা শুনে ইউসুফের হৃদয় উথলে উঠল। কিন্তু অতি কষ্টে বুকে পাষাণ চেপে রেখে বললেন, তোমাদের পিতার আরও কোন সন্তান আছে কি?

তারা বলল, আমরা বারো ভাই ছিলাম। তন্মধ্যে এক ভাই ইউসুফ ছোট বেলায় জঙ্গলে হারিয়ে গেছে। আমাদের পিতা তাকেই সর্বাধিক স্নেহ করতেন। অতঃপর তার সহোদর সবার ছোট ভাই বেনিয়ামীন এখন বাড়ীতে আছে পিতাকে দেখাশুনার জন্য। সবকথা শুনে নিশ্চিত হবার পর ইউসুফ (আঃ) তাদেরকে রাজকীয় মেহমানের মর্যাদায় রাখার এবং যথারীতি খাদ্য-

১৬১. *তাফসীর কুরতুবী, ইবনু কাছীর, ইউসুফ ৫৮-৫৯।*

শস্য প্রদানের নির্দেশ দিলেন। অতঃপর বিদায়ের সময় তাদের বললেন, পুনরায় আসার সময় তোমরা তোমাদের ছোট ভাইটিকে সাথে নিয়ে এসো। এ বিষয়ে কুরআনী বর্ণনা নিম্নরূপ-

وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِيْ بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيْكُمْ أَلاَ تَرَوْنَ أَنِّيْ أُوْفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ- فَإِن لَّمْ تَأْتُونِيْ بِهِ فَلاَ كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلاَ تَقْرَبُونِ- قَالُواْ سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ- (يوسف ٥٩-٦١)-

'অতঃপর ইউসুফ যখন তাদের রসদ সমূহ প্রস্তুত করে দিল, তখন বলল, তোমাদের বৈমাত্রেয় ভাইকে আমার কাছে নিয়ে এসো। তোমরা কি দেখছ না যে, আমি মাপ পূর্ণভাবে দিয়ে থাকি এবং মেহমানদের উত্তম সমাদর করে থাকি'? *(৫৯)*। 'কিন্তু যদি তোমরা তাকে আমার কাছে না আনো, তবে আমার কাছে তোমাদের কোন বরাদ্দ নেই এবং তোমরা আমার নিকটে পৌঁছতে পারবে না' *(৬০)*। 'ভাইয়েরা বলল, আমরা তার সম্পর্কে তার পিতাকে রাযী করার চেষ্টা করব এবং আমরা একাজ অবশ্যই করব' *(ইউসুফ ১২/৫৯-৬১)*।

এরপর ইউসুফ (আঃ) কৌশল অবলম্বন করলেন। কেননা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, দশটি উটের সমপরিমাণ খাদ্যমূল্য সংগ্রহ করতে ভাইদের সামর্থ্য নাও হ'তে পারে। অথচ ছোট ভাইকে আনা প্রয়োজন। সেকারণ তিনি কর্মচারীদের বলে দিলেন, খাদ্যমূল্য বাবদ তাদের দেওয়া অর্থ তাদের কোন একটি বস্তার মধ্যে ভরে দিতে। যাতে বাড়ী গিয়ে উক্ত টাকা নিয়ে আবার তারা চলে আসতে পারে। এ বিষয়ে কুরআনী বর্ণনা নিম্নরূপ-

وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوْا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُوْنَهَا إِذَا انْقَلَبُوْا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ- (يوسف ٦٢)-

'ইউসুফ তার কর্মচারীদের বলল, তাদের পণ্যমূল্য তাদের রসদ-পত্রের মধ্যে রেখে দাও, যাতে গৃহে পৌঁছে তারা তা বুঝতে পারে। সম্ভবতঃ তারা পুনরায় আসবে' *(ইউসুফ ১২/৬২)*।

ইউসুফের ভাইয়েরা যথাসময়ে বাড়ী ফিরে এল। বস্তা খুলে পণ্যমূল্য ফেরত পেয়ে তারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। তারা এটাকে তাদের প্রতি আযীযে

মিছরের বিশেষ অনুগ্রহ বলে ধারণা করল। এক্ষণে তারা পিতাকে বলল, আব্বা! আমরা যখন পণ্যমূল্য পেয়ে গেছি, তখন আমরা সত্বর পুনরায় মিসরে যাব। তবে মিসররাজ আমাদেরকে একটি শর্ত দিয়েছেন যে, এবারে যাওয়ার সময় ছোট ভাই বেনিয়ামীনকে নিয়ে যেতে হবে। তাকে ছেড়ে গেলে খাদ্যশস্য দিবেন না বলে তিনি স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন। অতএব আপনি তাকে আমাদের সাথে যাবার অনুমতি দিন। জবাবে পিতা ইয়াকূব (আঃ) বললেন, তার সম্পর্কে তোমাদের কিভাবে বিশ্বাস করব? ইতিপূর্বে তোমরা তার ভাই ইউসুফ সম্পর্কে বিশ্বাসভঙ্গ করেছ'। অতঃপর পরিবারের অভাব-অনটনের কথা ভেবে তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়ে তিনি বেনিয়ামীনকে তাদের সাথে যাবার অনুমতি দিলেন। ঘটনাটি কুরআনের ভাষায় নিম্নরূপ-

فَلَمَّا رَجَعُوْا إِلَى أَبِيْهِمْ قَالُوْا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ- قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلاَّ كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَى أَخِيْهِ مِن قَبْلُ فَاللهُ خَيْرٌ حَافِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ- وَلَمَّا فَتَحُوْا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوْا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوْا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَـذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيْرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيْرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيْرٌ- قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوْنِ مَوْثِقاً مِّنَ اللهِ لَتَأْتُنَّنِيْ بِهِ إِلاَّ أَن يُّحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللهُ عَلَى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ- (يوسف ٦٣-٦٦)-

'অতঃপর তারা যখন তাদের পিতার কাছে ফিরে এল, তখন বলল, হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্য খাদ্যশস্যের বরাদ্দ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অতএব আপনি আমাদের সাথে আমাদের ভাইকে প্রেরণ করুন, যাতে আমরা খাদ্যশস্যের বরাদ্দ আনতে পারি। আমরা অবশ্যই তার পুরোপুরি হেফাযত করব' *(৬৩)*। 'পিতা বললেন, আমি কি তার সম্পর্কে তোমাদের সেইরূপ বিশ্বাস করব, যেরূপ বিশ্বাস ইতিপূর্বে তার ভাই সম্পর্কে করেছিলাম? অতএব আল্লাহ উত্তম হেফাযতকারী এবং তিনিই সর্বাধিক দয়ালু' *(৬৪)*। 'অতঃপর যখন তারা পণ্য সম্ভার খুলল, তখন দেখতে পেল যে, তাদেরকে তাদের পণ্যমূল্য ফেরত দেওয়া হয়েছে। তারা (আনন্দে) বলে উঠলো, হে আমাদের পিতা! আমরা আর কি চাইতে পারি? এইতো আমাদের দেওয়া পণ্যমূল্য

আমাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন আমরা আবার আমাদের পরিবারের জন্য খাদ্যশস্য আনব। আমরা আমাদের ভাইয়ের হেফাযত করব এবং এক উট খাদ্যশস্য বেশী আনতে পারব এবং ঐ বরাদ্দটা খুবই সহজ' *(৬৫)*। 'পিতা বললেন, তাকে তোমাদের সাথে পাঠাব না, যতক্ষণ না তোমরা আমার নিকটে আল্লাহ্‌র নামে অঙ্গীকার কর যে, তাকে অবশ্যই আমার কাছে পৌঁছে দেবে। অবশ্য যদি তোমরা একান্তভাবেই অসহায় হয়ে পড় (তবে সেকথা স্বতন্ত্র)। অতঃপর যখন সবাই তাঁকে অঙ্গীকার দিল, তখন তিনি বললেন, আমাদের মধ্যে যে কথা হ'ল, সে ব্যাপারে আল্লাহ মধ্যস্থ রইলেন' *(ইউসুফ ১২/৬৩-৬৬)*।

উপরের আলোচনায় মনে হচ্ছে যে, দশভাই বাড়ী এসেই প্রথমে তাদের পিতার কাছে বেনিয়ামীনকে নিয়ে যাবার ব্যাপারে দরবার করেছে। অথচ তারা ভাল করেই জানত যে, এ প্রস্তাবে পিতা কখনোই রাযী হবেন না। দীর্ঘদিন পরে বাড়ী ফিরে অভাবের সংসারে প্রথমে খাদ্যশস্যের বস্তা না খুলে বৃদ্ধ পিতার অসন্তুষ্টি উদ্রেককারী বিষয় নিয়ে কথা বলবে, এটা ভাবা যায় না। পণ্যমূল্য ফেরত পাওয়ায় খুশীর মুহূর্তেই বরং এরূপ প্রস্তাব দেওয়াটা যুক্তিসম্মত।

উল্লেখ্য যে, কুরআনী বর্ণনায় আগপিছ হওয়াতে ঘটনার আগপিছ হওয়া যরূরী নয়। যেমন মূসা (আঃ)-এর কওমের গাভী কুরবানীর ঘটনা বর্ণনা *(বাক্বারাহ ৬৭-৭১)* শেষে ঘটনার কারণ ও সূত্র বর্ণনা করা হয়েছে *(বাক্বারাহ ৭২-৭৩)*। এমন বিবরণ কুরআনের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায়। এখানেও সেটা হয়েছে বলে অনুমিত হয়।

ছেলেদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়ে বেনিয়ামীনকে তাদের সাথে পাঠাবার ব্যাপারে সম্মত হওয়ার পর পিতা ইয়াকূব (আঃ) পরিষ্কারভাবে বলেন, فَاللهُ خَيْرٌ حَافِظاً 'আল্লাহ্‌ই উত্তম হেফাযতকারী' *(ইউসুফ ১২/৬৪)*। অর্থাৎ তিনি বেনিয়ামীনকে আল্লাহ্‌র হাতেই সোপর্দ করলেন। আল্লাহ তার বান্দার এই আকুতি শুনলেন। অতঃপর ইয়াকূব (আঃ) ছেলেদেরকে কিছু উপদেশ দেন, যার মধ্যে তাঁর বাস্তববুদ্ধি ও দূরদর্শিতার প্রতিফলন ঘটেছে। তিনি তাদেরকে একসাথে একই প্রবেশদ্বার দিয়ে মিসরের রাজধানীতে প্রবেশ করতে নিষেধ করেন। বরং তাদেরকে পৃথক পৃথক ভাবে বিভিন্ন দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ

করতে বলেন। কেননা তিনি ভেবেছিলেন যে, একই পিতার সন্তান সুন্দর ও সুঠামদেহী ১১ জন ভিনদেশীকে একত্রে এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে দেখলে অনেকে মন্দ কিছু সন্দেহ করবে। **দ্বিতীয়তঃ** প্রথমবার সফরে মিসররাজ তাদের প্রতি যে রাজকীয় মেহমানদারী প্রদর্শন করেছেন, তাতে অনেকের মনে হিংসা জেগে থাকতে পারে এবং তারা তাদের ক্ষতি করতে পারে। **তৃতীয়তঃ** তাদের প্রতি অন্যদের কুদৃষ্টি লাগতে পারে। বিষয়টি আল্লাহ বর্ণনা করেন এভাবে,

وَقَالَ يَا بَنِيَّ لاَ تَدْخُلُواْ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُواْ مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِيْ عَنكُم مِّنَ اللّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ- (يوسف ٦٧)-

‘ইয়াকূব বললেন, হে আমার সন্তানেরা! তোমরা সবাই একই দরজা দিয়ে প্রবেশ করো না। বরং পৃথক পৃথক দরজা দিয়ে প্রবেশ কর। তবে আল্লাহ থেকে আমি তোমাদের রক্ষা করতে পারি না। আল্লাহ ব্যতীত কারু হুকুম চলে না। তাঁর উপরেই আমি ভরসা করি এবং তাঁর উপরেই ভরসা করা উচিত সকল ভরসাকারীর’ *(ইউসুফ ১২/৬৭)*।

অতঃপর পিতার নিকট থেকে বিদায় নিয়ে বেনিয়ামীন সহ ১১ ভাই ১১টি উট নিয়ে মিসরের পথে যাত্রা করল। পথিমধ্যে তাদের কোনরূপ বাধা-বিঘ্ন ঘটেনি। মিসরে পৌঁছে তারা পিতার উপদেশ মতে বিভিন্ন দরজা দিয়ে পৃথক পৃথকভাবে শহরে প্রবেশ করল। ইয়াকূবের এ পরামর্শ ছিল পিতৃসূলভ স্নেহ-মমতা হ’তে উৎসারিত। যার ফল সন্তানেরা পেয়েছে। তারা কারু হিংসার শিকার হয়নি কিংবা কারু বদনযরে পড়েনি। কিন্তু এর পরেও আল্লাহ্র পূর্ব নির্ধারিত তাক্বদীর কার্যকর হয়েছে। বেনিয়ামীন চুরির মিথ্যা অপবাদে গ্রেফতার হয়ে যায়। যা ছিল ইয়াকূবের জন্য দ্বিতীয়বার সবচেয়ে বড় আঘাত। কিন্তু এটা ইয়াকূবের দো‘আর পরিপন্থী ছিল না। কেননা তিনি বলেছিলেন, ‘আল্লাহ থেকে আমি তোমাদের রক্ষা করতে পারি না। আল্লাহ ব্যতীত কারু হুকুম চলে না’ *(ইউসুফ ১২/৬৭)*। অতএব পিতার নির্দেশ পালন

করলেও তারা আল্লাহ্র পূর্বনির্ধারণ বা তাক্বদীরকে এড়াতে পারেনি। আর সেই তাক্বদীরের ফলেই ইয়াকূব (আঃ) তার হারানো দু'সন্তানকে একত্রে ফিরে পান। ইয়াকূবের গভীর জ্ঞানের প্রশংসা করে আল্লাহ বলেন, وَإِنَّهُ لَذُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَـــكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ، 'ইয়াকূব বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। যা আমরা তাকে দান করেছিলাম। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না' *(ইউসুফ ১২/৬৮)*।

বলা বাহুল্য, ইয়াকূবের সেই ইল্ম ছিল আল্লাহ্র সত্তা ও তাঁর গুণাবলীর ইল্ম, আল্লাহ্র অতুলনীয় ক্ষমতার ইল্ম। আর এটাই হ'ল মা'রেফাত বা দিব্যজ্ঞান, যা সূক্ষ্মদর্শী মুত্তাক্বী আলেমগণ লাভ করে থাকেন। সেজন্যেই তিনি নিজের দেওয়া কৌশলের উপরে নির্ভর না করে আল্লাহ্র উপরে ভরসা করেন ও তাঁর উপরেই ছেলেদের ন্যস্ত করেন। সেকারণেই আল্লাহ তাঁর নিজস্ব কৌশল প্রয়োগ করে ছেলেদেরকে সসম্মানে পিতার কোলে ফিরিয়ে দেন। *ফালিল্লাহিল হাম্দ*।

উক্ত বিষয়গুলি কুরআনে বর্ণিত হয়েছে নিম্নরূপে:

وَلَمَّا دَخَلُوْا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوْهُمْ مَّا كَانَ يُغْنِيْ عَنْهُم مِّنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ حَاجَةً فِيْ نَفْسِ يَعْقُوْبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَـــكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ- وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوْسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَاْ أَخُوْكَ فَلاَ تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ- (يوسف ٦٨-٦٩)-

'তারা যখন তাদের পিতার নির্দেশনা মতে শহরে প্রবেশ করল, তখন আল্লাহ্র বিধানের বিরুদ্ধে তা তাদের বাঁচাতে পারল না (অর্থাৎ তাদের সে কৌশল কাজে আসল না এবং বেনিয়ামীন গ্রেফতার হ'ল)। কেবল ইয়াকূবের একটি প্রয়োজন (অর্থাৎ ছেলেদের দেওয়া পরামর্শে) যা তার মনের মধ্যে (অর্থাৎ, স্নেহ মিশ্রিত তাকীদ) ছিল, যা তিনি পূর্ণ করেছিলেন বস্তুতঃ তিনি তো ছিলেন একজন জ্ঞানী, যে জ্ঞান আমরা তাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম (অর্থাৎ আল্লাহ্র সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান)। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা

জানে না’। ‘অতঃপর যখন তারা ইউসুফের নিকটে উপস্থিত হ’ল, তখন সে তার ভাই (বেনিয়ামীন)-কে নিজের কাছে রেখে দিল এবং (গোপনে তাকে) বলল, নিশ্চয়ই আমি তোমার সহোদর ভাই (ইউসুফ)। অতএব তাদের (অর্থাৎ সৎ ভাইদের) কৃতকর্মের জন্য দুঃখ করো না’ *(ইউসুফ ১২/৬৮-৬৯)*।

বেনিয়ামীনকে আটকে রাখা হ’ল:

সহোদর ছোট ভাই বেনিয়ামীনকে রেখে দেবার জন্য ইউসুফ (আঃ) আল্লাহ্র হুকুমে একটি বিশেষ কৌশল অবলম্বন করলেন। যখন সকল ভাইকে নিয়ম মাফিক খাদ্য-শস্য প্রদান করা হ’ল এবং পৃথক পৃথক বস্তায় পৃথক নামে পৃথক উটের পিঠে চাপানো হ’ল, তখন গোপনে বেনিয়ামীনের বস্তার মধ্যে বাদশাহ্র নিজস্ব ব্যবহৃত স্বর্ণ বা রৌপ্য নির্মিত ওযন পাত্র, যা ছিল অতীব মূল্যবান, সেটিকে ভরে দেওয়া হ’ল। অতঃপর কাফেলা বের হয়ে কিছু দূর গেলে পিছন থেকে জনৈক রাজকর্মচারী ছুটে গিয়ে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করল, হে কাফেলার লোকেরা! তোমরা চোর। দাঁড়াও তোমাদের তল্লাশি করা হবে। ঘটনাটির বর্ণনা কুরআনের ভাষায় নিম্নরূপ:

فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِيْ رَحْلِ أَخِيْهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيْرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُوْنَ- قَالُوْا وَأَقْبَلُوْا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُوْنَ- قَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيْمٌ- قَالُوْا تَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِيْنَ- قَالُوْا فَمَا جَزَآؤُهُ إِنْ كُنتُمْ كَاذِبِيْنَ- قَالُوْا جَزَآؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِيْ رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِيْنَ- (يوسف ٨٠- ٨٥)-

‘অতঃপর যখন ইউসুফ তাদের জন্য খাদ্যশস্য প্রস্তুত করে দিচ্ছিল, তখন একটি পাত্র তার (সহোদর) ভাইয়ের বরাদ্দ খাদ্যশস্যের মধ্যে রেখে দিল। অতঃপর একজন ঘোষক ডেকে বলল, হে কাফেলার লোকজন! তোমরা অবশ্যই চোর’ *(৭০)*। ‘একথা শুনে তারা ওদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, তোমাদের কি হারিয়েছে’? *(৭১)*। ‘তারা বলল, আমরা বাদশাহ্র ওযনপাত্র হারিয়েছি। যে কেউ এটা এনে দেবে, সে এক উটের বোঝা পরিমাণ মাল

পাবে এবং আমি এটার যামিন রইলাম' *(৭২)*। 'তারা বলল, আল্লাহ্র কসম! তোমরা তো জানো যে, আমরা এদেশে কোনরূপ অনর্থ ঘটাতে আসিনি এবং আমরা কখনোই চোর নই' *(৭৩)*। বাদশাহ্র লোকেরা বলল, 'যদি তোমরা মিথ্যাবাদী হও তবে যে চুরি করেছে, তার শাস্তি কি হবে'? *(৭৪)*। 'তারা বলল, (আমাদের নবী ইয়াকূবের শরী'আত অনুযায়ী) এর শাস্তি এই যে, যার খাদ্যশস্যের বস্তা থেকে এটা পাওয়া যাবে, তার শাস্তি স্বরূপ সে (মালিকের) গোলাম হবে। আমরা যালেমদেরকে এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি' *(ইউসুফ ১২/৭০-৭৫)*।

এভাবে ইউসুফ তার ভাইদের মুখ দিয়েই তাদের শরী'আতের বিধান জেনে নিলেন এবং সভাসদগণ সবাই তা জানলো। যদিও ইউসুফ তার পিতার শরী'আতের বিধান জানতেন এবং নিজেও নবী ছিলেন। আল্লাহ বলেন,

فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيْهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيْهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِيْ دِيْنِ الْمَلِكِ إِلاَّ أَن يَّشَآءَ اللهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَشَآءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيْمٌ- (يوسف ٧٦)-

'অতঃপর (ইউসুফের নির্দেশ মোতাবেক) তার ভাইয়ের বস্তার পূর্বে (ঘোষক) অন্য ভাইদের বস্তা তল্লাশি শুরু করল। অবশেষে সেই পাত্রটি তার (সহোদর) ভাইয়ের বস্তা থেকে বের করল। এমনিভাবে আমরা ইউসুফকে কৌশল শিক্ষা দিয়েছিলাম। সে বাদশাহ্র (প্রচলিত) আইনে আপন ভাইকে কখনো নিজ অধিকারে নিতে পারত না আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতীত। আমরা যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নীত করি এবং (সত্য কথা এই যে,) প্রত্যেক জ্ঞানীর উপরে জ্ঞানী আছেন *(ইউসুফ ১২/৭৬)*।

শিক্ষণীয় বিষয় :

(১) আল্লাহ্র উপরোক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে একথা বুঝানো হয়েছে যে, ভাইদের মর্যাদার চেয়ে ইউসুফের মর্যাদা আল্লাহ অধিক উন্নীত করেছেন (২) এতদ্ব্যতীত এ বিষয়ে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইয়াকূব (আঃ) নিজ জ্ঞান মোতাবেক বেনিয়ামীনকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে আনার জন্য ছেলেদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নেওয়ার মাধ্যমে যে কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, তার চাইতে ইউসুফের

মাধ্যমে আল্লাহ যে জ্ঞানের প্রকাশ ঘটিয়েছেন, তা ছিল অনেক ঊর্ধ্বের এবং অনেক সুদূর প্রসারী। কেননা এর ফলেই পরবর্তীতে ইয়াকূব (আঃ) সব ছেলেদের নিয়ে সপরিবারে মিসরে উচ্চ সম্মান নিয়ে আগমনের সুযোগ পান।

প্রশ্ন হ'তে পারে যে, ইউসুফ (আঃ) বেনিয়ামীনকে চোর বানিয়ে নিজের কাছে রেখে দেবার মত নিষ্ঠুর পন্থা বেছে নিলেন কেন? তাছাড়া এর দ্বারা তার বৃদ্ধ পিতা ইয়াকূব (আঃ) যে আরও বেশী মনোকষ্ট পাবেন, তাতো তিনি জানতেন। তিনি এটাও জানতেন যে, তাকে হারিয়ে শোকে-দুঃখে তার পিতা কাতর হয়ে আছেন। এ প্রশ্নের জবাব আল্লাহ নিজেই দিয়েছেন যে, 'আমরাই ইউসুফকে এ কৌশল শিক্ষা দিয়েছিলাম। নইলে বাদশাহ্র (প্রচলিত) আইনে আপন ভাইকে সে কখনো নিজ অধিকারে নিতে পারত না' *(ইউসুফ ১২/৭৬)*। অতএব আল্লাহ্র হুকুমে ইউসুফ এ কাজ করেছিলেন। এখানে তার নিজের কিছুই করার ছিল না।

(৩) একটি সাধারণ নীতি এখানে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, প্রত্যেক জ্ঞানীর উপরে জ্ঞানী আছেন। অতএব মানুষ যেন তার জ্ঞানের বড়াই না করে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এখানে আল্লাহকেই সর্বোচ্চ জ্ঞানের অধিকারী বলে বুঝানো হয়েছে *(কুরতুবী)*।

বেনিয়ামীনকে ফিরিয়ে নেবার জন্য ভাইদের প্রচেষ্টা :

চোর হিসাবে বিদেশে গ্রেফতার হওয়া ও গোলামীর শৃংখলে আবদ্ধ হওয়ার মত লজ্জাষ্কর ঘটনায় প্রত্যেক ভাই-ই বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। স্বয়ং বেনিয়ামীনও এজন্য প্রস্তুত ছিল না। তবে তার মনে এতটুকু সান্ত্বনা ছিল যে, সে তার ভাইয়ের কাছে থাকবে। কিন্তু চুরির মত অপবাদ সহ্য করা নিঃসন্দেহে কষ্টদায়ক ছিল। কিন্তু বিদেশ-বিভূঁইয়ে ভিন রাজ্যে তাদের কিছু করারও ছিল না। অবশেষে সকলে মিলে বাদশাহ্র কাছে গিয়ে অনুরোধ করার সিদ্ধান্ত নিল। তারা গিয়ে বাদশাহ্কে বলল, আমাদের যিনি বৃদ্ধ পিতা আছেন, ছোট ছেলেটি তাঁর অতীব প্রিয়। এর বিচ্ছেদের বেদনা তিনি সইতে পারবেন না। তাই আমাদের অনুরোধ, আপনি তার বদলে আমাদের একজনকে রেখে দিন'। কিন্তু বাদশাহ (ইউসুফ) তাতে রাযী হলেন না। তিনি বললেন, যার কাছে মাল পাওয়া গেছে, তাকে বাদ দিয়ে অন্যকে গ্রেফতার করা আইনসিদ্ধ নয়।

শত অনুনয়-বিনয়ে কাজ না হওয়ায় অবশেষে মনের ক্ষেদ প্রকাশ করে তাদের কেউ বলে ফেলল, সে যদি চুরি করে থাকে, তবে এতে আর আশ্চর্যের কি আছে। ওর ভাইও ইতিপূর্বে চুরি করেছিল। এর দ্বারা তারা বুঝাতে চেয়েছিল যে, আমরা দশভাই ঠিক আছি, ওরা দুই সহোদর ভাই-ই চোর *(নাঊযুবিল্লাহ)*। ইউসুফকে কাছে রাখার জন্য শৈশবে তার স্নেহপরায়ণ ফুফু যে চুরির ঘটনা সাজিয়েছিল, সে ঘটনার দিকেই তারা ইঙ্গিত করেছিল, যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। যদিও তারা ভালভাবে জানত যে, সেটা ছিল একেবারেই মিথ্যা এবং সাজানো বিষয়। কিন্তু সেটাকেই সত্যিকার চুরি বলে আখ্যায়িত করল বেনিয়ামীনের প্রতি আক্রোশ বশতঃ। ইউসুফ শুনে ধৈর্য ধারণ করলেন ও মনের দুঃখ মনে চেপে রাখলেন।

এভাবে বাদশাহ্র কাছ থেকে নিরাশ হয়ে বেনিয়ামীনকে ছেড়ে যখন তারা বেরিয়ে এল, তখন তাদের বড় ভাই ইয়াহূদা অন্য ভাইদের বলল, তোমরা পিতার কাছে ফেরত যাও এবং তাঁকে সব খুলে বল। আমি এখান থেকে ফেরত যাব না, যতক্ষণ না পিতা আমাকে আদেশ দেন কিংবা আল্লাহ আমার জন্য কোন ফায়ছালা করেন। উল্লেখ্য, এই বড় ভাইয়ের হাতেই তার পিতা বেনিয়ামীনকে সোপর্দ করেছিলেন এবং ইতিপূর্বে এই বড় ভাই-ই ইউসুফকে হত্যা না করার জন্য অন্য ভাইদের পরামর্শ দিয়েছিল এবং সেই-ই গোপনে জঙ্গলের সেই অন্ধকূপে ইউসুফের জন্য খাদ্য সরবরাহ করেছিল ও সারাক্ষণ তার তদারকি করত, যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

উপরোক্ত ঘটনাটি কুরআনে আগপিছ করে বর্ণিত হয়েছে। যেমন সেখানে ইউসুফের সামনে আগেই ইউসুফের চুরির ঘটনা বলা হয়েছে। অথচ শুরুতেই এটা বলা অযৌক্তিক এবং অসমীচীন। কেননা তাতে বেনিয়ামীন যে আসলেই চোর, সেকথা পরোক্ষভাবে স্বীকার করা হয়। অথচ তারা প্রথমে সেটা অস্বীকার করেছিল এবং সেটাই স্বাভাবিক। এ বিষয়ে কুরআনী বর্ণনা নিম্নরূপ:

قَالُوْا إِن يَّسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوْسُفُ فِيْ نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَاناً وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ- قَالُوْا يَا أَيُّهَا الْعَزِيْزُ إِنَّ لَهُ أَباً

شَيْخاً كَبِيْراً فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ- قَالَ مَعَاذَ اللهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلاَّ مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّـــا إِذاً لَّظَالِمُوْنَ-(يوسف ٧٧-٧٩)-

'তারা বলতে লাগল, যদি সে চুরি করে থাকে, তবে তার এক ভাইও ইতিপূর্বে চুরি করেছিল। তখন ইউসুফ প্রকৃত ব্যাপার নিজের মনের মধ্যে রাখল, তাদেরকে প্রকাশ করল না। (মনে মনে) বললেন, তোমরা লোক হিসাবে খুবই মন্দ এবং আল্লাহ সে বিষয়ে ভালভাবে জ্ঞাত, যা তোমরা বলছ' *(৭৭)*। 'তারা বলতে লাগল, হে আযীয (অর্থাৎ ইউসুফ)! তার পিতা আছেন অতিশয় বৃদ্ধ। অতএব আপনি আমাদের একজনকে তার বদলে রেখে দিন। আমরা আপনাকে অনুগ্রহশীলদের মধ্যকার একজন বলে দেখতে পাচ্ছি' *(৭৮)*। 'সে বলল, যার কাছে আমরা আমাদের মাল পেয়েছি, তাকে ছেড়ে অন্যকে গ্রেফতার করা থেকে আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। এমনটি করলে তো আমরা নিশ্চিতভাবে যুলুমকারী হয়ে যাব' *(ইউসুফ ১২/৭৭-৭৯)*।

বেনিয়ামীনকে রেখেই মিসর থেকে ফিরল ভাইয়েরা :

অতঃপর তারা যখন বাদশাহ্র কাছ থেকে নিরাশ হয়ে গেল, তখন পরামর্শের জন্য সকলে একান্তে বসল। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন,

فَلَمَّا اسْتَيْأَسُواْ مِنْهُ خَلَصُواْ نَجِيّاً قَالَ كَبِيْرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقاً مِّنَ اللّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الأَرْضَ حَتَّىَ يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، ارْجِعُواْ إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلاَّ بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِيْنَ-

(يوسف ٨٠ -٨١)-

'অতঃপর যখন তারা তার (বাদশাহ্র) কাছ থেকে নিরাশ হয়ে গেল, তখন তারা একান্তে পরামর্শে বসল। তখন তাদের বড় ভাই বলল, তোমরা কি জানো না যে, পিতা তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহ্র নামে অঙ্গীকার নিয়েছেন এবং ইতিপূর্বে ইউসুফের ব্যাপারেও তোমরা অন্যায় করেছ? অতএব আমি কিছুতেই এদেশ ত্যাগ করব না, যে পর্যন্ত না পিতা আমাকে আদেশ দেন

অথবা আল্লাহ আমার কোন ফায়ছালা করেন। তিনিই সর্বোত্তম ফায়ছালাকারী'। 'তোমরা তোমাদের পিতার কাছে ফিরে যাও এবং বল, হে পিতা! আপনার ছেলে চুরি করেছে। আমরা যা জানি, কেবল তারই সাক্ষ্য দিলাম এবং কোন অদৃশ্য বিষয়ে আমরা হেফাযতকারী ছিলাম না' *(ইউসুফ ১২/৮০-৮১)*।

অর্থাৎ বেনিয়ামীনকে হেফাযতের অঙ্গীকার বাহ্যিক অবস্থা পর্যন্ত সম্ভবপর ছিল। কিন্তু আমাদের দৃষ্টির আড়ালে সে কিছু করে থাকলে তাতে আমাদের কিছুই করার ছিল না। অতঃপর তারা কেন'আনে ফিরে এল এবং পিতাকে সব কথা খুলে বলল।

পিতার নিকটে ছেলেদের কৈফিয়ত :

কেন'আনে ফিরে এসে পিতার নিকটে তারা বেনিয়ামীনকে রেখে আসার কারণ ব্যাখ্যা করে এবং সেই সাথে তারা নিজেদের কথার সত্যতা প্রমাণের জন্য মিসর প্রত্যাগত অন্যান্য কেন'আনী কাফেলাকে সাক্ষী মানল এবং পিতাকে বলল, وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ '(হে পিতা!) আপনি জিজ্ঞেস করুন ঐ জনপদের লোকদের, যেখানে আমরা ছিলাম এবং (জিজ্ঞেস করুন) ঐসব কাফেলাকে যাদের সাথে আমরা এসেছি। আমরা নিশ্চিতভাবেই (আপনাকে) সত্য ঘটনা বলছি' *(ইউসুফ ৮২)*। (কিন্তু ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত পিতা তাদের কথায় কর্ণপাত না করে বললেন),

بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ عَسَى اللهُ أَن يَأْتِيَنِيْ بِهِمْ جَمِيْعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ 'বরং তোমরা মনগড়া একটা কথা নিয়েই এসেছ। এখন ধৈর্যধারণই উত্তম। সম্ভবতঃ আল্লাহ তাদের সবাইকে (ইউসুফ ও বেনিয়ামীনকে) একসঙ্গে আমার কাছে নিয়ে আসবেন। তিনি বিজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়' *(৮৩)*। 'অতঃপর তিনি তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন, হায় আফসোস ইউসুফের জন্য! (আল্লাহ বলেন,) এভাবে দুঃখে তাঁর চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে গেল এবং অসহনীয় মনস্তাপে তিনি ছিলেন ক্লিষ্ট' *(৮৪)*। ছেলেরা তখন তাঁকে বলতে লাগল, 'আল্লাহ্র কসম! আপনি তো

ইউসুফের স্মরণ থেকে নিবৃত্ত হবেন না, যে পর্যন্ত না মরণাপন্ন হন কিংবা মৃত্যুবরণ করেন' *(৮৫)*। ইয়াকূব বললেন,

إِنَّمَا أَشْكُوْ بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ، يَا بَنِيَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيْهِ وَلاَ تَيْأَسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللهِ إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِنْ رَّوْحِ اللهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُوْنَ-(يوسف ٨٦-٨٧)-

'আমি তো আমার অস্থিরতা ও দুঃখ আল্লাহ্র কাছেই পেশ করছি এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না' *(৮৬)*। 'হে বৎসগণ! যাও ইউসুফ ও তার ভাইকে তালাশ কর এবং আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ্র রহমত থেকে কাফের সম্প্রদায় ব্যতীত কেউ নিরাশ হয় না' *(ইউসুফ ১২/৮২-৮৭)*।

উপরোক্ত ৮৬ ও ৮৭ আয়াতে বর্ণিত ইয়াকূব (আঃ)-এর বক্তব্যে ইউসুফ ও বেনিয়ামীনকে ফিরে পাওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে। হ'তে পারে ইউসুফকে হারানোর দীর্ঘ বিরহ-বেদনা এবং নতুনভাবে পাওয়া বেনিয়ামীন হারানোর কঠিন মানসিক ধাক্কা সামাল দেওয়ার জন্য আল্লাহ পাক তাঁকে অহী মারফত ইঙ্গিত দিয়ে থাকবেন অথবা আল্লাহ তাকে উক্ত মর্মে ওয়াদা দিয়ে থাকবেন। ইয়াকূব (আঃ)-এর বক্তব্য إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ 'আমি আমার অস্থিরতা ও দুঃখ আল্লাহ্র কাছে পেশ করছি' *(ইউসুফ ১২/৮৬)*, একথার মধ্যে তাঁর কঠিন ধৈর্যগুণের প্রকাশ ঘটেছে।

পিতার নির্দেশে ছেলেদের পুনরায় মিসরে গমন :

ইউসুফ ও বেনিয়ামীনকে খুঁজে বের করার জন্য ইয়াকূব (আঃ) ছেলেদেরকে এরূপ কঠোর নির্দেশ ইতিপূর্বে কখনো দেননি। তাঁর দৃঢ়তায় ছেলেদের মধ্যেও আশার সঞ্চার হ'ল। বেনিয়ামীন মিসরে থাকা নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু ইউসুফের ব্যাপারে কোন আশা ছিল না।

বলা হয়ে থাকে যে, إذا أراد الله أمرًا هيأ له الأسباب 'আল্লাহ যখন কোন কাজের ইচ্ছা করেন, তখন তার কার্যকারণ সমূহ প্রস্তুত করে দেন'। বেনিয়ামীনের উদ্দেশ্যে মিসর যাত্রার মধ্যেই ইউসুফ উদ্ধারের বিষয়টি

লুকিয়েছিল, যেটা কারু জানা ছিল না। তাই আল্লাহ্র ইচ্ছায় ভাইয়েরা সবাই মিসরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'ল।

ইউসুফের সৎ ভাইয়েরা পিতার নির্দেশক্রমে মিসর পৌঁছল এবং 'আযীযে মিছর'-এর সাথে সাক্ষাৎ করল। তারা তাঁর কাছে নিজেদের সাংসারিক অভাব-অনটনের কথা পেশ করল। এমনকি পণ্যমূল্য আনার মত সঙ্গতিও তাদের নেই বলে জানাল। তদুপরি পরপর দুই পুত্রকে হারিয়ে অতিবৃদ্ধ পিতার করুণ অবস্থার কথাও জানালো।

যেমন আল্লাহ বলেন,

فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا يَا أَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِيْنَ-(يوسف ٨٨)-

'অতঃপর যখন তারা ইউসুফের কাছে পৌঁছল, তখন বলল, হে আযীয! আমরা ও আমাদের পরিবার বর্গ কষ্টের সম্মুখীন হয়েছি এবং আমরা অপর্যাপ্ত পুঁজি নিয়ে এসেছি। আপনি আমাদেরকে পুরোপুরি বরাদ্দ দিন এবং আমাদেরকে অনুদান দিন। আল্লাহ দানকারীদের প্রতিদান দিয়ে থাকেন' *(ইউসুফ ১২/৮৮)*। উল্লেখ্য যে, এখানে ছাদাক্বার অর্থ অনুদান এবং স্বল্প মূল্যের বিনিময়ে পুরোপুরি দান করা।

ইউসুফের আত্মপ্রকাশ এবং ভাইদের ক্ষমা প্রার্থনা :

পরিবারের অনটনের কথা শুনে এবং পিতার অন্ধত্ব ও অসহায় অবস্থার কথা শুনে ইউসুফ আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি আল্লাহ্র হুকুমে নিজেকে প্রকাশ করে দিলেন এবং বললেন, قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَاهِلُونَ- 'তোমাদের কি জানা আছে যা তোমরা করেছিলে ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে? যখন তোমরা (পরিণাম সম্পর্কে) অজ্ঞ ছিলে' *(৮৯)*। 'তারা বলল, إِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ؟ তবে কি তুমিই ইউসুফ? তিনি বললেন, أَنَا يُوسُفُ وَهَـــذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللهُ عَلَيْنَا، আমিই ইউসুফ, আর এ হ'ল আমার (সহোদর) ভাই। আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি তাক্বওয়া অবলম্বন করে ও ধৈর্য ধারণ করে,

আল্লাহ এহেন সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না' *(৯০)*। 'তারা বলল, تَاللهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِيْنَ– 'আল্লাহ্র কসম! আমাদের উপরে আল্লাহ তোমাকে পসন্দ করেছেন এবং আমরা অবশ্যই অপরাধী ছিলাম' *(৯১)*। 'ইউসুফ বললেন, لاَ تَثْرَيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ– 'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। তিনি সকল দয়ালুর চাইতে অধিক দয়ালু' *(ইউসুফ ১২/৮৯-৯২)*।

ইউসুফের ব্যবহৃত জামা প্রেরণ :

ভাইদেরকে মাফ করে দেওয়ার পর ইউসুফ তাঁর ব্যবহৃত জামাটি বড় ভাইদের হাতে দিয়ে বললেন, এই জামাটি নিয়ে পিতার চেহারার উপরে রেখো। তাতেই তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। অতঃপর তাঁকে সহ তোমাদের সকলের পরিবারবর্গকে নিয়ে এখানে চলে এসো। একটি বর্ণনায় এসেছে যে, এই সময় ইয়াহূদা বলেছিল, বড় ভাই হিসাবে পিতা সেদিন আমার হাতেই তোমাকে সোপর্দ করেছিলেন। কিন্তু আমি ভাইদের চাপের মুখে তোমার জামায় মিথ্যা রক্ত মাখিয়ে পিতাকে দেখিয়েছিলাম। আজ আমি তার প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। তোমার এ জামাটি আমিই স্বহস্তে পিতার মুখের উপরে রাখব। এর বিনিময়ে তিনি যদি আমাকে ক্ষমা করে দেন। ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, এই বড় ভাই-ই সে সময় তিনদিন ধরে গোপনে ইউসুফকে কূয়ায় দেখাশুনা করতেন। এরই পরামর্শে ভাইয়েরা তাকে হত্যা করেনি। বেনিয়ামীনকে হারিয়ে মনের দুঃখে এই বড় ভাই-ই মিসর থেকে আর কেন'আনে ফিরে যায়নি। তাই আজকে ইউসুফকে ফিরে পাওয়ার সুসংবাদ এবং তার জামা নিয়ে পিতার চেহারার উপরে রাখার এ মহান দায়িত্ব পালনের অধিকার স্বভাবতঃ তার উপরেই বর্তায়। অতঃপর ইউসুফের জামা নিয়ে ভাইদের কাফেলা মিসর ত্যাগ করে কেন'আনের পথে রওয়ানা হ'ল। ওদিকে আল্লাহ্র বিশেষ ব্যবস্থাপনায় প্রায় ২৫০ মাইল দূরে ইয়াকূবের নিকটে উক্ত জামার গন্ধ পৌঁছে গেল। তিনি আনন্দের আতিশয্যে সবাইকে বলে ফেললেন যে, إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ওগো তোমরা শুনো! আমি ইউসুফের গন্ধ পাচ্ছি' *(১২/৯৪)*। নিঃসন্দেহে এটি ছিল মু'জেযা, যা আল্লাহ যথাসময়ে ইয়াকূবকে

Contents

প্রদর্শন করেছেন। কেননা মু'জেযা নবীগণের ইচ্ছাধীন নয়। এটা আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন। তিনি সময় ও প্রয়োজন মাফিক নবীগণের মাধ্যমে তা প্রদর্শন করে থাকেন। যদি এটা নবীগণের ইচ্ছাধীন হ'ত, তাহ'লে বাড়ীর অদূরে জঙ্গলের এক পরিত্যক্ত কূয়ায় ইউসুফ তিনদিন পড়ে রইলেন, তার রক্তমাখা জামা পিতার কাছে দেওয়া হ'ল তখন তো তিনি ইউসুফের খবর জানতে পারেননি। তাই নবীদের মু'জেযা হৌক বা দ্বীনদার মুমিনদের কারামত হৌক, কোনটাই ব্যক্তির ইচ্ছাধীন নয়, বরং সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন।

ভাইদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনের তাৎপর্য :

ইউসুফ ভাইদের উপরে কোনরূপ প্রতিশোধ নিতে চাননি। বরং তিনি চেয়েছিলেন তাদের তওবা ও অনুতাপ। সেটা তিনি যথাযথভাবেই পেয়েছিলেন। কেননা এই দশ ভাইও নবীপুত্র এবং তাদেরই একজন 'লাভী' (لاوى)-এর বংশের অধঃস্তন চতুর্থ পুরুষ হয়ে জন্ম নেন অন্যতম যুগশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল হযরত মূসা (আঃ)।

বস্তুতঃ ইয়াকূব (আঃ)-এর উক্ত বারোজন পুত্রের বংশধারা হিসাবে বনু ইস্রাঈলের বারোটি গোত্র সৃষ্টি হয় এবং তাদের থেকেই যুগে যুগে জন্ম গ্রহণ করেন লক্ষাধিক নবী ও রাসূল। যাঁদের মধ্যে ছিলেন দাঊদ ও সুলায়মানের মত শক্তিধর রাষ্ট্রনায়ক, রাসূল ও নবী এবং বনু ইস্রাঈলের সর্বশেষ রাসূল হযরত ঈসা (আঃ)। অতএব বৈমাত্রেয় হিংসায় পদস্খলিত হ'লেও নবী রক্তের অন্যান্য গুণাবলী তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। ইউসুফ (আঃ) তাই তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়ে নিঃসন্দেহে বিরাট মহত্ত্ব ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে অর্থাৎ এই ঘটনার প্রায় আড়াই হাযার বছর পরে বনু ইসমাঈলের একমাত্র ও সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ নবী বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের দিন তাঁর জানী দুশমন মক্কার কাফেরদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। তিনিও সেদিন ইউসুফের ন্যায় একই ভাষায় বলেছিলেন, لاتثريبَ عليكمُ اليوم فاذهبوا وأَنتمُ الطُّلَقاءُ 'তোমাদের প্রতি আজ কোন অভিযোগ নেই। যাও! তোমরা মুক্ত'। শুধু তাই নয়, কাফের নেতা আবু সুফিয়ানের গৃহে যে ব্যক্তি আশ্রয় নিবে, তাকেও তিনি ক্ষমা ঘোষণা করে বলেন, مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِى سُفيانَ فهو آمِنٌ 'যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের বাড়ীতে আশ্রয় নিবে, সে নিরাপদ

থাকবে'।[১৬২] তাতে ফল হয়েছিল এই যে, যারা ছিল এতদিন তাঁর রক্ত পিয়াসী, তারাই হ'ল এখন তাঁর দেহরক্ষী। মক্কা বিজয়ের মাত্র ১৯ দিন পরে হুনায়েন যুদ্ধে নওমুসলিম কুরায়েশদের বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং দু'বছর পরে আবুবকরের খেলাফতকালে ইয়ারমূকের যুদ্ধে আবু সুফিয়ানের ও তার পুত্র ইয়াযীদের এবং আবু জাহ্ল-পুত্র ইকরিমার কালজয়ী ভূমিকা ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। তাই বিদ্বেষী সৎ ভাইদের ক্ষমা করে দিয়ে ইউসুফ (আঃ) নবীসুলভ মহানুভবতা এবং রাষ্ট্রনায়কোচিত দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

ঘটনাটির কুরআনী বর্ণনা নিম্নরূপ:

اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَـــذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيراً وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ- وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلاَ أَن تُفَنِّدُونِ- قَالُوا تَاللهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلاَلِكَ الْقَدِيمِ- (يوسف ٩٣-٩٥)-

ইউসুফ তার ভাইদের বললেন, 'তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও। এটি আমার পিতার চেহারার উপরে রেখো। এতে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে। আর তোমাদের পরিবারবর্গের সবাইকে আমার কাছে নিয়ে আস'। 'অতঃপর কাফেলা যখন রওয়ানা হ'ল, তখন (কেন'আনে) তাদের পিতা বললেন, যদি তোমরা আমাকে অপ্রকৃতিস্থ না ভাবো, তবে বলি যে, আমি নিশ্চিতভাবেই ইউসুফের গন্ধ পাচ্ছি'। 'লোকেরা বলল, আল্লাহ্র কসম! আপনি তো আপনার সেই পুরানো ভ্রান্তিতেই পড়ে আছেন' *(ইউসুফ ১২/৯৩-৯৫)*।

ইয়াকূব (আঃ) দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন :

যথাসময়ে কাফেলা দীর্ঘ সফর শেষে বাড়ীতে পৌঁছল এবং বড়ভাই ইয়াহূদা ছুটে গিয়ে পিতাকে ইউসুফের সুসংবাদ দিলেন। অতঃপর ইউসুফের প্রদত্ত জামা পিতার মুখের উপরে রাখলেন। আল্লাহ্র ইচ্ছায় সাথে সাথে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে এল। খুশীতে উদ্বেলিত ও আনন্দে উৎফুল্ল বৃদ্ধ পিতা বলে উঠলেন, 'আমি কি বলিনি যে, আল্লাহ্র নিকট থেকে আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না'। অর্থাৎ ইউসুফ জীবিত আছে এবং তার সাথে আমার সাক্ষাত

---

১৬২. *আর-রাহীকুল মাখতূম (কুয়েতঃ ১৪১৪/১৯৯৪), পৃঃ ৪০৫, ৪০১।*

হবে, এ খবর আল্লাহ আমাকে আগেই দিয়েছিলেন। বিষয়টির কুরআনী বর্ণনা নিম্নরূপ:

فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيْرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيْراً قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّيْ أَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ-(يوسف ٩٦)-

'অতঃপর যখন সুসংবাদ দাতা (ইয়াহূদা) পৌঁছল, সে জামাটি তার (ইয়াকূবের) চেহারার উপরে রাখল। অমনি সে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল এবং বলল, আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আমি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যা জানি, তোমরা তা জানো না'? *(ইউসুফ ১২/৯৬)*।

ঘামের গন্ধে দৃষ্টিশক্তি ফেরা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তথ্য :

ইউসুফ (আঃ)-এর ব্যবহৃত জামা প্রেরণ ও তা মুখের উপরে রাখার মাধ্যমে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়ার এ বিষয়টির উপর বর্তমানে গবেষণা হয়েছে এবং দেখানো হয়েছে যে, মানবদেহের ঘামের মধ্যে এমন উপাদান আছে যার প্রতিক্রিয়ায় দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসা সম্ভব। উক্ত গবেষণার মূল সূত্র ছিল ইউসুফ (আঃ)-এর ব্যবহৃত জামা মুখের উপরে রাখার মাধ্যমে ইয়াকূব (আঃ)-এর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়ার কুরআনী বর্ণনা।[১৬৩]

পিতার নিকটে ছেলেদের ক্ষমা প্রার্থনা :

প্রকৃত ঘটনা সবার নিকটে পরিষ্কার হয়ে গেলে লজ্জিত ও অনুতপ্ত বিমাতা ভাইয়েরা সবাই এসে পিতার কাছে করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করল এবং আল্লাহ্র নিকটে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার অনুরোধ করল। যেমন আল্লাহ বলেন,

---

১৬৩. *সূরা ইউসুফ ৮৪ এবং ৯৩-৯৬ আয়াতগুলি গবেষণা করে মিসরের সরকারী 'ন্যাশনাল সেন্টার অফ রিসার্চেস ইন ইজিপ্ট'-এর মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডা. আবদুল বাসিত মুহাম্মাদ মানুষের দেহের ঘাম থেকে একটি 'আইড্রপ' আবিষ্কার করেন, যা দিয়ে ২৫০ জন রোগীর উপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে, কোনরূপ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই ৯০%-এর বেশী চোখের ছানি রোগ সেরে যায় ও তারা দৃষ্টি ফিরে পায়। ইতিমধ্যে এই ঔষধটি 'ইউরোপিয়ান ইন্টারন্যাশনাল প্যাটেন্ট ১৯৯১' এবং 'আমেরিকান প্যাটেন্ট ১৯৯৩' লাভ করেছে। এছাড়া একটি সুইস ঔষধ কোম্পানীর সাথে তাঁর চুক্তি হয়েছে এই মর্মে যে, তারা তাদের ঔষধের প্যাকেটের উপর 'মেডিসিন অফ কুরআন' লিখে তা বাজারে ছাড়বে।- সূত্র: ইন্টারনেট।*

قَالُواْ يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِيْنَ- قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ-(يوسف ٩٧-٩٨)-

‘তারা বলল, হে আমাদের পিতা! আমাদের অপরাধ মার্জনার জন্য আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই আমরা গোনাহগার ছিলাম’। ‘পিতা বললেন, সত্বর আমি আমার পালনকর্তার নিকটে তোমাদের জন্য ক্ষমা চাইব। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান’ *(ইউসুফ ১২/৯৭-৯৮)*।

ইয়াকূব-পরিবারের মিসর উপস্থিতি ও স্বপ্নের বাস্তবায়ন :

৯৩ আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইউসুফ তার ভাইদেরকে তাদের পরিবারবর্গসহ মিসরে আসতে বলেছিলেন। মিসরে তাদের এই যাওয়াটাই ছিল কেন‘আন থেকে স্থায়ীভাবে তাদের মিসরে হিজরত। আরবের ইহুদীরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে প্রশ্ন করেছিল, ইয়াকূব পরিবারের মিসরে হিজরতের কারণ কি? তার জবাব এটাই যে, ইউসুফের আহ্বানে ইয়াকূব পরিবার স্থায়ীভাবে মিসরে হিজরত করেছিল এবং প্রায় চারশ’ বছর পরে সেখানে মূসা (আঃ)-এর আবির্ভাবকালে তাদের সংখ্যা ছিল মিসরের মোট জনসংখ্যার ১০ হ’তে ২০ শতাংশের মত।[১৬৪]

মিসর থেকে ভাইদের কেন‘আনে ফেরৎ পাঠানোর সময় কোন কোন বর্ণনা মোতাবেক ইউসুফ (আঃ) দু’শো উট বোঝাই খাদ্য-শস্য ও মালামাল উপঢৌকন স্বরূপ পাঠিয়েছিলেন, যাতে তারা যাবতীয় দায়-দেনা চুকিয়ে ভালভাবে প্রস্তুতি নিয়ে মিসরে স্থায়ীভাবে ফিরে আসতে পারে। ইয়াকূব পরিবার সেভাবেই প্রস্তুতি নিলেন। অতঃপর গোটা পরিবার বিরাট কাফেলা নিয়ে কেন‘আন ছেড়ে মিসর অভিমুখে রওয়ানা হ’লেন। এই সময় তাদের সংখ্যা নারী-পুরুষ সব মিলে ৭০ জন অথবা তার অধিক ছিল বলে বিভিন্ন রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে।[১৬৫]

অপর দিকে মিসর পৌঁছার সময় নিকটবর্তী হ’লে ইউসুফ (আঃ) ও নগরীর গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ তাঁদের অভ্যর্থনার জন্য বিশাল আয়োজন করেন। অতঃপর পিতা-মাতা ও ভাইদের নিয়ে তিনি শাহী মহলে প্রবেশ করেন।

১৬৪. মাওলানা মওদূদী, রাসায়েল ও মাসায়েল (ঢাকাঃ ১৯৯৬), ৫/২৫০ পৃঃ।
১৬৫. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ ১/২০৪।

ইউসুফের শৈশবকালে তার মা মৃত্যুবরণ করার কারণে তার আপন খালাকে পিতা বিবাহ করেন, ফলে তিনিই মা হিসাবে পিতার সাথে আগমন করেন। তবে কেউ বলেছেন, তাঁর নিজের মা এসেছিলেন।[১৬৬] অতঃপর তিনি পিতা-মাতাকে তাঁর সিংহাসনে বসালেন। এর পরবর্তী ঘটনা হ'ল শৈশবে দেখা স্বপ্ন বাস্তবায়নের অনন্য দৃশ্য। এ বিষয়ে বর্ণিত কুরআনী ভাষ্য নিম্নরূপ:

فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَى يُوْسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوْا مِصْرَ إِنْ شَآءَ اللهُ آمِنِيْنَ- وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوْا لَهُ سُجَّداً وَقَالَ يَا أَبَتِ هَـــذَا تَأْوِيْلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّيْ حَقّاً وَقَدْ أَحْسَنَ بِيْ إِذْ أَخْرَجَنِيْ مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِيْ وَبَيْنَ إِخْوَتِيْ إِنَّ رَبِّيْ لَطِيفٌ لِّمَا يَشَآءُ، إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ- (يوسف ٩٩-١٠٠)-

'অতঃপর যখন তারা ইউসুফের কাছে পৌঁছল, তখন ইউসুফ পিতা-মাতাকে নিজের কাছে নিল এবং বলল, আল্লাহ চাহেন তো নিঃশংকচিত্তে মিসরে প্রবেশ করুন'। 'অতঃপর সে তাঁর পিতা-মাতাকে সিংহাসনে বসালো এবং তারা সবাই তার সম্মুখে সিজদাবনত হ'ল। সে বলল, হে পিতা! এটিই হচ্ছে আমার ইতিপূর্বে দেখা স্বপ্নের ব্যাখ্যা। আমার পালনকর্তা একে বাস্তবে রূপায়িত করেছেন। তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আমাকে জেল থেকে বের করেছেন এবং আপনাদেরকে গ্রাম থেকে নিয়ে এসেছেন, শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করে দেওয়ার পর। আমার পালনকর্তা যা চান, সুক্ষ্ম কৌশলে তা সম্পন্ন করেন। নিশ্চয়ই তিনি বিজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়' *(ইউসুফ ১২/৯৯-১০০)*।

দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর পিতা-পুত্রের মিলনের সময় ইউসুফের কথাগুলি লক্ষণীয়। তিনি এখানে ভাইদের দ্বারা অন্ধকূপে নিক্ষেপের কথা এবং পরবর্তীতে যোলায়খার চক্রান্তে কারাগারে নিক্ষেপের কথা চেপে গিয়ে কেবল কারামুক্তি থেকে বক্তব্য শুরু করেছেন। তারপর পিতাকে গ্রাম থেকে শহরে এনে মিলনের কথা ও উন্নত জীবনে পদার্পণের কথা বলেছেন। অতঃপর ভাইদের হিংসা ও চক্রান্তের দোষটি শয়তানের উপরে চাপিয়ে দিয়ে ভাইদেরকে

---

১৬৬. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, ১/১৮৪, ২০৪।

বাঁচিয়ে নিয়েছেন। সবকিছুতে আল্লাহ্র অনুগ্রহের স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। নিঃসন্দেহে এটি একটি উচ্চাঙ্গের বর্ণনা এবং এতে মহানুভব ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ইয়াকূবী শরী'আতে সম্মানের সিজদা বা সিজদায়ে তা'যীমী জায়েয ছিল। কিন্তু মুহাম্মাদী শরী'আতে এটা হারাম করা হয়েছে। এমনকি সালাম করার সময় মাথা নত করা বা মাথা ঝুঁকানোও হারাম। এর মাধ্যমে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের প্রতি সিজদা করার দূরতম সম্ভাবনাকেও নস্যাৎ করে দেওয়া হয়েছে।

ইউসুফের দো'আ :

এভাবে ইউসুফের শৈশবকালীন স্বপ্ন যখন স্বার্থক হ'ল, তখন তিনি কৃতজ্ঞ চিত্তে আল্লাহ্র নিকটে প্রাণভরে দো'আ করেন নিম্নোক্ত ভাষায়-

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِيْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِيْ مِنْ تَأْوِيْلِ الأَحَادِيْثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّيْ فِي الدُّنُيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَّنِيْ مُسْلِماً وَّأَلْحِقْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ- (يوسف ١٠١)-

'হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে রাষ্ট্রক্ষমতা দান করেছেন এবং আমাকে (স্বপ্নব্যাখ্যা সহ) বাণীসমূহের নিগুঢ় তত্ত্ব ব্যাখ্যা দানের শিক্ষা প্রদান করেছেন। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের হে সৃষ্টিকর্তা! আপনিই আমার কার্যনির্বাহী দুনিয়া ও আখেরাতে। আপনি আমাকে 'মুসলিম' হিসাবে মৃত্যু দান করুন এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের সাথে মিলিত করুন' *(ইউসুফ ১২/১০১)*।

ইউসুফের উক্ত দো'আর মধ্যে যুগে যুগে সকল আল্লাহভীরু মযলূমের হৃদয় উৎসারিত প্রার্থনা ফুটে বেরিয়েছে। সকল অবস্থায় আল্লাহ্র উপরে ভরসাকারী ও সমর্পিত চিত্ত ব্যক্তির জন্য ইউসুফ (আঃ)-এর জীবনী নিঃসন্দেহে একটি অনন্য সাধারণ প্রেরণাদায়ক দৃষ্টান্ত।

ইউসুফের প্রশংসায় আল্লাহ তা'আলা :

সূরা আল-আন'আমের ৮৩ হ'তে ৮৬ আয়াতে আল্লাহ পাক একই স্থানে পরপর ১৮ জন নবীর নাম উল্লেখ পূর্বক তাঁদের প্রশংসা করে বলেন, আমি

তাদের প্রত্যেককে সুপথ প্রদর্শন করেছি, সৎকর্মশীল হিসাবে তাদের প্রতিদান দিয়েছি এবং তাদের প্রত্যেককে আমরা সারা বিশ্বের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি (وَكُلاًّ فضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ) -*(৮৬)*। তারা প্রত্যেকে ছিল পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত (كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ)-*(৮৫)*। বস্তুতঃ ঐ **১৮** জন প্রশংসিত নবীর মধ্যে হযরত ইউসুফও রয়েছেন *(আন'আম ৬/৮৪)*।

ইউসুফকে আল্লাহ সম্ভবতঃ ছহীফা সমূহ প্রদান করেছিলেন, যেমন ইতিপূর্বে ইবরাহীম (আঃ)-কে প্রদান করা হয়েছিল *(আ'লা ৮৭/১৯)*। আল্লাহ তাঁকে নবুঅত ও হুকূমত উভয় মর্যাদায় ভূষিত করেছিলেন। মানুষ তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকলেও মিসরবাসী সকলে তাঁর দ্বীন কবুল করেনি। উক্ত প্রসঙ্গে আল্লাহ ইউসুফের প্রশংসা করেন এবং মানুষের সন্দেহবাদের নিন্দা করে বলেন,

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوْسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَّبْعَثَ اللهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُوْلاً كَذَلِكَ يُضِلُّ اللهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ-

'ইতিপূর্বে তোমাদের কাছে ইউসুফ সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ আগমন করেছিল। অতঃপর তোমরা তার আনীত বিষয়ে সর্বদা সন্দেহ পোষণ করতে থাক। অবশেষে যখন সে মারা গেল, তখন তোমরা বললে, আল্লাহ ইউসুফের পরে কখনো আর কাউকে রাসূল রূপে পাঠাবেন না... (অথচ রিসালাতের ধারা অব্যাহত ছিল)। আল্লাহ এমনিভাবে সীমালংঘনকারী ও সন্দেহবাদীদের পথভ্রষ্ট করে থাকেন' *(মুমিন ৪০/৩৪)*।

শেষনবীর প্রতি আল্লাহ্র সম্বোধন ও সান্ত্বনা প্রদান :

৩ থেকে ১০১ পর্যন্ত ৯৯টি আয়াতে ইউসুফের কাহিনী বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করার পর আল্লাহ পাক শেষনবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন, ذَلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ- 'এগুলি হ'ল গায়েবী খবর, যা আমরা তোমার কাছে প্রত্যাদেশ করলাম। তুমি তাদের নিকটে (অর্থাৎ ইউসুফ ভ্রাতাদের

নিকটে) ছিলে না, যখন তারা তাদের পরিকল্পনা আঁটছিল এবং ষড়যন্ত্র করছিল' *(ইউসুফ ১২/১০২)*।

এর দ্বারা আল্লাহ একথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, প্রায় আড়াই হাযার বছর পূর্বে ঘটে যাওয়া ইউসুফ ও ইয়াকূব পরিবারের এই অলৌকিক ঘটনা ও অশ্রুতপূর্ব কাহিনী সবিস্তারে ও সঠিকভাবে বর্ণনা করা নবুঅতে মুহাম্মাদীর এক অকাট্য দলীল। কুরআন অবতরণের পূর্বে এ ঘটনা মক্কাবাসী মোটেই জানত না। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَـــذَا، 'ইতিপূর্বে (নবীদের) এ সকল ঘটনা না তুমি জানতে, না তোমার স্বজাতি জানত' *(হূদ ১১/৪৯)*। ইমাম বাগাভী (রহঃ) বলেন, (মদীনা থেকে প্রেরিত) ইহুদী প্রতিনিধি এবং কুরায়েশ নেতারা একত্রিতভাবে রাসূলকে ইউসুফ ও ইয়াকূব-পরিবারের ঘটনাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল। তাদের প্রশ্নের জবাবে অহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত উপরোক্ত ঘটনাবলী সুন্দরভাবে বলে দেওয়া সত্ত্বেও এবং তা তাওরাতের অনুকূলে হওয়া সত্ত্বেও যখন তারা অবিশ্বাস ও কুফরীতে অটল রইল, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অন্তরে দারুন আঘাত পেলেন। এ সময় আল্লাহ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে পরবর্তী আয়াত নাযিল করে বলেন, وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ– 'তুমি যতই আকাংখা কর, অধিকাংশ লোক বিশ্বাস স্থাপনকারী নয়' *(ইউসুফ ১২/১০৩; তাফসীরে বাগাভী)*। অর্থাৎ নবী হিসাবে একমাত্র কাজ হ'ল প্রচার করা ও সাধ্যমত সংশোধনের চেষ্টা করা। চেষ্টাকে সফল করার দায়িত্ব বা ক্ষমতা কোনটাই নবীর এখতিয়ারাধীন নয়। কাজেই লোকদের অবিশ্বাস বা অস্বীকারে দুঃখ করার কিছুই নেই। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَّخَافُ وَعِيْدِ–

'তারা যা বলে আমরা তা সম্যক অবগত আছি। তুমি তাদের উপরে যবরদস্তি কারী নও। অতএব, যে আমার শাস্তিকে ভয় করে, তাকে কুরআনের মাধ্যমে উপদেশ দাও' *(ক্বাফ ৫০/৪৫)*।

ইউসুফের কাহিনী এক নযরে :

(১) জন্মের বৎসরাধিক কাল পরেই মায়ের মৃত্যু (২) অতঃপর ফুফুর কাছে লালন-পালন (৩) ফুফু ও পিতার স্নেহের দ্বন্দ্বে ফুফু কর্তৃক চুরির অপবাদ প্রদান। অতঃপর চুরির শাস্তি স্বরূপ ফুফুর দাসত্ব বরণ (৪) শৈশবে স্বপ্ন দর্শন ও পিতার নিকটে বর্ণনা (৫) পিতৃস্নেহের আধিক্যের কারণে ভ্রাতৃ হিংসায় পতিত হন এবং তাকে হত্যার চক্রান্ত হয় (৬) পরে জঙ্গলে নিয়ে হত্যার বদলে অন্ধকূপে নিক্ষেপ করা হয় (৭) সেখান থেকে প্রসিদ্ধ মতে তিন দিন পরে একটি পথহারা ব্যবসায়ী কাফেলার নিক্ষিপ্ত বালতিতে করে উপরে উঠে আসেন (৮) অতঃপর ভাইদের মাধ্যমে ব্যবসায়ী কাফেলার নিকটে ক্রীতদাস হিসাবে স্বল্পমূল্যে বিক্রি হয়ে যান (৯) অতঃপর 'আযীযে মিছর' ক্বিৎফীরের গৃহে ক্রীতদাস হিসাবে পদার্পণ করেন ও পুত্রস্নেহে লালিত-পালিত হন (১০) যৌবনে গৃহস্বামীর স্ত্রী যোলায়খার কু-নযরে পড়েন (১১) অতঃপর সেখান থেকে ব্যভিচার চেষ্টার মিথ্যা অপবাদে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন (১২) প্রসিদ্ধ মতে সাত বছর কারাগারে থাকার পর বাদশাহ্র স্বপ্ন ব্যাখ্যা দানের অসীলায় বেকসূর খালাস পান এবং তার পূর্বে সম্ভবতঃ জেলখানাতেই তাঁর নবুঅত লাভ হয় (১৩) অতঃপর বাদশাহ্র নৈকট্যশীল হিসাবে বরিত হন (১৪) এ সময় ক্বিৎফীরের মৃত্যু এবং বাদশাহ্র উদ্যোগে যুলায়খার সাথে ইউসুফের বিবাহ হয় বলে ইস্রাঈলী বর্ণনায় প্রতিভাত হয়। তবে এতে মতভেদ রয়েছে। (১৫) বাদশাহ ইসলাম কবুল করেন বলে বর্ণিত হয়েছে এবং ইউসুফকে অর্থ মন্ত্রণালয় সহ দেশের পুরা শাসনভার অর্পণ করে তিনি নির্জনবাসী হন (১৬) দুর্ভিক্ষের সাত বছরের শুরুতে কেন'আন থেকে ইউসুফের সৎ ভাইয়েরা খাদ্যের সন্ধানে মিসরে আসেন এবং তিনি তাদের চিনতে পারেন। দ্বিতীয়বার আসার সময় তিনি বেনিয়ামীনকে সাথে আনতে বলেন (১৭) বেনিয়ামীনকে আনার পর বিদায়ের সময় তার খাদ্য-শস্যের বস্তার মধ্যে ওযনপাত্র রেখে দিয়ে কৌশলে 'চোর'(?) বানিয়ে তাকে নিজের কাছে আটকে রাখেন (১৮) বেনিয়ামীনকে হারানোর মনোকষ্টে বেদনাহত পিতা ইয়াকূব স্বীয় পুত্র ইউসুফ ও বেনিয়ামীনকে একত্রে পাওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্র নিকট থেকে বিশেষ জ্ঞান অথবা গোপন অহী লাভ করেন (১৯) ইউসুফ ও বেনিয়ামীনকে খুঁজে আনার জন্য ছেলেদের প্রতি তিনি কড়া নির্দেশ দেন এবং সেমতে তারা পুনরায় মিসর গমন করেন (২০) এই সময় আযীযে মিছরের সঙ্গে সাক্ষাৎ কালে ভাইদের মুখে বৃদ্ধ পিতার ও দুস্থ পরিবারের দুরবস্থার কথা শুনে ব্যথিত ইউসুফ নিজেকে প্রকাশ করে দেন। (২১) তখন ভাইয়েরা তার নিকটে ক্ষমা

প্রার্থনা করেন এবং নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেন (২২) ইউসুফের নির্দেশে ভাইয়েরা কেন‘আনে ফিরে যান এবং ইউসুফের দেওয়া তার ব্যবহৃত জামা তার পরামর্শমতে অন্ধ পিতার চেহারার উপরে রাখার সাথে সাথে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান (২৩) অতঃপর ইউসুফের আবেদনক্রমে গোটা ইয়াকূব-পরিবার মিসরে স্থায়ীভাবে হিজরত করে (২৪) মিসরে তাদেরকে রাজকীয় সম্বর্ধনা প্রদান করা হয় এবং প্রসিদ্ধ মতে চল্লিশ বছর পর পিতা ও পুত্রের মিলন হয়। (২৫) অতঃপর পিতা-মাতা ও ১১ ভাই ইউসুফকে সম্মানের সিজদা করেন। (২৬) এভাবে শৈশবে দেখা ইউসুফের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয় এবং একটি করুণ কাহিনীর আনন্দময় সমাপ্তি ঘটে।

ইয়াকূব (আঃ)-এর মৃত্যু :

ইয়াকূব (আঃ) মিসরে ১৭ বছর বসবাস করার পর ১৪৭ বছর বয়সে সেখানে মৃত্যুবরণ করেন এবং অছিয়ত অনুযায়ী তাঁকে কেন‘আনে পিতা ইসহাক ও দাদা ইবরাহীম (আঃ)-এর কবরের পাশে সমাহিত করা হয়।[১৬৭]

ইউসুফ (আঃ)-এর মৃত্যুঃ

ইউসুফ (আঃ) ১২০ বছর বয়সে মিসরে ইন্তেকাল করেন। তিনিও কেন‘আনে সমাধিস্থ হওয়ার জন্য অছিয়ত করে যান। তাঁর দুই ছেলে ছিল ইফরাঈম ও মানশা।[১৬৮] কেন‘আনের উক্ত স্থানটি এখন ফিলিস্তীনের হেবরন এলাকায় ‘আল-খলীল’ নামে পরিচিত। আল্লাহ বলেন, لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُوْلِي الأَلْبَابِ، ‘নিশ্চয়ই নবীগণের কাহিনীতে জ্ঞানীদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ রয়েছে’ *(ইউসুফ ১২/১১১)*।

ঐতিহাসিক মানছূরপুরী (মৃঃ ১৩৪৯/১৯৩০ খৃঃ) বলেন, ইউসুফ (আঃ)-এর অবস্থার সাথে আমাদের নবী (ছাঃ)-এর অবস্থার পুরোপুরি মিল ছিল। দু’জনেই সৌন্দর্য ও পূর্ণতার অধিকারী ছিলেন। দু’জনকেই নানাবিধ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ’তে হয়েছে। দু’জনের মধ্যে ক্ষমা ও দয়াগুণের প্রাচুর্য ছিল। দু’জনেই স্ব স্ব অত্যাচারী ভাইদের উদ্দেশ্যে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে বলেছিলেন, لاَتَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ‘আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ

---

১৬৭. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ ১/২০৫।
১৬৮ . ঐ, পৃঃ ১/২০৬, ১৯৬।

নেই'। দু'জনেই আদেশ দানের ও শাসন ক্ষমতার মালিক ছিলেন এবং পূর্ণ কামিয়াবী ও প্রতিপত্তি থাকা অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছেন'।[১৬৯]

পূর্বে বর্ণিত ঐতিহাসিক বর্ণনা সমূহের সাথে মানছূরপুরীর বর্ণনার মধ্যে কিছু গরমিল রয়েছে। ঐতিহাসিকগণের মধ্যে এরূপ মতপার্থক্য থাকাটা স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য এই যে, কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বাইরে সকল বক্তব্যের উৎস হ'ল ইস্রাঈলী বর্ণনা সমূহ। সেখানে বক্তব্যের ভিন্নতার কারণেই মুসলিম ঐতিহাসিকদের বক্তব্যে ভিন্নতা এসেছে। এই সঙ্গে এটাও জানা আবশ্যক যে, ইহুদীরা ছিল আল্লাহ্র আয়াত সমূহকে অস্বীকারকারী, অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যাকারী, আল্লাহ্র কিতাবসমূহকে বিকৃতকারী ও তার মাধ্যমে দুনিয়া উপার্জনকারী এবং নবীগণের চরিত্র হননকারী। বিশেষ করে ইউসুফ, দাঊদ, সুলায়মান, ঈসা ও তাঁর মায়ের উপরে যে ধরনের জঘন্য অপবাদ সমূহ তারা রটনা করেছে, ইতিহাসে তার তুলনা বিরল। অতএব ইউসুফ (আঃ) সম্পর্কে তাদের বর্ণিত অভব্য ও আপত্তিকর বিষয়াবলী থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

সংশয় নিরসন :

সূরা ইউসুফের মোট ৯ (নয়)টি আয়াতের ব্যাখ্যায় বিদ্বানগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আয়াতগুলি হ'ল যথাক্রমে ৪, ৬, ৮, ১৫, ২৪, ২৬, ২৮, ৪২ ও ৫২ আমরা এখানে সেগুলি সংক্ষেপে তুলে ধরব এবং গৃহীত ব্যাখ্যাটি পেশ করব।-

১. আয়াত সংখ্যা ৪ : (أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً) 'এগারোটি নক্ষত্র'। জনৈক ইহুদীর প্রশ্নের উত্তরে রাসূলের বরাত দিয়ে উক্ত ১১টি নক্ষত্রের নাম সহ হাদীছ বর্ণনা করা হয়েছে।[১৭০] যাদেরকে ইউসুফ আকাশে তাকে সিজদা করতে দেখেন। অথচ হাদীছটি ভিত্তিহীন।

এখানে গৃহীত ব্যাখ্যা হ'ল, ইউসুফের বাকী ১১ ভাই হ'লেন ১১টি নক্ষত্র এবং তাঁর পিতা-মাতা হ'লেন সূর্য ও চন্দ্র, যারা একত্রে ইউসুফকে সম্মানের সিজদা করেন। যা বর্ণিত হয়েছে সূরা ইউসুফ ১০০ নম্বর আয়াতে।

২. আয়াত সংখ্যা ৬ : (وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ) 'এবং তোমাকে বাণী সমূহের নিগুঢ় তত্ত্ব শিক্ষা দেবেন'। এখানে একদল বিদ্বান বলেছেন, 'বাণী

---

১৬৯. *সুলায়মান বিন সালমান মানছূরপুরী, রহমাতুল লিল আলামীন (সুইওয়ালাঁ দিল্লী-২ : ই'তিক্বাদ পাবলিশিং হাউস, ১ম সংস্করণ ১৯৮০ খৃঃ), ৩/১৩৩ পৃঃ।*
১৭০. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/১৮৬।*

সমূহের নিগুঢ় তত্ত্ব' অর্থ আল্লাহ্‌র কিতাব ও নবীগণের সুন্নাত সমূহের অর্থ উপলব্ধি করা। এখানে গৃহীত ব্যাখ্যা হ'ল : স্বপ্ন ব্যাখ্যা দানের ক্ষমতা, যা বিশেষভাবে হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে দেওয়া হয়েছিল। আল্লাহ্‌র বাণী সমূহ, যা তাঁর কিতাব সমূহে এবং নবীগণের সুন্নাত সমূহে বিধৃত হয়েছে, সেসবের ব্যাখ্যাও এর মধ্যে শামিল রয়েছে।

৩. আয়াত সংখ্যা ৮ : (إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ) 'নিশ্চয়ই আমাদের পিতা স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছেন'। ইউসুফের বিমাতা দশ ভাই তাদের পিতা হযরত ইয়াকূব (আঃ)-কে একথা বলেছিল শিশুপুত্র ইউসুফ ও তার ছোট ভাই বেনিয়ামীনের প্রতি তাঁর স্নেহাধিক্যের অভিযোগ এনে। একই কথা তাঁকে পরিবারের অন্যেরা কিংবা প্রতিবেশীরাও বলেছিল, যখন ইউসুফের সাথে সাক্ষাতের পর তার ব্যবহৃত জামা নিয়ে ভাইদের কাফেলা কেন'আনের উদ্দেশ্যে মিসর ত্যাগ করছিল। পিতা ইয়াকূব তখন বলেছিলেন, إِنِّي لَأَجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ 'আমি ইউসুফের গন্ধ পাচ্ছি' *(ইউসুফ ৯৪)*। জবাবে লোকেরা বলেছিল, تَاللهِ إِنَّكَ لَفِيْ ضَلاَلِكَ الْقَدِيْمِ 'আল্লাহ্‌র কসম! আপনি তো সেই পুরানো ভ্রান্তিতেই পড়ে আছেন' *(ইউসুফ ৯৫)*।

এখানে 'ভ্রান্তি' (ضلل) অর্থ 'প্রকৃত বিষয় সম্পর্কে না জানা'। যেমন শেষনবী (ছাঃ) সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন, وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فَهَدَى 'তিনি তোমাকে পেয়েছিলেন পথহারা। অতঃপর তিনি পথ দেখিয়েছেন' *(আয-যোহা ৭)*। অতএব গৃহীত ব্যাখ্যা হ'ল এই যে, এখানে ضلال বা ভ্রান্তি কথাটি আভিধানিক অর্থে এসেছে পারিভাষিক অর্থে নয়। কেননা পারিভাষিক অর্থে ضلال বা ভ্রষ্টতার অর্থ ضلال في الدين 'ধর্মচ্যুত হওয়া'। নবীপুত্র হিসাবে ইউসুফের ভাইয়েরা তাদের পিতা নবী ইয়াকূবকে নিশ্চয়ই ধর্মচ্যুত কাফের বলেনি।

৪. আয়াত সংখ্যা ১৫ : (فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَّجْعَلُوْهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَـذَا وَهُمْ لاَ يَشْعُرُوْنَ) 'অতঃপর তারা যখন

তাকে নিয়ে যাত্রা করল এবং অন্ধকূপে নিক্ষেপ করতে একমত হ'ল, তখন আমরা তাকে অহী (ইলহাম) করলাম যে, (এমন একটা দিন আসবে, যখন) অবশ্যই তুমি তাদেরকে তাদের এ কুকর্মের কথা অবহিত করবে। অথচ তারা তোমাকে চিনতে পারবে না'।

এখানে বিদ্বানগণ মতভেদ করেছেন 'যখন তারা তাকে নিয়ে যাত্রা করল'-এর لَمَّا অর্থাৎ 'যখন'-এর জওয়াব নিয়ে। অর্থাৎ কূপে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পূর্বে না পরে এই ইলহাম হয়েছিল। কোন কোন বিদ্বান বলেছেন, কূপে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর ভাইয়েরা যখন রক্ত মাখা জামা নিয়ে পিতার নিকটে এসে কৈফিয়ত পেশ করে *(ইউসুফ ১৭)*, তখন ইউসুফকে সান্ত্বনা দিয়ে এ ইলহাম করা হয়।

এক্ষেত্রে <u>গৃহীত ব্যাখ্যা হ'ল</u>: (وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ)-এর واو এসেছে (لَمَّا)-এর জওয়াব হিসাবে এবং তা বাক্যে صلة হয়েছে। ফলে ব্যাখ্যা দাঁড়াবে এই যে, কূয়ায় নিক্ষিপ্ত হওয়ার পূর্বেই এ ইলহাম করা হয়েছিল। আর এটি বাস্তবায়িত হয়েছিল বহু বৎসর পরে যখন ইউসুফের সঙ্গে তার ভাইদের সাক্ষাৎ হয়। অথচ তারা তাঁকে চিনতে পারেনি *(ইউসুফ ৫৮)*। ইউসুফ তার ভাইদের সেদিন বলেছিলেন, 'তোমাদের কি জানা আছে যা তোমরা করেছিলে ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে? যখন তোমরা (পরিণাম সম্পর্কে) অজ্ঞ ছিলে'? 'তারা বলল, তবে কি তুমিই ইউসুফ? তিনি বললেন, আমিই ইউসুফ, আর এ হ'ল আমার (সহোদর) ভাই। আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন... *(ইউসুফ ৮৯-৯০)*।

৫. আয়াত সংখ্যা ২৪ : (وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلاَ أَن رَّآ بُرْهَانَ رَبِّهِ)
'উক্ত মহিলা তার বিষয়ে কুচিন্তা করেছিল। আর সেও তার প্রতি কল্পনা করত, যদি না সে স্বীয় পালনকর্তার প্রমাণ অবলোকন করত..'।

এখানে প্রথম প্রশ্ন হ'লঃ ইউসুফ উক্ত মহিলার প্রতি কোনরূপ অন্যায় কল্পনা করেছিলেন কি-না। দ্বিতীয় প্রশ্ন হ'ল, তিনি যে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে 'প্রমাণ' (برهان) অবলোকন করেছিলেন সেটা কি?

প্রথম প্রশ্নের জওয়াব হ'ল দ্বিবিধ: (১) অনিচ্ছাকৃতভাবে কল্পনা এসে থাকতে পারে। যা বেগানা নারী-পুরুষের মধ্যে হ'তে পারে। কিন্তু বুদ্বুদের ন্যায় উবে যাওয়া চকিতের এই কল্পনা কোন পাপের কারণ নয়। কেননা তিনি নিজেকে সংযত রেখেছিলেন এবং ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। ভবিষ্যৎ নবী হিসাবে যেটা তাঁর জন্য স্বাভাবিক ছিল। আল্লাহ বলেন, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى– 'যে ব্যক্তি তার প্রভুর সত্তাকে ভয় করে এবং নিজেকে প্রবৃত্তির তাড়না থেকে বিরত রাখে', 'নিশ্চয়ই জান্নাত তার ঠিকানা হবে' *(নাযে'আত ৪০-৪১)*। মুনাফিকদের কুপরামর্শে ওহোদের যুদ্ধ থেকে বনু হারেছাহ ও বনু সালামাহ পালিয়ে আসতে চেয়েছিল। কিন্তু পালায়নি। যে বিষয়ে আল্লাহ বলেন, إِذْ هَمَّتْ طَّآئِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلاَ وَاللهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ 'যখন তোমাদের দু'টি দল সাহস হারাবার উপক্রম করেছিল, অথচ আল্লাহ তাদের অভিভাবক ছিলেন, আর আল্লাহ্র উপরেই বিশ্বাসীদের ভরসা করা উচিত' *(আলে ইমরান ১২২)*।

এখানে একই هَمَّتْ (কল্পনা করছিল) ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ আল্লাহ তাদের ক্ষমা করেন এবং নিজেকে তাদের অভিভাবক বলে বরং তাদের প্রশংসা করেছেন। উল্লেখ্য যে, هَمٌّ বা কল্পনা দু'ধরনের হয়ে থাকে।

এক- هم ثابت বা দৃঢ় কল্পনা, যা আযীয-পত্নী করেছিল ইউসুফের প্রতি।

দুই- هم عارض অনিচ্ছাকৃত কল্পনা, যাতে কোন দৃঢ় সংকল্প থাকে না। ইউসুফের মধ্যে যদি এটা এসে থাকে বলে মনে করা হয়, তবে তাতে তিনি দোষী হবেন না। কেননা তিনি ঐ কল্পনার কথা মুখে বলেননি বা কাজে করেননি। বরং তার বিরুদ্ধে বলেছেন ও করেছেন।

দ্বিতীয় জওয়াব হ'ল এই যে, ইউসুফের মনে আদৌ কোন অন্যায় কল্পনা আসেনি। প্রমাণ মওজুদ থাকার কারণে এটা তাঁর চরিত্রে নিষিদ্ধ ছিল। মুফাসসির আবু হাইয়ান স্বীয় তাফসীর 'বাহরুল মুহীত্বে' একথা বলেন। তিনি বলেন, এমতাবস্থায় আয়াতটির বর্ণনা হবে, لولا أن رَّآ برهان ربه لهَمَّ بِها 'যদি তিনি তার পালনকর্তার প্রমাণ না দেখতেন, তাহ'লে তার (অর্থাৎ উক্ত

মহিলার) ব্যাপারে কল্পনা করতেন'। আলোচ্য আয়াতে لولا (যদি) শর্তের জওয়াব আগেই উল্লেখিত হয়েছে। অর্থাৎ বলা হয়েছে وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَن رَّآ بُرْهَانَ رَبِّهِ 'আর সেও তার প্রতি কল্পনা করত, যদি না সে স্বীয় পালনকর্তার প্রমাণ অবলোকন করত'। আর সেই 'বুরহান' বা প্রমাণ ছিল আল্লাহ নির্ধারিত 'নফসে লাউয়ামাহ' অর্থাৎ শাণিত বিবেক, যা তাকে কঠোরভাবে বাধা দিয়েছিল।

আরবী সাহিত্যে ও কুরআনে এ ধরনের বাক্যের বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন জান্নাতীগণ বলবেন, وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلاَ أَنْ هَدَانَا اللهُ 'আমরা কখনো সুপথ পেতাম না, যদি না আল্লাহ আমাদের পথ প্রদর্শন করতেন' *(আ'রাফ ৪৩)*। অর্থাৎ لولا أن هدانا اللهُ ما كنا لِنهتديَ 'যদি আল্লাহ আমাদের হেদায়াত না করতেন, তাহ'লে আমরা হেদায়াত পেতাম না'।

ইউসুফের নিষ্পাপত্ব :

ইউসুফ যে এ ব্যাপারে শতভাগ নিষ্পাপ ছিলেন, সে বিষয়ে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি দ্রষ্টব্য:

(১) ইউসুফ দৃঢ়ভাবে নিজের নির্দোষিতা ঘোষণা করেন। যেমন গৃহস্বামীর কাছে তিনি বলেন, هِيَ رَاوَدَتْنِيْ عَنْ نَفْسِيْ 'উক্ত মহিলাই আমাকে প্ররোচিত করেছিল' *(ইউসুফ ২৬)*। তার আগে তিনি মহিলার কুপ্রস্তাবের জওয়াবে বলেছিলেন, مَعَاذَ اللهِ إِنَّهُ رَبِّيْ أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُوْنَ 'আল্লাহ আমাকে রক্ষা করুন! তিনি (অর্থাৎ গৃহস্বামী) আমার মনিব। তিনি আমার উত্তম বসবাসের ব্যবস্থা করেছেন। নিশ্চয়ই সীমা লংঘনকারীগণ সফলকাম হয় না' *(ইউসুফ ২৩)*। নগরীর মহিলাদের সমাবেশে গৃহকর্ত্রী যখন ইউসুফকে তার কুপ্রস্তাবে রাযী না হ'লে জেলে পাঠানোর হুমকি দেন, তখন ইউসুফ তার জওয়াবে বলেছিলেন, رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِيْ إِلَيْهِ 'হে আমার পালনকর্তা! এরা আমাকে যে কাজের দিকে আহ্বান জানাচ্ছে, তার চাইতে কারাগারই আমার নিকটে অধিক পসন্দনীয়' *(ইউসুফ ৩৩)*। এখানে তিনি তাদের চক্রান্ত থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ্র আশ্রয় ভিক্ষা করেন।

(২) উক্ত মহিলা নিজেই ইউসুফের নির্দোষিতার সাক্ষ্য দেন। যেমন নগরীর মহিলাদের সমাবেশে তিনি বলেন, وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَنْ نَّفْسِهِ فَاسَتَعْصَمَ 'আমি তাকে প্ররোচিত করেছিলাম, কিন্তু সে নিজেকে সংযত রেখেছিল' *(ইউসুফ ৩২)*। পরবর্তীতে যখন ঘটনা পরিষ্কার হয়ে যায়, তখনও উক্ত মহিলা বলেন, الآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدتُّهُ عَنْ نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ 'এখন সত্য প্রকাশিত হ'ল। আমিই তাকে ফুসলিয়েছিলাম এবং সে ছিল সত্যবাদী' *(ইউসুফ ৫১)*।

(৩) তদন্তকালে নগরীর সকল মহিলা ইউসুফ সম্পর্কে সত্য সাক্ষ্য দেন। তারা বলেন, حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْءٍ 'আল্লাহ পবিত্র। আমরা ইউসুফ সম্পর্কে মন্দ কিছুই জানি না' *(ইউসুফ ৫১)*।

(৪) গৃহকর্তা আযীযে মিছর তার নির্দোষিতার সাক্ষ্য দিয়ে বলেন, إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمٌ '(হে স্ত্রী!) এটা তোমাদের ছলনা মাত্র। নিঃসন্দেহে তোমাদের ছলনা খুবই মারাত্মক' *(ইউসুফ ২৮)*। 'ইউসুফ! এ প্রসঙ্গ ছাড়। আর হে মহিলা! এ পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চিতভাবে তুমিই পাপাচারিনী' *(ঐ, ২৯)*।

(৫) গৃহকর্তার উপদেষ্টা ও সাক্ষী একইভাবে সাক্ষ্য দেন ও বলেন, وَإِنْ كَانَ قَمِيْصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ 'যদি ইউসুফের জামা পিছন দিকে ছেঁড়া হয়, তবে মহিলা মিথ্যা বলেছে এবং ইউসুফ সত্যবাদী' *(ঐ, ২৭)*।

(৬) আল্লাহ স্বয়ং ইউসুফের নির্দোষিতার সাক্ষ্য দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন, كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ 'এভাবেই এটা এজন্য হয়েছে, যাতে আমরা তার থেকে যাবতীয় মন্দ ও নির্লজ্জ বিষয় সরিয়ে দেই। নিশ্চয়ই সে আমাদের মনোনীত বান্দাগণের অন্যতম' *(ঐ, ২৪)*।

(৭) এমনকি অভিশপ্ত ইবলীসও প্রকারান্তরে ইউসুফের নির্দোষিতার সাক্ষ্য দিয়েছে। যেমন সে অভিশপ্ত হওয়ার পর আল্লাহ্কে বলেছিল, لَأُغْوِيَنَّهُمْ

Contents

أَجْمَعِيْنَ، إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ– 'আমি অবশ্যই তাদের (বনু আদমের) সবাইকে পথভ্রষ্ট করব'। 'তবে তাদের মধ্য হ'তে তোমার মনোনীত বান্দাগণ ব্যতীত *(হিজর ৩৯-৪০; ছোয়াদ ৮২)*। এখানে একই শব্দ ব্যবহার করে আল্লাহ ইউসুফকে তাঁর 'মনোনীত বান্দাগণের অন্যতম' *(ইউসুফ ২৪)* বলে ঘোষণা করেছেন।

অত্র ২৪ আয়াতে বর্ণিত (السُّوْءَ وَالْفَحْشَاء) 'মন্দ ও নির্লজ্জ বিষয়সমূহ' অর্থ কি? এ বিষয়ে বিদ্বানগণ বলেন, মুখের বা হাতের দ্বারা স্পর্শ করার পাপ এবং প্রকৃত যেনার পাপ। অর্থাৎ উভয় প্রকার পাপ থেকে আল্লাহ ইউসুফকে ফিরিয়ে নেন।

নিকৃষ্ট মনের অধিকারী ইহুদীরা ও তাদের অনুসারীরা, যারা ইউসুফের চরিত্রে কালিমা লেপন করে নানাবিধ কল্পনার ফানুস উড়িয়ে শত শত পৃষ্ঠা মসীলিপ্ত করেছে, তাদের উদ্দেশ্যে ইমাম রাযী (রহঃ) বলেন, 'যেসব মূর্খরা ইউসুফের চরিত্রে কলংক লেপনের চেষ্টা করে, তারা যদি আল্লাহ্র দ্বীনের অনুসারী হবার দাবীদার হয়, তাহ'লে তারা এ ব্যাপারে আল্লাহ্র সাক্ষ্য কবুল করুক। অথবা যদি তারা শয়তানের তাবেদার হয়, তবে ইবলীসের সাক্ষ্য কবুল করুক'। আসল কথা এই যে, ইবলীস এখন এদের শিষ্যে পরিণত হয়েছে।

এক্ষণে আয়াতের গৃহীত ব্যাখ্যা দু'টির সারমর্ম হ'ল (১) আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে প্রমাণ মওজুদ থাকার কারণে ইউসুফের অন্তরে আদৌ বাজে কল্পনার উদয় হয়নি (২) প্রমাণ দেখার কারণে কল্পনার বুদ্বুদ সাথে সাথে মিলে যায় এবং তিনি আল্লাহ্র আশ্রয় কামনা করেন ও দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

এক্ষণে প্রশ্ন হ'ল: ঐ 'বুরহান' বা প্রমাণটি কি ছিল, যা তিনি দেখেছিলেন? এ বিষয়ে ইবনু আব্বাস, আলী, ইকরিমা, মুজাহিদ, সুদ্দী, সাঈদ ইবনু জুবায়ের, ইবনু সীরীন, ক্বাতাদাহ, হাসান বাছরী, যুহরী, আওযাঈ, কা'ব আল-আহবার, ওহাব বিন মুনাব্বিহ এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ বিদ্বান মণ্ডলীর নামে এমন সব উদ্ভট ও নোংরা কাল্পনিক চিত্রসমূহ তাফসীরের কেতাব সমূহে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, যা পড়তেও ঘৃণাবোধ হয় ও লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায়। শুরু থেকে এ যাবত কালের কোন তাফসীরের কেতাবই সম্ভবতঃ এইসব ভিত্তিহীন ও কাল্পনিক গল্প থেকে মুক্ত নয়। উক্ত মুফাসসিরগণের তাক্বওয়া ও বিদ্যাবত্তার

প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেও বলতে বাধ্য হব যে, ইউসুফের প্রতি সুধারণা রাখা সত্ত্বেও তাঁরা প্রাচীন কালের ইহুদী যিন্দীক্বদের বানোয়াট কাহিনী সমূহের কিছু কিছু স্ব স্ব কিতাবে স্থান দিয়ে দুধের মধ্যে বিষ মিশ্রিত করেছেন। যা এ যুগের নাস্তিক ও যিন্দীক্বদের জন্য নবীগণের নিষ্পাপত্বের বিরুদ্ধে প্রচারের মোক্ষম হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে তা ধর্মভীরু মানুষের ধর্মচ্যুতির কারণ হয়েছে। সাথে সাথে এগুলি কিছু পেট পূজারী কাহিনীকারের রসালো গল্পের খোরাক হয়েছে। তাফসীরের নামে যা শুনে মানুষ ক্রমেই ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। অতএব ঈমানদারগণ সাবধান!!

‘বুরহান’ কি?

لَوْلا أَن رَّآى بُرْهَانَ رَبِّهِ ‘যদি সে তার পালনকর্তার প্রমাণ না দেখত’ এ কথার মধ্যে কোন্ প্রমাণ ইউসুফকে দেখানো হয়েছিল, সেটা বলা হয়নি। তবে কুরআনে মানুষের তিনটি নফসের কথা বলা হয়েছে। (১) নফসে আম্মারাহ। যা মানুষকে অন্যায় কাজে প্ররোচিত করে (২) নফসে লাউয়ামাহ। যা মানুষকে ন্যায় কাজে উদ্বুদ্ধ করে ও অন্যায় কাজে বাধা দেয় এবং (৩) নফসে মুত্বমাইন্নাহ, যা মানুষকে ন্যায়ের উপর দৃঢ় রাখে, আর তাতে দেহমনে প্রশান্তি আসে। নবীগণের মধ্যে শেষের দু’টি নফস সর্বাধিক জোরালোভাবে ক্রিয়াশীল থাকে। আর নফসে লাউয়ামাহ বা বিবেকের তীব্র কষাঘাতকেই এখানে ‘বুরহান’ বা ‘আল্লাহ্র প্রমাণ’ হিসাবে বলা হয়ে থাকতে পারে। যেমন হাদীছে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ছিরাতে মুস্তাক্বীমের উদাহরণ বর্ণনা করে তার মাথায় একজন আহ্বানকারীর কথা বলেছেন, যিনি সর্বদা মানুষকে ধমক দেন যখনই সে অন্যায়ের কল্পনা করে। তিনি বলেন, খবরদার! নিষিদ্ধ পর্দা উত্তোলন করো না। করলেই তুমি তাতে প্রবেশ করবে। এই ধমকদানকারীকে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) واعظُ اللهِ فِي قلبِ كلِّ مؤمنٍ ‘প্রত্যেক মুমিনের হৃদয়ে আল্লাহ্র উপদেশদাতা’ হিসাবে অভিহিত করেছেন’।[১৭১] ইউসুফের হৃদয়ে নিশ্চয়ই ঐ ধমকদাতা উপদেশ দানকারী মওজুদ ছিলেন যাকে (بُرْهَانَ رَبِّهِ) বা ‘আল্লাহ্র প্রমাণ’ বলা হয়েছে।

---

১৭১ . *রাযীন, আহমাদ, মিশকাত হা/১৯১ সনদ ছহীহ, ‘কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা’ অনুচ্ছেদ।*

অতএব এখানে 'বুরহান' বা প্রমাণ বলতে যেনার মত জঘন্য অপকর্মের বিরুদ্ধে বিবেকের তীব্র কষাঘাতকেই বুঝানো হয়েছে। যা নবীগণের হৃদয়ে আল্লাহ প্রোথিত রাখেন। ইমাম জা'ফর ছাদিক্ব বলেন, 'বুরহান' অর্থ নবুঅত, যাকে আল্লাহ নবীগণের হৃদয়ে গ্রথিত রাখেন। যা তার মধ্যে এবং আল্লাহ্র ক্রোধপূর্ণ কাজের মধ্যে প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করে। অতএব 'বুরহান' অর্থ নবুঅতের নিষ্পাপত্ব, যা ইউসুফকে উক্ত পাপ থেকে বিরত রাখে।

৬. আয়াত সংখ্যা ২৬ : (وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا) 'আর মহিলার পরিবারের জনৈক ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল'। কিন্তু কে সেই সাক্ষী? এ নিয়ে মুফাসসিরগণের মধ্যে প্রচুর মতভেদ রয়েছে। যেমন কেউ বলেছেন এটি ছিল দোলনার শিশু, কেউ বলেছেন, মহিলার এক দূরদর্শী চাচাতো ভাই, কেউ বলেছেন, তিনি মানুষ বা জিন ছিলেন না, বরং আল্লাহ্র অন্য এক সৃষ্টি ছিলেন। ছাহাবী ও তাবেঈগণের নামেই উক্ত মতভেদগুলি বর্ণিত হয়েছে। অথচ কুরআন স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছে যে, 'ঐ ব্যক্তি ছিলেন মহিলার পরিবারের সদস্য' *(ইউসুফ ২৬)*। এটা বুঝতে মোটেই কষ্ট হয় না যে, লোকটি ছিলেন নিরপেক্ষ ও অত্যন্ত জ্ঞানী ব্যক্তি এবং তিনি ছিলেন আযীযে মিছরের নিকটতম লোক। নইলে তিনি তার সঙ্গে অন্দরমহলে আসতে পারতেন না।

দুর্ভাগ্য যে, এ প্রসঙ্গে একটি হাদীছও বলা হয়ে থাকে। সেখানে বলা হয়েছে যে, চার জন শিশু দোলনায় থাকতে কথা বলেছে, তার মধ্যে ইউসুফের সাক্ষী একজন। চারজনের মধ্যে তিন জনের বিষয়টি সঠিক। কিন্তু ইউসুফের সাক্ষী কথাটি মিথ্যা। যার কারণে হাদীছটি যঈফ।[১৭২] ঐ তিন জন হ'লেন, ঈসা (আঃ), ২- জুরায়েজ নামক বনু ইস্রাঈলের জনৈক সৎ ব্যক্তি, যাকে এক দুষ্টু মহিলা যেনার অপবাদ দেয়। পরে তার বাচ্চা স্বয়ং জুরায়েজ-এর নির্দোষিতার সাক্ষ্য দেয় ও প্রকৃত যেনাকারীর নাম বলে দেয় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ)*। ৩- শেষনবীর জন্মগ্রহণের প্রায় ৪০ বছর পূর্বে সংঘটিত আছহাবুল উখদূদের ঘটনা, যেখানে এক যালেম শাসক বহু গর্ত খুঁড়ে সেখানে আগুন জ্বালিয়ে একদিনে প্রায় বিশ হাযার মতান্তরে সত্তুর হাযার ঈমানদার নর-নারীকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারে। সে সময় একজন মহিলা তার কোলে থাকা দুধের বাচ্চাকে নিয়ে আগুনে ঝাঁপ দিতে ইতস্তত করায় শিশু পুত্রটি বলে

---

১৭২. *আলবানী, যঈফুল জামে' হা/৪৭৬২, ৪৭৭৫।*

উঠেছিল إصبِرى ياأُمَّهْ فإنكِ على الحق ‘ছবর কর মা! কেননা তুমি সত্যের উপরে আছ’।[১৭৩] এইসব ছহীহ হাদীছের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে ইউসুফের সাক্ষীর নাম। অথচ কুরআন স্পষ্টভাবেই বলে দিয়েছে যে, সাক্ষী ছিলেন মহিলাটির পরিবারের একজন ব্যক্তি। তাছাড়া আরও বলে দিয়েছে উক্ত ব্যক্তির দূরদর্শিতাপূর্ণ পরামর্শ যে, যদি ইউসুফের জামা পিছন দিকে ছেঁড়া হয়, তাহ’লে সে সত্যবাদী’ *(ইউসুফ ২৭)*। এক্ষণে কীভাবে একথা বলা যায় যে, ঐ সাক্ষী ছিল দোলনার শিশু বা আল্লাহ্র অন্য এক সৃষ্টি? যদি তাই হবে, তাহ’লে সেটাই তো যথেষ্ট ছিল। অন্য কোন তদন্তের দরকার ছিল না বা ইউসুফকে হয়ত জেলও খাটতে হ’ত না।

৭. আয়াত সংখ্যা ২৮ : (إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ) ‘নিশ্চয়ই তোমাদের ছলনা খুবই মারাত্মক’। এই আয়াতের সঙ্গে যদি অন্য একটি আয়াত মিলানো হয়, যেখানে বলা হয়েছে যে, إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً ‘নিশ্চয়ই শয়তানের কৌশল সর্বদা দুর্বল’ *(নিসা ৭৬)*। তাহ’লে ফলাফল দাঁড়াবে এই যে, মহিলারা শয়তানের চাইতে মারাত্মক। ইমাম কুরতুবী এর পক্ষে একটি মরফূ হাদীছ এনেছেন, যেখানে বলা হয়েছে যে, إِنَّ كَيْدَ النِّسَاءِ أَعْظَمُ مِنْ كَيْدِ الشَّيْطَانِ ‘নিশ্চয়ই নারীদের ছলনা শয়তানের ছলনার চাইতে বড়’। অথচ হাদীছটি যঈফ ও জাল।[১৭৪] অথচ শয়তানকে আল্লাহ ক্ষমতা দিয়েছেন মানুষকে পথভ্রষ্ট করার। আর এটা করেছেন মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য, কে শয়তানের ধোঁকায় পড়ে আর কে না পড়ে। পুরুষ ও নারী উভয়ের মধ্যে ভাল ও মন্দ রয়েছে। উভয়ে শয়তানের খপ্পরে পড়তে পারে। কিন্তু কেউই শয়তানের চাইতে বড় নয়। আলোচ্য আয়াতে দুষ্টু নারীদের ছলনার ভয়ংকরতা বুঝানো হয়েছে। যেকথা একটি ছহীহ হাদীছে আল্লাহ্র রাসূলও বলেছেন যে, ‘জ্ঞানী পুরুষকে হতবুদ্ধি করার মোক্ষম হাতিয়ার হ’ল নারী’।[১৭৫] কেননা সাধারণ নীতি এই যে, নারীর প্রতি পুরুষ সহজে দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু তাই বলে

---

১৭৩. আহমাদ, সনদ ছহীহ, রাবী ছোহায়েব (রাঃ), সিলসিলা যঈফাহ হা/৮৮০।
১৭৪. মারাসীলু ইবনে আবী হাতেম হা/৪২৯; কুরতুবী, ঐ, ২৮ আয়াত, ৯/১৫০ পৃঃ।
১৭৫. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯ ‘ঈমান’ অধ্যায়।

এর অর্থ এটা নয় যে, নারীদের ছলনা শয়তানের চাইতে বড়। এ ধরনের ব্যাখ্যা নারী জাতিকে অপমান করার শামিল।

৮. আয়াত সংখ্যা ৪২ : (اذْكُرْنِيْ عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنساهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ) 'যে কারাবন্দী সম্পর্কে ইউসুফের ধারণা ছিল যে, সে মুক্তি পাবে, তাকে সে বলে দিল যে, তুমি তোমার মনিবের কাছে আমার কথা আলোচনা করো। কিন্তু শয়তান তাকে তা ভুলিয়ে দেয় ফলে তাঁকে কয়েক বছর কারাগারে থাকতে হয়'।

মালেক ইবনে দীনার, হাসান বাছরী, কা'ব আল-আহবার, ওহাব বিন মুনাব্বিহ ও অন্যান্য বিদ্বানগণের নামে এখানে বিস্ময়কর সব তাফসীর বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন আইয়ূব রোগভোগ করেন সাত বছর, ইউসুফ কারাভোগ করেন সাত বছর, বুখতানছর আকৃতি পরিবর্তনের শাস্তি ভোগ করেন সাত বছর' *(কুরতুবী)*। আমরা বুঝতে পারি না আল্লাহ্র নবীগণের সাথে ফিলিস্তীনে ইহুদী নির্যাতনকারী নিষ্ঠুর রাজা বুখতানছরের তুলনা করার মধ্যে কি সামঞ্জস্য রয়েছে?

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে যে, ইউসুফ যখন কারাবন্দী সাক্ষীকে উক্ত কথা বলেন, তখন তাকে বলা হয়, হে ইউসুফ! তুমি আমাকে ছেড়ে অন্যকে অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করলে? অতএব শাস্তি স্বরূপ আমি তোমার কারাভোগের মেয়াদ বাড়িয়ে দিলাম। তখন ইউসুফ কেঁদে উঠে বললেন, হে আমার পালনকর্তা! বিপদ সমূহের বোঝা আমার অন্তরকে ভুলিয়ে দিয়েছে। সেজন্য আমি একটি কথা বলে ফেলেছি। আর কখনো এরূপ বলব না'।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, জিবরীল কারাগারে প্রবেশ করলেন এবং ইউসুফকে বললেন, বিশ্বপালক তোমাকে সালাম দিয়েছেন এবং তোমাকে বলেছেন যে, ইউসুফ! তোমার কি লজ্জা হয়নি যে, তুমি আমাকে ছেড়ে মানুষের কাছে সুফারিশ করলে? অতএব আমার সম্মান ও উচ্চ মর্যাদার কসম! অবশ্যই আমি তোমাকে কয়েক বছর জেলে রাখব। ইউসুফ বললেন, এর পরেও কি তিনি আমার উপর সন্তুষ্ট আছেন? জিব্রীল বললেন, হ্যাঁ আছেন। তখন ইউসুফ বললেন, তাহ'লে আমি কিছুরই পরোয়া করি না'।

অন্য একজন মুফাসসির বলেছেন, পাঁচ বছর জেল খাটার পরে এই ঘটনা ঘটে। ফলে শাস্তি স্বরূপ তাঁকে আরো সাত বছর জেল খাটতে হয়। এরপর তাঁর মুক্তির অনুমতি হয় এবং বাদশাহ স্বপ্ন দেখেন ও সেই অসীলায় তাঁর মুক্তি হয়'। এভাবে কেউ বলেছেন ১২ বছর, কেউ বলেছেন ১৪ বছর জেল খেটেছেন *(ইবনু কাছীর)*। তবে অধিকাংশের মতে ৭ বছর। আর কুরআনে রয়েছে কেবল بضع سنين যার অর্থ হ'ল কয়েক বছর, যা ৩ থেকে ৯ অথবা ১০ বছরের মধ্যে *(কুরতুবী)*।

মূলতঃ ইহুদী লেখকরা ইউসুফ (আঃ)-এর কারাভোগকে তাঁর অপরাধের শাস্তি হিসাবে প্রমাণ করার জন্য এরূপ গল্প বানিয়েছে। অথচ এটা আদৌ কোন অপরাধ নয়। কেননা ছহীহ হাদীছে এসেছে, 'আল্লাহ মানুষের সাহায্যে অতক্ষণ থাকেন, যতক্ষণ মানুষ মানুষের সাহায্যে থাকে'।[১৭৬] অতএব একজন মানুষ আরেকজন মানুষের কাছে সাহায্য চাইবে এবং পরস্পরকে সাহায্য করবে, এটাই স্বাভাবিক এবং এতে অশেষ নেকী রয়েছে। কিন্তু অপরাধ হ'ল সেটাই যখন জীবিত ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তি বা কোন বস্তুর কাছে সাহায্য চায়, অথচ তার কোন ক্ষমতা নেই। মুসলিম তাফসীরকারগণও এক্ষেত্রে ধোঁকায় পড়েছেন। এমনকি উক্ত মর্মে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে রাসূলের নামে একটি হাদীছও বর্ণিত হয়েছে যে, رحم الله يوسف لو لم يقل الكلمة التي قالها ما لبث في السجن طول ما لبث، حيث يبتغي الفرج من عند غير الله– 'ইউসুফের উপর আল্লাহ রহম করুন! যদি তিনি ঐ কথা না বলতেন যা তিনি কারা সাথীকে বলেছিলেন, তাহ'লে এত দীর্ঘ সময় তাঁকে কারাগারে থাকতে হতো না। কেননা তিনি কারামুক্তির জন্য আল্লাহ ব্যতীত অন্যের সাহায্য কামনা করেছিলেন'।[১৭৭] অথচ হাদীছটি মুনকার ও যঈফ এবং অত্যন্ত দুর্বল। যা থেকে কোন দলীল গ্রহণ করা যায় না *(হাশিয়া কুরতুবী; ইবনু কাছীর)*। এর বিপরীত ছহীহ হাদীছে আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لولَبِثْتَ فِى السِّجْنِ ما لَبِثَ يوسفُ لأَجَبْتُ الداعِيَ 'ইউসুফ

---

১৭৬. মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪ 'ইল্ম' অধ্যায়।
১৭৭. কুরতুবী হা/৩৬৭০-৭১; ইবনু জারীর, ইবনু কাছীর, ত্বাবারাণী, ইবনু হিব্বান প্রভৃতি।

যতদিন জেল খেটেছেন, অতদিন যদি আমি জেল খাটতাম, তাহ'লে আমি বাদশাহ্র দূতের ডাকে সাড়া দিতাম'।[১৭৮] অন্য বর্ণনায় এসেছে, لو كنت أنا لأسرعتُ الإجابةَ وما ابتغيتُ العذرَ 'যদি আমি হ'তাম, তাহ'লে দ্রুত সাড়া দিতাম এবং কোনরূপ ওযর করতাম না'।[১৭৯]

বস্তুতঃ এটি ছিল নবী হিসাবে ইউসুফ (আঃ)-এর পরীক্ষা। আর নবীগণই দুনিয়াতে বেশী পরীক্ষিত হন, যা বহু ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে।[১৮০]

৯. আয়াত সংখ্যা ৫২ : (ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ) 'এটা এজন্য যাতে গৃহস্বামী জানতে পারেন যে, আমি তার অগোচরে তার সাথে কোন বিশ্বাসঘাতকতা করিনি'।

এখানে 'আমি' কে? গৃহকর্ত্রী না ইউসুফ? বড় বড় মুফাসসিরগণ লিখেছেন, ইউসুফ। এজন্য ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর নামে একটি হাদীছ বর্ণনা করা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে, বাদশাহ নগরীর মহিলাদের জমা করে তাদের কাছে ইউসুফ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সবাই বলে যে, আমরা তার ব্যাপারে মন্দ কিছু জানি না। তখন আযীয-পত্নী বলেন, এখন সত্য প্রকাশিত হ'ল। আমিই তাকে প্ররোচিত করেছিলাম এবং সে ছিল সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। তখন ইউসুফ বলল, এটা এজন্য যাতে গৃহকর্তা জানতে পারেন যে, আমি তার অসাক্ষাতে তার সাথে কোন বিশ্বাসঘাতকতা করিনি'। তখন জিবরীল ইউসুফকে গুঁতা মেরে বলেন, যখন ঐ নারীর প্রতি তুমি কুচিন্তা করেছিলে তখনও কি নয়? অর্থাৎ তখন কি তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করো নি? জবাবে ইউসুফ বলেন, আমি নিজেকে নির্দোষ বলি না। নিশ্চয়ই মানুষের অন্তর মন্দ প্রবণ'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, জিবরীল ইউসুফকে বলেন, যখন তুমি পায়জামা খুলেছিলে, তখনও কি বিশ্বাসঘাতকতা করোনি? ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলি যে স্রেফ বাজে কথা, তা যেকোন পাঠকই বুঝতে পারেন।

---

১৭৮. বুখারী হা/৩৩৭২, ৩৩৮৭, ৪৬৯৪, ৬৯৯২; মুসলিম, নাসাঈ, আহমাদ; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৭০৫ 'কিয়ামতের অবস্থা' অধ্যায় 'সৃষ্টির সূচনা ও নবীগণের আলোচনা' অনুচ্ছেদ।

১৭৯. আহমাদ হা/৯২৯৮ রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ), হাদীছ হাসান।

১৮০. সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩২৬৭; ছহীহুল জামে' হা/৯৯৪-৯৬।

অথচ এগুলি এমন এমন তাফসীর গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, যা সব সময় আমরা মাথায় রাখি।[১৮১]

বস্তুতঃ ৫০, ৫১, ৫২ ও ৫৩ চারটি আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক বিচার করলে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, ৫২ ও ৫৩ আয়াতের বক্তব্য হ'ল আযীযে মিছরের স্ত্রীর। কেননা ঐ সময় ইউসুফ ছিলেন জেলখানায়। তিনি কিভাবে মহিলাদের ঐ মজলিসে হাযির থাকলেন এবং উক্ত মন্তব্য করলেন? নগরীর মহিলাদের ও আযীয-পত্নীর স্পষ্ট স্বীকৃতির মাধ্যমে সত্য উদঘাটনের পরেই তো ইউসুফের মুক্তির পথ খুলে গেল এবং বাদশাহ বললেন, তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাকে আমার একান্ত সহচর করে নেব *(ইউসুফ ৫৪)*। কুরআনের প্রকাশ্য অর্থকে পাস কাটিয়ে দূরতম অর্থ গ্রহণের পিছনে নবী বিদ্বেষী ইহুদী লেখকদের অপপ্রচারের ফাঁদে পা দেওয়া ছাড়া এগুলি আর কীইবা হ'তে পারে?

প্রাচীনতম মুফাসসির হিসাবে ইবনু জারীর ত্বাবারী (মৃঃ ৩১০ হিঃ) তাঁর বিখ্যাত তাফসীরে এমন অনেক দুর্বল বর্ণনা জমা করেছেন, যা নবীগণের মর্যাদার খেলাফ। রাসূল (ছাঃ), ছাহাবী, তাবেঈ ও অন্যান্য বিদ্বানগণের নামে সেখানে অসংখ্য যঈফ ও ভিত্তিহীন বর্ণনা জমা করা হয়েছে।

যেমন ২৪ আয়াতাংশ (وَلَقَدْ هَمَّتْ به وَهَمَّ بِهَا)-এর তাফসীরে ইবনু আব্বাসের ৮টি সহ ছয়জন বিদ্বানের মোট ১৪টি উক্তি উদ্ধৃত করার পর তিনি বলেছেন, هذا قول جميع أهل العلم بتأويل القرآن الذين عنهم يؤخذ تأويله

১৮১. *যেমন ১-সঊদী সরকার প্রকাশিত ও মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত করাচীর মুফতী মুহাম্মাদ শফী কৃত তাফসীর মা'আরেফুল কুরআনে বক্তব্যটি ইউসুফের বলে লেখা হয়েছে (পৃঃ ৬৬৯)। ২-ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের বঙ্গানুবাদে ১৩১ নং টীকাতে বলা হয়েছে যে, অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে ৫২ ও ৫৩ নম্বর আয়াতে বর্ণিত কথাগুলি হযরত য়ূসুফের উক্তি (ঐ, পৃঃ ৩৬৭)। ৩- তাফসীর ইবনে কাছীরের অনুবাদে ডঃ মুজীবুর রহমান ব্রাকেটে লিখেছেন, 'ইউসুফ বললেন' (ঐ, দারুস সালাম, রিয়াদ পৃঃ ৪৫৫)। ৪- মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী অনূদিত ঐ উর্দূ তাফসীরে একই অনুবাদ করা হয়েছে, যা সঊদী সরকার কর্তৃক পাকিস্তানের ছালাহুদ্দীন ইউসুফের তাফসীর সহ প্রকাশিত হয়েছে (ঐ, পৃঃ ৬৫৬)। ৫- সঊদী সরকার প্রকাশিত ইংরেজী অনুবাদেও (পৃঃ ৩১০) একই কথা লেখা হয়েছে। ৬- অথচ আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী তাঁর ইংরেজী তাফসীরে সঠিক অর্থ করেছেন (ঐ, পৃঃ ৫৭০)। ৭- অন্যদিকে মাওলানা মওদূদী কেবল এটি ইউসুফের উক্তি বলে সমর্থনই করেননি, উল্টা এর বিরোধিতা করার কারণে ইবনু তায়মিয়াহ, ইবনু কাছীর প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত বিদ্বানগণকে কটাক্ষ করে তাফসীর লিখেছেন (ঐ, বঙ্গানুবাদ ৬/১০৪ পৃঃ)। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।*

‘এগুলি হ’ল কুরআন ব্যাখ্যায় অভিজ্ঞ সেই সকল বিদ্বানের ব্যাখ্যা সমূহ, যাঁদের থেকে কুরআনের ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হয়ে থাকে’।[১৮২] অথচ এসব বিদ্বানগণের নামে উদ্ধৃত বক্তব্যগুলি বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত বলে পরবর্তী বিদ্বানগণ স্বীকার করেননি।

এভাবে প্রধানতঃ ইবনু জারীরের তাফসীরের উপরে ভিত্তি করেই পরবর্তী বহু খ্যাতনামা মুফাসসির ঐসব ত্রুটিপূর্ণ বর্ণনা অথবা এ সবের মর্ম সমূহ স্ব স্ব তাফসীরে স্থান দিয়েছেন। যেমন ওয়াহেদী, বাগাভী, কুরতুবী, ইবনু কাছীর, জালালায়েন, বায়যাভী, কাশশাফ, আলূসী, আবুস সঊদ, শাওকানী প্রমুখ বিদ্বানগণ। যদিও তাঁদের অনেকেই এসবের সমর্থক ছিলেন না। তবুও তাঁদের তাফসীরে এসব বর্ণনা স্থান পাওয়ায় লোকেরা তাঁদের নামে সেগুলি অন্যদের নিকট বর্ণনা করে এবং জনগণ বিভ্রান্ত হয়। অবস্থা দাঁড়িয়েছে এই যে, নবীগণের শত্রু হিব্রুভাষী ইহুদী যিন্দীক্বদের কপট লেখনীগুলো আরবী ভাষী মুসলিম বিদ্বানগণের মাধ্যমে বিশ্বের সর্বত্র প্রচারিত হয়েছে। বিদ্বানগণের সরলতা এভাবেই অনেক সময় অন্যদের পথভ্রষ্টতার কারণ হয়।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন,

وأما ما ينقل أنه حل سراويله وجلس مجلس الرجل من المرأة وأنه رأى صورة يعقوب عاضاً على يده وأمثال ذلك فكله مما لم يخبر الله به ولا رسوله و ما لم يكن كذلك فهو مأخوذ عن اليهود الذين هم أعظم الناس كذبًا على الأنبياء وقدحاً فيهم، وكل من نقله من المسلمين فعنهم نقله، لم ينقل من ذلك أحد عن نبينا صلى الله عليه وسلم حرفاً واحداً-

‘অতঃপর যেসব কথা বর্ণিত হয়েছে যে, ইউসুফ তার পাজামা খুলে ফেলেছিলেন ও উক্ত নারীর উপর উদ্যত হয়েছিলেন এবং এ সময় তিনি তার পিতাকে দাঁতে নিজ আঙ্গুল কামড়ে ধরা অবস্থায় দেখেছিলেন- এধরনের কাহিনী সমূহের সবটাই ঐসমস্ত কথার অন্তর্ভুক্ত, যে বিষয়ে আল্লাহ এবং তাঁর

১৮২. দ্রঃ তাফসীর ত্বাবারী (বৈরুতঃ ১৪০৭/১৯৮৭) ১২/১০৮-১১০ পৃঃ।

রাসূল কোন খবর দেননি। আর তা আদৌ ঐরূপ নয়। বরং এগুলি ইহুদীদের কাছ থেকে গৃহীত, যারা নবীগণের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার ও অপবাদ দেওয়ার ব্যাপারে মানবজাতির মধ্যে সেরা। মুসলমানদের মধ্যে যারা এসব বিষয়ে বলে, তারা তাদের থেকে নকল করে বলে। অথচ তাদের কেউ এ বিষয়ে আমাদের নবী (ছাঃ) থেকে একটি হরফও বর্ণনা করেনি'।[১৮৩] তিনি আরও বলেন, وقد اتفق الناس على أنه لم تقع منه الفاحشة ولكن بعض الناس يذكر أنه وقع منه بعض مقدماتها– 'বিদ্বানগণ এ বিষয়ে একমত যে, ইউসুফ থেকে কোন ফাহেশা কাজ হয়নি। তবে কিছু লোক বর্ণনা করে যে, তাঁর থেকে উক্ত কাজের প্রারম্ভিক কিছু নমুনা পাওয়া গিয়েছিল। যেমন তারা এ বিষয়ে কিছু বর্ণনা করে থাকে। যার কোনটাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে নয়। বরং কিছু ইহুদী থেকে তারা এগুলি বর্ণনা করে থাকে মাত্র'।[১৮৪]

উল্লেখ্য যে, সূরা ইউসুফ-এর ৪২ আয়াতটিকে লুফে নিয়ে একদল কাহিনীকার কল্পনার ঘোড়া দৌড়িয়ে এমনকি মহাকাব্য পর্যন্ত রচনা করেছেন। এ ব্যাপারে ফারসী ভাষায় কবি ফেরদৌসীর *(মৃঃ ৪১৬ হিঃ/১০২৫ খৃঃ)* 'মাছনাবী ইউসুফ-যোলেখা' (مثنوى يوسف زليخا) কাব্য প্রসিদ্ধ। যদিও এটি তাঁর সময়কার অজ্ঞাত কোন কবির লেখনী বলে অনেকে ধারণা করেন। তারপর তা তুর্কী ভাষায় অনুদিত হয়। অতঃপর ফারসী ও তুর্কী ভাষা হ'তে তা এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত ও রূপান্তরিত হয়ে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে। দিল্লীর সুলতান গিয়াছুদ্দীন আযম শাহের সময় *(১৩৮৯-১৪১০ খৃঃ)* পনের শতকের প্রথম মুসলিম কবি শাহ মুহাম্মাদ ছগীর সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম বাংলায় 'ইউসুফ-জুলেখা' কাব্য রচনা করেন। বর্তমানে নামধারী কিছু মুফাসসিরে কুরআন গ্রামে ও শহরে তাফসীর মাহফিলের নামে কয়েকদিন ব্যাপী ইউসুফ-যুলায়খার রসালো কাহিনী শুনিয়ে থাকেন। অথচ 'যুলায়খা' নামটিরও কোন সঠিক ভিত্তি নেই। কুরআনে কেবল امرأة العزيز বা

---

১৮৩. দাক্বায়েকুত তাফসীর ৩/২৭৩ পৃঃ।
১৮৪. মাজমূ' ফাতাওয়া 'তাফসীর' অধ্যায় (কায়রোঃ ১৪০৪ হিঃ) ১৫/১৪৮-৪৯ পৃঃ।

‘আযীয-পত্নী’ বলা হয়েছে। নবী বিদ্বেষী ইহুদী গল্পকারদের খপপরে পড়ে মুসলমান গল্পকারগণ আজকাল রীতিমত মুফাসসিরে কুরআন বনে গেছেন।

অতএব জান্নাত পিয়াসী পাঠক, গবেষক, লেখক, আলেম, মুফতী ও বক্তাগণকে অবশ্যই সাবধান হ’তে হবে এবং মন্দটা বাদ দিয়ে ভালটা বাছাই করে নিতে হবে। নইলে ক্বিয়ামতের মাঠে জওয়াবদিহিতার সম্মুখীন হ’তে হবে। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন- আমীন!

[আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ ইবনু তায়মিয়াহ, মজমূ‘ ফাতাওয়া ‘তাফসীর’ অধ্যায়; মুহাম্মাদ আল-আমীন শানক্বীত্বী, তাফসীর আযওয়াউল বায়ান (বৈরুত: ‘আলামুল কুতুব, তাবি); ডঃ মুহাম্মাদ আবু শাহবাহ, আল-ইস্রাঈলিয়াত (কায়রোঃ মাকতাবাতুস সুন্নাহ ৪র্থ সংস্করণ ১৪০৮); ডঃ তাহের মাহমূদ, আসবাবুল খাত্বা ফিত তাফসীর (দাম্মাম, সঊদী আরব, দার ইবনুল জাওযী ১ম সংস্করণ ১৪২৫ হিঃ) প্রভৃতি]

ইউসুফের কাহিনীতে শিক্ষণীয় বিষয় সমূহঃ

(১) ইউসুফের কাহিনীতে একথা পূর্ণভাবে প্রতিভাত হয়েছে যে, আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকেই পরিণামে বিজয়ী করেন। এই বিজয় তো আখেরাতে অবশ্যই। তবে দুনিয়াতেও হ’তে পারে।

(২) আল্লাহ্র কৌশল বান্দা বুঝতে পারে না। যদিও অবশেষে আল্লাহ্র কৌশলই বিজয়ী হয়। যেমন অন্ধকূপে নিক্ষেপ করে অতঃপর বিদেশী কাফেলার কাছে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রি করে দিয়ে ইউসুফের ভাইয়েরা নিশ্চিন্ত হয়ে ভেবেছিল যে, আপদ গেল। কিন্তু আল্লাহ তাঁর নিজস্ব কৌশলে ইউসুফকে দেশের সর্বোচ্চ পদে আসীন করলেন এবং ভাইদেরকে ইউসুফের কাছে আনিয়ে অপরাধ স্বীকারে বাধ্য করলেন’ *(ইউসুফ ৯১)*। যেটা ইউসুফ নিজে কখনোই পারতেন না।

(৩) সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র উপরে ভরসা করা ও সুন্দরভাবে ধৈর্য ধারণ করাই হ’ল আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাদের বৈশিষ্ট্য। সেজন্যেই দেখা গেছে যে, ইউসুফ (আঃ) জেলে গিয়েও সর্বদা আল্লাহ্র উপরে ভরসা করেছেন ও সুন্দরভাবে ধৈর্য ধারণ করেছেন। অন্যদিকে পিতা ইয়াকূব (আঃ) সন্তান হারিয়ে

পাগলপরা হ'লেও তাঁর যাবতীয় দুঃখ ও অস্থিরতা আল্লাহ্র নিকটে পেশ করে ধৈর্য ধারণ করেছেন' *(ইউসুফ ৮৬)*।

(৪) নবীগণ মানুষ ছিলেন। তাই মনুষ্যসূলভ প্রবণতা ইয়াকূব ও ইউসুফের মধ্যেও ছিল। ইউসুফের শোকে ইয়াকূবের বিরহ-বেদনা এবং আযীযের গৃহে চরিত্র বাঁচানো কঠিন হবে বিবেচনায় ইউসুফের কারাগারকে বেছে নেওয়ার আগ্রহ প্রকাশের মধ্যে উপরোক্ত দুর্বলতার প্রমাণ ফুটে ওঠে। কিন্তু তাঁরা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র প্রতি নিবিষ্টচিত্ত থাকার কারণে আল্লাহ্র অনুগ্রহে নিষ্পাপ থাকেন। বস্তুতঃ আল্লাহ তাঁর প্রত্যেক তাক্বওয়াশীল বান্দার প্রতি একইরূপ অনুগ্রহ করে থাকেন।

(৫) ইউসুফের কাহিনী কেবল তিক্ত বাস্তবতার এক অনন্য জীবন কাহিনী নয়। বরং বিপদে ও সম্পদে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা ও তাঁর উপরে একান্ত নির্ভরতার এক বাস্তব দলীল।

(৬) ইউসুফের কাহিনীর সার-নির্যাস হ'ল 'তাওহীদ' অর্থাৎ 'তাওহীদে ইবাদত'। কারণ এখানে বাস্তব ঘটনাবলী দিয়ে প্রমাণ করে দেওয়া হয়েছে যে, কেবল আল্লাহ্র স্বীকৃতিই যথেষ্ট নয়, বরং জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাঁর দাসত্ব করা ও তাঁর বিধান মেনে চলার মধ্যেই বান্দার প্রকৃত মঙ্গল ও সার্বিক কল্যাণ নির্ভর করে। যেমন ইউসুফের সৎ ভাইয়েরা আল্লাহকে মানতো। কিন্তু তাঁর বিধান মানেনি বলেই তারা চূড়ান্তভাবে পরাজিত ও লজ্জিত হয়েছিল। অথচ ইউসুফ অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও আল্লাহ্র দাসত্বে ও তাঁর বিধান মানায় অটল থাকায় আল্লাহ তাঁকে অনন্য পুরস্কারে ভূষিত করেন ও মহা সম্মানে সম্মানিত করেন ॥

১২. হযরত আইয়ূব *(আলাইহিস সালাম)*

হযরত আইয়ূব (আঃ) ছবরকারী নবীগণের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় এবং অনন্য দৃষ্টান্ত ছিলেন। ইবনু কাছীরের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ইসহাক (আঃ)-এর দুই যমজ পুত্র ঈছ ও ইয়াকূবের মধ্যেকার প্রথম পুত্র ঈছ-এর প্রপৌত্র ছিলেন। আর তাঁর স্ত্রী ছিলেন ইয়াকূব-পুত্র ইউসুফ (আঃ)-এর পৌত্রী 'লাইয়া' বিনতে ইফরাঈম বিন ইউসুফ। কেউ বলেছেন, 'রাহমাহ'। তিনি ছিলেন স্বামী ভক্তি ও পতিপরায়ণতায় বিশ্বের এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত। বাংলাদেশে তিনি 'বিবি রহীমা' নামে পরিচিত। তাঁর পতিভক্তি বিষয়ে উক্ত নামে জনপ্রিয় উপন্যাস সমূহ বাজারে চালু রয়েছে। অথচ এ নামটির উৎপত্তি কাহিনী নিতান্তই হাস্যকর। পবিত্র কুরআনে সূরা আম্বিয়া ৮৪ আয়াতে رَحْمَـــةً مِّـــنْ عِنْـــدِنَا ('আমরা আইয়ূবকে.... আরও দিলাম আমার পক্ষ হ'তে দয়া পরবশে') বাক্যাংশের 'রাহমাতান' বা 'রাহ্‌মাহ' (رَحْمَةً) শব্দটিকে 'রহীমা' করে এটিকে আইয়ূবের স্ত্রীর নাম হিসাবে একদল লোক সমাজে চালু করে দিয়েছে। ইহুদী-নাছারাগণ যেমন তাদের ধর্মগ্রন্থের শাব্দিক পরিবর্তন ঘটাতো, এখানেও ঠিক ঐরূপ করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ যেন বলছেন যে, আইয়ূবের স্ত্রী রহীমা তার স্বামীকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। পরে আমরা তাকে আইয়ূবের কাছে ফিরিয়ে দিলাম'। বস্তুতঃ এটি একটি উদ্ভট ব্যাখ্যা বৈ কিছু নয়। মূলতঃ আইয়ূবের স্ত্রীর নাম কি ছিল, সে বিষয়ে সঠিক তথ্য কুরআন বা হাদীছে নেই। এ বিষয়ের ভিত্তি হ'ল ইহুদী ধর্মনেতাদের রচিত কাহিনী সমূহ। যার উপরে পুরোপুরি বিশ্বাস স্থাপন করাটা নিতান্তই ভুল। তাফসীরবিদ ও ঐতিহাসিকগণ আইয়ূবের জনপদের নাম বলেছেন 'হূরান' অঞ্চলের 'বাছানিয়াহ' এলাকা। যা ফিলিস্তীনের দক্ষিণ সীমান্ত বরাবর দামেস্ক ও আযরূ'আত-এর মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত।[১৮৫]

পবিত্র কুরআনে ৪টি সূরার ৮টি আয়াতে আইয়ূব (আঃ)-এর কথা এসেছে। যথা- নিসা ১৬৩, আন'আম ৮৪, আম্বিয়া ৮৩-৮৪ এবং ছোয়াদ ৪১-৪৪।

---

১৮৫. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ১/২০৬-১০ পৃঃ; কুরতুবী, ছোয়াদ ৪১।

Contents

আল্লাহ বলেন,

وَأَيُّوْبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ- فَاسْتَجَبْنَا لَــهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَّآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْــرَى لِلْعَابِدِيْنَ-

'আর স্মরণ কর আইয়ূবের কথা, যখন তিনি তার পালনকর্তাকে আহ্বান করে বলেছিলেন, আমি কষ্টে পতিত হয়েছি এবং আপনি সর্বোচ্চ দয়াশীল'। 'অতঃপর আমরা তার আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং তার দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিলাম। তার পরিবারবর্গকে ফিরিয়ে দিলাম এবং তাদের সাথে তাদের সমপরিমাণ আরও দিলাম আমাদের পক্ষ হ'তে দয়া পরবশে। আর এটা হ'ল ইবাদতকারীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ' *(আম্বিয়া ২১/৮৩-৮৪)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوْبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّيْ مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّــا وَذِكْرَى لِأُوْلِي الْأَلْبَابِ، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِب بِّهِ وَلاَ تَحْنَثْ إِنَّا وَجَــدْنَاهُ صَابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ-(ص ٤١-٤٤)-

'আর তুমি বর্ণনা কর আমাদের বান্দা আইয়ূবের কথা। যখন সে তার পালনকর্তাকে আহ্বান করে বলল, শয়তান আমাকে (রোগের) কষ্ট এবং (সম্পদ ও সন্তান হারানোর) যন্ত্রণা পৌঁছিয়েছে' *(ছোয়াদ ৩৮/৪১)*। '(আমরা তাকে বললাম,) তুমি তোমার পা দিয়ে (ভূমিতে) আঘাত কর। (ফলে পানি নির্গত হ'ল এবং দেখা গেল যে,) এটি গোসলের জন্য ঠাণ্ডা পানি ও (পানের জন্য উত্তম) পানীয়' *(৪২)*। 'আর আমরা তাকে দিয়ে দিলাম তার পরিবারবর্গ এবং তাদের সাথে তাদের সমপরিমাণ আমাদের পক্ষ হ'তে রহমত স্বরূপ এবং জ্ঞানীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ' *(৪৩)*। '(আমরা তাকে বললাম,) তুমি তোমার হাতে একমুঠো তৃণশলা নাও। অতঃপর তা দিয়ে (স্ত্রীকে) আঘাত কর এবং শপথ ভঙ্গ করো না (বরং শপথ পূর্ণ কর)। এভাবে আমরা তাকে পেলাম ধৈর্যশীল রূপে। কতই না চমৎকার বান্দা সে। নিশ্চয়ই সে ছিল

(আমার দিকে) অধিক প্রত্যাবর্তনশীল' *(ছোয়াদ ৩৮/৪১-৪৪)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ 'আর এভাবেই আমরা সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি' *(আন'আম ৬/৮৪)*।

অতঃপর আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আইয়ূব একদিন নগ্নাবস্থায় গোসল করছিলেন (অর্থাৎ বাথরুম ছাড়াই খোলা স্থানে)। এমন সময় তাঁর উপরে সোনার টিড্ডি পাখি সমূহ এসে পড়ে। তখন আইয়ূব সেগুলিকে ধরে কাপড়ে ভরতে থাকেন। এমতাবস্থায় আল্লাহ তাকে ডেকে বলেন, হে আইয়ূব! أَلَمْ اَكُنْ أُغْنِيَنَّكَ عَمَّا تَـرَى؟ আমি কি তোমাকে এসব থেকে মুখাপেক্ষীহীন করিনি? আইয়ূব বললেন, بَلَى وَعِزَّتِكَ ولكـن لاغِنَى بِى عَنْ بَرَكَتِـكَ তোমার ইযযতের কসম! অবশ্যই তুমি আমাকে তা দিয়েছ। কিন্তু তোমার বরকত থেকে আমি মুখাপেক্ষীহীন নই'।[১৮৬]

আইয়ূবের ঘটনাবলী :

আইয়ূব (আঃ) সম্পর্কে কুরআনে ও হাদীছে উপরোক্ত বক্তব্যগুলির বাইরে আর কোন বক্তব্য বা ইঙ্গিত নেই। কুরআন থেকে মূল যে বিষয়টি প্রতিভাত হয়, তা এই যে, আল্লাহ আইয়ূবকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছিলেন। সে পরীক্ষায় আইয়ূব উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। যার পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ তাকে হারানো নে'মত সমূহের দ্বিগুণ ফেরৎ দিয়েছিলেন। আল্লাহ এখানে ইবরাহীম, মূসা, দাঊদ, সুলায়মান, আইয়ূব, ইউনুস প্রমুখ নবীগণের কষ্ট ভোগের কাহিনী শুনিয়ে শেষনবীকে সান্ত্বনা দিয়েছেন এবং সেই সাথে উম্মতে মুহাম্মাদীকে যেকোন বিপাদপদে দ্বীনের উপর দৃঢ় থাকার উপদেশ দিয়েছেন।

বিপদে ধৈর্য ধারণ করায় এবং আল্লাহ্‌র পরীক্ষাকে হাসিমুখে বরণ করে নেওয়ায় আল্লাহ আইয়ূবকে 'ছবরকারী' হিসাবে ও 'সুন্দর বান্দা' হিসাবে প্রশংসা করেছেন *(ছোয়াদ ৪৪)*। প্রত্যেক নবীকেই কঠিন পরীক্ষাসমূহ দিতে

১৮৬. বুখারী, মিশকাত হা/৫৭০৭ 'ক্বিয়ামতের অবস্থা' অধ্যায় 'সৃষ্টির সূচনা ও নবীগণের আলোচনা' অনুচ্ছেদ।

হয়েছে। তারা সকলেই সে সব পরীক্ষায় ধৈর্যধারণ করেছেন ও উত্তীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু আইয়ূবের আলোচনায় বিশেষ ভাবে إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِراً 'আমরা তাকে ধৈর্যশীল হিসাবে পেলাম' *(ছোয়াদ ৪৪)* বলার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ তাঁকে কঠিনতম কোন পরীক্ষায় ফেলেছিলেন। তবে সে পরীক্ষা এমন হ'তে পারে না, যা নবীর মর্যাদার খেলাফ ও স্বাভাবিক ভদ্রতার বিপরীত এবং যা ফাসেকদের হাসি-ঠাট্টার খোরাক হয়। যেমন তাকে কঠিন রোগে ফেলে দেহে পোকা ধরানো, দেহের সব মাংস খসে পড়া, পচে-গলে দুর্গন্ধময় হয়ে যাওয়ায় ঘর থেকে বের করে জঙ্গলে ফেলে আসা, ১৮ বা ৩০ বছর ধরে রোগ ভোগ করা, আত্মীয়-স্বজন সবাই তাকে ঘৃণাভরে ছেড়ে চলে যাওয়া ইত্যাদি সবই নবীবিদ্বেষী ও নবী হত্যাকারী ইহুদী গল্পকারদের বানোয়াট মিথ্যাচার বৈ কিছুই নয়। ইহুদী নেতাদের কুকীর্তির বিরুদ্ধে যখনই নবীগণ কথা বলেছেন, তখনই তারা তাদের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়েছে এবং যা খুশী তাই লিখে কেতাব ভরেছে। ধর্ম ও সমাজ নেতারা তাদের অনুসারীদের বুঝাতে চেয়েছে যে, নবীরা সব পথভ্রষ্ট। সেজন্য তাদের উপর আল্লাহ্‌র গযব এসেছে। তোমরা যদি তাদের অনুসারী হও, তাহ'লে তোমরাও অনুরূপ গযবে পড়বে। এ ব্যাপারে মুসলিম মুফাসসিরগণও ধোঁকায় পড়েছেন এবং ঐসব ভিত্তিহীন কাল্পনিক গল্প ছাহাবী ও তাবেঈগণের নামে নিজেদের তাফসীরের কেতাবে জমা করেছেন। এ ব্যাপারে ছাহাবী ইবনু আব্বাস ও তাবেঈ ইবনু শিহাব যুহরীর নামেই বেশী বর্ণনা করা হয়েছে। যে সবের কোন ছহীহ ভিত্তি নেই।

এক্ষণে আমরা আইয়ূব (আঃ)-এর বিষয়ে কুরআনী বক্তব্যগুলির ব্যাখ্যায় মনোনিবেশ করব। (১) সূরা আম্বিয়া ও সূরা ছোয়াদের দু'স্থানেই আইয়ূবের আলোচনার শুরুতে আল্লাহ্‌র নিকটে আইয়ূবের আহ্বানের (إِذْ نَادَى) কথা আনা হয়েছে। তাতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আইয়ূব নিঃসন্দেহে কঠিন বিপদে পড়েছিলেন। যেজন্য তিনি আকুতিভরে আল্লাহকে ডেকেছিলেন। আর বিপদে পড়ে আল্লাহকে ডাকা ও তার নিকটে বিপদ মুক্তির জন্য প্রার্থনা করা নবুঅতের শানের খেলাফ নয়। বরং এটাই যেকোন অনুগত বান্দার কর্তব্য। তিনি বিপদে ধৈর্য হারিয়ে এটা করেননি, বরং বিপদ দূর করে দেবার জন্য

আল্লাহ্‌র নিকটে প্রার্থনা করেছিলেন। তবে সেই বিপদ কি ধরনের ছিল, সে বিষয়ে কিছুই উল্লেখিত হয়নি। অতএব আল্লাহ এ বিষয়ে সর্বাধিক অবগত।

(২) কষ্টে পড়ার বিষয়টিকে তিনি শয়তানের দিকে সম্বন্ধ করেছেন (مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ) *(ছোয়াদ ৪১)*, আল্লাহ্‌র দিকে নয়। এটা তিনি করেছেন আল্লাহ্‌র প্রতি শিষ্টাচারের দিকে লক্ষ্য রেখে। কেননা শয়তান নবীদের উপর কোন ক্ষমতা রাখে না। এমনকি কোন নেককার বান্দাকেও শয়তান পথভ্রষ্ট করতে পারে না। তবে সে ধোঁকা দিতে পারে, বিপদে ফেলতে পারে, যা আল্লাহ্‌র হুকুম ব্যতীত কার্যকর হয় না। যেমন মূসা (আঃ)-এর সাথী যুবক থলে থেকে মাছ বেরিয়ে যাবার কথা মূসাকে বলতে ভুলে গিয়েছিল। সে কথাটি মূসাকে বলার সময় তিনি বলেছিলেন, وَمَا أَنْسَانِيْهُ إِلاَّ الشَّيْطَانُ 'আমাকে ওটা শয়তান ভুলিয়ে দিয়েছিল' *(কাহফ ৬৩)*। আসলে শয়তানের ধোঁকা আল্লাহ কার্যকর হ'তে দিয়ে ছিলেন বিশেষ উদ্দেশ্যে, যা মূসা ও খিযিরের কাহিনীতে বর্ণিত হয়েছে। এখানেও তেমনি শয়তানের ধোঁকার কারণে আইয়ূব তাকেই দায়ী করেছেন। কিন্তু ঐ ধোঁকা কার্যকর করা এবং তা থেকে মুক্তি দানের ক্ষমতা যেহেতু আল্লাহ্‌র হাতে, সেকারণ তিনি আল্লাহ্‌র নিকটেই প্রার্থনা করেছেন।

এক্ষণে শয়তান তাকে কী ধরনের বিপদে ফেলেছিল, কেমন রোগে তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন, দেহের সর্বত্র কেমন পোকা ধরেছিল, জিহ্বা ও কলিজা ব্যতীত দেহের সব মাংস তার খসে পড়েছিল, পচা দুর্গন্ধে সবাই তাকে নির্জন স্থানে ফেলে পালিয়েছিল, ইত্যাকার ১৭ রকমের কাল্পনিক কাহিনী যা কুরতুবী স্বীয় তাফসীরে জমা করেছেন *(কুরতুবী, আম্বিয়া ৮৪)* এবং অন্যান্য মুফাসসিরগণ আরও যেসব কাহিনী বর্ণনা করেছেন, সে সবের কোন ভিত্তি নেই। বরং স্রেফ ইস্রাঈলী উপকথা মাত্র।

(৩) আল্লাহ বলেন, 'আমরা তার দো'আ কবুল করেছিলাম এবং তার দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিয়েছিলাম' *(আম্বিয়া ৮৪)*। কীভাবে দূর করা হয়েছিল, সে বিষয়ে আল্লাহ বলেন যে, তিনি তাকে ভূমিতে পদাঘাত করতে বলেন। অতঃপর সেখান থেকে স্বচ্ছ পানির ঝর্ণা ধারা বেরিয়ে আসে। যাতে গোসল করায় তার দেহের উপরের কষ্ট দূর হয় এবং উক্ত পানি পান করায় তার

ভিতরের কষ্ট দূর হয়ে যায় *(ছোয়াদ ৪২)*। এটি অলৌকিক মনে হলেও বিষ্ময়কর নয়। ইতিপূর্বে শিশু ইসমাঈলের ক্ষেত্রে এটা ঘটেছে। পরবর্তীকালে হোদায়বিয়ার সফরে রাসূলের হাতের বরকতে সেখানকার শুষ্ক পুকুরে পানির ফোয়ারা ছুটেছিল, যা তাঁর সাথী ১৪০০ ছাহাবীর পানির কষ্ট নিবারণে যথেষ্ট হয়। বস্তুতঃ এগুলি নবীগণের মু'জেযা। নবী আইয়ূবের জন্য তাই এটা হতেই পারে আল্লাহ্র হুকুমে।

এক্ষণে কতদিন তিনি রোগভোগ করেন সে বিষয়ে ৩ বছর, ৭ বছর, সাড়ে ৭ বছর, ৭ বছর ৭ মাস ৭ দিন ৭ রাত, ১৮ বছর, ৩০ বছর, ৪০ বছর ইত্যাদি যা কিছু বর্ণিত হয়েছে[১৮৭], সবই ইস্রাঈলী উপকথা মাত্র। যার কোন ভিত্তি নেই। বরং নবীগণের প্রতি ইহুদী নেতাদের বিদ্বেষ থেকে কল্পিত।

(৪) আল্লাহ বলেন, 'আমরা তার পরিবার বর্গকে ফিরিয়ে দিলাম এবং তাদের সাথে সমপরিমাণ আরও দিলাম আমাদের পক্ষ হ'তে দয়া পরবশে *(আম্বিয়া ৮৪; ছোয়াদ ৪৩)*। এখানে পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি তার বিপদে ধৈর্য ধারণের পুরস্কার দ্বিগুণভাবে পেয়েছিলেন দুনিয়াতে এবং আখেরাতে। বিপদে পড়ে যা কিছু তিনি হারিয়েছিলেন, সবকিছুই তিনি বিপুলভাবে ফেরত পেয়েছিলেন। অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন, وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ 'এভাবেই আমরা আমাদের সৎকর্মশীল বান্দাদের পুরস্কৃত করে থাকি' *(আন'আম ৮৪)*। এক্ষণে তাঁর মৃত সন্তানাদি পুনর্জীবিত হয়েছিল, না-কি হারানো গবাদি পশু সব ফেরৎ এসেছিল, এসব কষ্ট কল্পনার কোন প্রয়োজন নেই। এতটুকুই বিশ্বাস রাখা যথেষ্ট যে, তিনি তাঁর ধৈর্য ধারণের পুরস্কার ইহকালে ও পরকালে বহুগুণ বেশী পরিমাণে পেয়েছিলেন। যুগে যুগে সকল ধৈর্যশীল ঈমানদার নর-নারীকে আল্লাহ এভাবে পুরস্কৃত করে থাকেন। তাঁর রহমতের দরিয়া কখনো খালি হয় না।

(৫) উপরোক্ত পুরস্কার দানের পর আল্লাহ বলেন, رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا 'আমাদের পক্ষ হতে দয়া পরবশে' *(আম্বিয়া ৮৪)*। এর দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ কারু প্রতি অনুগ্রহ করতে বাধ্য নয়। তিনি যা খুশী তাই করেন, যাকে খুশী যথেচ্ছ দান করেন। তিনি সবকিছুতে একক কর্তৃত্বশীল। কেউ কেউ অত্র

---

১৮৭. কুরতুবী, আম্বিয়া ৮৪; ছোয়াদ ৪২; ইবনু কাছীর, আম্বিয়া ৮৩-৮৪।

আয়াতে বর্ণিত ‘রাহমাতান’ (رَحْمَـــةً) থেকে আইয়ূব (আঃ)-এর স্ত্রীর নাম ‘রহীমা’ কল্পনা করেছেন। যা নিতান্তই মূর্খতা ছাড়া কিছুই নয়’।[১৮৮]

(৬) ছহীহ বুখারীতে আইয়ূবের উপর এক ঝাঁক সোনার টিড্ডি পাখি এসে পড়ার যে কথা বর্ণিত হয়েছে, সেটা হ’ল আউয়ূবের সুস্থতা লাভের পরের ঘটনা। এর দ্বারা আল্লাহ বিপদমুক্ত আইয়ূবের উচ্ছ্বল আনন্দ পরখ করতে চেয়েছেন। আল্লাহ্র অনুগ্রহ পেয়ে বান্দা কত খুশী হ’তে পারে, তা দেখে যেন আল্লাহ নিজেই খুশী হন। এজন্য আইয়ূবকে খোঁচা দিয়ে কথা বললে অনুগ্রহ বিগলিত আইয়ূব বলে ওঠেন, ‘আল্লাহ্র বরকত থেকে আমি মুখাপেক্ষীহীন নই’। অর্থাৎ বান্দা সর্বদা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র রহমত ও বরকতের মুখাপেক্ষী। নিঃসন্দেহে উক্ত ঘটনাটিও একটি মু‘জেযা। কেননা কোন প্রাণীই স্বর্ণ নির্মিত হয় না।

(৭) আল্লাহ আইয়ূবকে বলেন, وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِّـــهِ وَلاَ تَحْنَـــثْ ‘আর তুমি তোমার হাতে এক মুঠো তৃণশলা নাও। অতঃপর তা দিয়ে (স্ত্রীকে) আঘাত কর এবং তোমার শপথ ভঙ্গ করো না’ *(ছোয়াদ ৪৪)*। অত্র আয়াতে আরেকটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, রোগ অবস্থায় আইয়ূব শপথ করেছিলেন যে, সুস্থ হ’লে তিনি স্ত্রীকে একশ’ বেত্রাঘাত করবেন। রোগ তাড়িত স্বামী কোন কারণে স্ত্রীর উপর ক্রোধবশে এরূপ শপথ করেও থাকতে পারেন। কিন্তু কেন তিনি এ শপথ করলেন, তার স্পষ্ট কোন কারণ কুরআন বা হাদীছে বলা হয়নি। ফলে তাফসীরের কেতাব সমূহে নানা কল্পনার ফানুস উড়ানো হয়েছে, যা আইয়ূব নবীর পুণ্যশীলা স্ত্রীর উচ্চ মর্যাদার একেবারেই বিপরীত। নবী আইয়ূবের স্ত্রী ছিলেন আল্লাহ্র প্রিয় বান্দীদের অন্যতম। তাকে কোনরূপ কষ্টদান আল্লাহ পসন্দ করেননি। অন্য দিকে শপথ ভঙ্গ করাটাও ছিল নবীর মর্যাদার খেলাফ। তাই আল্লাহ একটি সুন্দর পথ বাৎলে দিলেন, যাতে উভয়ের সম্মান বজায় থাকে এবং যা যুগে যুগে সকল নেককার নর-নারীর জন্য অনুসরণীয় হয়। তা এই যে, স্ত্রীকে শিষ্টাচারের নিরিখে প্রহার করা যাবে। কিন্তু তা কোন অবস্থায় শিষ্টাচারের সীমা লংঘন করবে না। আর

১৮৮. আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ ১/২০৯ পৃঃ।

সেকারণেই এখানে বেত্রাঘাতের বদলে তৃণশলা নিতে বলা হয়েছে, যার আঘাত মোটেই কষ্টদায়ক নয়' *(কুরতুবী, ছোয়াদ ৪৪)*।

(৮) আইয়ূবের ঘটনা বর্ণনার পর সূরা আম্বিয়া ও সূরা ছোয়াদে আল্লাহ কাছাকাছি একইরূপ বক্তব্য রেখেছেন যে, এটা হ'ল وَذِكْـــرَى لِلْعَابِـــدِيْنَ 'ইবাদতকারীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ' *(আম্বিয়া ৮৪)* এবং وَذِكْـــرَى لِـــأُوْلِي الْأَلْبَـــابِ 'জ্ঞানীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ' *(ছোয়াদ ৪৪)*। এতে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্র দাসত্বকারী ব্যক্তিই প্রকৃত জ্ঞানী এবং প্রকৃত জ্ঞানী তিনিই যিনি জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্র দাসত্বকারী। অবিশ্বাসী কাফের-নাস্তিক এবং আল্লাহ্র অবাধ্যতাকারী ফাসেক-মুনাফিক কখনোই জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান নয়। যদিও তারা সর্বদা জ্ঞানের বড়াই করে থাকে।

ক্বাযী আবুবকর ইবনুল 'আরাবী বলেন, আইয়ূব সম্পর্কে অত্র দু'টি আয়াতে *(আম্বিয়া ৮৩ ও ছোয়াদ ৪১)* আল্লাহ আমাদেরকে যা খবর দিয়েছেন, তার বাইরে কিছুই বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত নয়। অনুরূপভাবে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) হ'তে (উপরে বর্ণিত) হাদীছটি ব্যতীত একটি হরফও বিশুদ্ধভাবে জানা যায়নি। তাহ'লে কে আমাদেরকে আইয়ূব সম্পর্কে খবর দিবে? অন্য আর কার যবানে আমরা এগুলো শ্রবণ করব? আর বিদ্বানগণের নিকটে ইস্রাঈলী উপকথা সমূহ একেবারেই পরিত্যক্ত। অতএব তাদের লেখা পাঠ করা থেকে তোমার চোখ বন্ধ রাখো। তাদের কথা শোনা থেকে তোমার কানকে বধির করো' *(কুরতুবী, ছোয়াদ ৪১-৪২)*।

আইয়ূব (আঃ) ৭০ বছর বয়সে পরীক্ষায় পতিত হন। পরীক্ষা থেকে মুক্ত হবার অনেক পরে ৯৩ বছর বা তার কিছু বেশী বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

তাবেঈ বিদ্বান মুজাহিদ হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, ক্বিয়ামতের দিন ধনীদের সম্মুখে প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা হবে হযরত সুলায়মান (আঃ)-কে

(২) ক্রীতদাসদের সামনে পেশ করা হবে হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে এবং (৩) বিপদগ্রস্তদের সামনে পেশ করা হবে হযরত আইয়ূব (আঃ)-কে।[১৮৯]

শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ :

(১) বড় পরীক্ষায় বড় পুরস্কার লাভ হয়। ধন-সম্পদ ও পুত্র-কন্যা হারিয়ে অবশেষে রোগ জর্জরিত দেহে পতিত হয়েও আইয়ূব (আঃ) আল্লাহ্র স্মরণ থেকে বিচ্যুত হননি এবং আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হননি। এরূপ কঠিন পরীক্ষা বিশ্ব ইতিহাসে আর কারো হয়েছে বলে জানা যায় না। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাই বলেন, إنَّ عِظَمِ الجزاءِ مع عظَمِ البلاء ... 'নিশ্চয়ই বড় পরীক্ষায় বড় পুরস্কার লাভ হয়ে থাকে'।[১৯০] আর দুনিয়াতে দ্বীনদারীর কঠোরতা ও শিথিলতার তারতম্যের অনুপাতে পরীক্ষায় কমবেশী হয়ে থাকে। আর সেকারণে নবীগণ হ'লেন সবচেয়ে বেশী বিপদগ্রস্ত।[১৯১]

(২) প্রকৃত মুমিনগণ আনন্দে ও বিষাদে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র রহমতের আকাংখী থাকেন। বরং বিপদে পড়লে তারা আরও বেশী আল্লাহ্র নিকটবর্তী হন। কোন অবস্থাতেই নিরাশ হন না।

(৩) প্রকৃত স্ত্রী তিনিই, যিনি সর্বাবস্থায় নেককার স্বামীর সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দেন। আইয়ূবের স্ত্রী ছিলেন বিশ্বের পুণ্যবতী মহিলাদের শীর্ষস্থানীয় দৃষ্টান্ত।

(৪) প্রকৃত ছবরকারীর জন্যই দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা। আইয়ূব দম্পতি ছিলেন তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

(৫) শয়তান প্রতি মুহূর্তে নেককার মানুষের দুশমন। শিরকী চিন্তাধরার জাল বিস্তার করে সে সর্বদা মুমিনকে আল্লাহ্র পথ হ'তে সরিয়ে নিতে চায়। একমাত্র আল্লাহ নির্ভরতা এবং দৃঢ় তাওহীদ বিশ্বাসই মুমিনকে শয়তানের প্রতারণা হ'তে রক্ষা করতে পারে।

---

১৮৯. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/২০৭, ২১০ পৃঃ।*

১৯০. *তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৫৬৬ সনদ হাসান, 'জানায়েয' অধ্যায় 'রোগীর সেবা ও রোগের ছওয়াব' অনুচ্ছেদ।*

১৯১. *তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, দারেমী, মিশকাত হা/১৫৬২, সনদ হাসান, 'জানায়েয' অধ্যায় 'রোগীর সেবা ও রোগের ছওয়াব' অনুচ্ছেদ।*

১৩. হযরত শো‘আয়েব *(আলাইহিস সালাম)*

আল্লাহ্‌র গযবে ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রধান ৬টি প্রাচীন জাতির মধ্যে পঞ্চম জাতি হ’ল ‘আহলে মাদইয়ান’। ‘মাদইয়ান’ হ’ল লূত সাগরের নিকটবর্তী সিরিয়া ও হিজাযের সীমান্তবর্তী একটি জনপদের নাম। যা অদ্যাবধি পূর্ব জর্ডনের সামুদ্রিক বন্দর ‘মো‘আন’ (معان)-এর অদূরে বিদ্যমান রয়েছে। কুফরী করা ছাড়াও এই জনপদের লোকেরা ব্যবসায়ের ওযন ও মাপে কম দিত, রাহাজানি ও লুটপাট করত। অন্যায় পথে জনগণের মাল-সম্পদ ভক্ষণ করত।[১৯২] ইয়াকূত হামাভী *(মৃঃ ৬২৬/১২২৮খৃঃ)* বলেন, ইবরাহীম-পুত্র মাদইয়ানের নামে জনপদটি পরিচিত হয়েছে।[১৯৩] হযরত শো‘আয়েব (আঃ) এদের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। ইনি হযরত মূসা (আঃ)-এর শ্বশুর ছিলেন। কওমে লূত-এর ধ্বংসের অনতিকাল পরে কওমে মাদইয়ানের প্রতি তিনি প্রেরিত হন *(হূদ ১১/৮৯)*। চমৎকার বাগ্মিতার কারণে তিনি (خطيب الأنبياء) ‘খাত্বীবুল আম্বিয়া’ (নবীগণের মধ্যে সেরা বাগ্মী) নামে খ্যাত ছিলেন।[১৯৪] আহলে মাদইয়ান-কে পবিত্র কুরআনে কোথাও কোথাও ‘আছহাবুল আইকাহ’ (اصحاب الأيكة) বলা হয়েছে। যার অর্থ ‘জঙ্গলের বাসিন্দাগণ’। এটা বলার কারণ এই যে, এই অবাধ্য জনগোষ্ঠী প্রচণ্ড গরমে অতিষ্ট হয়ে নিজেদের বসতি ছেড়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিলে আল্লাহ তাদেরকে সেখানেই ধ্বংস করে দেন। এটাও বলা হয় যে, উক্ত জঙ্গলে ‘আইকা’ (الأيكة) বলে একটা গাছকে তারা পূজা করত। যার আশপাশে জঙ্গল বেষ্টিত ছিল।

মাদইয়ান (مدين) ছিলেন হাজেরা ও সারাহ্‌র মৃত্যুর পরে হযরত ইবরাহীমের আরব বংশোদ্ভূত কেন‘আনী স্ত্রী ক্বানতূরা বিনতে ইয়াক্বত্বিন (قنطورا بنت يقطن)-এর ৬টি পুত্র সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র।[১৯৫]

---

১৯২. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/১৭৩।*
১৯৩. *মু‘জামুল বুলদান, বৈরূত : দার ছাদের, ১৯৭৯), ৫/৭৭ পৃঃ, ।*
১৯৪. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/১৭৩।*
১৯৫. *ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ ১/১৬৪ পৃঃ।*

উল্লেখ্য যে, হযরত শো‘আয়েব (আঃ) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ১০টি সূরায় ৫৩টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।[১৯৬]

হযরত শো‘আয়েব (আঃ)-এর দাওয়াত :

ধ্বংসপ্রাপ্ত বিগত কওমগুলোর বড় বড় কিছু অন্যায় কর্ম ছিল। যার জন্য বিশেষভাবে সেখানে নবী প্রেরিত হয়েছিলেন। শো‘আয়েব-এর কওমেরও তেমনি মারাত্মক কয়েকটি অন্যায় কর্ম ছিল, যেজন্য খাছ করে তাদের মধ্য থেকে তাদের নিকটে শো‘আয়েব (আঃ)-কে প্রেরণ করা হয়। তিনি তাঁর কওমকে যে দাওয়াত দেন, তার মধ্যেই বিষয়গুলোর উল্লেখ রয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَــهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ- وَلاَ تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجاً وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلاً فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ- وَإِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ يْؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ- (الأعراف ٨٥-٨٧)-

‘আমি মাদইয়ানের প্রতি তাদের ভাই শো‘আয়েবকে প্রেরণ করেছিলাম। সে তাদের বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হ’তে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে গেছে। অতএব তোমরা মাপ ও ওযন পূর্ণ কর। মানুষকে তাদের মালামাল কম দিয়ো না। ভূপৃষ্ঠে সংস্কার সাধনের পর তোমরা সেখানে অনর্থ সৃষ্টি করো না। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও’। ‘তোমরা পথে-ঘাটে এ কারণে বসে

---

১৯৬. যথাক্রমে সূরা আ‘রাফ ৭/৮৫-৯৩=৯; তওবাহ ৯/৭০; হূদ ১১/৮৪-৯৫=১২; হিজর ১৫/৭৮-৭৯; হজ্জ ২২/৪৪; শো‘আরা ২৬/১৭৬-১৯১=১৬; ক্বাছাছ ২৮/২৩-২৮=৬; আনকাবূত ২৯/৩৬-৩৭; ছোয়াদ ৩৮/১৩-১৫=৩; ক্বাফ ৫০/১৪। সর্বমোট = ৫৩টি।

থেকো না যে, ঈমানদারদের হুমকি দেবে, আল্লাহ্র পথে বাধা সৃষ্টি করবে ও তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করবে। স্মরণ কর, যখন তোমরা সংখ্যায় অল্প ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তোমাদেরকে আধিক্য দান করেছেন এবং লক্ষ্য কর কিরূপ অশুভ পরিণতি হয়েছে অনর্থকারীদের'। 'আর যদি তোমাদের একদল ঐ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে যা নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি এবং আরেক দল বিশ্বাস স্থাপন না করে, তবে তোমরা অপেক্ষা কর যে পর্যন্ত না আল্লাহ আমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেন। কেননা তিনিই শ্রেষ্ঠ ফায়ছালাকারী' *(আ'রাফ ৭/৮৫-৮৭)*।

কওমে শো'আয়েব-এর ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থা এবং দাওয়াতের সারমর্মঃ

উপরোক্ত আয়াত সমূহে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি প্রতীয়মান হয়। **প্রথমতঃ** তারা আল্লাহ্র হক ও বান্দার হক দু'টিই নষ্ট করেছিল। আল্লাহ্র হক হিসাবে তারা বিশ্বাসের জগতে আল্লাহকে বাদ দিয়ে সৃষ্টির পূজায় লিপ্ত হয়েছিল কিংবা আল্লাহ্র সঙ্গে অন্যকে শরীক করেছিল। তারা আল্লাহ্র ইবাদত ছেড়ে দিয়েছিল। দুনিয়াবী ধনৈশ্বর্যে ও বিলাস-ব্যসনে ডুবে গিয়ে তারা আল্লাহ্র সত্তা ও গুণাবলী এবং তাঁর হক সম্পর্কে গাফেল হয়ে গিয়েছিল। সেই সাথে নিজেদের পাপিষ্ঠ জীবনের মুক্তির জন্য বিভিন্ন সৃষ্ট বস্তুকে শরীক সাব্যস্ত করে তাদের অসীলায় মুক্তি কামনা করত। এভাবে তারা আল্লাহ ও তাঁর গযবের ব্যাপারে নিঃশংক হয়ে গিয়েছিল। সেকারণ সকল নবীর ন্যায় শো'আয়েব (আঃ) সর্বপ্রথম আক্বীদা সংশোধনের জন্য 'তাওহীদে ইবাদত'-এর আহ্বান জানান। যাতে তারা সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে স্রেফ আল্লাহ্র ইবাদত করে এবং সকল ব্যাপারে স্রেফ আল্লাহ্র ও তাঁর নবীর আনুগত্য করে। তিনি নিজের নবুঅতের প্রমাণ স্বরূপ তাদেরকে মু'জেযা প্রদর্শন করেন। যা স্বয়ং প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে 'সুস্পষ্ট প্রমাণ' রূপে তাঁর নিকটে আগমন করে।

দ্বিতীয়তঃ তারা মাপ ও ওযনে কম দিয়ে বান্দার হক নষ্ট করত। সেদিকে ইঙ্গিত করে শো'আয়েব (আঃ) বলেন, 'তোমরা মাপ ও ওযন পূর্ণ কর এবং মানুষের দ্রব্যাদিতে কম দিয়ে তাদের ক্ষতি করো না' *(আ'রাফ ৭/৮৫)*। আয়াতের প্রথমাংশে খাছভাবে মাপ ও ওযন পূর্ণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং শেষাংশে সর্বপ্রকার হকে ত্রুটি করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সে হক

মানুষের ধন-সম্পদ, ইযযত-আবরূ বা যেকোন বস্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত হৌক না কেন। বস্তুতঃ দ্রব্যাদির মাপ ও ওযনে কম দেওয়া যেমন মহা অপরাধ, তেমনি কারু ইযযত-আবরূ নষ্ট করা, কারু পদমর্যাদা অনুযায়ী তাকে সম্মান না করা, যাদের আনুগত্য করা যরূরী তাদের আনুগত্যে ত্রুটি করা অথবা যাকে সম্মান করা ওয়াজিব তার সম্মানে ত্রুটি করা ইত্যাদি সবই এ অপরাধের অন্তর্ভুক্ত, যা শো'আয়েব (আঃ)-এর সম্প্রদায় করত। সে সমাজে মানীর মান ছিল না বা গুণীর কদর ছিল না।

তৃতীয়তঃ বলা হয়েছে, 'তোমরা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করো না, সেখানে সংস্কার সাধিত হওয়ার পর' *(আ'রাফ ৭/৮৫)*। অর্থাৎ আল্লাহ পৃথিবীকে যেভাবে আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সবদিক দিয়ে সুন্দর ও সামঞ্জস্যশীল করে সৃষ্টি করেছেন, তোমরা তাতে ব্যত্যয় ঘটিয়ো না এবং কোনরূপ অনর্থ সৃষ্টি করো না।

চতুর্থতঃ তোমরা মানুষকে ভীতি প্রদর্শন ও আল্লাহ্র পথে বাধা দানের উদ্দেশ্যে পথে-ঘাটে ওঁৎ পেতে থেকো না *(আ'রাফ ৭/৮৬)*। এর দ্বারা মাদইয়ান বাসীদের আরেকটি মারাত্মক দোষের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তারা রাস্তার মোড়ে চৌকি বসিয়ে লোকদের কাছ থেকে অবৈধভাবে চাঁদা আদায় করত ও লুটপাট করত। সাথে সাথে তারা লোকদেরকে শো'আয়েব (আঃ)-এর উপরে ঈমান আনতে নিষেধ করত ও ভয়-ভীতি প্রদর্শন করত। তারা সর্বদা আল্লাহ্র পথে বক্রতার সন্ধান করত' *(আ'রাফ ৭/৮৬)* এবং কোথাও অঙ্গুলি রাখার জায়গা পেলে আপত্তি ও সন্দেহের ঝড় তুলে মানুষকে সত্যধর্ম হ'তে বিমুখ করার চেষ্টায় থাকত।

মাদইয়ানবাসীদের আরেকটি দুষ্কর্ম ছিল যে, তারা প্রচলিত স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার পার্শ্ব হ'তে সোনা ও রূপার কিছু অংশ কেটে রেখে সেগুলো বাজারে চালিয়ে দিত। শো'আয়েব (আঃ) তাদেরকে একাজ থেকে নিষেধ করেন।[১৯৭]

পঞ্চমতঃ তাদের অকৃতজ্ঞতার বিষয়ে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলা হয়েছে যে, 'স্মরণ কর তোমরা যখন সংখ্যায় কম ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তোমাদের বংশবৃদ্ধি করে তোমাদেরকে একটি বিরাট জাতিতে পরিণত করেছেন' *(আ'রাফ ৭/৮৬)*। তোমরা ধন-সম্পদে হীন ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তোমাদের প্রাচুর্য

১৯৭. *তাফসীরে কুরতুবী, হূদ ৮৭।*

Contents

দান করেছেন। অথচ তোমরা আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞ না হয়ে নানাবিধ শিরক ও কুফরীতে লিপ্ত হয়েছ। অতএব তোমরা সাবধান হও এবং তোমাদের পূর্ববর্তী কওমে নূহ, 'আদ, ছামূদ ও কওমে লূত-এর ধ্বংসলীলার কথা স্মরণ কর *(আ'রাফ ৭/৮৬)*। তাদের মর্মান্তিক পরিণাম ও অকল্পনীয় গযবের কথা মনে রেখে হিসাব-নিকাশ করে পা বাড়াও।

ষষ্ঠতঃ মাদইয়ানবাসীদের উত্থাপিত একটি সন্দেহের জবাব দেওয়া হয়েছে। তারা বলত যে, ঈমানদারগণ যদি ভাল ও সৎ হয়, আর আমরা কাফিররা যদি মন্দ ও পাপী হই, তাহ'লে আমাদের উভয় দলের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা একরূপ কেন? কাফিররা অপরাধী হ'লে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের শাস্তি দিতেন। এর উত্তরে নবী বলেন, فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، 'অপেক্ষা কর যতক্ষণ না আল্লাহ আমাদের মাঝে ফায়ছালা করেন বস্তুতঃ তিনিই শ্রেষ্ঠ ফায়সালাকারী' *(আ'রাফ ৭/৮৭)*। অর্থাৎ আল্লাহ স্বীয় সহনশীলতা ও কৃপাগুণে পাপীদের অবকাশ দিয়ে থাকেন। অতঃপর তারা যখন চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে যায়, তখন সত্য ও মিথ্যার ফায়ছালা নেমে আসে। তোমাদের অবস্থাও তদ্রূপ হবে। অবিশ্বাসী ও পাপীদের উপরে আল্লাহ্র চূড়ান্ত গযব সত্বর নাযিল হয়ে যাবে। একই ধরনের বক্তব্য উল্লেখিত হয়েছে সূরা হূদে *(১১/৮৪-৮৬ আয়াতে)*।

হযরত শো'আয়েব (আঃ) একথাও বলেন যে, '(আমার এ দাওয়াতের জন্য) আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান বিশ্বপালনকর্তাই দেবেন' *(শু'আরা ২৬/১৮০)*। তিনি বললেন, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর ও শেষ দিবসের আশা রাখ। তোমরা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করো না' *(আনকাবূত ২৯/৩৬)*।

শো'আয়েব (আঃ)-এর দাওয়াতের ফলশ্রুতি :

হযরত শো'আয়েব (আঃ)-এর নিঃস্বার্থ ও আন্তরিকতাপূর্ণ দাওয়াত তাঁর উদ্ধত কওমের নেতাদের হৃদয়ে রেখাপাত করল না। তারা বরং আরও উদ্ধত হয়ে তাঁর দরদ ভরা সুললিত বয়ান ও অপূর্ব চিত্তহারী বাগ্মীতার জবাবে পূর্ববর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত কওমের পাপিষ্ঠ নেতাদের ন্যায় নবীকে প্রত্যাখ্যান করল এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও তাচ্ছিল্য করে বলল, أَصَلاَتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ

آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَآء إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ– 'তোমার ছালাত কি তোমাকে একথা শিখায় যে, আমরা আমাদের ঐসব উপাস্যের পূজা ছেড়ে দিই, আমাদের পূর্ব পুরুষেরা যুগ যুগ ধরে যে সবের পূজা করে আসছে? আর আমাদের ধন-সম্পদে ইচ্ছামত আমরা যা কিছু করে থাকি, তা পরিত্যাগ করি? তুমি তো একজন সহনশীল ও সৎ ব্যক্তি' *(হূদ ১১/৮৭)*। অর্থাৎ তুমি একজন জ্ঞানী, দূরদর্শী ও সাধু ব্যক্তি হয়ে একথা কিভাবে বলতে পার যে, আমরা আমাদের বাপ-দাদার আমল থেকে চলে আসা দেব-দেবীর পূজা ও শেরেকী প্রথা সমূহ পরিত্যাগ করি এবং আমাদের আয়-উপাদানে ও রূযী-রোজগারে ইচ্ছামত চলা ছেড়ে দেই। আয়-ব্যয়ে কোন্টা হালাল কোন্টা হারাম তা তোমার কাছ থেকে জেনে নিয়ে কাজ করতে হবে এটা কি কখনো সম্ভব হ'তে পারে? তাদের ধারণা মতে তাদের সকল কাজ চোখ বুঁজে সমর্থন করা ও তাতে বরকতের জন্য দো'আ করাই হ'ল সৎ ও ভাল মানুষদের কাজ। ঐসব কাজে শিরক ও তাওহীদ, হারাম ও হালালের প্রশ্ন তোলা কোন ধার্মিক (?) ব্যক্তির কাজ নয়।

দ্বিতীয়তঃ তারা ইবাদাত ও মু'আমালাতকে পরস্পরের প্রভাবমুক্ত ভেবেছিল। ইবাদত কবুলের জন্য যে রূযী হালাল হওয়া যরূরী, একথা তাদের বুঝে আসেনি। সেজন্য তারা ব্যবসা-বাণিজ্যে হালাল-হারামের বিধান মানতে রাযী ছিল না। যদিও ছালাত আদায়ে কোন আপত্তি তাদের ছিল না। কেননা দেব-দেবীর পূজা সত্ত্বেও সৃষ্টিকর্তা হিসাবে এক আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস ও স্বীকৃতি সবারই ছিল *(লোকমান ৩১/২৫)*। তাদের আপত্তি ছিল কেবল একখানে যে, সবকিছু ছেড়ে কেবলমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করতে হবে এবং দুনিয়াবী ক্ষেত্রে আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হবে। তারা ধর্মকে কতিপয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমিত মনে করত এবং ব্যবহারিক জীবনে তার কোন দখল দিতে প্রস্তুত ছিল না। শো'আয়েব (আঃ) অধিকাংশ সময় ছালাত ও ইবাদতে নিমগ্ন থাকতেন বলে তাকে বিদ্রূপ করে কোন কোন মূর্খ নেতা এরূপ কথাও বলে ফেলে যে, তোমার ছালাত কি তোমাকে এসব আবোল-তাবোল কথা-বার্তা শিক্ষা দিচ্ছে?

কওমের লোকদের এসব বিদ্রূপবান ও রূঢ় মন্তব্য সমূহে বিচলিত না হয়ে অতীব ধৈর্য ও দরদের সাথে তিনি তাদের সম্বোধন করে বললেন,

قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيْدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيْدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيْقِيْ إِلاَّ بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ- وَيَا قَوْمِ لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيْ أَن يُّصِيْبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ أَوْ قَوْمَ هُوْدٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيْدٍ- وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيْمٌ وَدُوْدٌ- قَالُوْا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُوْلُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا وَلَوْلاَ رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ- قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِيْ أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَاتَّخَذْتُمُوْهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ- وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوْا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّيْ عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ، مَن يَّأْتِيهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوْا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيْبٌ- (هود ٨٨-٩٣)-

‘হে আমার জাতি! তোমরা কি মনে কর আমি যদি আমার পালনকর্তার পক্ষ হ’তে সুস্পষ্ট দলীলের উপরে কায়েম থাকি, আর তিনি যদি নিজের তরফ থেকে আমাকে (দ্বীনী ও দুনিয়াবী) উত্তম রিযিক দান করে থাকেন, (তবে আমি কি তাঁর হুকুম অমান্য করতে পারি?)। আর আমি চাই না যে, আমি তোমাদেরকে যে বিষয়ে নিষেধ করি, পরে নিজেই সে কাজে লিপ্ত হই। আমি আমার সাধ্যমত তোমাদের সংশোধন চাই মাত্র। আর আমার কোনই ক্ষমতা নেই আল্লাহ্র সাহায্য ব্যতীত। আমি তাঁর উপরেই নির্ভর করি এবং তাঁর দিকেই ফিরে যাই’ *(৮৮)*। ‘হে আমার জাতি! আমার প্রতি হঠকারিতা করে তোমরা নিজেদের উপরে নূহ, হূদ বা ছালেহ-এর কওমের মত আযাব ডেকে এনো না। আর লূতের কওমের ঘটনা তো তোমাদের থেকে দূরে নয়’ *(৮৯)*। ‘তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাঁর দিকেই ফিরে এস। নিশ্চয়ই আমার পালনকর্তা অতীব দয়ালু ও প্রেমময়’ *(৯০)*। ‘তারা বলল, হে শো‘আয়েব! তোমার অত শত কথা আমরা বুঝি না। তোমাকে তো আমাদের মধ্যকার একজন দুর্বল ব্যক্তি বলে আমরা মনে করি। যদি তোমার জাতি-গোষ্ঠীর লোকেরা না থাকত, তাহ’লে এতদিন আমরা তোমাকে পাথর

মেরে চূর্ণ করে ফেলতাম। তুমি আমাদের উপরে মোটেই প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি নও’ *(৯১)*। ‘শো‘আয়েব বলল, হে আমার কওম! আমার জ্ঞাতি-গোষ্ঠী কি তোমাদের নিকটে আল্লাহ্র চেয়ে অধিক ক্ষমতাশালী? অথচ তোমরা তাঁকে পরিত্যাগ করে পিছনে ফেলে রেখেছ? মনে রেখ তোমাদের সকল কার্যকলাপ আমার পালনকর্তার আয়ত্তাধীন’ *(৯২)*। ‘অতএব হে আমার জাতি! তোমরা তোমাদের স্থানে কাজ কর, আমিও কাজ করে যাই। অচিরেই তোমরা জানতে পারবে কার উপরে লজ্জাষ্কর আযাব নেমে আসে, আর কে মিথ্যাবাদী। তোমরা অপেক্ষায় থাক, আমিও অপেক্ষায় রইলাম’ *(হূদ ১১/৮৮-৯৩)*।

জবাবে ‘তাদের দাম্ভিক নেতারা চূড়ান্তভাবে বলে দিল, لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا- ‘হে শো‘আয়েব! আমরা অবশ্যই তোমাকে ও তোমার সাথী ঈমানদারগণকে শহর থেকে বের করে দেব অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করবে’ *(আ‘রাফ ৭/৮৮)*। তারা আরও বলল,

إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ- وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ- فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ- (الشعراء ١٨٥-١٨٧)-

‘নিঃসন্দেহে তুমি জাদুগ্রস্তদের অন্যতম’। ‘তুমি আমাদের মত একজন মানুষ বৈ কিছুই নও। আমাদের ধারণা তুমি অবশ্যই মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত’। ‘এক্ষণে যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে আকাশের কোন টুকরা আমাদের উপরে ফেলে দাও’ *(শো‘আরা ২৬/১৮৫-১৮৭)*। শো‘আয়েব (আঃ) তখন নিরাশ হয়ে প্রথমে কওমকে বললেন,

قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللهِ كَذِباً إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلاَّ أَن يَّشَآءَ اللهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا (الأعراف ٨٩)-

'আমরা আল্লাহ্র উপরে মিথ্যারোপকারী হয়ে যাব যদি আমরা তোমাদের ধর্মে ফিরে যাই। অথচ আল্লাহ আমাদেরকে তা থেকে মুক্তি দিয়েছেন। ঐ ধর্মে ফিরে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, তবে যদি আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ সেটা চান। আমাদের পালনকর্তা স্বীয় জ্ঞান দ্বারা প্রত্যেক বস্তুকে বেষ্টন করে আছেন। (অতএব) আল্লাহ্র উপরেই আমরা ভরসা করলাম।'

অতঃপর তিনি আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করে বললেন, رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ– 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের ও আমাদের কওমের মধ্যে তুমি যথার্থ ফায়ছালা করে দাও। আর তুমিই তো শ্রেষ্ঠ ফায়ছালাকারী' *(৮৯)*। 'তখন তার কওমের কাফের নেতারা বলল, وَقَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْباً إِنَّكُمْ إِذاً لَّخَاسِرُونَ– যদি তোমরা শো'আয়েবের অনুসরণ কর, তবে তোমরা নিশ্চিতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে' *(আ'রাফ ৭/৮৯-৯০)*।

অতঃপর শো'আয়েব (আঃ) স্বীয় কওমের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন,

فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ– (الأعراف ٩٣)–

'অনন্তর তিনি তাদের কাছ থেকে প্রস্থান করলেন এবং বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদেরকে আমার প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদের উপদেশ দিয়েছি। এখন আমি কাফেরদের জন্য আর কিভাবে সহানুভূতি দেখাব' *(আ'রাফ ৭/৯৩)*।

শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ :

হযরত শো'আয়েব (আঃ) ও তাঁর কওমের নেতাদের মধ্যকার উপরোক্ত কথোপকথনের মধ্যে নিম্নোক্ত শিক্ষণীয় বিষয়গুলি ফুটে ওঠে। যেমন:

(১) শো'আয়েব (আঃ) একটি সম্ভ্রান্ত গোত্রের মর্যাদাবান ব্যক্তি ছিলেন। নবুঅতের সম্পদ ছাড়াও তিনি দুনিয়াবী সম্পদে সমৃদ্ধিশালী ছিলেন। বস্তুতঃ

সকল নবীই স্ব স্ব যুগের সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তারা উচ্চ মর্যাদাশীল ব্যক্তি ছিলেন। (২) কওমের নেতারা ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মীয় বিধি-বিধান মানতে প্রস্তুত থাকলেও বৈষয়িক জীবনে ধর্মীয় বাধা-নিষেধ মানতে রাযী ছিল না (৩) আল্লাহকে স্বীকার করলেও তাদের মধ্যে অসীলা পূজা ও মূর্তিপূজার শিরকের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল (৪) বাপ-দাদার আমল থেকে চলে আসা রসমপূজা ছেড়ে নির্ভেজাল তাওহীদের সংস্কার ধর্মী দাওয়াত তারা কবুল করতে প্রস্তুত ছিল না (৫) মূলতঃ দুনিয়া পূজা ও প্রবৃত্তি পূজার কারণেই তারা শিরকী রেওয়াজ এবং বান্দার হক বিনষ্টকারী অপকর্ম সমূহের উপরে যিদ ধরেছিল।

(৬) প্রচলিত কোন অন্যায় রসমের সঙ্গে আপোষ করে তা দূর করা সম্ভব নয়। বরং শত বাধা ও ক্ষতি স্বীকার করে হ'লেও স্রেফ আল্লাহ্র উপরে ভরসা করে আপোষহীনভাবে সংস্কার কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়াই প্রকৃত সমাজ সংস্কারকের কর্তব্য (৭) সংস্কারককে সর্বদা স্পষ্ট দলীলের উপরে কায়েম থাকতে হবে (৮) তাকে অবশ্যই ধৈর্যশীল ও প্রকৃত সমাজদরদী হ'তে হবে (৯) কোনরূপ দুনিয়াবী প্রতিদানের আশাবাদী হওয়া চলবে না (১০) সকল ব্যাপারে কেবল আল্লাহ্র তাওফীক কামনা করতে হবে এবং প্রতিদান কেবল তাঁর কাছেই চাইতে হবে (১১) শিরক-বিদ'আত ও যুলুম অধ্যুষিত সমাজে তাওহীদের দাওয়াতের মাধ্যমে সংস্কার কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়াকে দুনিয়াদার সমাজনেতারা 'ফাসাদ' ও 'ক্ষতিকর' মনে করলেও মূলতঃ সেটাই হ'ল 'ইছলাহ' বা সমাজ সংশোধনের কাজ। সকল বাধা উপেক্ষা করে তাওহীদের দাওয়াত দিয়ে যাওয়াই হ'ল সংস্কারকের মূল কর্তব্য (১২) চূড়ান্ত অবস্থায় আল্লাহ্র নিকটেই ফায়ছালা চাইতে হবে।

আহলে মাদইয়ানের উপরে আপতিত গযবের বিবরণ :

হযরত শো'আয়েব (আঃ)-এর শত উপদেশ উপেক্ষা করে যখন কওমের নেতারা তাদের অন্যায় কর্মসমূহ চালিয়ে যাবার ব্যাপারে অনড় রইল এবং নবীকে জনপদ থেকে বের করে দেবার ও হত্যা করার হুমকি দিল ও সর্বোপরি হঠকারিতা করে তারা আল্লাহ্র গযব প্রত্যক্ষ করতে চাইল, তখন তিনি বিষয়টি আল্লাহ্র উপরে সোপর্দ করলেন এবং কওমের নেতাদের

বললেন, وَارْتَقِبُوْا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيْبٌ '(ঠিক আছে), তোমরা এখন আযাবের অপেক্ষায় থাক। আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় রইলাম' *(হূদ ১১/৯৩)*।

বলা বাহুল্য, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় চিরন্তন বিধান অনুযায়ী শো'আয়েব (আঃ) ও তাঁর ঈমানদার সাথীগণকে উক্ত জনপদ হ'তে অন্যত্র নিরাপদে সরিয়ে নিলেন। অতঃপর জিবরীলের এক গগণবিদারী নিনাদে অবাধ্য কওমের সকলে নিমেষে ধ্বংস হয়ে গেল। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন,

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْباً وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوْا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِيْنَ- كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلاَ بُعْداً لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُوْدُ- (هود ٩٤-٩٥)-

'অতঃপর যখন আমার আদেশ এসে গেল, তখন আমি শো'আয়েব ও তার ঈমানদার সাথীদের নিজ অনুগ্রহে রক্ষা করলাম। আর পাপিষ্ঠদের উপর বিকট গর্জন আপতিত হ'ল। ফলে তারা নিজেদের ঘরে উপুড় হয়ে মরে পড়ে রইল'। '(তারা এমনভাবে নিশ্চিহ্ন হ'ল) যেন তারা কখনোই সেখানে বসবাস করেনি। সাবধান! ছামূদ জাতির উপর অভিসম্পাতের ন্যায় মাদইয়ানবাসীর উপরেও অভিসম্পাত' *(হূদ ১১/৯৪-৯৫)*। যদিও তারা দুনিয়াতে মযবুত ও নিরাপদ অট্টালিকায় বসবাস করত।

আছহাবে মাদইয়ানের উপরে গযবের ব্যাপারে কুরআনে ظُلَّةٌ *(শো'আরা ১৮৯)*, رَجْفَةٌ *(হূদ ৯৪)*, صَيْحَةٌ *(আ'রাফ ৮৮)* তিন ধরনের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, বিকট নিনাদ, ভূমিকম্প। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, আহলে মাদইয়ানের উপরে প্রথমে সাতদিন এমন ভীষণ গরম চাপিয়ে দেওয়া হয় যে, তারা দহন জ্বালায় ছটফট করতে থাকে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা একটি ঘন কালো মেঘমালা পাঠিয়ে দিলেন, যার নীচ দিয়ে শীতল বায়ু প্রবাহিত হচ্ছিল। তখন কওমের লোকেরা ঊর্ধ্বশ্বাসে সেখানে দৌড়ে এল। এভাবে সবাই জমা হবার পর হঠাৎ ভূমিকম্প শুরু হ'ল এবং মেঘমালা হ'তে শুরু হল অগ্নিবৃষ্টি। তাতে মানুষ সব পোকা-মাকড়ের মত পুড়ে ছাই হ'তে লাগল। ইবনু আব্বাস (রাঃ) ও মুহাম্মাদ বিন কা'ব আল-কুরাযী বলেন, অতঃপর তাদের উপর নেমে আসে এক বজ্রনিনাদ। যাতে সব

মরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল’।[১৯৮] এভাবে কোনরূপ গ্রেফতারী পরোয়ানা ও সিপাই-সান্ত্রীর প্রহরা ছাড়াই আল্লাহদ্রোহীরা সবাই পায়ে হেঁটে স্বেচ্ছায় বধ্যভূমিতে উপস্থিত হয় এবং চোখের পলকে সবাই নিস্তনাবুদ হয়ে যায়।

মক্কা থেকে সিরিয়া যাওয়ার পথে এসব ধ্বংসস্থল নযরে পড়ে। আল্লাহ বলেন, وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيْشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيْلاً وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، ‘এসব জনপদ ধ্বংস হওয়ার পর পুনরায় আবাদ হয়নি অল্প কয়েকটি ব্যতীত। অবশেষে আমরাই এ সবের মালিক রয়েছি’ *(ক্বাছাছ ২৮/৫৮)*। তিনি বলেন, إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِيْنَ، ‘নিশ্চয়ই এর মধ্যে চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শনসমূহ রয়েছে’ *(হিজর ১৫/৭৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন এসব স্থান অতিক্রম করতেন, তখন আল্লাহ্র ভয়ে ভীত হয়ে পড়তেন ও সওয়ারীকে দ্রুত হাঁকিয়ে নিয়ে স্থান অতিক্রম করতেন।[১৯৯] অথচ এখনকার যুগের বস্তুবাদী লোকেরা এসব স্থানকে শিক্ষাস্থল না বানিয়ে পর্যটন কেন্দ্রের নামে তামাশার স্থলে পরিণত করেছে। আল্লাহ আমাদের সুপথ প্রদর্শন করুন- আমীন!

ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ বলেন, শু‘আয়েব (আঃ) ও তাঁর মুমিন সাথীগণ মক্কায় চলে যান ও সেখানে মৃত্যুবরণ করেন। কা‘বা গৃহের পশ্চিম দিকে দারুন নাদওয়া ও দার বনু সাহ্মের মধ্যবর্তী স্থানে তাদের কবর হয়’।[২০০] তবে এই সকল বর্ণনার ভিত্তি সুনিশ্চিত নয়। আর থাকলেও সেগুলি সবই এখন নিশ্চিহ্ন এবং সবই বায়তুল্লাহ্র চতুঃসীমার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ –

اللَّهُمَّ اغْفِرْلِى وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الحِسَابُ–

(প্রথম খণ্ড সমাপ্ত)

---

১৯৮. তাফসীর ইবনে কাছীর, শো‘আরা ১৮৯; কুরতুবী, ঐ।
১৯৯. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫১২৫ ‘শিষ্টাচার’ অধ্যায়, ‘যুলুম’ অনুচ্ছেদ।
২০০. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/১৭৯।

প্রথম খণ্ড

॥ প্রশ্নমালা ॥

ভূমিকা

প্রশ্ন (০/১) : প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী আদম (আঃ)-কে আল্লাহ কাদের হেদায়াতের জন্য প্রেরণ করেন? (উত্তর পৃ. ৯ দ্র.)।

প্রশ্ন (০/২) : পৃথিবীতে মোট কতজন নবী-রাসূল আগমন করেন? (উত্তর পৃ. ৯ দ্র.)।

প্রশ্ন (০/৩) : প্রধান ৪টি এলাহী গ্রন্থের নাম কি এবং তা কাদের উপরে নাযিল হয়? (উত্তর পৃ. ৯ দ্র.)।

প্রশ্ন (০/৪) : মুহাম্মাদ (ছাঃ) কোন নবীর বংশধর ছিলেন? (উত্তর পৃ. ৯ দ্র.)।

প্রশ্ন (০/৫) : কুরআন মজীদে কতজন নবীর নাম উল্লেখিত হয়েছে এবং তাঁদের নাম কি? (উত্তর পৃ. ১১ দ্র.)।

প্রশ্ন (০/৬) : কুরআনে নবীদের কাহিনী বর্ণনার উদ্দেশ্য কি? (উত্তর পৃ. ১১ দ্র.)।

১. আদম (আঃ)

প্রশ্ন (১/১) : মানুষ কি বানরের বংশধর? মানুষের আদি পিতা কে? তাকে আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টি করেন? (উত্তর পৃ. ১২ দ্র.)।

প্রশ্ন (১/২) : হাওয়া (আঃ)-কে কোথা থেকে সৃষ্টি করা হয়? (উত্তর পৃ. ১২ দ্র.)।

প্রশ্ন (১/৩) : সৃষ্টির শুরুতে মানুষ কি অসভ্য ছিল? (উত্তর পৃ. ১২ দ্র.)।

প্রশ্ন (১/৪) : শয়তানকে কেন সৃষ্টি করা হয়? (উত্তর পৃ. ১৩ দ্র.)।

প্রশ্ন (১/৫) : মানুষের ঠিকানা কয়টি ও কি কি? (উত্তর পৃ. ১৪ দ্র.)।

প্রশ্ন (১/৬) : ক্বিয়ামত কখন হবে? (উত্তর পৃ. ১৪ দ্র.)।

প্রশ্ন (১/৭) : মৃত্যুর পর মানুষের রূহগুলি কোথায় থাকে? (উত্তর পৃ. ১৪ দ্র.)।

প্রশ্ন (১/৮) : খলীফা অর্থ কি? খলীফা বলে কাদের বুঝানো হয়েছে? (উত্তর পৃ. ১৫ দ্র.)।

প্রশ্ন (১/৯) : আল্লাহ আদম (আঃ)-কে কিসের নাম শিক্ষা দেন? (উত্তর পৃ. ১৬ দ্র.)।

প্রশ্ন (১/১০) : জিন ও ফিরিশতা উভয়ের উপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ কি ছিল এবং কিভাবে তা প্রমাণিত হয়? (উত্তর পৃ. ১৬-১৭ দ্র.)।

প্রশ্ন (১/১১) : আদমকে সিজদার ব্যাখ্যা ও উদ্দেশ্য বর্ণনা কর। (উত্তর পৃ. ১৭ দ্র.)।

Contents

প্রশ্ন (১/৩১) : আদম (আঃ)-এর উপর নাযিলকৃত অধিকাংশ অহী কোন বিষয়ে ছিল? (উত্তর পৃ. ৪২ দ্র.)।

প্রশ্ন (১/৩২) : আদম (আঃ) সর্বপ্রথম কি আবিষ্কার করেন? (উত্তর পৃ. ৪২ দ্র.)।

প্রশ্ন (১/৩৩) : পৃথিবীর প্রথম কৃষিপণ্য কি ছিল? (উত্তর পৃ. ৪২ দ্র.)।

প্রশ্ন (১/৩৪) : ক্বাবীল কেন হাবীলকে হত্যা করে? (উত্তর পৃ. ৪৪ দ্র.)।

প্রশ্ন (১/৩৫) : সে যুগে কুরবানী কবুল হওয়ার নিদর্শন কি ছিল? (উত্তর পৃ. ৪৩-৪৪ দ্র.)।

প্রশ্ন (১/৩৬) : হাবীল-কাবীলের ঘটনায় কি কি শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে? (উত্তর পৃ. ৪৭-৪৮ দ্র.)।

প্রশ্ন (১/৩৭) : আদম (আঃ) কত বছর জীবিত ছিলেন? (উত্তর পৃ. ৪৮ দ্র.)।

প্রশ্ন (১/৩৮) : আদম (আঃ)-এর জীবনীতে কি কি শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে? (উত্তর পৃ. ৪৮-৫০ দ্র.)।

প্রশ্ন (১/৩৯) : আদম (আঃ) সম্পর্কে কুরআনের কয়টি সূরায় কতটি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে? (উত্তর পৃ. ১৫ দ্র.)।

২. নূহ (আঃ)

প্রশ্ন (২/১) : আদম (আঃ) থেকে নূহ (আঃ) পর্যন্ত কত সময়ের ব্যবধান ছিল? উত্তর পৃ. ৫১ দ্র.)।

প্রশ্ন (২/২) : পৃথিবীতে আদি যুগে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি কয়টি ও কি কি? (উত্তর পৃ. ৫১ দ্র.)।

প্রশ্ন (২/৩) : নূহ (আঃ)-এর কতজন পুত্র ছিল এবং তাদের মধ্যে কে ঈমান আনেনি? তার নাম কি? (উত্তর পৃ. ৫১ দ্র.)।

প্রশ্ন (২/৪) : আরব জাতির পিতা কে ছিলেন? (উত্তর পৃ. ৫২ দ্র.)।

প্রশ্ন (২/৫) : আবরদের মধ্যে কয়জন নবী ছিলেন এবং তাদের নাম কি? (উত্তর পৃ. ৫৩ দ্র.)।

প্রশ্ন (২/৬) : নূহ (আঃ) কোথায় বাস করতেন এবং তিনি কত বছর জীবিত ছিলেন? (উত্তর পৃ. ৫৩ দ্র.)।

প্রশ্ন (২/৭) : পৃথিবীর প্রাচীনতম শিরক কি? (উত্তর পৃ. ৫৫ দ্র.)।

প্রশ্ন (২/৮) : পৃথিবীতে সর্বপ্রথম মূর্তি কার ছিল, যার পূজা শুরু হয় (উত্তর পৃ. ৫৫ দ্র.)।

প্রশ্ন (২/৯) : নূহ (আঃ) তাঁর কওমকে কিসের দাওয়াত দেন? (উত্তর পৃ. ৫৬ দ্র.)।

প্রশ্ন (২/১০) : নূহ (আঃ)-এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তিসমূহ ছিল কয়টি ও কি কি? (উত্তর পৃ. ৫৭ দ্র.)।

প্রশ্ন (২/১১) : উত্থাপিত আপত্তিসমূহের জবাবে তিনি কি বলেন? (উত্তর পৃ. ৫৮-৬১ দ্র.)।

প্রশ্ন (২/১২) : নূহ (আঃ)-এর দাওয়াতের ফলশ্রুতি বর্ণনা কর। (উত্তর পৃ. ৬১-৬২ দ্র.)।

প্রশ্ন (২/১৩) : নূহ (আঃ) স্বীয় কওমের বিরুদ্ধে কি দো'আ করেন? (উত্তর পৃ. ৬৪ দ্র.)।

প্রশ্ন (২/১৪) : নূহ (আঃ)-এর কওমের উপর গযবের কারণ কি ছিল? (উত্তর পৃ. ৬৭ দ্র.)।

প্রশ্ন (২/১৫) : নৌকা ও জাহায শিল্পের গোড়াপত্তন করেন কে? (উত্তর পৃ. ৬৭ দ্র.)।

প্রশ্ন (২/১৬) : নূহ (আঃ)-এর প্লাবনের আলামত কি ছিল? (উত্তর পৃ. ৬৮ দ্র.)।

প্রশ্ন (২/১৭) : প্লাবনকে তূফান বলা হয় কেন? (উত্তর পৃ. ৬৮ দ্র.)।

প্রশ্ন (২/১৮) : নূহ (আঃ) নৌকায় কাদেরকে নিয়েছিলেন? (উত্তর পৃ. ৬৯ দ্র.)।

প্রশ্ন (২/১৯) : নৌকারোহীদের সংখ্যা কত ছিল? (উত্তর পৃ. ৭০ দ্র.)।

প্রশ্ন (২/২০) : মুক্তিপ্রাপ্তরা যে স্থানে বসতি স্থাপন করে সেস্থান কি নামে খ্যাতি লাভ করে? (উত্তর পৃ. ৭০ দ্র.)।

প্রশ্ন (২/২১) : সূমর জাতি কারা? (উত্তর পৃ. ৭০ দ্র.)।

প্রশ্ন (২/২২) : নৌকাটি কোন পাহাড়ে প্রথম ভিড়ে এবং এটা বর্তমানে কোথায়? (উত্তর পৃ. ৭০ দ্র.)।

প্রশ্ন (২/২৩) : নূহ (আঃ)-এর জীবনীতে কি কি শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে? (উত্তর পৃ. ৭০-৭২ দ্র.)।

প্রশ্ন (২/২৪) : নূহ (আঃ) সম্পর্কে কুরআনের কয়টি সূরায় কতটি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে? (উত্তর পৃ. ৫৩ দ্র.)।

৩. ইদরীস (আঃ)

প্রশ্ন (৩/১) : ইদরীস (আঃ) নূহ (আঃ)-এর পূর্বের নবী ছিলেন, না পরের? (উত্তর পৃ. ৭৩-৭৫ দ্র.)।

প্রশ্ন (৩/২) : ইদরীস (আঃ) জান্নাত দেখতে গিয়ে ৪র্থ আসমানে উঠে মারা যান একথা কি সত্য? (উত্তর পৃ. ৭৪ দ্র.)।

প্রশ্ন (৩/৩) : ইদরীস (আঃ)-এর মু'জেযা কি ছিল এবং তিনি কোন কোন শিল্পের সূচনা করেন? (উত্তর পৃ. ৭৫ দ্র.)।

প্রশ্ন (৩/৪) : ইদরীস (আঃ) সম্পর্কে কয়টি সূরায় কতটি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে? (উত্তর পৃ. ৭৪ দ্র.)।

৪. হূদ (আঃ)

প্রশ্ন (৪/১) : হূদ (আঃ) কাদের প্রতি প্রেরিত হন? (উত্তর পৃ. ৭৬ দ্র.)।

প্রশ্ন (৪/২) : আদ সম্প্রদায়ের কয়টি গোত্র এবং তাদের বসবাস কোথায় ছিল? (উত্তর পৃ. ৭৬ দ্র.)।

প্রশ্ন (৪/৩) : হূদ (আঃ)-এর দাওয়াতের সারমর্ম বিবৃত কর। (উত্তর পৃ. ৮৪ দ্র.)।

প্রশ্ন (৪/৪) : হূদ (আঃ)-এর দাওয়াতের ফলাফল কি হয়েছিল? (উত্তর পৃ. ৮৬ দ্র.)।

প্রশ্ন (৪/৬) : আদ জাতির প্রতি কি ধরনের গযব নাযিল হয়েছিল? (উত্তর পৃ. ৮৭-৮৮ দ্র.)।

প্রশ্ন (৪/৭) : আদ জাতির ধ্বংসের প্রধান কারণ সমূহ কি ছিল? (উত্তর পৃ. ৮৯-৯০ দ্র.)।

প্রশ্ন (৪/৮) : হূদ (আঃ) ও আদ জাতির ঘটনা থেকে কি শিক্ষণীয় রয়েছে? (উত্তর পৃ. ৯০ দ্র.)।

প্রশ্ন (৪/৯) : কওমে হূদ সম্পর্কে কুরআনের কয়টি সূরায় কতটি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। (উত্তর পৃ. ৭৭ দ্র.)।

৫. ছালেহ (আঃ)

প্রশ্ন (৫/১) : আদ জাতির ধ্বংসের কত বছর পরে ছালেহ (আঃ) নবী হিসাবে প্রেরিত হন? (উত্তর পৃ. ৯১ দ্র.)।

প্রশ্ন (৫/২) : ছামূদ জাতি কোথায় বসবাস করত? (উত্তর পৃ. ৯১ দ্র.)।

প্রশ্ন (৫/৩) : ছামূদ জাতি কোন কাজে পারদর্শী ছিল? (উত্তর পৃ. ৯১ দ্র.)।

প্রশ্ন (৫/৪) : ছালেহ (আঃ) তাঁর কওমের নিকট কি দাওয়াত দিয়েছিলেন? (উত্তর পৃ. ৯২ দ্র.)।

প্রশ্ন (৫/৫) : ছালেহ (আঃ)-কে হত্যার ষড়যন্ত্রারী দলের নেতা ছিল কয়জন এবং তাদের যুক্তি কি ছিল? (উত্তর পৃ. ৯৯-১০০ দ্র.)।

প্রশ্ন (৫/৬) : কওমে ছামূদের উপর গযবের বিবরণ দাও? (উত্তর পৃ. ৯৫-১০৩ দ্র.)।

প্রশ্ন (৫/৭) : কওমে ছালেহ (আঃ)-এর উপর আপতিত গযবের ধরন কিরূপ ছিল? (উত্তর পৃ. ১০১ দ্র.)।

প্রশ্ন (৫/৮) : ছাক্বীফ গোত্রে জন্মগ্রহণকারী ভণ্ডনবী ও রক্ত পিপাসু ব্যক্তিদ্বয়ের নাম কি? (উত্তর পৃ. ১০১-১০২ দ্র.)।

প্রশ্ন (৫/৯) : ছামূদ জাতির উপর যেখানে গযব নাযিল হয়, সেস্থানের নাম কি? (উত্তর পৃ. ১০২ দ্র.)।

প্রশ্ন (৫/১০) : ছামূদ জাতির কাহিনীতে কি কি শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। (উত্তর পৃ. ১০৩-১০৪ দ্র.)।

প্রশ্ন (৫/১১) : কওমে ছালেহ সম্পর্কে কুরআনে কয়টি সূরায় কতটি আয়াত বর্ণিত হয়েছে? (উত্তর পৃ. ৯৪ দ্র.)।

৬. ইবরাহীম (আঃ)

প্রশ্ন (৬/১) : ইবরাহীম (আঃ) ছালেহ (আঃ)-এর কত বছর পরে এবং কোথায় আগমন করেন এবং তাঁর কর্মস্থল ছিল কোথায়? (উত্তর পৃ. ১০৫ দ্র.)।

প্রশ্ন (৬/২) : ইবরাহীম (আঃ) নূহ (আঃ)-এর কত বছর পরে এবং ঈসা (আঃ)-এর কত বছর পূর্বে আগমন করেন? (উত্তর পৃ. ১০৫ দ্র.)।

প্রশ্ন (৬/৩) : আবুল আম্বিয়া, সাইয়েদুল আম্বিয়া, উম্মতে মুসলিমার পিতা ও উম্মুল আম্বিয়া কাদেরকে বলা হয় ও কেন বলা হয়? (উত্তর পৃ. ১০৫-১০৭ দ্র.)।

প্রশ্ন (৬/৪) : ইবরাহীম (আঃ) কোথায় জন্মগ্রহণ করেন এবং কত বছর বয়সে নবুঅত লাভ করেন? (উত্তর পৃ. ১০৭ দ্র.)।

প্রশ্ন (৬/৫) : নমরূদ কত বছর রাজত্ব করেন? (উত্তর পৃ. ১০৭ দ্র.)।

প্রশ্ন (৬/৬) : ইবরাহীম (আঃ) কোন জাতির নিকট প্রেরিত হন? (উত্তর পৃ. ১০৭-১০৮ দ্র.)।

প্রশ্ন (৬/৭) : ইবরাহীম (আঃ)-এর নিজ পরিবারের কে কে মুসলমান হন? (উত্তর পৃ. ১০৮ দ্র.)।

প্রশ্ন (৬/৮) : ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় মূর্তিপূজারী কওমকে কি দাওয়াত দেন? (উত্তর পৃ. ১০৮-১০৯ দ্র.)।

প্রশ্ন (৬/৯) : ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পিতাকে কি দাওয়াত দেন? (উত্তর পৃ. ১০৯-১১০ দ্র.)।

প্রশ্ন (৬/১০) : পিতার জবাব কি ছিল? সেখানে ইবরাহীমের জবাব কি ছিল? (উত্তর ১০৯-১১০)।

প্রশ্ন (৬/১১) : ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় পিতা ও কওমকে একত্রিতভাবে যে দাওয়াত দেন তার সারকথা ও ফলশ্রুতি কি ছিল? (উত্তর পৃ. ১১৪-১১৫ দ্র.)।

প্রশ্ন (৬/১২) : ইবরাহীম (আঃ) নক্ষত্র, চন্দ্র ও সূর্যকে প্রভু বলে স্বীকার করে প্রথমে মুশরিক হন এবং পরে ঐসবকে ত্যাগ করে মুসলিম হয়েছিলেন, একথা কি সত্য? (উত্তর পৃ. ১১৭ দ্র.)।

Contents

প্রশ্ন (৬/৩০) : ইবরাহীম (আঃ)-কে আল্লাহ মৃত প্রাণীকে জীবিত করে দেখালেন এতে কি শিক্ষা রয়েছে? (উত্তর পৃ. ১৪৪ দ্র.)।

প্রশ্ন (৬/৩১) : বায়তুল্লাহ নির্মাণের ইতিহাস বলুন? (উত্তর পৃ. ১৪৪ দ্র.)।

প্রশ্ন (৬/৩২) : হজ্জে তালবিয়াহ পাঠের ভিত্তি কি? (উত্তর পৃ. ১৪৫ দ্র.)।

প্রশ্ন (৬/৩৩) : ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ)-এর স্মৃতি কিভাবে অক্ষুণ্ন আছে? (উত্তর পৃ. ১৪৫ দ্র.)।

প্রশ্ন (৬/৩২) : ইবরাহীম (আঃ)-এর জীবনে পরীক্ষা সমূহের মূল্যায়ন করুন? (উত্তর পৃ. ১৪৮-১৪৯ দ্র.)।

প্রশ্ন (৬/৩৩) : ইবরাহীম (আঃ)-এর জীবনীতে কি কি শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে? (উত্তর পৃ. ১৫০ দ্র.)।

প্রশ্ন (৬/৩৪) : কওমে ইবরাহীম সম্পর্কে কুরআনের কয়টি সূরায় কতটি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে? (উত্তর পৃ. ১০৮ দ্র.)।

৭. লূত (আঃ)

প্রশ্ন (৭/১) : লূত (আঃ) কে এবং তিনি কাদের নিকট নবী হিসাবে প্রেরিত হন? (উত্তর পৃ. ১৫২ দ্র.)।

প্রশ্ন (৭/২) : লূত (আঃ) মুহাজির হওয়া সত্ত্বেও 'তাদের ভাই' বলার কারণ কি? (উত্তর পৃ. ১৫৩ দ্র.)।

প্রশ্ন (৭/৩) : কওমে লূতের মধ্যে কি কি পাপকর্ম ছিল? (উত্তর পৃ. ১৫৪ দ্র.)।

প্রশ্ন (৭/৪) : লূতের কওমের উপরে গযব কিভাবে কার্যকর হয়? (উত্তর পৃ. ১৫৮-১৫৯ দ্র.)।

প্রশ্ন (৭/৫) : কওমের লূতের ধ্বংসস্থলটি কোথায়? (উত্তর পৃ. ১৬০ দ্র.)।

প্রশ্ন (৭/৬) : গযব থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত লোকের সংখ্যা কত ছিল? (উত্তর পৃ. ১৬১ দ্র.)।

প্রশ্ন (৭/৭) : লূত (আঃ)-এর কওমের ঘটনায় কি শিক্ষণীয় রয়েছে? (উত্তর পৃ. ১৬২ দ্র.)।

প্রশ্ন (৭/৮) : কওমে লূত সম্পর্কে কুরআনের কয়টি সূরায় কতটি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে? (উত্তর পৃ. ১৫২ দ্র.)।

৮. ইসমাঈল (আঃ)

প্রশ্ন (৮/১) : ইবরাহীমের কত বয়সে ইসমাঈল জন্মগ্রহণ করেন? (উত্তর পৃ. ১৬৩ দ্র.)।

প্রশ্ন (৮/২) : কত বছর বয়সে ইসমাঈলকে কুরবানী করা হয়? (উত্তর পৃ. ১৬৩ দ্র.)।

Contents

প্রশ্ন (৮/৩) : কা'বা নির্মাণকালে ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ) যে দো'আ করেছিলেন তার ফলাফল কি হয়েছিল? (উত্তর পৃ. ১৬৪ দ্র.)।

প্রশ্ন (৮/৪) : প্রথম বিশুদ্ধ আরবী ভাষী কে ছিলেন? এ বিষয়ে দলীল কি? (উত্তর পৃ. ১৬৪ দ্র.)।

প্রশ্ন (৮/৫) : পিতার প্রতি ইসমাঈলের শ্রদ্ধাবোধের দৃষ্টান্ত কিরূপ ছিল? (উত্তর পৃ. ১৬৫ দ্র.)

প্রশ্ন (৮/৬) : ইসমাঈল (আঃ) কত বছর বেঁচে ছিলেন এবং কোথায় মৃত্যুবরণ করেন? (উত্তর পৃ. ১৬৬ দ্র.)।

প্রশ্ন (৮/৭) : যবীহুল্লাহ কে ছিলেন? (উত্তর পৃ. ১৬৬ দ্র.)।

প্রশ্ন (৮/৮) : ইসমাঈল (আঃ) সম্পর্কে কুরআনের কয়টি সূরায় কতটি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে? (উত্তর পৃ. ১৬৪ দ্র.)।

৯. ইসহাক (আঃ)

প্রশ্ন (৯/১) : ইসহাক (আঃ)-এর জন্ম কোথায় হয় এবং তিনি ইসমাঈলের কত বছরের ছোট ছিলেন? তাঁর জন্মের সময় ইবরাহীম ও সারার বয়স কত ছিল? (উত্তর পৃ. ১৬৯ দ্র.)।

প্রশ্ন (৯/২) : ইসহাক (আঃ)-এর কোন এলাকায় তাওহীদের দাওয়াত দেন? (উত্তর পৃ. ১৬৯ দ্র.)।

প্রশ্ন (৯/৩) : ইসহাক কত বছর বয়সে কোথায় মৃত্যুবরণ করেন? (উত্তর পৃ. ১৬৯ দ্র.)।

প্রশ্ন (৯/৪) : ইসহাক (আঃ) সম্পর্কে কুরআনের কয়টি সূরায় কতটি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে? (উত্তর পৃ. ১৬৯ দ্র.)।

১০. ইয়াকূব (আঃ)

প্রশ্ন (১০/১) : ইয়াকুব (আঃ) -এর অপর নাম কি? (উত্তর পৃ. ১৬৮ দ্র.)।

প্রশ্ন (১০/২) : ইয়াকূব (আঃ) ও মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মধ্যে কিসে মিল রয়েছে? (উত্তর পৃ. ১৭০ দ্র.)।

প্রশ্ন (১০/৩) : ইয়াকূব (আঃ) কোথায় ইবাদতখানা প্রতিষ্ঠা করেন এবং কেন? (উত্তর পৃ. ১৭০ দ্র.)।

প্রশ্ন (১০/৪) : ইয়াকূব (আঃ)-এর কত বছর পরে কে উক্ত স্থানে বায়তুল মুক্বাদ্দাস নির্মাণ করেন? (উত্তর পৃ. ১৭০ দ্র.)।

প্রশ্ন (১০/৫) : কা'বা গৃহের কত বছর পরে কার দ্বারা 'বায়তুল মুকাদ্দাস' নির্মিত হয়? (উত্তর পৃ. ১৭১ দ্র.)।

Contents

প্রশ্ন (১০/৬) : ইয়াকূব (আঃ) কোথায় বিবাহ করেন এবং তাঁর কয়টি সন্তান হয়? কার নামানুসারে 'বনু ইস্রাঈল' নামকরণ করা হয়? (উত্তর পৃ. ১৭১ দ্র.)।

প্রশ্ন (১০/৭) : ইয়াকূব (আঃ) কোন এলাকার নবী ছিলেন? (উত্তর পৃ. ১৬৯ দ্র.)।

প্রশ্ন (১০/৮) : তিনি কত বছর বয়সে কোথায় মৃত্যু বরণ করেন এবং কোথায় সমাহিত হন? (উত্তর পৃ. ১৭২ দ্র.)।

প্রশ্ন (১০/৯) : ইয়াকূব (আঃ) তাঁর সন্তানদের প্রতি কি অছিয়ত করেন? (উত্তর পৃ. ১৭২-১৭৩ দ্র.)।

প্রশ্ন (১০/১০) : ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব প্রমুখ নবীগণের ধর্ম কি ছিল? (উত্তর পৃ. ১৭৩ দ্র.)।

প্রশ্ন (১০/১১) : একজন দূরদর্শী পিতার প্রধান কর্তব্য কি? (উত্তর পৃ. ১৭৩ দ্র.)।

প্রশ্ন (১০/১২) : ইয়াকূব (আঃ) সম্পর্কে কুরআনের কয়টি সূরায় কতটি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে? (উত্তর পৃ. ১৭০ দ্র.)।

১১. ইউসুফ (আঃ)

প্রশ্ন (১১/১) : সূরা ইউসুফ কেন নাযিল হয়? (উত্তর পৃ. ১৭৪-১৭৫ দ্র.)।

প্রশ্ন (১১/২) : ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনীকে 'সুন্দরতম কাহিনী' বলার কারণ কি? (উত্তর পৃ. ১৭৫-১৭৬ দ্র.)।

প্রশ্ন (১১/৩) : আরবী ভাষায় কুরআন নাযিলের কারণ কি? (উত্তর পৃ. ১৭৬ দ্র.)।

প্রশ্ন (১১/৪) : ইউসুফ (আঃ)-এর স্বপ্নে দেখা '১১টি নক্ষত্র ও চন্দ্র-সূর্য তাকে সিজদা করছে' এ কথার তাৎপর্য কি এবং তা কখন কিভাবে বাস্তবায়িত হয়? (উত্তর পৃ. ১৮২ দ্র.)।

প্রশ্ন (১১/৫) : ইউসুফ (আঃ) কি যুলায়খাকে বিবাহ করেছিলেন? (উত্তর পৃ. ১৭৭ দ্র.)।

প্রশ্ন (১১/৬) : সূরা ইউসুফ মক্কায় নাযিল হওয়ার কারণ কি? (উত্তর পৃ. ১৭৮ দ্র.)।

প্রশ্ন (১১/৭) : ইউসুফ (আঃ)-এর পূর্ণ বংশ পরিচয় কি ও তাঁর মায়ের নাম কি? (উত্তর পৃ. ১৭১, ১৭৯ দ্র.)।

প্রশ্ন (১১/৮) : ইউসুফ (আঃ) কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? (উত্তর পৃ. ১৭৯ দ্র.)।

প্রশ্ন (১১/৯) : ইয়াকূব (আঃ) মিসরে পুত্র ইউসুফের সাথে কত বছর অবস্থান করেন? (উত্তর পৃ. ১৭৯ দ্র.)।

প্রশ্ন (১১/১০) : তিনি কত বছর বয়সে কোথায় মৃত্যুবরণ করেন? তাকে কোথায় দাফন করা হয়? (উত্তর পৃ. ১৭৯ দ্র.)।

Contents

Contents

Contents

প্রশ্ন (১১/৪২) : বেনিয়ামীনকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য তার ভাইয়েরা কি প্রচেষ্টা চালায়? (উত্তর পৃ. ২১৮-২১৯ দ্র.)।

প্রশ্ন (১১/৪৩) : বেনিয়ামীনকে রেখে এসে তার ভাইয়েরা পিতার নিকট কি কৈফিয়ত পেশ করে? (উত্তর পৃ. ২২১ দ্র.)।

প্রশ্ন (১১/৪৪) : ইয়াকূব (আঃ) কিভাবে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান? (উত্তর পৃ. ২২৬ দ্র.)।

প্রশ্ন (১১/৪৫) : বনু ইসরাঈলের ১২টি বংশধারা কোথা থেকে সৃষ্টি হয়? (উত্তর পৃ. ২২৫ দ্র.)।

প্রশ্ন (১১/৪৬) : ইউসুফ (আঃ) কি তার ভাইদের উপর প্রতিশোধ না নিয়ে কি বলেছিলেন? (উত্তর পৃ. ২২৪ দ্র.)।

প্রশ্ন (১১/৪৭) : ঘামের গন্ধে দৃষ্টিশক্তি ফেরা বিষয়ে আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্য কি? (উত্তর পৃ. ২২৭ দ্র.)।

প্রশ্ন (১১/৪৮) : ইউসুফের স্বপ্নের বাস্তবায়ন কিভাবে হয়? (উত্তর পৃ. ২২৬-২২৭ দ্র.)।

প্রশ্ন (১১/৪৯) : ইউসুফ (আঃ) আল্লাহ্র কাছে কি দো‘আ করেন? (উত্তর পৃ. ২৩০ দ্র.)।

প্রশ্ন (১১/৫০) : ইউসুফ ও ইয়াকূব (আঃ)-এর ঘটনার বর্ণনা কিসের প্রমাণ ছিল? (উত্তর পৃ. ২৩২ দ্র.)।

প্রশ্ন (১১/৫১) : মোট কয়টি আয়াতে মুফাসসিরগণ মতভেদ করেছেন ও সেগুলি কি কি? (উত্তর পৃ. ২৩৫ দ্র.)।

প্রশ্ন (১১/৫২) : ইউসুফের নিষ্পাপত্বের প্রমাণ কি? (উত্তর পৃ. ২৩৯-২৪১ দ্র.)।

প্রশ্ন (১১/৫৩) : বুরহান কি? (উত্তর পৃ. ২৪২ দ্র.)।

প্রশ্ন (১১/৫৪) : ইউসুফ (আঃ) কত বছর কারাগারে ছিলেন? এটা কি তাঁর অপরাধের শাস্তি ছিল? (উত্তর পৃ. ২৪৬-২৪৭ দ্র.)।

প্রশ্ন (১১/৫৫) : ইউসুফ-এর কাহিনীতে কি কি শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে? (উত্তর পৃ. ২৫১-২৫২ দ্র.)।

প্রশ্ন (১১/৫৬) : ইউসুফ (আঃ) সম্পর্কে কুরআনে কয়টি সূরায় কতটি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে? (উত্তর পৃ. ১৭৪ দ্র.)।

১২. আইয়ূব (আঃ)

প্রশ্ন (১২/১) : আইয়ূব (আঃ)-এর পূর্ণ পরিচয় কি? তিনি কোন এলাকার অধিবাসী ছিলেন? (উত্তর পৃ. ২৫৩ দ্র.)।

প্রশ্ন (১২/২) : আইয়ূব (আঃ) ও অন্যান্য নবীদের কষ্ট ভোগের ঘটনাবলী শেষনবী (ছাঃ)-কে শুনানোর কারণ কি? (উত্তর পৃ. ২৫৫ দ্র.)।

প্রশ্ন (১২/৩) : আইয়ূব (আঃ)-এর দীর্ঘ রোগভোগ সম্পর্কে কথিত ঘটনা কি সত্য? (উত্তর পৃ. ২৫৮ দ্র.)।

প্রশ্ন (১২/৪) : আইয়ূব (আঃ)-এর কষ্ট কিভাবে দূরীভূত হয়? (উত্তর পৃ. ২৫৭-৫৮ দ্র.)।

প্রশ্ন (১২/৫) : আইয়ূব (আঃ)-এর স্ত্রীর নাম কি 'রহীমা' ছিল? (উত্তর পৃ. ২৫৮-২৫৯ দ্র.)।

প্রশ্ন (১২/৬) : আইয়ূব (আঃ)-এর উপর এক ঝাঁক সোনার টিড্ডি এসে পড়লে তিনি কি করেন? (উত্তর পৃ. ২৫৯ দ্র.)।

প্রশ্ন (১২/৭) : আইয়ূব (আঃ) স্বীয় স্ত্রীকে একশত বেত্রাঘাত করার শপথ কেন করেন এবং ঐ শপথ কিভাবে পূর্ণ করেন? (উত্তর পৃ. ২৫৯-২৬০ দ্র.)।

প্রশ্ন (১২/৮) : আইয়ূব (আঃ) কতবছর বয়সে পরীক্ষায় পতিত হন এবং কত বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন? (উত্তর পৃ. ২৬০ দ্র.)।

প্রশ্ন (১২/৯) : আইয়ূব (আঃ)-এর জীবনী থেকে কি কি শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে? (উত্তর পৃ. ২৬১ দ্র.)।

প্রশ্ন (১২/১০) : আইয়ূব (আঃ) সম্পর্কে কুরআনের কয়টি সূরায় কতটি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে? (উত্তর পৃ. ২৫৩ দ্র.)।

১৩. শো'আয়েব (আঃ)

প্রশ্ন (১৩/১) : শো'আয়েব (আঃ) কোন এলাকায় নবী হিসাবে প্রেরিত হন? (উত্তর পৃ. ২৬২ দ্র.)।

প্রশ্ন (১৩/২) : শো'আয়েব (আঃ) -এর উপাধি কি ছিল? (উত্তর পৃ. ২৬২ দ্র.)।

প্রশ্ন (১৩/৩) : মাদইয়ানবাসীকে কুরআনে আর কি নামে অভিহিত করা হয়? তাদেরকে এ নামে অভিহিত করার কারণ কি? (উত্তর পৃ. ২৬২ দ্র.)।

প্রশ্ন (১৩/৪) : মাদইয়ান কে ছিলেন? (উত্তর পৃ. ২৬২ দ্র.)।

প্রশ্ন (১৩/৫) : মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে কি কি পাপাচার বিদ্যমান ছিল? (উত্তর পৃ. ২৬৪-২৬৫ দ্র.)।

প্রশ্ন (১৩/৬) : শো'আয়েব (আঃ) তাঁর কওমকে কি কি বিষয়ে দাওয়াত দেন? (উত্তর পৃ. ২৬৪-২৬৫ দ্র.)।

প্রশ্ন (১৩/৭) : তাঁর দাওয়াতের ফলাফল কি ছিল? (উত্তর পৃ. ২৬৬-৬৭ দ্র.)।

প্রশ্ন (১৩/৮) : শো'আয়েব ও তাঁর কওমের নেতাদের কথোপকথনে কি শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে? (উত্তর পৃ. ২৭০-২৭১ দ্র.)।

প্রশ্ন (১৩/৯) : মাদইয়ানবাসীদের উপর কি ধরনের গযব এসেছিল? (উত্তর পৃ. ২৭২-২৭৩ দ্র.)।

প্রশ্ন (১৩/১০) : কওমে শো'আয়েব সম্পর্কে কুরআনের কয়টি সূরায় কতটি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে? (উত্তর পৃ. ২৬৩ দ্র.)।

Contents

‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’ প্রকাশিত বই সমূহ

	বইয়ের নাম	লেখকের নাম	মূল্য
০১।	আহলেহাদীছ আন্দোলন: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (ডক্টরেট থিসিস)	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	২৫০/=
০২।	আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন?	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	২১/=
০৩।	দাওয়াত ও জিহাদ	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	১৫/=
০৪।	মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	২০/=
০৫।	মীলাদ প্রসঙ্গ	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	১০/=
০৬।	শবেবরাত	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	১০/=
০৭।	আরবী ক্বায়েদা	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	১৫/=
০৮।	ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	৪০/=
০৯।	তালাক ও তাহলীল	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	২০/=
১০।	হজ্জ ও ওমরাহ	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	২০/=
১১।	আক্বীদা ইসলামিয়াহ	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	০৬/=
১২।	উদাত্ত আহ্বান	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	০৬/=
১৩।	ইসলামী খিলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	১৮/=
১৪।	ইক্বামতে দ্বীনঃ পথ ও পদ্ধতি	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	১২/=
১৫।	হাদীছের প্রামাণিকতা	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	২০/=
১৬।	আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	১০/=
১৭।	সমাজ বিপ্লবের ধারা	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	১২/=
১৮।	তিনটি মতবাদ	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	২৫/=
১৯।	নৈতিক ভিত্তি ও প্রস্তাবনা	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	১০/=
২০।	ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	
২১।	ইনসানে কামেল	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	১৫/=
২২।	ছবি ও মূর্তি	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	১৫/=
২৩।	নবীদের কাহিনী-১	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	১২০/=
২৪।	নয়টি প্রশ্নের উত্তর	মুহাম্মাদ নাছেরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)	১৫/=
২৫।	আক্বীদায়ে মুহাম্মাদী	মাওলানা আহমাদ আলী	০৪/=
২৬।	কিতাব ও সুন্নাতের দিকে ফিরে চল	আলী খাশান অনু:	১৫/=
২৭।	ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ	নাছের বিন সোলায়মান আল-ওমর অনু:	৩০/=
২৮।	সূদ	শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান	২৫/=
২৯।	একটি পত্রের জওয়াব	আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী	১২/=
৩০।	জাগরণী	আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী	২০/=

Contents

২

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

Contents

تاريخ الأنبياء والرسل ﷺ

(الجزء الثاني)

تأليف: د. محمد أسد الله الغالب

الناشر: حديث فاؤنديشن بنغلاديش

(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة و النشر)

প্রকাশক

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

কাজলা, রাজশাহী-৬২০৪

হা.ফা.বা. প্রকাশনা- ৩১

ফোন ও ফ্যাক্স ঃ ০৭২১-৮৬১৩৬৫

১ম প্রকাশ

মুহাররম ১৪৩২ হিঃ

ডিসেম্বর ২০১০ খৃঃ

কম্পোজ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

নির্ধারিত মূল্য

১০০ (একশত) টাকা মাত্র।

NOBIDER KAHINI-2 (The lives of the prophets-2) by **Dr. Muhammad Asadullah Al-Ghalib**. Professor, Department of Arabic, University of Rajshahi, Bangladesh. Published by: **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH**. Kajla, Rajshahi, Bangladesh. Ph & Fax : 88-0721-861365, 760525. Fixed Price: US Doller: $3 (three) only.

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের নিবেদন

আশরাফুল মাখলূক্বাত মানবজাতির কল্যাণে প্রেরিত বিধান সমূহ প্রচার ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে আদম (আঃ) থেকে মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত যুগে যুগে যে অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন, তাঁদের মধ্য থেকে মাত্র পঁচিশজন নবীর নাম আল্লাহ পবিত্র কুরআনে গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছেন এবং সত্যের পথে তাঁদের দৃঢ়চিত্ত সংগ্রামের হৃদয়গ্রাহী কাহিনী বর্ণনা করে মানবতার সামনে সত্য, ন্যায় ও সুন্দরের অনুপম মানদণ্ড উপস্থাপন করেছেন। এসব কাহিনী কেবল চিত্তবিনোদনের খোরাক নয়, বরং এক অবিরাম বিচ্ছুরিত আলোকধারা, যার প্রতিটি কণায় বিকশিত হয় মানবতার সর্বোচ্চ নমুনা। নবী ও রাসূলগণের জীবনালেখ্য জানা ও তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হ'লেও সত্য যে, বাংলাভাষায় এ সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস খুবই দুর্লভ। তাই বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে মাননীয় লেখক **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বগুড়া যেলা কারাগারে অবস্থানকালে পবিত্র কুরআনের তাফসীর ও মিশকাতুল মাছাবীহের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা রচনার ফাঁকে ফাঁকে এই মূল্যবান পাণ্ডুলিপিটি সমাপ্ত করেন। মুহতারাম লেখক এই ইতিহাস রচনায় কেবল বিশুদ্ধ সূত্রগুলির উপর নির্ভর করেছেন এবং যাবতীয় ইস্রাঈলী বর্ণনা ও সমাজে প্রচলিত নানা উপকথা ও ভিত্তিহীন কেচ্ছা-কাহিনী থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত থাকার চেষ্টা করেছেন। তাঁর সবচেয়ে মূল্যবান সংযোজন হ'ল আম্বিয়ায়ে কেরামের জীবনী থেকে বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপটে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ পাঠকের সামনে তুলে ধরা। মার্চ'১০-য়ে ১৩ জন নবীর জীবনী নিয়ে ১ম খণ্ডের '১ম সংস্করণ' এবং অক্টোবর'১০-য়ে '২য় সংস্করণ' বের হবার পর বাকী ১১ জন নবীর জীবনী নিয়ে ২য় খণ্ড প্রকাশিত হ'ল। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জীবনী নিয়ে ৩য় খণ্ড সত্বর বের হবে ইনশাআল্লাহ।

আমরা দৃঢ় আশাবাদী যে, এর মাধ্যমে পাঠকসমাজ মানবজাতির প্রাচীন ইতিহাসের পাদপীঠে নিজেদেরকে নতুনভাবে মূল্যায়ন করতে সক্ষম হবেন এবং নবীগণের উন্নত জীবনকে উত্তম আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করার প্রেরণা লাভ করবেন।

পরিশেষে সুলিখিত এ গ্রন্থটির বিজ্ঞ রচয়িতার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সকলকে ইহকালে ও পরকালে উত্তম জাযা দান করুন- আমীন!!

-প্রকাশক

Contents

সূচীপত্র

(المحتويات)

Contents

Contents

Contents

Contents

১৪-১৫. হযরত মূসা ও হারূণ *(আলাইহিমাস সালাম)*

আল্লাহ্র গযবে ধ্বংসপ্রাপ্ত পৃথিবীর আদি ৬টি জাতির মধ্যে কওমে নূহ, ‘আদ, ছামূদ, লূত্ব ও কওমে মাদইয়ানের বর্ণনার পর ষষ্ঠ গযবপ্রাপ্ত জাতি হিসাবে কওমে ফেরাঊন সম্পর্কে আল্লাহ পাক কুরআনের ২৭টি সূরায় ৭৫টি স্থানে বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন।[১] কুরআনে সর্বাধিক আলোচিত বিষয় হ’ল এটি। যাতে ফেরাঊনের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য ও তার যুলুমের নীতি-পদ্ধতি সমূহ পাঠকদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় এবং এযুগের ফেরাঊনদের বিষয়ে উম্মতে মুহাম্মাদী হুঁশিয়ার হয়। ফেরাঊনের কাছে প্রেরিত নবী মূসা ও হারূণ (আঃ) সম্পর্কে কুরআনে সর্বাধিক আলোচনা স্থান পেয়েছে। কারণ মূসা (আঃ)-এর মু‘জেযা সমূহ অন্যান্য নবীদের তুলনায় যেমন বেশী ছিল, তাঁর সম্প্রদায় বনী ইস্রাঈলের মূর্খতা ও হঠকারিতার ঘটনাবলীও ছিল বিগত উম্মতগুলির তুলনায় অধিক এবং চমকপ্রদ। এতদ্ব্যতীত মূসা (আঃ)-কে বারবার পরীক্ষা নেবার মধ্যে এবং তাঁর কওমের দীর্ঘ কাহিনীর আলোচনা প্রসঙ্গে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় ও আদেশ-নিষেধের কথাও এসেছে। সর্বোপরি শাসক সম্রাট ফেরাঊন ও তার ক্বিবতী সম্প্রদায় কর্তৃক সংখ্যালঘু অভিবাসী বনু ইস্রাঈল সম্প্রদায়ের উপর যুলুম-অত্যাচারের বিবরণ ও তার প্রতিরোধে মূসা (আঃ)-এর প্রচেষ্টা এবং দীর্ঘ বিশ বছর ধরে যালেম সম্প্রদায়ের উপরে আপতিত বিভিন্ন গযবের বর্ণনা ও অবশেষে ফেরাঊনের সদলবলে সলিল সমাধির ঘটনা যেন জীবন্ত বাণীচিত্র হয়ে ফুটে উঠেছে বিভিন্ন সূরায় বর্ণিত কুরআনের অনুপম বাকভঙ্গীতে। মোটকথা কুরআন পাক মূসা (আঃ)-এর কাহিনীকে এত গুরুত্ব দিয়েছে যে, অধিকাংশ সূরায় এর কিছু না কিছু বর্ণিত হয়েছে। কারণ এই কাহিনীতে অগণিত শিক্ষা, আল্লাহ তা‘আলার অপার শক্তি ও অনুগ্রহের বিস্ময়কর রহস্য সমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে। এগুলোতে কর্মোদ্দীপনা ও চারিত্রিক সংশোধনের নির্দেশিকা সমূহ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান রয়েছে।

মূসা (আঃ) ও ফেরাঊনের ঘটনা কুরআনে বারবার উল্লেখ করার অন্যতম উদ্দেশ্য হ’ল, এলাহী কিতাবধারী ইহুদী-নাছারাদের পিছনের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া এবং শেষনবীর উপরে ঈমান আনার পক্ষে যৌক্তিকতা উপস্থাপন করা। উল্লেখ্য যে, পরবর্তী রাসূল দাঊদ, সুলায়মান ও ঈসা

---

১. *মুহাম্মাদ সালামাহ জাবর, তারীখুল আম্বিয়া (কুয়েত : মাকতাবা ছাহওয়াহ ১৪১৩/১৯৯৩), ১/১৩৬ পৃঃ।*

(আলাইহিমুস সালাম) সবাই ছিলেন বনু ইস্রাঈল-এর সম্প্রদায়ভুক্ত এবং তাদের প্রতি প্রেরিত নবী। মূসা *(আলাইহিস সালাম)* ছিলেন এঁদের সবার মূল ও অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব।

উল্লেখ্য যে, কওমে মূসা ও ফেরাঊন সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের মোট ৪৪টি সূরায় ৫৩২টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।[২]

ফেরাঊনের পরিচয় :

'ফেরাঊন' কোন ব্যক্তির নাম নয়। বরং এটি হ'ল তৎকালীন মিসরের সম্রাটদের উপাধি। ক্বিবতী বংশীয় এই সম্রাটগণ কয়েক শতাব্দী ব্যাপী মিসর শাসন করেন। এই সময় মিসর সভ্যতা ও সমৃদ্ধির শীর্ষে পৌঁছে গিয়েছিল। লাশ মমিকরণ, পিরামিড (PYRAMID), স্ফিংক্স (SPHINX) প্রভৃতি তাদের সময়কার বৈজ্ঞানিক উন্নতির প্রমাণ বহন করে। হযরত মূসা (আঃ)-এর সময়ে পরপর দু'জন ফেরাঊন ছিলেন। সর্বসম্মত ইস্রাঈলী বর্ণনাও হ'ল এটাই এবং মূসা (আঃ) দু'জনেরই সাক্ষাৎ লাভ করেন। লুইস গোল্ডিং (LOUIS GOLDING)-এর তথ্যানুসন্ধানমূলক ভ্রমণবৃত্তান্ত IN THE STEPS OF MOSSES, THE LAW GIVER অনুযায়ী উক্ত 'উৎপীড়ক ফেরাঊন'-এর (PHARAOH, THE PERSECUTOR) নাম ছিল 'রেমেসিস-২' (RAMSES-11) এবং ডুবে মরা ফেরাঊন ছিল তার পুত্র মানেপতাহ (منفطه) বা মারনেপতাহ (MERNEPTAH)। লোহিত সাগর সংলগ্ন তিক্ত হ্রদে তিনি সসৈন্যে ডুবে মরেন। যার 'মমি' ১৯০৭ সালে আবিষ্কৃত হয়। সিনাই

---

২. *যথাক্রমে (১) বাক্বারাহ ২/৪৯-৭৪=২৬, ৮৭, ৯২-৯৮=৭, ১০৮, ১৩৬, ২৪৬-২৪৮; (২) আলে-ইমরান ৩/১১, ৮৪; (৩) নিসা ৪/৪৭, ১৫৩-১৫৫, ১৬৪; (৪) মায়েদাহ ৫/২০-২৬=৭; (৫) আন'আম ৬/৮৪, ৯১, ১৫৪; (৬) আ'রাফ ৭/১০৩-১৬২=৬০, ১৭১, ১৭৫-১৭৬; (৭) আনফাল ৮/৫২-৫৪=৩; (৮) ইউনুস ১০/৭৫-৯০=১৬; (৯) হূদ ১১/৯৬-১০১=৬, ১১০; (১০) ইবরাহীম ১৪/৫-৮=৪; (১১) ইসরা ১৭/২, ১০১-১০৪=৪; (১২) কাহফ ১৮/৬০-৮২=২৩; (১৩) মারিয়াম ১৯/৫১-৫৩=৩; (১৪) ত্বোয়াহা ২০/৯-৯৯=৯১; (১৫) আম্বিয়া ২১/৪৮-৫০=৩; (১৬) হজ্জ ২২/৪৪; (১৭) মুমিনূন ২৩/৪৫-৪৯=৫; (১৮) ফুরক্বান ২৫/৩৫-৩৬; (১৯) শো'আরা ২৬/১০-৬৮=৫৯; (২০) নমল ২৭/৭-১৪=৮; (২১) ক্বাছাছ ২৮/৩-৪৮=৪৬, ৭৬-৮৩=৮; (২২) আনকাবূত ২৯/৩৯-৪০; (২৩) সাজদাহ ৩২/২৩-২৪; (২৪) আহযাব ৩৩/৭, ৬৯; (২৫) ছাফফাত ৩৭/১১৪-১২২=৯; (২৬) ছোয়াদ ৩৮/১২; (২৭) গাফের/মুমিন ৪০/২৩-৫৪=৩২; (২৮) ফুছছিলাত/হা-মীম সাজদাহ ৪১/৪৫; (২৯) শূরা ৪২/১৩ (৩০) যুখরুফ ৪৩/৪৬-৫৬=১১; (৩১) দুখান ৪৪/১৭-৩১=১৫; (৩২) আহক্বাফ ৪৬/১২, ৩০; (৩৩) ক্বাফ ৫০/১৩; (৩৪) নজম ৫৩/৩৬; (৩৫) ছফ ৬১/৫ (৩৬) যারিয়াত ৫১/৩৮-৪০=৩; (৩৭) ক্বামার ৫৪/৪১-৪২; (৩৮) তাহরীম ৬৬/১১; (৩৯) হা-কক্বাহ ৬৯/৯; (৪০) মুযযাম্মিল ৭৩/১৫-১৬; (৪১) নাযি'আত ৭৯/১৫-২৬=১২; (৪২) বুরূজ ৮৫/১৮; (৪৩) আ'লা ৮৭/১৯ (৪৪) ফাজর ৮৯/১০। সর্বমোট = ৫৩২টি।*

উপদ্বীপের পশ্চিম তীরে ‘জাবালে ফেরাঊন’ নামে একটি ছোট পাহাড় আছে। এখানেই ফেরাঊনের লাশ প্রথম পাওয়া যায় বলে জনশ্রুতি আছে। গোল্ডিংয়ের ভ্রমণ পুস্তক এবং এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার নিবন্ধে বলা হয়েছে যে, ‘থেব্স’ (THEBES) নামক স্থানের সমাধি মন্দিরে ১৮৯৬ সালে একটি স্তম্ভ আবিস্কৃত হয়, যাতে মারনেপতাহ-এর আমলের কীর্তি সমূহ লিপিবদ্ধ ছিল। অতঃপর ১৯০৬ সালে বৃটিশ নৃতত্ত্ববিদ স্যার ক্রাঁফো ইলিয়ট স্মিথ (SIR CRAFTON ELLIOT SMITH) মমিগুলো খুলে মমিকরণের কলাকৌশল অনুসন্ধান শুরু করেন। এভাবে তিনি ৪৪টি মমি পরীক্ষা করেন এবং অবশেষে ১৯০৭ সালে তিনি ফেরাঊন মারনেপতাহ-এর লাশ শনাক্ত করেন। ঐসময় তার লাশের উপরে লবণের একটি স্তর জমে ছিল। যা দেখে সবাই স্তম্ভিত হন। এ কারণে যে, অন্য কোন মমি দেহে অনুরূপ পাওয়া যায়নি।[৩] উক্ত লবণের স্তর যে সাগরের লবণাক্ত পানি তা বলাই বাহুল্য। এভাবে সূরা ইউনুস ৯২ আয়াতের বক্তব্য দুনিয়াবাসীর নিকটে সত্য প্রমাণিত হয়ে যায়। যেখানে আল্লাহ বলেছিলেন যে, ‘আজকে আমরা তোমার দেহকে (বিনষ্ট হওয়া থেকে) বাঁচিয়ে দিলাম। যাতে তুমি পরবর্তীদের জন্য দৃষ্টান্ত হ’তে পার’... *(ইউনুস ১০/৯২)*। বস্তুতঃ ফেরাঊনের লাশ আজও মিসরের পিরামিডে রক্ষিত আছে। যা দেখে লোকেরা উপদেশ হাছিল করতে পারে।

মূসা ও ফেরাঊন সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

نَتْلُوا عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ- إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ- (القصص ٣-٤)-

‘আমরা আপনার নিকটে মূসা ও ফেরাঊনের বৃত্তান্ত সমূহ থেকে সত্য সহকারে বর্ণনা করব বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য’। ‘নিশ্চয়ই ফেরাঊন তার দেশে উদ্ধত হয়েছিল এবং তার জনগণকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করেছিল। তাদের মধ্যকার একটি দলকে সে দুর্বল করে দিয়েছিল। সে তাদের পুত্র সন্তানদের হত্যা করত ও কন্যা সন্তানদের বাঁচিয়ে রাখত। বস্তুতঃ সে ছিল অনর্থ সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত’ *(ক্বাছাছ ২৮/৩-৪)*।

পবিত্র কুরআনে ফেরাঊনের আলোচনা যত এসেছে, পূর্ব যুগের অন্য কোন নরপতি সম্পর্কে এত বেশী আলোচনা আসেনি। এর মাধ্যমে ফেরাঊনী

---

৩. মাওলানা মওদূদী, রাসায়েল ও মাসায়েল (ঢাকা: ১৯৯৬) ৫/৯৯ পৃ:; তানত্বাভী জওহারী (মৃ: ১৯৪০খৃ:), আল-জাওয়াহের ফী তাফসীরিল কুরআনিল কারীম (বৈরুত: দারুল ফিকর, তাবি) তাফসীর সূরা ইউনুস ৯২ দ্র: ৬/৮৪ পৃ:।

যুলুমের বিভিন্ন দিক স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। যাতে ইঙ্গিত রয়েছে এ বিষয়ে যে, যুগে যুগে ফেরাঊনরা আসবে এবং ঈমানদার সৎকর্মশীলদের উপরে তাদের যুলুমের ধারা ও বৈশিষ্ট্য প্রায় একই রূপ হবে। যদিও পদ্ধতি পরিবর্তিত হবে। কোন যুগই ফেরাঊন থেকে খালি থাকবে না। তাই ফেরাঊন সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেওয়ার জন্য আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এই নরাধম সম্পর্কে এত বেশী আলোচনা করেছেন। যাতে আল্লাহ্র প্রিয় বান্দারা সাবধান হয় এবং যালেমদের ভয়ে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত না হয়। মুসলিম নামধারী বর্তমান মিসরীয় জাতীয়তাবাদী নেতারা ফেরাঊনকে তাদের 'জাতীয় বীর' বলে আখ্যায়িত করছেন এবং কায়রোর 'ময়দানে রেমেসীস'-এর প্রধান ফটকে তার বিশাল প্রস্তর মূর্তি খাড়া করেছেন'।[৪]

বনু ইস্রাঈলের পূর্ব ইতিহাস :

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর কনিষ্ঠ পুত্র হযরত ইসহাক্ব (আঃ)-এর পুত্র ইয়াকূব (আঃ)-এর অপর নাম ছিল 'ইস্রাঈল'। হিব্রু ভাষায় 'ইস্রাঈল' অর্থ 'আল্লাহ্র দাস'। সে হিসাবে ইয়াকূব (আঃ)-এর বংশধরগণকে 'বনু ইস্রাঈল' বলা হয়। কুরআনে তাদেরকে 'বনু ইস্রাঈল' বলে অভিহিত করা হয়েছে, যাতে 'আল্লাহ্র দাস' হবার কথাটি তাদের বারবার স্মরণে আসে।

ইয়াকূব (আঃ) ও বনু ইস্রাঈলদের আদি বাসস্থান ছিল কেন'আনে, যা বর্তমান ফিলিস্তীন এলাকায় অবস্থিত। তখনকার সময় ফিলিস্তীন ও সিরিয়া মিলিতভাবে শাম দেশ ছিল। বলা চলে যে, প্রথম ও শেষনবী ব্যতীত প্রায় সকল নবীর আবাসস্থল ছিল ইরাক ও শাম অঞ্চলে। যার গোটা অঞ্চলকে এখন 'মধ্যপ্রাচ্য' বলা হচ্ছে। ইয়াকূব (আঃ)-এর পুত্র হযরত ইউসুফ (আঃ) যখন মিসরের অর্থমন্ত্রী ও পরে শাসনকর্তা নিযুক্ত হন এবং অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় কেন'আন অঞ্চলেও চরম দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, তখন ইউসুফ (আঃ)-এর আমন্ত্রণে পিতা ইয়াকূব (আঃ) স্বীয় পুত্রগণ ও পরিবারবর্গ সহ হিজরত করে মিসরে চলে যান। ক্রমে তাঁরা সেখানে আধিপত্য বিস্তার করেন ও সুখে-শান্তি তে দিনাতিপাত করতে থাকেন। তারীখুল আম্বিয়া-র লেখক বলেন, ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনীতে কোথাও ফেরাঊনের নাম উল্লেখ না থাকায় প্রমাণিত হয় যে, ঐ সময় ফেরাঊনদের হটিয়ে সেখানে 'হাকসূস' (ملوك الهكسوس)

৪. *মুহাম্মাদ সালামাহ জাবর, তারীখুল আম্বিয়া (কুয়েত: মাকতাবা ছাহওয়াহ ১৪১৩/১৯৯৩) ১/১৩৭।*

Contents

রাজাদের রাজত্ব কায়েম হয়। যারা দু’শো বছর রাজত্ব করেন এবং যা ছিল ঈসা (আঃ)-এর জন্মের প্রায় দু’হাযার বছর আগের ঘটনা।[৫] অতঃপর মিসর পুনরায় ফেরাঊনদের অধিকারে ফিরে আসে। ইউসুফ (আঃ)-এর মৃত্যুর পরে তাঁর পঞ্চম অধঃস্তন পুরুষ মূসা ও হারূনের সময় যে নিপীড়ক ফেরাঊন শাসন ক্ষমতায় ছিল তার নাম ছিল রেমেসীস-২। অতঃপর তার পুত্র মারনেপতাহ-এর সময় সাগরডুবির ঘটনা ঘটে এবং সৈন্য-সামন্ত সহ তার সলিল সমাধি হয়।

‘ফেরাঊন’ ছিল মিসরের ক্বিবতী বংশীয় শাসকদের উপাধি। ক্বিবতীরা ছিল মিসরের আদি বাসিন্দা। এক্ষণে তারা সম্রাট বংশের হওয়ায় শাম থেকে আগত সুখী-স্বচ্ছল বনু ইস্রাঈলদের হিংসা করতে থাকে। ক্রমে তা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নির্যাতনের রূপ পরিগ্রহ করে।

এক বর্ণনায় এসেছে যে, ইয়াকূবের মিসরে আগমন থেকে মূসার সাথে মিসর থেকে বিদায়কালে প্রায় চারশত বছর সময়ের মধ্যে তাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল কাছাকাছি প্রায় তিন মিলিয়ন[৬] এবং এ সময় তারা ছিল মিসরের মোট জনসংখ্যার ১০ থেকে ২০ শতাংশ’।[৭] তবে এগুলি সবই ইস্রাঈলীদের কাল্পনিক হিসাব মাত্র। যার কোন ভিত্তি নেই’। বরং কুরআন বলছে إِنَّ هَؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ- (الشعراء ٥٤)- ‘নিশ্চয়ই তারা ছিল ক্ষুদ্র একটি দল’ *(শো‘আরা ২৬/৫৪)*। এই বহিরাগত নবী বংশ ও ক্ষুদ্র দলের সুনাম-সুখ্যাতিই ছিল সংখ্যায় বড় ও শাসকদল ক্বিবতীদের হিংসার কারণ। এরপর জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণী ফেরাঊনকে ভীত ও ক্ষিপ্ত করে তোলে।

মূসা (আঃ)-এর পরিচয় :

موسى بن عمران بن قاهث بن عازر بن لاوى بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم عليهم السلام-

মূসা ইবনে ইমরান বিন ক্বাহেছ বিন ‘আযের বিন লাভী বিন ইয়াকূব বিন ইসহাক্ব বিন ইবরাহীম (আঃ)।[৮] অর্থাৎ মূসা হ’লেন ইবরাহীম (আঃ)-এর ৮ম

৫. তারীখুল আম্বিয়া, পৃঃ ১২৪।
৬. তারীখুল আম্বিয়া ১/১৪০।
৭. মাওলানা মওদূদী, রাসায়েল ও মাসায়েল ৫/২৫০ পৃঃ।
৮. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/২২২।

অধঃস্তন পুরুষ। মূসা (আঃ)-এর পিতার নাম ছিল 'ইমরান' ও মাতার নাম ছিল 'ইউহানিব'। তবে মায়ের নামের ব্যাপারে মতভেদ আছে।[৯] উল্লেখ্য যে, মারিয়াম (আঃ)-এর পিতার নামও ছিল 'ইমরান'। যিনি ছিলেন হযরত ঈসা (আঃ)-এর নানা। মূসা ও ঈসা উভয় নবীই ছিলেন বনু ইস্রাঈল বংশীয় এবং উভয়ে বনু ইস্রাঈলের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন *(সাজদাহ ৩২/২৩, ছফ ৬১/৬)*। মূসার জন্ম হয় মিসরে এবং লালিত-পালিত হন মিসর সম্রাট ফেরাঊনের ঘরে। তাঁর সহোদর ভাই হারূণ (আঃ) ছিলেন তাঁর চেয়ে তিন বছরের বড় এবং তিনি মূসা (আঃ)-এর তিন বছর পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন। উভয়ের মৃত্যু হয় মিসর ও শাম-এর মধ্যবর্তী তীহ্ প্রান্তরে বনু ইস্রাঈলের ৪০ বছর আটক থাকাকালীন সময়ে। মাওলানা মওদূদী বলেন, মূসা (আঃ) পঞ্চাশ বছর বয়সে নবী হয়ে ফেরাঊনের দরবারে পৌঁছেন। অতঃপর তেইশ বছর দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের পর ফেরাঊন ডুবে মরে এবং বনু ইস্রাঈল মিসর থেকে বেরিয়ে যায়। এ সময় মূসা (আঃ)-এর বয়স ছিল সম্ভবতঃ আশি বছর।[১০] তবে মুফতী মুহাম্মাদ শফী বলেন, ফেরাঊনের জাদুকরদের সাথে মুকাবিলার ঘটনার পর ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী মূসা (আঃ) বিশ বছর যাবত মিসরে অবস্থান করেন। এ সময় আল্লাহ মূসা (আঃ)-কে নয়টি মু'জেযা দান করেন।

উল্লেখ্য যে, আদম, ইয়াহ্ইয়া ও ঈসা (আঃ) ব্যতীত প্রায় সকল নবীই চল্লিশ বছর বয়সে নবুঅত লাভ করেছিলেন। মূসাও চল্লিশ বছর বয়সে নবুঅত লাভ করেছিলেন বলে অধিকাংশ বিদ্বান মত পোষণ করেছেন।[১১] সেমতে আমরা মূসা (আঃ)-এর বয়সকে নিম্নরূপে ভাগ করতে পারি। যেমন, প্রথম ৩০ বছর মিসরে, তারপর ১০ বছর মাদিয়ানে, তারপর মিসরে ফেরার পথে তূর পাহাড়ের নিকটে 'তুবা' (طُوًى) উপত্যকায় ৪০ বছর বয়সে নবুঅত লাভ। অতঃপর ২০ বছর মিসরে অবস্থান করে সেখানকার অধিবাসীদেরকে তাওহীদের দাওয়াত প্রদান। তারপর ৬০ বছর বয়সে বনু ইস্রাঈলদের নিয়ে মিসর হ'তে প্রস্থান এবং ফেরাঊনের সলিল সমাধি। অতঃপর আদি বাসস্থান কেন'আন অধিকারী আমালেক্বাদের বিরুদ্ধে জিহাদের হুকুম অমান্য করায় অবাধ্য ইস্রাঈলীদের নিয়ে ৪০ বছর যাবত তীহ্ প্রান্তরে উন্মুক্ত কারাগারে

---

৯. তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন, ত্বোয়াহা ৩৮-৩৯, পৃঃ ৮৫১।
১০. রাসায়েল ও মাসায়েল ৩/১২০, ৩য় মুদ্রণ ২০০১।
১১. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/২২৬।

অবস্থান ও বায়তুল মুক্বাদ্দাসের সন্নিকটে মৃত্যু সম্ভবতঃ ৮০ থেকে ১০০ বছর বয়সের মধ্যে। মূসা (আঃ)-এর কবর হয় বায়তুল মুক্বাদ্দাসের উপকণ্ঠে। আমাদের নবী (ছাঃ) সেখানে একটি লাল ঢিবির দিকে ইশারা করে সেস্থানেই মূসা (আঃ)-এর কবর হয়েছে বলে জানিয়েছেন।[১২] উল্লেখ্য যে, আদম (আঃ) থেকে ইবরাহীম (আঃ) পর্যন্ত ১০/১২ জন নবী বাদে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত পৃথিবীতে আগত সর্বমোট এক লক্ষ চব্বিশ হাযার নবী-রাসূলের[১৩] প্রায় সবাই ইস্রাঈল বংশের ছিলেন এবং তাঁরা ছিলেন সেমেটিক। কেননা ইব্রাহীম (আঃ) ছিলেন সাম বিন নূহ-এর ৯ম অধঃস্তন পুরুষ। এজন্য ইবরাহীমকে ‘আবুল আম্বিয়া’ বা নবীদের পিতা বলা হয়।

মূসা ও ফেরাঊনের কাহিনী :

সুদ্দী ও মুররাহ প্রমুখ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস ও আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘ঊদ (রাঃ) এবং বহু সংখ্যক ছাহাবী থেকে বর্ণনা করেন যে, ফেরাঊন একদা স্বপ্নে দেখেন যে, বায়তুল মুক্বাদ্দাসের দিক হ’তে একটি আগুন এসে মিসরের ঘর-বাড়ি ও মূল অধিবাসী ক্বিবতীদের জ্বালিয়ে দিচ্ছে। অথচ অভিবাসী বনু ইস্রাঈলদের কিছুই হচ্ছে না। ভীত-চকিত অবস্থায় তিনি ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। অতঃপর দেশের বড় বড় জ্যোতিষী ও জাদুকরদের সমবেত করলেন এবং তাদের সম্মুখে স্বপ্নের বৃত্তান্ত বর্ণনা দিলেন ও এর ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। জ্যোতিষীগণ বলল যে, অতি সত্বর বনু ইস্রাঈলের মধ্যে একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে। যার হাতে মিসরীয়দের ধ্বংস নেমে আসবে’।[১৪]

মিসর সম্রাট ফেরাঊন জ্যোতিষীদের মাধ্যমে যখন জানতে পারলেন যে, অতি সত্বর ইস্রাঈল বংশে এমন একটা পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, যে তার সাম্রাজ্যের পতন ঘটাবে। তখন উক্ত সন্তানের জন্ম রোধের কৌশল হিসাবে ফেরাঊন বনু ইস্রাঈলদের ঘরে নবজাত সকল পুত্র সন্তানকে ব্যাপকহারে হত্যার নির্দেশ দিল। উদ্দেশ্য ছিল, এভাবে হত্যা করতে থাকলে এক সময় বনু ইস্রাঈল কওম যুবক শূন্য হয়ে যাবে। বৃদ্ধরাও মারা যাবে। মহিলারা সব

---

১২. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৭১৩ ‘ক্বিয়ামতের অবস্থা ও সৃষ্টির সূচনা’ অধ্যায় ৯ অনুচ্ছেদ।

১৩. আহমাদ, মিশকাত হা/৫৭৩৭ ‘ক্বিয়ামতের অবস্থা ও সৃষ্টির সূচনা’ অধ্যায় ৯ অনুচ্ছেদ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬৬৮।

১৪. কুরতুবী, ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/২২২ পৃঃ।

Contents

দাসীবৃত্তিতে বাধ্য হবে। অথচ বনু ইস্রাঈলগণ ছিল মিসরের শাসক শ্রেণী এবং উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন জাতি। এই দূরদর্শী কপট পরিকল্পনা নিয়ে ফেরাঊন ও তার মন্ত্রীগণ সারা দেশে একদল ধাত্রী মহিলা ও ছুরিধারী জাল্লাদ নিয়োগ করে। মহিলারা বাড়ী বাড়ী গিয়ে বনু ইস্রাঈলের গর্ভবতী মহিলাদের তালিকা করত এবং প্রসবের দিন হাযির হয়ে দেখত, ছেলে না মেয়ে। ছেলে হ'লে পুরুষ জাল্লাদকে খবর দিত। সে এসে ছুরি দিয়ে মায়ের সামনে সন্তানকে যবহ করে ফেলে রেখে চলে যেত।[১৫] এভাবে বনু ইস্রাঈলের ঘরে ঘরে কান্নার রোল পড়ে গেল। ইবনু কাছীর বলেন, একাধিক মুফাসসির বলেছেন যে, শাসকদল ক্বিবতীরা ফেরাঊনের কাছে গিয়ে অভিযোগ করল যে, এভাবে পুত্র সন্তান হত্যা করায় বনু ইস্রাঈলের কর্মজীবী ও শ্রমিক শ্রেণীর ঘাটতি হচ্ছে। যাতে তাদের কর্মী সংকট দেখা দিয়েছে। তখন ফেরাঊন এক বছর অন্তর অন্তর পুত্র হত্যার নির্দেশ দেয়। এতে বাদ পড়া বছরে হারূণের জন্ম হয়। কিন্তু হত্যার বছরে মূসার জন্ম হয়।[১৬] ফলে পিতা-মাতা তাদের নবজাত সন্তানের নিশ্চিত হত্যার আশংকায় দারুণভাবে ভীত হয়ে পড়লেন। এমতাবস্থায় আল্লাহ মূসা (আঃ)-এর মায়ের অন্তরে 'ইলহাম' করেন। যেমন আল্লাহ পরবর্তীতে মূসাকে বলেন,

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى- إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى- أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي- (طه ٣٧-٣٩)-

'আমরা তোমার উপর আরো একবার অনুগ্রহ করেছিলাম'। 'যখন আমরা তোমার মাকে প্রত্যাদেশ করেছিলাম, যা প্রত্যাদেশ করা হয়'। '(এই মর্মে যে,) তোমার নবজাত সন্তানকে সিন্দুকে ভরে নদীতে ভাসিয়ে দাও'। 'অতঃপর নদী তাকে তীরে ঠেলে দেবে। অতঃপর আমার শত্রু ও তার শত্রু (ফেরাঊন) তাকে উঠিয়ে নেবে এবং আমি তোমার উপর আমার পক্ষ হ'তে বিশেষ মহব্বত নিক্ষেপ করেছিলাম এবং তা এজন্য যে, তুমি আমার চোখের সামনে প্রতিপালিত হও' *(ত্বোয়াহা ২০/৩৭-৩৯)*। বিষয়টি আল্লাহ অন্যত্র বলেন এভাবে,

---

১৫. *তাফসীর ইবনু কাছীর, ক্বাছাছ ৮, ৯।*
১৬. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/২২৩ পৃঃ।*

وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيْهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيْهِ فِي الْيَمِّ وَلاَ تَخَافِي وَلاَ تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ- (القصص ٧)-

‘আমরা মূসার মায়ের কাছে প্রত্যাদেশ করলাম এই মর্মে যে, তুমি ছেলেকে দুধ পান করাও। অতঃপর তার জীবনের ব্যাপারে যখন শংকিত হবে, তখন তাকে নদীতে নিক্ষেপ করবে। তুমি ভীত হয়ো না ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ো না। আমরা ওকে তোমার কাছেই ফিরিয়ে দেব এবং ওকে নবীদের অন্তর্ভুক্ত করব’ *(ক্বাছাছ ২৮/৭)*। মূলতঃ শেষের দু’টি ওয়াদাই তাঁর মাকে নিশ্চিন্ত ও উদ্বুদ্ধ করে। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوْسَى فَارِغاً إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِيْ بِهِ لَوْلاَ أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ- (القصص ١٠)-

‘মূসা জননীর অন্তর (কেবলি মূসার চিন্তায়) বিভোর হয়ে পড়ল। যদি আমরা তার অন্তরকে সুদৃঢ় করে না দিতাম, তাহ’লে সে মূসার (জন্য অস্থিরতার) বিষয়টি প্রকাশ করেই ফেলত। (আমরা তার অন্তরকে দৃঢ় করেছিলাম এ কারণে যে) সে যেন আল্লাহ্‌র উপরে প্রত্যয়শীলদের অন্তর্ভুক্ত থাকে’ *(ক্বাছাছ ২৮/১০)*।

মূসা নদীতে নিক্ষিপ্ত হ’লেন :

ফেরাঊনের সৈন্যদের হাতে নিহত হবার নিশ্চিত সম্ভাবনা দেখা দিলে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশ (ইলহাম) অনুযায়ী পিতা-মাতা তাদের প্রাণাধিক প্রিয় সন্তানকে সিন্দুকে ভরে বাড়ীর পাশের নীল নদীতে ভাসিয়ে দিলেন।[১৭] অতঃপর স্রোতের সাথে সাথে সিন্দুকটি এগিয়ে চলল। ওদিকে মূসার (বড়) বোন তার মায়ের হুকুমে *(ক্বাছাছ ২৮/১১)* সিন্দুকটিকে অনুসরণ করে নদীর কিনারা দিয়ে চলতে লাগল *(ত্বোয়াহা ২০/৪০)*। এক সময় তা ফেরাঊনের প্রাসাদের ঘাটে এসে ভিড়ল। ফেরাঊনের পুণ্যবতী স্ত্রী আসিয়া (آسية) বিনতে মুযাহিম ফুটফুটে সুন্দর বাচ্চাটিকে দেখে অভিভূত হয়ে পড়লেন। ফেরাঊন তাকে বনু ইস্রাঈল সন্তান ভেবে হত্যা করতে চাইল। কিন্তু সন্তানহীনা স্ত্রীর অপত্য

---

১৭. *তাফসীর ইবনু কাছীর, ক্বাছাছ ৭ আয়াত।*

স্নেহের কারণে তা সম্ভব হয়নি। অবশেষে ফেরাঊন নিজে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। কারণ আল্লাহ মূসার চেহারার মধ্যে বিশেষ একটা মায়াময় কমনীয়তা দান করেছিলেন *(ত্বোয়াহা ২০/৩৯)*। যাকে দেখলেই মায়া পড়ে যেত। ফেরাঊনের হৃদয়ের পাষাণ গলতে সেটুকুই যথেষ্ট ছিল। বস্তুতঃ এটাও ছিল আল্লাহ্র মহা পরিকল্পনারই অংশ বিশেষ। ফুটফুটে শিশুটিকে দেখে ফেরাঊনের স্ত্রী তার স্বামীকে বললেন,

وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لاَ تَقْتُلُوهُ عَسَى أَن يَّنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُوْنَ- (القصص ٩)-

'এ শিশু আমার ও তোমার নয়নমণি। একে হত্যা করো না। এ আমাদের উপকারে আসতে পারে অথবা আমরা তাকে পুত্র করে নিতে পারি'। আল্লাহ বলেন, 'অথচ তারা (আমার কৌশল) বুঝতে পারল না' *(ক্বাছাছ ২৮/৯)*। মূসা এক্ষণে ফেরাঊনের স্ত্রীর কোলে পুত্রস্নেহ পেতে শুরু করলেন। অতঃপর বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানোর জন্য রাণীর নির্দেশে বাজারে বহু ধাত্রীর কাছে নিয়ে যাওয়া হ'ল। কিন্তু মূসা কারুরই বুকে মুখ দিচ্ছেন না। আল্লাহ বলেন, وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ- (القصص ١٢)- 'আমরা পূর্ব থেকেই অন্যের দুধ খাওয়া থেকে মূসাকে বিরত রেখেছিলাম' *(ক্বাছাছ ২৮/১২)*। এমন সময় অপেক্ষারত মূসার ভগিনী বলল, 'আমি কি আপনাদেরকে এমন এক পরিবারের খবর দিব, যারা আপনাদের জন্য এ শিশু পুত্রের লালন-পালন করবে এবং তারা এর শুভাকাংখী'? *(ক্বাছাছ ২৮/১২)*। রাণীর সম্মতিক্রমে মূসাকে প্রস্তাবিত ধাত্রীগৃহে প্রেরণ করা হ'ল। মূসা খুশী মনে মায়ের দুধ গ্রহণ করলেন। অতঃপর মায়ের কাছে রাজকীয় ভাতা ও উপঢৌকনাদি প্রেরিত হ'তে থাকল।[১৮] এভাবে আল্লাহ্র অপার অনুগ্রহে মূসা তার মায়ের কোলে ফিরে এলেন। এভাবে একদিকে পুত্র হত্যার ভয়ংকর আতংক হ'তে মা-বাবা মুক্তি পেলেন ও নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া সন্তানকে পুনরায় বুকে ফিরে পেয়ে তাদের হৃদয় শীতল হ'ল। অন্যদিকে বহু মূল্যের রাজকীয় ভাতা পেয়ে সংসার যাত্রা নির্বাহের দুশ্চিন্তা হ'তে তারা মুক্ত হ'লেন। সাথে সাথে সম্রাট

---

১৮. কুরতুবী, ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ১/২২৫; ঐ, তাফসীর সূরা ত্বোয়াহা ৪০ আয়াত, নাসাঈ, 'হাদীছুল ফুতূন'।

নিয়োজিত ধাত্রী হিসাবে ও সম্রাট পরিবারের সাথে বিশেষ সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়ার ফলে তাঁদের পরিবারের সামাজিক মর্যাদাও বৃদ্ধি পেল। এভাবেই ফেরাঊনী কৌশলের উপরে আল্লাহ্র কৌশল বিজয়ী হ'ল। *ফালিল্লাহিল হাম্‌দ।*

আল্লাহ বলেন, وَمَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرْنَا مَكْراً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ- (النمل ٥٠)- ‘তারা চক্রান্ত করেছিল এবং আমরাও কৌশল করেছিলাম। কিন্তু তারা (আমাদের কৌশল) বুঝতে পারেনি’ *(নমল ২৭/৫০)*।

যৌবনে মূসা :

দুগ্ধ পানের মেয়াদ শেষে মূসা অতঃপর ফেরাঊন-পুত্র হিসাবে তার গৃহে শান-শওকতের মধ্যে বড় হ'তে থাকেন। আল্লাহ্র রহমতে ফেরাঊনের স্ত্রীর অপত্য স্নেহ ছিল তাঁর জন্য সবচেয়ে বড় দুনিয়াবী রক্ষাকবচ। এভাবে وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ- (القصص ١٤)- ‘যখন তিনি যৌবনে পদার্পণ করলেন এবং পূর্ণবয়স্ক মানুষে পরিণত হ'লেন, তখন আল্লাহ তাকে বিশেষ প্রজ্ঞা ও জ্ঞান সম্পদে ভূষিত করলেন’ *(ক্বাছাছ ২৮/১৪)*।

মূসা সমসাময়িক সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্যকভাবে উপলব্ধি করলেন। দেখলেন যে, পুরা মিসরীয় সমাজ ফেরাঊনের একচ্ছত্র রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অধীনে কঠোরভাবে শাসিত। ‘বিভক্ত কর ও শাসন কর’ এই সুপরিচিত ঘৃণ্য নীতির অনুসরণে ফেরাঊন তার দেশবাসীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করেছিল ও একটি দলকে দুর্বল করে দিয়েছিল *(ক্বাছাছ ২৮/৪)*। আর সেটি হ'ল বনু ইস্রাঈল। প্রতিদ্বন্দ্বী জন্মাবার ভয়ে সে তাদের নবজাতক পুত্র সন্তানদের হত্যা করত ও কন্যা সন্তানদের বাঁচিয়ে রাখত। এভাবে একদিকে ফেরাঊন অহংকারে স্ফীত হয়ে নিজেকে ‘সর্বোচ্চ পালনকর্তা ও সর্বাধিপতি’ ভেবে সারা দেশে অনর্থ সৃষ্টি করছিল। এমনকি সে নিজেকে ‘একমাত্র উপাস্য’ *(ক্বাছাছ ২৮/৩৮)* مَاعَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِىْ- (القصص ٣٨)- বলতেও লজ্জাবোধ করেনি। অন্যদিকে মযলূম বনু ইস্রাঈলদের হাহাকার ও দীর্ঘশ্বাসে বাতাস ভারী হয়ে উঠছিল। অবশেষে আল্লাহ মযলূমদের ডাকে সাড়া দিলেন। আল্লাহ বলেন, ‘দেশে যাদেরকে দুর্বল করা হয়েছিল, আমরা

Contents

চাইলাম তাদের উপরে অনুগ্রহ করতে, তাদেরকে নেতা করতে ও দেশের উত্তরাধিকারী করতে'। 'এবং আমরা চাইলাম তাদেরকে দেশের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করতে এবং ফেরাঊন, হামান ও তাদের সেনাবাহিনীকে তা দেখিয়ে দিতে, যা তারা সেই দুর্বল দলের তরফ থেকে আশংকা করত' *(ক্বাছাছ ২৮/৫-৬)*।

যুবক মূসা খুনী হ'লেন :

মূসার হৃদয় মযলূমদের প্রতি করুণায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। কিন্তু কি করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। ওদিকে আল্লাহ্র ইচ্ছা ছিল অন্য রকম। মূসা একদিন দুপুরের অবসরে শহরে বেড়াতে বেরিয়েছেন। এমন সময় তাঁর সামনে এক কাণ্ড ঘটে গেল। তিনি দুই ব্যক্তিকে লড়াইরত দেখতে পেলেন। যাদের একজন যালেম সম্রাটের ক্বিবতী বংশের এবং অন্যজন মযলূম বনু ইস্রাঈলের। মূসা তাদের থামাতে গিয়ে যালেম লোকটিকে একটা ঘুষি মারলেন। কি আশ্চর্য লোকটি তাতেই অক্কা পেল। মূসা দারুণভাবে অনুতপ্ত হলেন। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন,

وَدَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلَى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلاَنِ هَذَا مِنْ شِيْعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِيْ مِنْ شِيْعَتِهِ عَلَى الَّذِيْ مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ- قَالَ رَبِّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ- (القصص ١٥-١٦)-

'একদিন দুপুরে তিনি শহরে প্রবেশ করলেন, যখন অধিবাসীরা ছিল দিবানিদ্রার অবসরে। এ সময় তিনি দু'জন ব্যক্তিকে লড়াইরত দেখতে পেলেন। এদের একজন ছিল তার নিজ গোত্রের এবং অপরজন ছিল শত্রুদলের। অতঃপর তার নিজ দলের লোকটি তার শত্রুদলের লোকটির বিরুদ্ধে তার কাছে সাহায্য চাইল। তখন মূসা তাকে ঘুষি মারলেন এবং তাতেই তার মৃত্যু হয়ে গেল। মূসা বললেন, 'নিশ্চয়ই এটি শয়তানের কাজ। সে মানুষকে বিভ্রান্তকারী প্রকাশ্য শত্রু'। 'হে আমার প্রভু! আমি নিজের উপরে যুলুম করেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। অতঃপর আল্লাহ তাকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(ক্বাছাছ ২৮/১৫-১৬)*।

পরের দিন 'জনৈক ব্যক্তি ছুটে এসে মূসাকে বলল, হে মূসা! আমি তোমার শুভাকাংখী। তোমাকে পরামর্শ দিচ্ছি যে, এই মুহূর্তে তুমি এখান থেকে বের হয়ে চলে যাও। কেননা সম্রাটের পারিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র

করছে’ *(ক্বাছাছ ২৮/২০)*। এই লোকটি মূসার প্রতি আকৃষ্ট ও তাঁর গুণমুগ্ধ ছিল। একথা শুনে ভীত হয়ে মূসা সেখান থেকে বের হয়ে পড়লেন নিরুদ্দেশ যাত্রাপথে। যেমন আল্লাহ বলেন,

فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفاً يَّتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ- وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّيْ أَنْ يَّهْدِيَنِيْ سَوَاءَ السَّبِيْلِ- (القصص ٢١-٢٢)-

‘অতঃপর তিনি সেখান থেকে ভীত অবস্থায় বের হয়ে পড়লেন পথ দেখতে দেখতে এবং বললেন, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে যালেম সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা কর’। ‘এরপর যখন তিনি (পার্শ্ববর্তী রাজ্য) মাদিয়ান অভিমুখে রওয়ানা হ’লেন, তখন (দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে) বলে উঠলেন, ‘নিশ্চয়ই আমার প্রভু আমাকে সরল পথ দেখাবেন’ *(ক্বাছাছ ২৮/২১-২২)*।

আসলে আল্লাহ চাচ্ছিলেন, ফেরাঊনের রাজপ্রাসাদ থেকে মূসাকে বের করে নিতে এবং সাধারণ মানুষের জীবনাচারের সঙ্গে পরিচিত করতে। সাথে সাথে আল্লাহ তাঁকে তৎকালীন একজন শ্রেষ্ঠ নবীর গৃহে লালিত-পালিত করে তাওহীদের বাস্তব শিক্ষায় আগাম পরিপক্ক করে নিতে চাইলেন।

মূসার পরীক্ষা সমূহ :

অন্যান্য নবীদের পরীক্ষা হয়েছে সাধারণতঃ নবুঅত লাভের পরে। কিন্তু মূসার পরীক্ষা শুরু হয়েছে তার জন্ম লাভের পর থেকেই। বস্তুতঃ নবুঅত প্রাপ্তির পূর্বে ও পরে তাঁর জীবনে বহু পরীক্ষা হয়েছে। যেমন আল্লাহ মূসা (আঃ)-কে শুনিয়ে বলেন, وَفَتَنَّاكَ فُتُوْنًا ‘আর আমরা তোমাকে অনেক পরীক্ষায় ফেলেছি’ *(ত্বোয়াহা ২০/৪০)*।

নবুঅত লাভের পূর্বে তাঁর প্রধান পরীক্ষা ছিল তিনটি। যথাঃ (১) হত্যা থেকে বেঁচে যাওয়া (২) মাদিয়ানে হিজরত (৩) মাদিয়ান থেকে মিসর যাত্রা।

অতঃপর নবুঅত লাভের পর তাঁর পরীক্ষা হয় প্রধানতঃ চারটিঃ (১) জাদুকরদের মুকাবিলা (২) ফেরাঊনের যুলুমসমূহ মুকাবিলা (৩) সাগরডুবির পরীক্ষা (৪) বায়তুল মুক্বাদ্দাস অভিযান।

নবুঅত-পূর্ব ১ম পরীক্ষা : হত্যা থেকে বেঁচে যাওয়া

মূসার জন্ম হয়েছিল তাঁর কওমের উপরে আপতিত রাষ্ট্রীয় হত্যাযজ্ঞের ভয়ংকর বিভীষিকার মধ্যে। আল্লাহ তাঁকে অপূর্ব কৌশলের মাধ্যমে বাঁচিয়ে নেন। অতঃপর তাঁর জানী দুশমনের ঘরেই তাঁকে নিরাপদে ও সসম্মানে

লালন-পালন করালেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মা ও পরিবারকে করলেন উচ্চতর সামাজিক মর্যাদায় উন্নীত। অথচ মূসার জন্মকে ঠেকানোর জন্যই ফেরাঊন তার পশুশক্তির মাধ্যমে বনু ইস্রাঈলের শত শত শিশু পুত্রকে হত্যা করে চলছিল। এ বিষয়ে ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

২য় পরীক্ষা : মাদিয়ানে হিজরত

অতঃপর যৌবনকালে তাঁর দ্বিতীয় পরীক্ষা হ'ল- হিজরতের পরীক্ষা। মূলতঃ এটাই ছিল তাঁর জ্ঞানবুদ্ধি হবার পরে ১ম পরীক্ষা। শেষনবী সহ অন্যান্য নবীর জীবনে সাধারণতঃ নবুঅতপ্রাপ্তির পরে হিজরতের পরীক্ষা দিতে হয়েছে। কিন্তু মূসা (আঃ)-এর জীবনে নবুঅত প্রাপ্তির আগেই এই কঠিন পরীক্ষা উপস্থিত হয়। অনাকাংখিত ও আকস্মিক হত্যাকাণ্ডের আসামী হয়ে জীবনের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত্র মূসা ফেরাঊনের রাজ্যসীমা ছেড়ে কপর্দকহীন অবস্থায় পার্শ্ববর্তী রাজ্য মাদিয়ানে গিয়ে উপস্থিত হ'লেন। ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় কাতর মূসা এই ভীতিকর দীর্ঘ সফরে কিভাবে চলেছেন, কি খেয়েছেন সেসব বিষয়ে তাফসীরকারগণ বিভিন্ন চমকপ্রদ ঘটনাবলী উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কুরআন এসব বিষয়ে চুপ থেকেছে বিধায় আমরাও চুপ থাকছি। তবে রওয়ানা হবার সময় যেহেতু মূসা নিজেকে সম্পূর্ণরূপে স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহ্র উপরে সমর্পণ করেছিলেন এবং প্রত্যাশা করেছিলেন 'নিশ্চয়ই আমার পালনকর্তা আমাকে সরল পথ দেখাবেন' *(ক্বাছাছ ২৮/২২)*, অতএব তাঁকে মাদিয়ানের মত অপরিচিত রাজ্যে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া ও সসম্মানে সেখানে বসবাস করার যাবতীয় দায়িত্ব আল্লাহ নিয়েছিলেন। এর মধ্যে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে যে, সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র উপরে নিজেকে সঁপে দিলে আল্লাহ তাঁর নেককার বান্দাদের সব দায়িত্ব নিজে নিয়ে থাকেন। উল্লেখ্য যে, বর্তমান পূর্ব জর্দানের মো'আন (معان) সামুদ্রিক বন্দরের অনতিদূরেই 'মাদইয়ান' অবস্থিত।

মাদিয়ানের জীবন : বিবাহ ও সংসার পালন

মাদিয়ানে প্রবেশ করে তিনি পানির আশায় একটা কূপের দিকে গেলেন। সেখানে পানি প্রার্থী লোকদের ভিড়ের অদূরে দু'টি মেয়েকে তাদের তৃষ্ণার্ত পশুগুলি সহ অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাঁর হৃদয় উথলে উঠলো। কেউ তাদের দিকে ভ্রুক্ষেপই করছে না। মূসা নিজে মযলূম। তিনি মযলূমের ব্যথা বুঝেন। তাই কিছুক্ষণ ইতঃস্তত করে মেয়ে দু'টির দিকে এগিয়ে

গেলেন। তিনি তাদের সমস্যার কথা জিজ্ঞেস করলে তারা বলল, ‘আমরা আমাদের পশুগুলিকে পানি পান করাতে পারি না, যতক্ষণ না রাখালরা তাদের পশুগুলিকে পানি পান করিয়ে চলে যায়। অথচ আমাদের পিতা খুবই বৃদ্ধ’ (যিনি ঘরে বসে আমাদের অপেক্ষায় উদগ্রীব হয়ে আছেন)। ‘অতঃপর তাদের পশুগুলি এনে মূসা পানি পান করালেন’ (তারপর মেয়ে দু’টি পশুগুলি নিয়ে বাড়ী চলে গেল)। মূসা একটি গাছের ছায়ায় বসে আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করলেন, رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ- (القصص ٢٤)-

‘হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমার উপর যে অনুগ্রহ নাযিল করবে, আমি তার মুখাপেক্ষী’ *(ক্বাছাছ ২৮/২৪)*। হঠাৎ দেখা গেল যে ‘বালিকাদ্বয়ের একজন সলজ্জ পদক্ষেপে তাঁর দিকে আসছে’। মেয়েটি এসে ধীর কণ্ঠে তাকে বলল, ‘আমার পিতা আপনাকে ডেকেছেন, যাতে আপনি যে আমাদেরকে পানি পান করিয়েছেন, তার বিনিময় স্বরূপ আপনাকে পুরস্কার দিতে পারেন’ *(ক্বাছাছ ২৮/২৩-২৫)*।

উল্লেখ্য যে, বালিকাদ্বয়ের পিতা ছিলেন মাদইয়ান বাসীদের নিকটে প্রেরিত বিখ্যাত নবী হযরত শু‘আয়েব (আঃ)। মূসা ইতিপূর্বে কখনো তাঁর নাম শোনেননি বা তাঁকে চিনতেন না। তাঁর কাছে পৌঁছে মূসা তাঁর বৃত্তান্ত সব বর্ণনা করলেন। শু‘আয়েব (আঃ) সবকিছু শুনে বললেন, لاَتَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ، ‘ভয় করো না। তুমি যালেম সম্প্রদায়ের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছ’। ‘এমন সময় বালিকাদ্বয়ের একজন বলল, আব্বা! এঁকে বাড়ীতে কর্মচারী হিসাবে রেখে দিন। কেননা إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ আপনার কর্ম সহায়ক হিসাবে সেই-ই উত্তম হবে, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত’ *(ক্বাছাছ ২৮/২৬)*। ‘তখন তিনি মূসাকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিবাহ দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার বাড়ীতে কর্মচারী থাকবে। তবে যদি দশ বছর পূর্ণ করো, সেটা তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ চাহেন তো তুমি আমাকে সদাচারী হিসাবে পাবে’। ‘মূসা বলল, আমার ও আপনার মধ্যে এই চুক্তি স্থির হ’ল। দু’টি মেয়াদের মধ্য থেকে যেকোন একটি পূর্ণ করলে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকবে না। আমরা যা বলছি, আল্লাহ তার উপরে তত্ত্বাবধায়ক’ *(ক্বাছাছ ২৮/২৫-২৮)*। মূলতঃ এটাই ছিল তাদের বিয়ের

মোহরানা। সেযুগে এ ধরনের রেওয়াজ অনেকের মধ্যে চালু ছিল। যেমন ইতিপূর্বে ইয়াকূব (আঃ) তাঁর স্ত্রীর মোহরানা বাবদ সাত বছর শ্বশুর বাড়ীতে মেষ চরিয়েছেন। এভাবে অচেনা-অজানা দেশে এসে মূসা (আঃ) অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান এবং অন্যান্য নিরাপত্তাসহ অত্যন্ত মর্যাদাবান ও নির্ভরযোগ্য একজন অভিভাবক পেয়ে গেলেন। সেই সঙ্গে পেলেন জীবন সাথী একজন পতি-পরায়ণা বুদ্ধিমতী স্ত্রী। অতঃপর সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে মূসার দিনগুলি অতিবাহিত হ'তে থাকলো। সময় গড়িয়ে এক সময় মেয়াদ পূর্ণ হ'য়ে গেল। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, তিনি চাকুরীর বাধ্যতামূলক আট বছর এবং ঐচ্ছিক দু'বছর মেয়াদ পূর্ণ করেছিলেন। কেননা এটাই নবী চরিত্রের জন্য শোভনীয় যে, কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ঐচ্ছিক দু'বছরও তিনি পূর্ণ করবেন'।[১৯]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন,

أفرسُ الناس ثلاثةٌ: صاحبُ يوسفَ حين قال لإمرأته أكرمى مثواه عسى أن ينفعنا، وصاحبةُ موسى حين قالت يا ابت استأجره إن خير من استأجرت القویُّ الامين، وابوبكر الصديق حين استخلف عمرَ رضى الله عنه-

'সর্বাধিক দূরদর্শী ব্যক্তি ছিলেন তিনজন: ১- ইউসুফকে ক্রয়কারী মিসরের আযীয (রাজস্বমন্ত্রী), যখন তিনি তার স্ত্রীকে বলেছিলেন, 'একে সম্মানের সাথে রাখ, হয়তবা সে আমাদের কল্যাণে আসবে' ২- মূসার স্ত্রী, যখন (বিবাহের পূর্বে) তিনি স্বীয় পিতাকে বলেছিলেন, 'হে পিতা, এঁকে কর্মচারী নিয়োগ করুন। নিশ্চয়ই আপনার শ্রেষ্ঠ সহযোগী তিনিই হ'তে পারেন, যিনি শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত' এবং ৩- আবুবকর ছিদ্দীক, যখন তিনি ওমরকে তাঁর পরবর্তী খলীফা মনোনীত করেন'।[২০]

৩য় পরীক্ষা: মিসর অভিমুখে যাত্রা ও পথিমধ্যে নবুঅত লাভ

মোহরানার চুক্তির মেয়াদ শেষ। এখন যাবার পালা। পুনরায় স্বদেশে ফেরা। দুরু দুরু বক্ষ। ভীত-সন্ত্রস্ত্র মন। চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ। তবুও যেতে হবে। পিতা-মাতা, ভাই-বোন সবাই রয়েছেন মিসরে। আল্লাহ্র উপরে ভরসা করে স্ত্রী-পরিবার নিয়ে বের হ'লেন পুনরায় মিসরের পথে। শুরু হ'ল তৃতীয় পরীক্ষার পালা।

---

১৯. বুখারী হা/২৪৮৭ 'সাক্ষ্য সমূহ' অধ্যায় ২৮ অনুচ্ছেদ।

২০. মুস্তাদরাকে হাকেম ২/৩৭৬ পৃঃ হা/৩৩২০, সনদ ছহীহ; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/২২৮।

উল্লেখ্য, দশ বছরে তিনি দু’টি পুত্র সন্তান লাভ করেন এবং শ্বশুরের কাছ থেকে পান এক পাল দুম্বা। এছাড়া তাক্বওয়া ও পরহেযগারীর আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ তো তিনি লাভ করেছিলেন বিপুলভাবে।

পরিবারের কাফেলা নিয়ে মূসা রওয়ানা হ’লেন স্বদেশ অভিমুখে। পথিমধ্যে মিসর সীমান্তে অবস্থিত সিনাই পর্বতমালার তূর পাহাড়ের নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছলে হঠাৎ স্ত্রীর প্রসব বেদনা শুরু হ’ল। এখুনি প্রয়োজন আগুনের। কিন্তু কোথায় পাবেন আগুন। পাথরে পাথরে ঘষে বৃথা চেষ্টা করলেন কতক্ষণ। প্রচণ্ড শীতে ও তুষারপাতের কারণে পাথর ঘষায় কাজ হ’ল না। দিশেহারা হয়ে চারিদিকে দেখতে লাগলেন। হঠাৎ অনতিদূরে আগুনের হলকা নজরে পড়ল। আশায় বুক বাঁধলেন। স্ত্রী ও পরিবারকে বললেন, ‘তোমরা এখানে অবস্থান কর। আমি আগুন দেখেছি। সম্ভবতঃ আমি তা থেকে তোমাদের জন্য কিছু আগুন জ্বালিয়ে আনতে পারব অথবা সেখানে পৌঁছে পথের সন্ধান পাব’ *(ত্বোয়াহা ২০/১০)*। একথা দৃষ্টে মনে হয়, মূসা পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন।[২১] পথিমধ্যে শাম অঞ্চলের শাসকদের পক্ষ থেকে প্রধান সড়কে বিপদাশংকা ছিল। তাই শ্বশুরের উপদেশ মোতাবেক তিনি পরিচিত রাস্তা ছেড়ে অপরিচিত রাস্তায় চলতে গিয়ে মরুভূমির মধ্যে পথ হারিয়ে ডান দিকে চলে তূর পাহাড়ের পশ্চিম প্রান্তে পৌঁছে গেলেন। মূলতঃ এ পথ হারানোটা ছিল আল্লাহ্র মহা পরিকল্পনারই অংশ।

মূসা আশান্বিত হয়ে যতই আগুনের নিকটবর্তী হন, আগুনের হল্কা ততই পিছাতে থাকে। আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, সবুজ বৃক্ষের উপরে আগুন জ্বলছে। অথচ গাছের পাতা পুড়ছে না; বরং তার উজ্জ্বলতা আরও বেড়ে যাচ্ছে। বিস্ময়ে অভিভূত মূসা এক দৃষ্টে আগুনটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। হঠাৎ এক গুরুগম্ভীর আওয়ায কানে এলো তাঁর চার পাশ থেকে। মনে হ’ল পাহাড়ের সকল প্রান্ত থেকে একই সাথে আওয়ায আসছে। মূসা তখন তূর পাহাড়ের ডান দিকে ‘তুবা’ (طُوًى) উপত্যকায় দণ্ডায়মান। আল্লাহ বলেন,

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى- إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى- (طه ١١-١٢)-

---

২১. *ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/২৩১।*

Contents

'অতঃপর যখন তিনি আগুনের কাছে পৌঁছলেন, তখন আওয়ায এলো, হে মূসা!' 'আমিই তোমার পালনকর্তা। অতএব তুমি তোমার জুতা খুলে ফেল। তুমি পবিত্র উপত্যকা তুবায় রয়েছ' *(ত্বোয়াহা ২০/১১-১২)*। এর দ্বারা বিশেষ অবস্থায় পবিত্র স্থানে জুতা খোলার আদব প্রমাণিত হয়। যদিও পাক জুতা পায়ে দিয়ে ছালাত আদায় করা জায়েয।[২২] অতঃপর আল্লাহ বলেন,

وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى- إِنَّنِي أَنَا اللهُ لآ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي- إِنَّ السَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى- فَلاَ يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لاَ يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى- (طه ١٣-١٦)-

'আর আমি তোমাকে মনোনীত করেছি। অতএব তোমাকে যা প্রত্যাদেশ করা হচ্ছে তা মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাক'। 'নিশ্চয় আমিই আল্লাহ। আমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরণে ছালাত কায়েম কর'। 'ক্বিয়ামত অবশ্যই আসবে, আমি তা গোপন রাখতে চাই; যাতে প্রত্যেকে তার কর্মানুযায়ী ফল লাভ করতে পারে'। 'সুতরাং যে ব্যক্তি ক্বিয়ামতে বিশ্বাস রাখে না এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, সে যেন তোমাকে (ক্বিয়ামত বিষয়ে সতর্ক থাকা হ'তে) নিবৃত্ত না করে। তাহ'লে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে' *(ত্বোয়াহা ২০/১৩-১৬)*।

এ পর্যন্ত আক্বীদা ও ইবাদতগত বিষয়ে নির্দেশ দানের পর এবার কর্মগত নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলছেন,

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى- قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى- قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى- فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى- قَالَ خُذْهَا وَلاَ تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى- (طه ١٧-٢١)-

'হে মূসা! তোমার ডান হাতে ওটা কি?' 'মূসা বললেন, এটা আমার লাঠি। এর উপরে আমি ভর দেই এবং এর দ্বারা আমার ছাগপালের জন্য গাছের পাতা ঝেড়ে নামাই। তাছাড়া এর দ্বারা আমার অন্যান্য কাজও চলে'। 'আল্লাহ বললেন, হে মূসা! তুমি ওটা ফেলে দাও'। 'অতঃপর তিনি ওটা (মাটিতে)

---

২২. *আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৭৬৬, 'ছালাত' অধ্যায় 'সতর' অনুচ্ছেদ-৮।*

ফেলে দিতেই তা সাপ হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল’। ‘আল্লাহ বললেন, তুমি ওটাকে ধর, ভয় করো না, আমি এখুনি ওকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেব’ *(ত্বোয়াহা ২০/১৭-২১)*।

এটি ছিল মূসাকে দেওয়া ১ম মু‘জেযা। কেননা মিসর ছিল ঐসময় জাদুবিদ্যায় শীর্ষস্থানে অবস্থানকারী দেশ। সেখানকার শ্রেষ্ঠ জাদুকরদের হারিয়ে দেওয়ার মাধ্যমেই নবুঅতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা আবশ্যক ছিল। সেজন্যই আল্লাহ মূসাকে সবদিক দিয়ে প্রস্তুত করে দিচ্ছিলেন। এর ফলে মূসা নিজের মধ্যে অনেকটা শক্তি ও স্বস্তি লাভ করলেন।

১ম মু‘জেযা প্রদানের পর আল্লাহ তাকে দ্বিতীয় মু‘জেযা প্রদানের উদ্দেশ্যে বললেন,

وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى- لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى- (طه ٢٢-٢٣)-

‘তোমার হাত বগলে রাখ। তারপর দেখবে তা বের হয়ে আসবে উজ্জ্বল ও নির্মল আলো হয়ে, অন্য একটি নিদর্শন রূপে’। ‘এটা এজন্য যে, আমরা তোমাকে আমাদের বিরাট নিদর্শনাবলীর কিছু অংশ দেখাতে চাই’ *(ত্বোয়াহা ২০/২২-২৩)*।

নয়টি নিদর্শন:

আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ- (إسراء ١٠١)- ‘আমরা মূসাকে নয়টি নিদর্শন প্রদান করেছিলাম’ *(ইসরা ১৭/১০১; নামল ২৭/১২)*। এখানে ‘নিদর্শন’ অর্থ একদল বিদ্বান ‘মু‘জেযা’ নিয়েছেন। তবে ৯ সংখ্যা উল্লেখ করায় এর বেশী না হওয়াটা যরূরী নয়। বরং এর চেয়ে অনেক বেশী মু‘জেযা তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। যেমন পাথরে লাঠি মারায় ১২টি গোত্রের জন্য বারোটি ঝর্ণাধারা নির্গমন, তীহ্ প্রান্তরে মেঘের ছায়া প্রদান, মান্না-সালওয়া খাদ্য অবতরণ প্রভৃতি। তবে এ নয়টি ছিল অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সমূহের অন্তর্ভুক্ত, যা ফেরাঊনী সম্প্রদায়কে প্রদর্শন করা হয়েছিল।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) উক্ত ৯টি মু‘জেযা নিম্নরূপে গণনা করেছেন। যথা- (১) মূসা (আঃ)-এর ব্যবহৃত লাঠি, যা নিক্ষেপ করা মাত্র অজগর

সাপের ন্যায় হয়ে যেত (২) শুভ্র হাত, যা বগলের নীচ থেকে বের করতেই জ্যোতির্ময় হয়ে সার্চ লাইটের মত চমকাতে থাকত (৩) নিজের তোতলামি, যা মূসার প্রার্থনাক্রমে দূর করে দেওয়া হয় (৪) ফেরাঊনী কওমের উপর প্লাবণের গযব প্রেরণ (৫) অতঃপর পঙ্গপাল (৬) উকুন (৭) ব্যাঙ (৮) রক্ত এবং অবশেষে (৯) নদী ভাগ করে তাকে সহ বনু ইস্রাঈলকে সাগরডুবি হ'তে নাজাত দান। তবে প্রথম দু'টিই ছিল সর্বপ্রধান মু'জেযা, যা নিয়ে তিনি শুরুতে ফেরাঊনের নিকটে গিয়েছিলেন *(নমল ২৭/১০, ১২)*।

অবশ্য কুরআনে বর্ণিত আয়াত সমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথমে ফেরাঊনের সম্প্রদায়ের উপরে দুর্ভিক্ষের গযব এসেছিল। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَونَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ- (الأعراف ١٣٠)- 'আমরা পাকড়াও করেছিলাম ফেরাঊনের অনুসারীদেরকে দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে এবং ফল-ফসলাদির ক্ষয়-ক্ষতির মাধ্যমে, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে' *(আ'রাফ ৭/১৩০)*।

হাফেয ইবনু কাছীর 'তোতলামী'টা বাদ দিয়ে 'দুর্ভিক্ষ'সহ নয়টি নিদর্শন বর্ণনা করেছেন। অবশ্য ফেরাঊন সম্প্রদায়ের উপরে আরও একটি নিদর্শন এসেছিল 'প্লেগ-মহামারী' *(আ'রাফ ৭/১৩৪)*। যাতে তাদের ৭০ হাযার লোক মারা গিয়েছিল এবং পরে মূসা (আঃ)-এর দো'আর বরকতে মহামারী উঠে গিয়েছিল। এটাকে গণনায় ধরলে সর্বমোট নিদর্শন ১১টি হয়। তবে 'নয়' কথাটি ঠিক রাখতে গিয়ে কেউ তোতলামি ও প্লেগ বাদ দিয়েছেন। কেউ দুর্ভিক্ষ ও প্লেগ বাদ দিয়েছেন। মূলতঃ সবটাই ছিল মূসা (আঃ)-এর নবুঅতের অকাট্ট দলীল ও গুরুত্বপূর্ণ মু'জেযা, যা মিসরে ফেরাঊনী সম্প্রদায়ের উপরে প্রদর্শিত হয়েছিল। এগুলি সবই হয়েছিল মিসরে। অতএব আমরা সেখানে পৌঁছে এসবের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করব ইনশাআল্লাহ।

সিনাই হ'তে মিসর

প্রসব বেদনায় কাতর স্ত্রীর জন্য আগুন আনতে গিয়ে মূসা এমন এক নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হ'লেন, যা রীতিমত ভীতিকর, শিহরণমূলক ও অভূতপূর্ব। তিনি স্ত্রীর জন্য আগুন নিয়ে যেতে পেরেছিলেন কি-না বা পরিবারের সেবায় তিনি পরে কি কি ব্যবস্থা নিলেন- এসব বিষয়ে কুরআন

চুপ রয়েছে। কুরআনের গৃহীত বাকরীতি অনুযায়ী এ সবের বর্ণনা কোন যরূরী বিষয় নয়। কেননা এগুলি সাধারণ মানবিক তাকীদ, যা যেকোন স্বামীই তার স্ত্রী ও পরিবারের জন্য করে থাকে। অতএব এখন আমরা সামনের দিকে আগাব।

আল্লাহ পাক মূসাকে নবুঅত ও প্রধান দু’টি মু‘জেযা দানের পর নির্দেশ দিলেন,

إِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى- قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ- وَيَسِّرْ لِيْ أَمْرِي- وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِيْ- يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ- وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْراً مِّنْ أَهْلِيْ- هَارُوْنَ أَخِي- اشْدُدْ بِهِ أَزْرِيْ- وَأَشْرِكْهُ فِيْ أَمْرِيْ- كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيراً- وَّنَذْكُرَكَ كَثِيْراً- إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْراً- (طه ٢٤-٣٥)-

হে মূসা! ‘তুমি ফেরাঊনের কাছে যাও। সে উদ্ধত হয়ে গেছে’। ভীত সন্ত্রস্ত মূসা বলল, ‘হে আমার পালনকর্তা! আমার বক্ষ উন্মোচন করে দিন’ ‘এবং আমার কাজ সহজ করে দিন’। ‘আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দূর করে দিন’ ‘যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে’ ‘এবং আমার পরিবারের মধ্য থেকে একজনকে আমার সাহায্যকারী নিযুক্ত করে দিন’। ‘আমার ভাই হারূণকে দিন’। ‘তার মাধ্যমে আমার কোমর শক্ত করুন’ ‘এবং তাকে (নবী করে) আমার কাজে অংশীদার করুন’। ‘যাতে আমরা বেশী বেশী করে আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করতে পারি’ ‘এবং অধিক পরিমাণে আপনাকে স্মরণ করতে পারি’। ‘আপনি তো আমাদের অবস্থা সবই দেখছেন’ *(ত্বোয়াহা ২০/২৪-৩৫)*।

মূসার উপরোক্ত দীর্ঘ প্রার্থনার জবাবে আল্লাহ বললেন, قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى- (طه ٣٦-٣٧)- ‘হে মূসা! তুমি যা যা চেয়েছ, সবই তোমাকে দেওয়া হ’ল’। শুধু এবার কেন, ‘আমি তোমার উপরে আরও একবার অনুগ্রহ করেছিলাম’ *(ত্বোয়াহা ২০/৩৬-৩৭)*। বলেই আল্লাহ মূসাকে তার জন্মের পর নদীতে ভাসিয়ে দেওয়ার ও ফেরাঊনের ঘরে লালন-পালনের চমকপ্রদ কাহিনী শুনিয়ে দিলেন।

আল্লাহ্র খেলা বুঝা ভার। হত্যার টার্গেট হয়ে জন্মলাভ করে হত্যার ঘোষণা দানকারী সম্রাট ফেরাঊনের গৃহে পুত্রস্নেহে লালিত-পালিত হয়ে পরে যৌবনকালে পুনরায় হত্যাকাণ্ডের আসামী হয়ে প্রাণভয়ে ভীত ও কপর্দকশূন্য অবস্থায় স্বদেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি জমালেন। অতঃপর সেখানে দীর্ঘ দশ বছর মেষপালকের চাকুরী করে স্ত্রী-পরিবার নিয়ে স্বদেশ ফেরার পথে রাহযানির ভয়ে মূল রাস্তা ছেড়ে অপরিচিত রাস্তায় এসে কনকনে শীতের মধ্যে অন্ধকার রাতে প্রসব বেদনায় কাতর স্ত্রীকে নিয়ে মহা বিপদগ্রস্ত স্বামী যখন অদূরে আলোর ঝলকানি দেখে আশায় বুক বেঁধে সেদিকে ছুটেছেন। তখন তিনি জানতেন না যে, সেখানে তার জন্য অপেক্ষা করছে এমন এক মহা সুসংবাদ যা দুনিয়ার কোন মানুষ ইতিপূর্বে দেখেনি, শোনেনি, কল্পনাও করেনি। বিশ্ব চরাচরের পালনকর্তা আল্লাহ স্বয়ং স্বকণ্ঠে, স্বশব্দে ও স্ব-ভাষায় তাকে ডেকে কথা বলবেন, এও কি সম্ভব? শংকিত, শিহরিত, পুলকিত মূসা সবকিছু ভুলে পুরা দেহ-মন দিয়ে শুনছেন স্বীয় প্রভুর দৈববাণী। দেখলেন তাঁর নূরের তাজাল্লী। চাইলেন প্রাণভরে যা চাওয়ার ছিল। পেলেন সাথে সাথে পরিপূর্ণভাবে। এতে বুঝা যায়, পারিবারিক সমস্যা ও রাস্তাঘাটের সমস্যা সবই আল্লাহ্র মেহেরবানীতে সুন্দরভাবে সমাধান হয়ে গিয়েছিল যা কুরআনে উল্লেখের প্রয়োজন পড়েনি।

ওদিকে মূসার প্রার্থনা কবুলের সাথে সাথে আল্লাহ হারূণকে মিসরে অহীর মাধ্যমে নবুঅত প্রদান করলেন *(মারিয়াম ১৯/৫৩)* এবং তাকে মূসার আগমন বার্তা জানিয়ে দিলেন। সেই সঙ্গে মূসাকে সার্বিক সহযোগিতা করার এবং তাকে মিসরের বাইরে এসে অভ্যর্থনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়। তিনি বনু ইস্রাঈলের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে এগিয়ে এসে যথাযথভাবে সে নির্দেশ পালন করেন।[২৩]

মূসার পাঁচটি দো‘আ : নবুঅতের গুরু দায়িত্ব লাভের পর মূসা (আঃ) এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে তা বহনের ক্ষমতা অর্জনের জন্য আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইতিপূর্বে বর্ণিত দীর্ঘ প্রার্থনা সংক্ষেপে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হ’ল, যা নিম্নরূপঃ

---

২৩. *কুরতুবী, তাফসীরে ইবনু কাছীর ‘হাদীছুল ফুতূন’; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/২৩৭।*

প্রথম দো‘আ : رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِى ‘হে আমার পালনকর্তা! আমার বক্ষ উন্মোচন করে দিন’। অর্থাৎ নবুঅতের বিশাল দায়িত্ব বহনের উপযুক্ত জ্ঞান ও দূরদর্শিতার উপযোগী করে দিন এবং আমার হৃদয়কে এমন প্রশস্ত করে দিন, যাতে উম্মতের পক্ষ থেকে ভবিষ্যতে প্রাপ্ত অপবাদ ও দুঃখ-কষ্ট বহনে তা সক্ষম হয়।

দ্বিতীয় দো‘আ : وَيَسِّرْلِىْ اَمْرِىْ ‘আমার কর্ম সহজ করে দিন’। অর্থাৎ নবুঅতের কঠিন দায়িত্ব বহনের কাজ আমার জন্য সহজ করে দিন। কেননা আল্লাহ্র অনুগ্রহ ব্যতীত কারু পক্ষেই কোন কাজ সহজ ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। স্বীয় অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে মূসা (আঃ) বুঝতে পেরেছিলেন যে, ফেরাঊনের মত একজন দুর্ধর্ষ, যালেম ও রক্ত পিপাসু সম্রাটের নিকটে গিয়ে দ্বীনের দাওয়াত পেশ করা মোটেই সহজসাধ্য ব্যাপার নয়, আল্লাহ্র একান্ত সাহায্য ব্যতীত।

তৃতীয় দো‘আ : وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِىْ يَفْقَهُوْا قَوْلِىْ ‘আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন, যাতে লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে’। কেননা রেসালাত ও দাওয়াতের জন্য রাসূল ও দাঈকে স্পষ্টভাষী ও বিশুদ্ধভাষী হওয়া একান্ত আবশ্যক। মূসা (আঃ) নিজের এ ক্রটি দূর করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ্র নিকটে বিশেষভাবে প্রার্থনা করেন। পরবর্তী আয়াতে যেহেতু তাঁর সকল প্রার্থনা কবুলের কথা বলা হয়েছে’ *(ত্বোয়াহা ২০/৩৬)*, সেহেতু এ প্রার্থনাটিও যে কবুল হয়েছিল এবং তাঁর তোতলামি দূর হয়ে গিয়েছিল, সেকথা বলা যায়।

এ বিষয়ে বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে বিভিন্ন চমকপ্রদ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। যেমন শৈশবে তিনি মুখে আগুন পুরেছিলেন বলে তাঁর জিভ পুড়ে গিয়েছিল। কেননা ফেরাঊনের দাড়ি ধরে চপেটাঘাত করার জন্য মূসাকে ফেরাঊন হত্যা করতে চেয়েছিল। তাকে বাঁচানোর জন্য ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়ার উপস্থিত বুদ্ধির জোরে তিনি বেঁচে যান। সেটি ছিল এই যে, তাকে অবোধ শিশু প্রমাণ করার জন্য ফেরাঊনের স্ত্রী দু’টি পাত্র এনে মূসার সামনে রাখেন। মূসা তখন জিবরাঈলের সাহায্যে মণিমুক্তার পাত্রে হাত না দিয়ে আগুনের পাত্রে হাত দিয়ে একটা স্ফূলিঙ্গ তুলে নিজের গালে পুরে নেন। এতে তার জিভ পুড়ে যায় ও তিনি তোৎলা হয়ে যান। ওদিকে ফেরাঊনও বুঝে নেন যে মূসা নিতান্তই

অবোধ। সেকারণ তাকে ক্ষমা করে দেন। যদিও এসব কাহিনী কুরতুবী, মাযহারী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, তবুও এগুলোর কোন বিশুদ্ধ ভিত্তি নেই। তাই তোৎলামির বিষয়টি স্বাভাবিক ত্রুটি ধরে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত।

উল্লেখ্য যে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক নাসাঈতে বর্ণিত 'হাদীছুল ফুতূনে' কেবল আগুনের পাত্রে হাত দেওয়ার কথা রয়েছে। কিন্তু আগুন মুখে দেওয়ার কথা নেই। এর ফলে তিনি ফেরাঊনের হাতে নিহত হওয়া থেকে বেঁচে যান। এ জন্য এ ঘটনাকে উক্ত হাদীছে ৩নং ফিৎনা বা পরীক্ষা হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।[২৪]

চতুর্থ দো'আ : وَاجْعَلْ لِّىْ وَزِيْرًا مِّنْ أَهْلِى، هَارُوْنَ أَخِىْ 'আমার পরিবার থেকে আমার জন্য একজন উযীর নিয়োগ করুন'। 'আমার ভাই হারূণকে'। পূর্বের তিনটি দো'আ ছিল তাঁর নিজ সত্তা সম্পর্কিত। অতঃপর চতুর্থ দো'আটি ছিল রেসালাতের দায়িত্ব পালন সম্পর্কিত। 'উযীর' অর্থ বোঝা বহনকারী। মূসা (আঃ) স্বীয় নবুঅতের বোঝা বহনে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান উপায় হিসাবে একজন যোগ্য ও বিশ্বস্ত সহযোগী প্রার্থনা করে দায়িত্ব পালনে স্বীয় আন্তরিকতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন এবং নির্দিষ্টভাবে নিজের বড় ভাই হারূণের নাম করে অশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। কারণ ভাই হারূণ আজন্ম মিসরেই অবস্থান করার কারণে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল অনেক বেশী। অধিকন্তু তার উপরে ফেরাঊনের কোন ক্রোধ বা ক্ষোভ ছিল না। সর্বোপরি তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত বিশুদ্ধভাষী ব্যক্তি, দ্বীনের দাওয়াত প্রদানের জন্য যা ছিল সবচাইতে যরূরী।

পঞ্চম দো'আ : وَأَشْرِكْهُ فِىْ أَمْرِىْ 'এবং তাকে আমার কাজে শরীক করে দিন'। অর্থাৎ তাকে আমার নবুঅতের কাজে শরীক করে দিন। 'যাতে আমরা বেশী বেশী আপনার যিকর ও পবিত্রতা বর্ণনা করতে পারি' *(ত্বোয়াহা ২০/৩৩-৩৪)*। এটা অনস্বীকার্য যে, আল্লাহ্র দ্বীনের প্রচার ও প্রসারে এবং আল্লাহ্র যিকরে মশগুল থাকার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ যরূরী। একারণেই তিনি সৎ ও নির্ভরযোগ্য সাথী ও সহযোগী হিসাবে বড় ভাই হারূণকে নবুঅতে শরীক

২৪. তাফসীরে ইবনে কাছীর, ত্বোয়াহা ২০/৪০।

করার জন্য আল্লাহ্‌র নিকটে দো‘আ করেন। তাছাড়া তিনি একটি আশংকার কথা উল্লেখ করে বলেন, ‘হে আমার পালনকর্তা, আমি তাদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলাম। তাই আমি ভয় করছি যে, তারা আমাকে হত্যা করবে’। ‘আমার ভাই হারূণ, সে আমার অপেক্ষা প্রাঞ্জলভাষী। অতএব তাকে আমার সাথে সাহায্যের জন্য প্রেরণ করুন। সে আমাকে সমর্থন যোগাবে। আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে’ *(ক্বাছাছ ২৮/৩৩-৩৪)*।

উক্ত পাঁচটি দো‘আ শেষ হবার পর সেগুলি কবুল হওয়ার সুসংবাদ দিয়ে আল্লাহ বলেন, قَدْ أُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يَا مُوْسَى ‘হে মূসা! তুমি যা যা চেয়েছ, সবই তোমাকে প্রদান করা হ’ল’ *(ত্বোয়াহা ২০/৩৬)*। এমনকি মূসার সাহস বৃদ্ধির জন্য سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيْكَ ‘আমরা তোমার ভাইয়ের মাধ্যমে তোমার বাহুকে সবল করব এবং তোমাদের দু’জনকে আধিপত্য দান করব। ফলে শত্রুরা তোমাদের কাছেই ঘেঁষতে পারবে না। তাছাড়া আমার নিদর্শনাবলীর জোরে তোমরা (দু’ভাই) এবং তোমাদের অনুসারীরা (শত্রুপক্ষের উপরে) বিজয়ী থাকবে’ *(ক্বাছাছ ২৮/৩৫)*।

মূসা হ’লেন কালীমুল্লাহ :

তুবা প্রান্তরের উক্ত ঘটনা থেকে মূসা কেবল নবী হ’লেন না। বরং তিনি হ’লেন ‘কালীমুল্লাহ’ বা আল্লাহ্‌র সাথে বাক্যালাপকারী। যদিও শেষনবী (ছাঃ) মে‘রাজে আল্লাহ্‌র সঙ্গে কথা বলেছেন। কিন্তু দুনিয়াতে এভাবে বাক্যালাপের সৌভাগ্য কেবলমাত্র হযরত মূসা (আঃ)-এর হয়েছিল। আল্লাহ বিভিন্ন নবীকে বিভিন্ন বিষয়ে বিশিষ্টতা দান করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন, ‘হে মূসা! আমি আমার বার্তা পাঠানোর মাধ্যমে এবং আমার বাক্যালাপের মাধ্যমে তোমাকে লোকদের উপরে বিশিষ্টতা দান করেছি। অতএব আমি তোমাকে যা কিছু দান করলাম, তা গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞ থাক’ *(আ‘রাফ ৭/১৪৪)*। এভাবে আল্লাহ পাক মূসা (আঃ)-এর সাথে আরেকবার কথা বলেন, সাগর ডুবি থেকে নাজাত পাবার পরে শামে এসে একই স্থানে ‘তওরাত’ প্রদানের সময় *(আ‘রাফ ৭/১৩৮, ১৪৫)*। এভাবে মূসা হ’লেন ‘কালীমুল্লাহ’।

মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র সাথে সরাসরি বাক্যালাপের পর উৎসাহিত ও পুলকিত মূসা এখানে তূর পাহাড়ের পাদদেশ এলাকায় কিছু দিন বিশ্রাম

Contents

করলেন। অতঃপর মিসর অভিমুখে রওয়ানা হ'লেন। সিনাই থেকে অনতিদূরে মিসর সীমান্তে পৌঁছে গেলে যথারীতি বড় ভাই হারূণ ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন এসে তাঁদেরকে সাদর অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*।

মূসা (আঃ)-এর মিসরে প্রত্যাবর্তন :

ফেরাঊন ও তার পারিষদবর্গের বিরুদ্ধে অলৌকিক লাঠি ও আলোকিত হস্ত তালুর দু'টি নিদর্শন নিয়ে মূসা (আঃ) মিসরে পৌঁছলেন *(ক্বাছাছ ২৮/৩২)*। ফেরাঊন ও তার সভাসদ বর্গকে আল্লাহ (أَئِمَّةً يَّدْعُوْنَ إِلَى النَّارِ) 'জাহান্নামের দিকে আহ্বানকারী নেতৃবৃন্দ' *(ক্বাছাছ ২৮/৪১)* হিসাবে এবং তাদের সম্প্রদায়কে 'ফাসেক' বা পাপাচারী *(ক্বাছাছ ২৮/৩২)* বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ পাক মূসাকে বললেন 'তুমি ও তোমার ভাই আমার নিদর্শনবলীসহ যাও এবং আমার স্মরণে শৈথিল্য করো না'। 'তোমরা উভয়ে ফেরাঊনের কাছে যাও। সে খুব উদ্ধত হয়ে গেছে'। 'তোমরা তার কাছে গিয়ে নম্রভাষায় কথা বলবে। তাতে হয়ত সে চিন্তা-ভাবনা করবে অথবা ভীত হবে'। 'তারা বলল, হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা আশংকা করছি যে, সে আমাদের উপরে যুলুম করবে কিংবা উত্তেজিত হয়ে উঠবে'। 'আল্লাহ বললেন, قَالَ لاَ تَخَافَا إِنَّنِيْ مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى 'তোমরা ভয় করো না। আমি তোমাদের সাথে আছি। আমি তোমাদের (সব কথা) শুনবো ও (সব অবস্থা) দেখব' *(ত্বোয়াহা ২০/৪২-৪৬)*।

ফেরাঊনের নিকটে মূসা (আঃ)-এর দাওয়াত :

আল্লাহ্র নির্দেশমত মূসা ও হারূণ ফেরাঊন ও তার সভাসদবর্গের নিকটে পৌঁছে গেলেন। অতঃপর মূসা ফেরাঊনকে বললেন,

وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ- حَقِيقٌ عَلَى أَن لاَّ أَقُوْلَ عَلَى اللهِ إِلاَّ الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيْ إِسْرَائِيلَ- (الأعراف ١٠٤-١٠٥)-

'হে ফেরাঊন! আমি বিশ্বপ্রভুর পক্ষ হ'তে প্রেরিত রাসূল'। 'আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যে সত্য এসেছে, তার ব্যতিক্রম কিছু না বলার ব্যাপারে আমি দৃঢ়চিত্ত।

আমি তোমাদের নিকটে তোমাদের পালনকর্তার নিদর্শন নিয়ে আগমন করেছি। অতএব তুমি বনু ইস্রাঈলগণকে আমার সাথে পাঠিয়ে দাও’ *(আ‘রাফ ৭/১০৪-১০৫)*। মূসার এদাবী থেকে বুঝা যায় যে, ঐ সময় বনু ইস্রাঈলের উপরে ফেরাঊনের ও তার সম্প্রদায়ের যুলুম চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল এবং তাদের সঙ্গে আপোষে বসবাসের কোন রাস্তা ছিল না। ফলে তিনি তাদেরকে সেখান থেকে বের করে আনতে চাইলেন। তবে এটা নিশ্চিত যে, মূসা তখনই বনু ইস্রাঈলকে নিয়ে বের হয়ে যাননি। এ বিষয়ে আমরা পরে বিস্তারিত বর্ণনা করব।

মূসা ফেরাঊনকে বললেন,

وَلاَ تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى- إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى- (طه ٤٧-٤٨)-

....‘তুমি বনু ইস্রাঈলদের উপরে নিপীড়ন করো না’। ‘আমরা আল্লাহ্র নিকট থেকে অহী লাভ করেছি যে, যে ব্যক্তি মিথ্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার উপরে আল্লাহ্র আযাব নেমে আসে’ *(ত্বোয়াহা ২০/৪৭-৪৮)*। একথা শুনে ফেরাঊন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, ‘মূসা! তোমার পালনকর্তা কে’? ‘মূসা বললেন, আমার পালনকর্তা তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন। অতঃপর পথ প্রদর্শন করেছেন’। ‘ফেরাঊন বলল, তাহ’লে অতীত যুগের লোকদের অবস্থা কি?’ ‘মূসা বললেন, তাদের খবর আমার প্রভুর কাছে লিখিত আছে। আমার পালনকর্তা ভ্রান্ত হন না এবং বিস্মৃতও হন না’। একথা বলার পর মূসা আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহ বর্ণনা শুরু করলেন, যাতে ফেরাঊন তার যৌক্তিকতা মেনে নিতে বাধ্য হয়। তিনি বললেন, আমার পালনকর্তা তিনি, ‘যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিছানা স্বরূপ বানিয়েছেন এবং তাতে চলার পথ সমূহ তৈরী করেছেন। তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তা দ্বারা বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেন’। ‘তোমরা তা আহার কর ও তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুসমূহ চরিয়ে থাক। নিশ্চয়ই এতে বিবেকবানদের জন্য নিদর্শন সমূহ রয়েছে’ *(ত্বোয়াহা ২০/৪৯-৫৪)*।

মূসা (আঃ)-এর দাওয়াতের সার-সংক্ষেপ :

১. বিশ্বের পালনকর্তা আল্লাহ্র দিকে আহ্বান।

২. আল্লাহ প্রেরিত সত্যই প্রকৃত সত্য। তার ব্যতিক্রম কিছু না বলা বা না করার ব্যাপারে সর্বদা দৃঢ়চিত্ত থাকার ঘোষণা প্রদান।

৩. আল্লাহ্র গযবের ভয় প্রদর্শন।

৪. আল্লাহ্র সৃষ্টিতত্ত্ব বিশ্লেষণ।

৫. পিছনের লোকদের কৃতকর্মের হিসাব আল্লাহ্র উপরে ন্যস্ত করে বর্তমান অবস্থার সংশোধনের প্রতি আহ্বান।

৬. মযলূম বনু ইস্রাঈলের মুক্তির জন্য যালেম ফেরাউনের নিকটে আবেদন।

মূসা (আঃ)-এর দাওয়াতের ফলশ্রুতি :

ফেরাউনের অহংকারী হৃদয়ে মূসার দাওয়াত ও উপদেশবাণী কোনরূপ রেখাপাত করল না। বরং সে পরিষ্কার বলে দিল,

مَا هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِيْ آبَائِنَا الْأَوَّلِيْنَ- وَقَالَ مُوسَى رَبِّيْ أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِندِهِ وَمَنْ تَكُوْنُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُوْنَ- (القصص ٣٦-٣٧)-

‘তোমার এসব অলীক জাদু মাত্র। আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদের মধ্যে এসব কথা শুনিনি’। ‘মূসা বললেন, ‘আমার পালনকর্তা সম্যক জানেন কে তার নিকট থেকে হেদায়াতের কথা নিয়ে আগমন করেছে এবং কে প্রাপ্ত হবে পরকালের গৃহ। নিশ্চয়ই যালেমরা সফলকাম হবে না’ *(ক্বাছাছ ২৮/৩৬-৩৭)*।

ফেরাউন তার সভাসদগণকে উদ্দেশ্য করে বলল, يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِيْ ‘হে পারিষদবর্গ! আমি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য আছে বলে আমি জানি না’ *(ক্বাছাছ ২৮/৩৮)*। এরপর সে মূসার প্রতিশ্রুত ‘পরকালের গৃহ’ (عَاقِبَةُ الدَّارِ) দেখার জন্য জনগণকে ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তার উযীরকে বলে উঠল,

Contents

فَأَوْقِدْ لِيْ يَا هَامَانُ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَل لِّيْ صَرْحاً لَّعَلِّيْ أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّيْ لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ- وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لاَ يُرْجَعُونَ- (القصص ٣٨-٣٩)-

‘হে হামান! তুমি ইট পোড়াও। অতঃপর আমার জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ কর, যাতে আমি মূসার উপাস্যকে উঁকি মেরে দেখতে পারি। আমার ধারণা সে একজন মিথ্যাবাদী’। একথা বলে ‘ফেরাঊন ও তার বাহিনী অন্যায়ভাবে অহংকারে ফেটে পড়ল। তারা ধারণা করল যে, তারা কখনোই আল্লাহ্র কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে না’ *(ক্বাছাছ ২৮/৩৮-৩৯; গাফির/মুমিন ২৩/৩৬-৩৭)*।

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে যে, মূসা ও হারূণ যখন ফেরাঊনের কাছে গিয়ে বললেন, ‘আমরা বিশ্বজগতের পালনকর্তার রাসূল’। ‘তুমি বনু ইস্রাঈলকে আমাদের সাথে যেতে দাও’ *(শো‘আরা ২৬/১৬-১৭)*। ফেরাঊন তখন বাঁকা পথ ধরে প্রশ্ন করে বসলো, ‘আমরা কি তোমাকে শিশু অবস্থায় আমাদের মধ্যে লালন-পালন করিনি? এবং তুমি কি আমাদের মাঝে তোমার জীবনের বহু বছর কাটাওনি? *(১৮)*। ‘আর তুমি করেছিলে (হত্যাকাণ্ডের) সেই অপরাধ, যা তুমি করেছিলে। (এরপরেও তুমি আমাকে পালনকর্তা না মেনে অন্যকে পালনকর্তা বলছ?) আসলে তুমিই হ’লে কাফির বা কৃতঘ্নদের অন্তর্ভুক্ত (وَأَنتَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ =১৯)’। জবাবে মূসা বললেন, ‘আমি সে অপরাধ তখন করেছি যখন আমি ভ্রান্ত ছিলাম’ *(২০)*। ‘অতঃপর আমি ভীত হয়ে তোমাদের কাছ থেকে পলায়ন করেছিলাম। এরপর আমার পালনকর্তা আমাকে প্রজ্ঞা দান করেছেন ও আমাকে রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত করেছেন’ *(২১)*। ‘অতঃপর আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহের কথা বলছ তা এই যে, তুমি বনু ইস্রাঈলকে গোলাম বানিয়ে রেখেছ’ *(২২)*। ফেরাঊন একথার জবাব না দিয়ে আক্বীদাগত প্রশ্ন তুলে বলল, তোমাদের কথিত ‘বিশ্বজগতের পালনকর্তা আবার কে?’*(২৩)* মূসা বললেন, ‘তিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও’*(২৪)*। এ জবাব শুনে ‘ফেরাঊন তার পারিষদবর্গকে বলল, তোমরা কি শুনছ না’?*(২৫)*। ....‘আসলে তোমাদের প্রতি প্রেরিত এ রাসূলটি একটা আস্ত পাগল (قَالَ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ

=২৭)। ...‘অতঃপর ফেরাঊন মূসাকে বলল, لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهاً غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ- (الشعراء ٢٩)- ‘যদি তুমি আমার পরিবর্তে অন্যকে উপাস্যরূপে গ্রহণ কর, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করব’*(২৯)*। মূসা বললেন, ‘আমি তোমার কাছে কোন স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে আগমন করলেও কি (তুমি আমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করবে)? *(শো‘আরা ২৬/১৮-৩০)*।

তখন ফেরাঊন তাচ্ছিল্যভরে বলল, হে মূসা! ‘যদি তুমি কোন নিদর্শন নিয়ে এসে থাক, তাহ’লে তা উপস্থিত কর, যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক’*(৩১)*। ‘মূসা তখন নিজের হাতের লাঠি মাটিতে নিক্ষেপ করলেন। ফলে তৎক্ষণাৎ তা একটা জ্বলজ্যান্ত অজগর সাপে পরিণত হয়ে গেল’*(৩২)*। ‘তারপর (বগল থেকে) নিজের হাত বের করলেন এবং তা সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের চোখে ধবধবে আলোকোজ্জ্বল দেখাতে লাগল’ *(শো‘আরা ২৬/৩১-৩৩; আ‘রাফ ৭/১০৬-১০৮)*।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত ‘হাদীছুল ফুতূনে’ বলা হয়েছে যে, বিশাল ঐ অজগর সাপটি যখন বিরাট হা করে ফেরাঊনের দিকে এগিয়ে গেল, তখন ফেরাঊন ভয়ে সিংহাসন থেকে লাফিয়ে মূসার কাছে গিয়ে আশ্রয় চাইল এবং তিনি তাকে আশ্রয় দিলেন *(ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা ত্বোয়াহা ২০/৪০)*।

উল্লেখ্য যে, মূসার প্রদর্শিত লাঠির মো‘জেযাটি ছিল অত্যাচারী সম্রাট ও তার যালেম সম্প্রদায়ের ভয় দেখানোর জন্য। এর দ্বারা তাদের যাবতীয় দুনিয়াবী শক্তিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়া হয়। অতঃপর প্রদীপ্ত হস্ততালুর দ্বিতীয় মো‘জেযাটি দেখানো হয়, এটা বুঝানোর জন্যে যে, তাঁর আনীত এলাহী বিধান মেনে চলার মধ্যেই রয়েছে অন্ধকার থেকে আলোর পথের দিশা। যাতে রয়েছে মানুষের সার্বিক জীবনে শান্তি ও কল্যাণের আলোকবর্তিকা।

মু‘জেযা ও জাদু :

মু‘জেযা অর্থ মানুষের বুদ্ধিকে অক্ষমকারী। অর্থাৎ এমন কর্ম সংঘটিত হওয়া যা মানুষের জ্ঞান ও ক্ষমতা বহির্ভূত। (১) ‘মু‘জেযা’ কেবল নবীগণের জন্য খাছ এবং ‘কারামত’ আল্লাহ তাঁর নেককার বান্দাদের মাধ্যমে কখনো কখনো প্রকাশ করে থাকেন। যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে। (২) মু‘জেযা নবীগণের মাধ্যমে সরাসরি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয়। পক্ষান্তরে জাদু কেবল

Contents

দুষ্ট জিন ও মানুষের মাধ্যমেই হয়ে থাকে এবং তা হয় অদৃশ্য প্রাকৃতিক কারণের প্রভাবে। (৩) জাদু কেবল পৃথিবীতেই ক্রিয়াশীল হয়, আসমানে নয়। কিন্তু মু'জেযা আল্লাহ্‌র হুকুমে আসমান ও যমীনে সর্বত্র ক্রিয়াশীল থাকে। যেমন শেষনবী (ছাঃ)-এর অঙ্গুলী সংকেতে আকাশের চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল। (৪) মু'জেযা মানুষের কল্যাণের জন্য হয়ে থাকে। কিন্তু জাদু স্রেফ ভেল্কিবাজি ও প্রতারণা মাত্র এবং যা মানুষের কেবল ক্ষতিই করে থাকে।

জাদুতে মানুষের সাময়িক বুদ্ধি বিভ্রম ঘটে। যা মানুষকে প্রতারিত করে। এজন্যে একে ইসলামে হারাম করা হয়েছে। মিসরীয় জাতি তথা ফেরাঊনের সম্প্রদায় ঐ সময় জাদু বিদ্যায় পারদর্শী ছিল এবং জ্যোতিষীদের প্রভাব ছিল তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে অত্যধিক। সেকারণ তাদের চিরাচরিত ধারণা অনুযায়ী মূসা (আঃ)-এর মু'জেযাকে তারা বড় ধরনের একটা জাদু ভেবেছিল মাত্র। তবে তারা তাঁকে সাধারণ জাদুকর নয়, বরং 'বিজ্ঞ জাদুকর' (سَاحِرٌ عَلِيْمٌ) বলে স্বীকৃতি দিয়েছিল *(আ'রাফ ৭/১০৯)*। কারণ তাদের হিসাব অনুযায়ী মূসার জাদু ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির, যা তাদের আয়ত্তাধীন জাদু বিদ্যার বাইরের এবং যা ছিল অনুপম ও অনন্য বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত।

পরবর্তীকালে সুলায়মান (আঃ)-এর সময়ে ইরাকের বাবেল নগরী তৎকালীন পৃথিবীতে জাদু বিদ্যায় শীর্ষস্থান লাভ করে। তখন আল্লাহ সুলায়মান (আঃ)-কে জিন, ইনসান, বায়ু ও পশুপক্ষীর উপর ক্ষমতা দিয়ে পাঠান। এগুলিকে লোকেরা জাদু ভাবে এবং তার নবুঅতকে অস্বীকার করে। তখন আল্লাহ হারূত ও মারূত ফেরেশতাদ্বয়কে জাদু ও মু'জেযার পার্থক্য বুঝানোর জন্য প্রেরণ করেন। যাতে লোকেরা জাদুকরদের তাবেদারী ছেড়ে নবীর তাবেদার হয়।

মূসার দাওয়াতের পর ফেরাঊনী অবস্থান :

মূসার মো'জেযা দেখে ফেরাঊন ও তার পারিষদবর্গ দারুণভাবে ভীত হয়ে পড়েছিল। তাই মূসার বিরুদ্ধে তার সম্মুখে আর টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করেনি। কিন্তু রাজনৈতিক স্বার্থ বিবেচনা করে তারা তাদের লোকদের বলতে লাগল যে, 'লোকটা বিজ্ঞ জাদুকর'। 'সে তোমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দিতে চায় (অর্থাৎ সে নিজে দেশের শাসক হ'তে চায়), এক্ষণে এ ব্যাপারে তোমাদের মত কি? 'লোকেরা ফেরাঊনকে বলল, 'আপনি তাকে ও তার ভাইকে

অবকাশ দিন এবং শহর ও নগরী সমূহের সর্বত্র খবর পাঠিয়ে দিন লোকদের জমা করার জন্য'। 'যাতে তারা সকল বিজ্ঞ জাদুকরদের সমবেত করে' *(আ'রাফ ৭/১০৯-১১২)*।

ফেরাঊন মূসা (আঃ)-কে বলল, 'হে মূসা! তুমি কি তোমার জাদুর জোরে আমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেবার জন্য আগমন করেছ'? 'তাহ'লে আমরাও তোমার মুকাবিলায় তোমার নিকট অনুরূপ জাদু উপস্থিত করব। অতএব আমাদের ও তোমার মধ্যে কোন একটি উন্মুক্ত প্রান্তরে একটা ওয়াদার দিন ধার্য কর, যার খেলাফ আমরাও করব না, তুমিও করবে না'। 'মূসা বললেন, 'তোমাদের ওয়াদার দিন হবে তোমাদের উৎসবের দিন এবং সেদিন পূর্বাহ্নেই লোকজন সমবেত হবে' *(ত্বোয়াহা ২০/৫৭-৫৯)*।

ফেরাঊনের জবাবের সার-সংক্ষেপ :

১. অদৃশ্য পালনকর্তা আল্লাহ্কে অস্বীকার করে দৃশ্যমান পালনকর্তা হিসাবে নিজেকেই সর্বোচ্চ পালনকর্তা বলে দাবী করা *(নাযে'আত ৭৯/২৪)*।

২. শৈশবে লালন-পালনের দোহাই পেড়ে তাকে পালনকর্তা বলে স্বীকার না করায় উল্টা মূসাকেই 'কাফির' বা কৃতঘ্ন বলে আখ্যায়িত করা *(শো'আরা ২৬/১৯)*।

৩. পূর্ব পুরুষের কারু কাছে এমন কথা না শোনার বাহানা পেশ করা *(ক্বাছাছ ২৮/৩৬)*।

৪. আল্লাহ্র কাছে ফিরে যাওয়ার কথা অস্বীকার করা *(ক্বাছাছ ২৮/৩৮)*।

৫. পরকালকে অস্বীকার করা *(ক্বাছাছ ২৮/৩৭)*।

৬. মূসাকে কারাগারে নিক্ষেপ করার ও হত্যার হুমকি প্রদান করা *(শো'আরা ২৬/২৯; মুমিন/গাফির ৪০/২৬)*।

৭. নবুঅতের মু'জেযাকে অস্বীকার করা এবং একে জাদু বলে অভিহিত করা *(ক্বাছাছ ২৮/৩৬)*।

৮. মূসার নিঃস্বার্থ দাওয়াতকে রাজনৈতিক স্বার্থ প্রণোদিত বলে অপবাদ দেওয়া *(আ'রাফ ৭/১১০; ত্বোয়াহা ২০/৬৩)*।

৯. নিজের কথিত ধর্ম রক্ষা ও নিজেদের রচিত বিধি-বিধান সমূহ রক্ষার দোহাই দিয়ে মূসার বিরুদ্ধে মানুষকে ক্ষেপিয়ে তোলা *(মুমিন/গাফির ৪০/২৬; ত্বোয়াহা ২০/৬৩)*।

১০. মূসাকে দেশে ফেৎনা সৃষ্টিকারী বলে দোষারোপ করা *(মুমিন/গাফির ৪০/২৬)*।

বস্তুতঃ এই ধরনের অপবাদসমূহ যুগে যুগে প্রায় সকল নবীকে ও তাঁদের অনুসারী সমাজ সংস্কারক গণকে দেওয়া হয়েছে এবং আজও দেওয়া হচ্ছে।

নবুঅত পরবর্তী ১ম পরীক্ষা : জাদুকরদের মুকাবিলা

মূসা (আঃ) ও ফেরাঊনের মাঝে জাদু প্রতিযোগিতার দিন ধার্য হবার পর মূসা (আঃ) পয়গম্বর সুলভ দয়া প্রকাশে নেতাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, وَيْلَكُمْ لاَ تَفْتَرُوا عَلَى اللهِ كَذِباً فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى- (طه ٦١)- ‘দুর্ভোগ তোমাদের! তোমরা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যারোপ করো না। তাহ’লে তিনি তোমাদেরকে আযাব দ্বারা ধ্বংস করে দেবেন। যারাই মিথ্যারোপ করে, তারাই বিফল মনোরথ হয়’ *(ত্বোয়াহা ২০/৬১)*। কিন্তু এতে কোন ফলোদয় হ’ল না। ফেরাঊন উঠে গিয়ে ‘তার সকল কলা-কৌশল জমা করল, অতঃপর উপস্থিত হ’ল’ *(ত্বোয়াহা ২০/৬০)*। ‘অতঃপর তারা তাদের কাজে নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করল এবং গোপনে পরামর্শ করল’। ‘তারা বলল, এই দু’জন লোক নিশ্চিতভাবেই জাদুকর। তারা তাদের জাদু দ্বারা আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করতে চায় এবং আমাদের উৎকৃষ্ট জীবনধারা রহিত করতে চায়’। ‘অতএব (হে জাদুকরগণ!) তোমরা তোমাদের যাবতীয় কলা-কৌশল সংহত কর। অতঃপর সারিবদ্ধভাবে এসো। আজ যে জয়ী হবে, সেই-ই সফলকাম হবে’ *(ত্বোয়াহা ২০/৬৩-৬৪)*।

জাদুকররা ফেরাঊনের নিকট সমবেত হয়ে বলল, জাদুকর ব্যক্তিটি কি দিয়ে কাজ করে? সবাই বলল, সাপ দিয়ে। তারা বলল, আল্লাহ্র কসম! পৃথিবীতে আমাদের উপরে এমন কেউ নেই, যে লাঠি ও রশিকে সাপ বানিয়ে কাজ করতে পারে (*‘হাদীছুল কুতূন’ নাসাঈ, ইবনু জারীর, ইবনু কাছীর*)। অতএব ‘আমাদের জন্য কি বিশেষ কোন পুরস্কার আছে, যদি আমরা বিজয়ী হই’? ‘সে বলল, হ্যাঁ। তখন অবশ্যই তোমরা আমার নিকটবর্তী লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে’ *(আ‘রাফ ৭/১১৩-১১৪)*।

জাদুকররা উৎসাহিত হয়ে মূসাকে বলল, 'হে মূসা! হয় তুমি (তোমার জাদুর লাঠি) নিক্ষেপ কর, না হয় আমরা প্রথমে নিক্ষেপ করি' *(ত্বোয়াহা ২০/৬৫)*। মূসা বললেন, 'তোমরাই নিক্ষেপ কর। অতঃপর যখন তারা 'তাদের রশি ও লাঠি নিক্ষেপ করল' *(শো'আরা ২৬/৪৪)*, তখন লোকদের চোখগুলিকে ধাঁধিয়ে দিল এবং তাদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলল ও এক মহাজাদু প্রদর্শন করল' *(আ'রাফ ৭/১১৬)*। 'তাদের জাদুর প্রভাবে মূসার মনে হ'ল যেন তাদের রশিগুলো ও লাঠিগুলো (সাপের ন্যায়) ছুটাছুটি করছে'। 'তাতে মূসার মনে কিছুটা ভীতির সঞ্চার হ'ল' *(ত্বোয়াহা ২০/৬৬-৬৭)*। এমতাবস্থায় আল্লাহ 'অহি' নাযিল করে মূসাকে অভয় দিয়ে বললেন, قُلْنَا لاَ تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى- وَأَلْقِ مَا فِي يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى- (طه ٦٨-٦٩)- 'তুমিই বিজয়ী হবে' 'তোমার ডান হাতে যা আছে, তা (অর্থাৎ লাঠি) নিক্ষেপ কর। এটা তাদের সবকিছুকে যা তারা করেছে, গ্রাস করে ফেলবে। তাদের ওসব তো জাদুর খেল মাত্র। বস্তুতঃ জাদুকর যেখানেই থাকুক সে সফল হবে না' *(ত্বোয়াহা ২০/৬৮-৬৯)*।

জাদুকররা তাদের রশি ও লাঠি সমূহ নিক্ষেপ করার সময় বলল, وَقَالُوْا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُوْنَ- (الشعراء ٤٤)- 'ফেরাঊনের মর্যাদার শপথ! আমরা অবশ্যই বিজয়ী হব' *(শো'আরা ২৬/৪৪)*। তারপর মূসা (আঃ) আল্লাহ্র নামে লাঠি নিক্ষেপ করলেন। দেখা গেল তা বিরাট অজগর সাপের ন্যায় রূপ ধারণ করল এবং জাদুকরদের সমস্ত অলীক কীর্তিগুলোকে গ্রাস করতে লাগল' *(শো'আরা ২৬/৪৫)*।

এদৃশ্য দেখে যুগশ্রেষ্ঠ জাদুকরগণ বুঝে নিল যে, মূসার এ জাদু আসলে জাদু নয়। কেননা জাদুর সর্বোচ্চ বিদ্যা তাদের কাছেই রয়েছে। মূসা তাদের চেয়ে বড় জাদুকর হ'লে এতদিন তার নাম শোনা যেত। তার উস্তাদের খবর জানা যেত। তাছাড়া তার যৌবনকাল অবধি সে আমাদের কাছেই ছিল। কখনোই তাকে জাদু শিখতে বা জাদু খেলা দেখাতে বা জাদুর প্রতি কোনরূপ আকর্ষণও তার মধ্যে কখনো দেখা যায়নি। তার পরিবারেও কোন জাদুকর নেই। তার বড় ভাই হারূণ তো সর্বদা আমাদের মাঝেই দিনাতিপাত করেছে। কখনোই তাকে এসব করতে দেখা যায়নি বা তার মুখে এখনকার মত বক্তব্য শোনা যায়নি। হঠাৎ করে কেউ বিশ্বসেরা জাদুকর হয়ে যেতে

Contents

পারে না। নিশ্চয়ই এর মধ্যে অলৌকিক কোন সত্তার নিদর্শন রয়েছে, যা আয়ত্ত করা মানুষের ক্ষমতার বাইরে। এ সময় মূসার দেওয়া তাওহীদের দাওয়াত ও আল্লাহ্র গযবের ভীতি তাদের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করল। আল্লাহ বলেন, فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ، فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَانقَلَبُواْ صَاغِرِينَ- (الأعراف ١١٨-١١٩)- ‘অতঃপর সত্য প্রতিষ্ঠিত হ’ল এবং বাতিল হয়ে গেল তাদের সমস্ত জাদুকর্ম’। ‘এভাবে তারা সেখানেই পরাজিত হ’ল এবং লজ্জিত হয়ে ফিরে গেল’ *(আ‘রাফ ৭/১১৮-১১৯)*। অতঃপর فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ- (الشعراء ٤٦-٤٨)- ‘তারা সিজদায় পড়ে গেল’। এবং ‘বলে উঠল, আমরা বিশ্বচরাচরের পালনকর্তার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করলাম, যিনি মূসা ও হারূণের রব’ *(শো‘আরা ২৬/৪৬-৪৮; ত্বোয়াহা ২০/৭০; আ‘রাফ ৭/১২০-১২১)*।

পরাজয়ের এ দৃশ্য দেখে ভীত-বিহ্বল ফেরাঊন নিজেকে সামলে নিয়ে উপস্থিত লাখো জনতার মনোবল চাঙ্গা রাখার জন্য জাদুকরদের উদ্দেশ্যে বলে উঠলো, آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ- (طه ٧١)- ‘আমার অনুমতি দানের পূর্বেই তোমরা তাকে মেনে নিলে? নিশ্চয়ই সে (অর্থাৎ মূসা) তোমাদের প্রধান, যে তোমাদেরকে জাদু শিক্ষা দিয়েছে’ *(ত্বোয়াহা ২০/৭১; আ‘রাফ ৭/১২৩; শো‘আরা ২৬/৪৯)*। অতঃপর সম্রাট সুলভ হুমকি দিয়ে বলল, فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ- (الشعراء ٤٩)- ‘শীঘ্রই তোমরা তোমাদের পরিণাম ফল জানতে পারবে। আমি অবশ্যই তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলব এবং তোমাদের সবাইকে শূলে চড়াব’ *(শো‘আরা ২৬/৪৯)*। জবাবে জাদুকররা বলল, لاَ ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ- إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَّغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ- (الشعراء ٥٠-٥١)- ‘কোন ক্ষতি নেই। আমরা আমাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করব’*(৫০)*। ‘আশা করি

আমাদের পালনকর্তা আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি সমূহ ক্ষমা করবেন’ *(শো‘আরা ২৬/৪৯-৫১; ত্বোয়াহা ২০/৭১-৭৩; আ‘রাফ ৭/১২৪-১২৬)*।

উল্লেখ্য যে, জাদুকরদের সাথে মুকাবিলার এই দিনটি (يوم الزينة) ছিল ১০ই মুহাররম আশূরার দিন (يوم عاشوراء) (*ইবনু কাছীর, ‘হাদীছুল ফুতূন’*)। তবে কোন কোন বিদ্বান বলেছেন, এটি ছিল তাদের ঈদের দিন। কেউ বলেছেন, বাজারের দিন। কেউ বলেছেন, নববর্ষের দিন (*তাফসীরে কুরতুবী, ত্বোয়াহা ৫৯*)।

ফেরাঊনের ছয়টি কুটচাল :

জাদুকরদের পরাজয়ের পর ফেরাঊন তার রাজনৈতিক কুটচালের মাধ্যমে জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে দিতে চাইল। তার চালগুলি ছিল, (১) সে বলল: এই জাদুকররা সবাই মূসার শিষ্য। তারা চক্রান্ত করেই তার কাছে নতি স্বীকার করেছে। এটা একটা পাতানো খেলা মাত্র। আসলে ‘মূসাই হ’ল বড় জাদুকর’ *(ত্বোয়াহা ২০/৭১)*। (২) সে বলল, মূসা তার জাদুর মাধ্যমে ‘নগরীর অধিবাসীদেরকে সেখান থেকে বের করে দিতে চায়’ *(আ‘রাফ ৭/১১০)* এবং মূসা ও তার সম্প্রদায় এদেশে আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। (৩) সে বলল মূসা যেসব কথা বলছে ‘আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে সেসব কথা কখনো শুনিনি’ *(ক্বাছাছ ২৮/৩৬)*। (৪) সে বলল, হে জনগণ! এ লোকটি তোমাদের ধর্ম পরিবর্তন করে দেবে ও দেশময় বিপর্যয় সৃষ্টি করবে’ *(মুমিন/গাফের ৪০/২৬)*। (৫) সে বলল, মূসা তোমাদের উৎকৃষ্ট (রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক) জীবন ব্যবস্থা রহিত করতে চায়’ *(ত্বোয়াহা ২০/৬৩)*। (৬) সে মিসরীয় জনগণকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দিয়েছিল *(ক্বাছাছ ২৮/৪)* এবং একটির দ্বারা অপরটিকে দুর্বল করার মাধ্যমে নিজের শাসন ও শোষণ অব্যাহত রেখেছিল। আজকের বহুদলীয় গণতন্ত্র বা দলতন্ত্র ফেলে আসা ফেরাঊনী তন্ত্রের আধুনিক রূপ বলেই মনে হয়। নিজেই সবকিছু করলেও লোকদের খুশী করার জন্য ফেরাঊন বলল, فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ‘অতএব হে জনগণ! তোমরা এখন কি বলতে চাও’? *(শো‘আরা ২৬/৩৫; আ‘রাফ ৭/১১০)*। এযুগের নেতারা যেমন নিজেদের সকল অপকর্ম জনগণের দোহাই দিয়ে করে থাকেন।

ফেরাঊনী কুটনীতির বিজয় ও জনগণের সমর্থন লাভ :

অধিকাংশের রায় যে সবসময় সঠিক হয় না বরং তা আল্লাহ্র পথ হ’তে মানুষকে বিভ্রান্ত করে, তার বড় প্রমাণ হ’ল ফেরাঊনী কুটনীতির বিজয় ও মূসার আপাত পরাজয়। ফেরাঊনের ভাষণে উত্তেজিত জনগণের পক্ষে নেতারা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, হে সম্রাট! أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ- (الأعراف ١٢٧)- ‘আপনি কি মূসা ও তার সম্প্রদায়কে এমনিই ছেড়ে দেবেন দেশময় ফাসাদ সৃষ্টি করার জন্য এবং আপনাকে ও আপনার উপাস্যদেরকে বাতিল করে দেবার জন্য’ *(আ‘রাফ ৭/১২৭)*।

জাদুকরদের সত্য গ্রহণ :

ধূর্ত ও কুটবুদ্ধি ফেরাঊন বুঝলো যে, তার ঔষধ কাজে লেগেছে। এখুনি মোক্ষম সময়। সে সাথে সাথে জাদুকরদের হাত-পা বিপরীতভাবে কেটে অতঃপর খেজুর গাছের সাথে শূলে চড়িয়ে হত্যা করার আদেশ দিল। সে ভেবেছিল, এতে জাদুকররা ভীত হয়ে তার কাছে প্রাণভিক্ষা চাইবে। কিন্তু ফল উল্টা হ’ল। তারা একবাক্যে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলে দিল,

لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا- إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى- (طه ٧٢-٧٣)-

‘আমরা তোমাকে ঐসব সুস্পষ্ট নিদর্শন (ও মু‘জেযার) উপরে প্রাধান্য দিতে পারি না, যেগুলো (মূসার মাধ্যমে) আমাদের কাছে পৌঁছেছে এবং প্রধান্য দিতে পারি না তোমাকে সেই সত্তার উপরে যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। অতএব তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পার। তুমি তো কেবল এই পার্থিব জীবনেই যা করার করবে’*(৭২)*। ‘আমরা আমাদের পালনকর্তার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করেছি, যাতে তিনি আমাদের পাপসমূহ এবং তুমি আমাদেরকে যে জাদু করতে বাধ্য করেছ, (তার পাপসমূহ) তা মার্জনা করেন। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ ও চিরস্থায়ী’ *(ত্বোয়াহা ২০/৭২-৭৩)*।

তারা আরও বলল,

قَالُوْا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ- وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءتْنَا ، رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ-- (الأعراف ١٢٥-١٢٦)-

'আমরা (তো মৃত্যুর পরে) আমাদের পরওয়ারদিগারের নিকটে ফিরে যাব'। 'বস্তুতঃ আমাদের সাথে তোমার শত্রুতা তো কেবল একারণেই যে, আমরা ঈমান এনেছি আমাদের পালনকর্তার নিদর্শন সমূহের প্রতি, যখন তা আমাদের নিকটে পৌঁছেছে। অতএব رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ 'হে আমাদের প্রভু! আমাদের জন্য ধৈর্যের দুয়ার খুলে দাও এবং আমাদেরকে 'মুসলিম' হিসাবে মৃত্যু দান কর' *(আ'রাফ ৭/১২৫-১২৬)*।

এটা ধারণা করা অযৌক্তিক হবে না যে, ইতিপূর্বে ফেরাঊনের দরবারে মূসার লাঠির মু'জেযা প্রদর্শনের ঘটনা থেকেই জাদুকরদের মনে প্রতীতি জন্মেছিল যে, এটা কোন জাদু নয়, এটা মু'জেযা। কিন্তু ফেরাঊন ও তার পারিষদবর্গের ভয়ে তারা মুখ খুলেনি। অবশেষে তাদেরকে সমবেত করার পর তাদেরকে সম্রাটের নৈকট্যশীল করার ও বিরাট পুরস্কারের লোভ দেখানো হয়। এগুলো নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক ও আর্থিক প্রলোভনের চাপ ভিন্ন কিছুই ছিল না।

জাদুকরদের মুসলমান হয়ে যাবার অন্যতম কারণ ছিল মুকাবিলার পূর্বে ফেরাঊন ও তার জাদুকরদের উদ্দেশ্যে মূসার প্রদত্ত উপদেশমূলক ভাষণ। যেখানে তিনি বলেছিলেন,

وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللهِ كَذِباً فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى- (طه ٦١)-

'দুর্ভোগ তোমাদের! তোমরা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যারোপ করো না। তাহ'লে তিনি তোমাদেরকে আযাব দ্বারা ধ্বংস করে দেবেন। বস্তুতঃ তারাই বিফল মনোরথ হয়, যারা মিথ্যারোপ করে' *(ত্বোয়াহা ২০/৬১)*।

মূসার মুখে একথা শুনে ফেরাঊন ও তার সভাসদরা অহংকারে স্ফীত হ'লেও জাদুকর ও সাধারণ জনগণের মধ্যে দারুণ প্রতিক্রিয়া হয়। ফলে জাদুকরদের মধ্যে গ্রুপিং হয়ে যায় এবং তারা আপোষে বিতর্কে লিপ্ত হয়। যদিও গোপন আলোচনার ভিত্তিতে সম্ভবতঃ রাজকীয় সম্মান ও বিরাট অংকের পুরস্কারের লোভে পরিশেষে তারা একমত হয়।

জাদুরকদের পরিণতি :

জাদুকরদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছিল কি-না, সে বিষয়ে কুরআনে স্পষ্টভাবে কিছু বলা না হ’লেও ত্বোয়াহা ৭২ হ’তে ৭৬ পর্যন্ত বর্ণিত আয়াত সমূহের বাকভঙ্গিতে বুঝা যায় যে, তা তৎক্ষণাৎ কার্যকর হয়েছিল। কেননা নিষ্ঠুরতার প্রতীক ফেরাঊনের দর্পিত ঘোষণার জবাবে দৃঢ়চিত্ত ঈমানদার জাদুকরদের মুখ দিয়ে যে কথাগুলো বের হয়েছিল, তা সকল ভয় ও দ্বিধা-সংকোচের ঊর্ধ্বে উঠে কেবলমাত্র মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির মুখেই শোভা পায়। সেকারণ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস, উবায়েদ ইবনু উমায়ের ও অন্যান্য বিদ্বানগণ বলেন, أَصْبَحُوْا سَحَرَةً وَأَمْسَوْا شُهَدَاءَ ‘যারা সকালে জাদুকর ছিল, তারা সন্ধ্যায় শহীদ হয়ে মৃত্যুবরণ করল’।[২৫] মূলতঃ এটাই হ’ল প্রকৃত মা‘রেফাত, যা যেকোন ভয়-ভীতির মুকাবিলায় মুমিনকে দৃঢ় হিমাদ্রির ন্যায় অবিচল রাখে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির অন্বেষায়। *সুবহা-নাল্লা-হি ওয়া বেহামদিহী।*

জনগণের প্রতিক্রিয়া :

আল্লাহ বলেন,

فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلاَّ ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَّفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ-(يونس ٨٣)-

‘ফেরাঊন ও তার পারিষদবর্গের নির্যাতনের ভয়ে তার সম্প্রদায়ের কিছু লোক ব্যতীত কেউ তার প্রতি ঈমান আনেনি। আর ফেরাঊন তার দেশে ছিল পরাক্রান্ত এবং সে ছিল সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত’ *(ইউনুস ১০/৮৩)*। এতে বুঝা যায় যে, ক্বিবতীদের মধ্যে গোপনে ঈমান আনয়নকারীর সংখ্যা বেশী থাকলেও প্রকাশ্যে ঈমান আনয়নকারীর সংখ্যা নিতান্তই কম ছিল।

উল্লেখ্য যে, অত্র আয়াতে ‘তার কওমের কিছু লোক ব্যতীত’ (إِلاَّ ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ) বলতে ইবনু আব্বাস (রাঃ) ‘ফেরাঊনের কওমের কিছু লোক’ বলেছেন। কিন্তু ইবনু জারীর ও অনেক বিদ্বান মূসার নিজ কওম ‘বনু ইস্রাঈলের কিছু লোক’ বলেছেন। এর জবাবে হাফেয ইবনু কাছীর বলেন,

---

২৫. তাফসীরে ইবনে কাছীর, ত্বোয়াহা ৭০; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/২৪২।

Contents

এটা প্রসিদ্ধ কথা যে, বনু ইস্রাঈলের সকলেই মূসাকে নবী হিসাবে বিশ্বাস করত একমাত্র ক্বারূণ ব্যতীত। কেননা সে ছিল বিদ্রোহী এবং ফেরাঊনের সাথী। আর মূসার কারণেই বনু ইস্রাঈলগণ মূসার জন্মের আগে ও পরে সমানভাবে নির্যাতিত ছিল (*আ'রাফ ৭/১২৯*)। অতএব অত্র আয়াতে যে মুষ্টিমেয় লোকের ঈমান আনার কথা বলা হয়েছে, তারা নিশ্চিতভাবেই ছিলেন ক্বিবতী সম্প্রদায়ের। আর তারা ছিলেন, ফেরাঊনের স্ত্রী আসিয়া, ফেরাঊনের চাচাতো ভাই জনৈক মুমিন ব্যক্তি যিনি তার ঈমান গোপন রেখেছিলেন এবং ফেরাঊনের খাজাঞ্চি ও তার স্ত্রী। যেকথা ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন।[২৬]

ফেরাঊনের স্ত্রীর প্রতিক্রিয়া :

জাদুকরদের সঙ্গে মুকাবিলা তথা সত্য ও মিথ্যার এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময় ফেরাঊনের নেককার স্ত্রী ও মূসার পালক মাতা (أمه البديلة) 'আসিয়া' উক্ত মুকাবিলার শুভ ফলাফলের জন্য সদা উদগ্রীব ছিলেন। যখন তাঁকে মূসা ও হারূণের বিজয়ের সংবাদ শোনানো হ'ল, তখন তিনি কালবিলম্ব না করে বলে ওঠেন, آمَنْتُ بِرَبِّ مُوْسَى وَ هَارُوْنَ 'আমি মূসা ও হারূণের পালনকর্তার উপরে ঈমান আনলাম'। নিজ স্ত্রীর ঈমানের এ খবর শুনে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ফেরাঊন তাকে মর্মান্তিকভাবে নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করে।[২৭] মৃত্যুর পূর্বে বিবি আসিয়া কাতর কণ্ঠে স্বীয় প্রভুর নিকটে প্রার্থনা করেন। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ-

'আল্লাহ ঈমানদারগণের জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন ফেরাঊনের স্ত্রীর, যখন সে বলেছিল, 'হে আমার পালনকর্তা! তোমার নিকটে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ কর! আমাকে ফেরাঊন ও তার পারিষদবর্গের হাত থেকে উদ্ধার কর এবং আমাকে যালেম সম্প্রদায়ের কবল থেকে মুক্তি দাও' (*তাহরীম ৬৬/১১*)।

---

২৬. *তাফসীরে ইবনু কাছীর, ইউনুস ১০/৮৩।*
২৭. *কুরতুবী, ত্বোয়াহা ২০/৭২-৭৬; তাহরীম ৬৬/১১।*

কুরআনে বর্ণিত চারজন নারীর দৃষ্টান্ত :

পবিত্র কুরআনের সূরা তাহরীমের ১০-১২ আয়াতে আল্লাহ পাক চারজন নারীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে তা থেকে সকলকে উপদেশ হাছিল করতে বলেছেন। প্রথম দু'জন দু'নবীর পত্নী। একজন নূহ (আঃ)-এর স্ত্রী, অন্যজন লূত্ব (আঃ)-এর স্ত্রী। এ দু'জন নারী তাওহীদ বিষয়ে আপন আপন স্বামীর তথা স্ব স্ব নবীর দাওয়াতে বিশ্বাস আনয়ন করেননি। বরং বাপ-দাদার আমলের শিরকী আক্বীদা ও রীতি-নীতির উপরে বিশ্বাসী ছিলেন। ফলে তারা জাহান্নামের অধিবাসী হয়েছেন। পয়গম্বরগণের সাথে বৈবাহিক সাহচর্য তাদেরকে আল্লাহ্র আযাব থেকে রক্ষা করতে পারেনি।

বাকী দু'জন নারীর একজন বিশ্বসেরা নাস্তিক ও দাম্ভিক সম্রাট ফেরাঊনের পুণ্যশীলা স্ত্রী 'আসিয়া' বিনতে মুযাহিম। তিনি মূসা (আঃ)-এর দাওয়াতে সাড়া দিয়ে স্বীয় ঈমান ঘোষণা করেন। ফেরাঊনের ঘোষিত মৃত্যুদণ্ড তিনি হাসিমুখে বরণ করে নেন। কোন কোন রেওয়ায়াত অনুসারে আল্লাহ পাক দুনিয়াতেই তাঁকে জান্নাতের গৃহ প্রদর্শন করেছেন।[২৮] চতুর্থ জন হ'লেন হযরত ঈসা (আঃ)-এর মাতা মারিয়াম বিনতে ইমরান। স্বীয় ঈমান ও সৎকর্মের বদৌলতে তিনি আল্লাহ্র নিকটে মহান মর্যাদার অধিকারিণী হন। এ থেকে বুঝানো হয়েছে যে, পুরুষ হৌক বা নারী হৌক প্রত্যেকে স্ব স্ব ঈমান ও আমলের কারণে জান্নাতের অধিকারী হবে, অন্য কোন কারণে নয়।

মূসা (আঃ)-এর উপরে ঈমান আনয়নকারিনী আসিয়াকে শেষনবী (ছাঃ) জগৎ শ্রেষ্ঠ চারজন মহিলার মধ্যে শামিল করেছেন। উক্ত চারজন হ'লেন ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া বিনতে মুযাহিম, মারিয়াম বিনতে ইমরান, খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ ও ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ।[২৯]

নবুঅত-পরবর্তী ২য় পরীক্ষা : বনু ইস্রাঈলদের উপরে আপতিত ফেরাউনী যুলুম সমূহ :

জাদুর পরীক্ষায় পরাজিত ফেরাঊনের যাবতীয় আক্রোশ গিয়ে পড়ল এবার নিরীহ বনু ইস্রাঈলগণের উপর। জাদুকরদের ঈমান আনয়ন, অতঃপর তাদের মৃত্যুদণ্ড প্রদান, বিবি আসিয়ার ঈমান আনয়ন ও তাঁকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান ইত্যাদি

---

২৮. আবু ইয়া'লা, ত্বাবারাণী, হাকেম, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৫০৮; আলবানী বলেন, হাদীছটি আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে মওকূফ ছহীহ, যা মরফূ হুকমীর পর্যায়ভুক্ত।

২৯. তিরমিযী আনাস (রাঃ) হ'তে, মিশকাত হা/৬১৮১ 'মানাক্বিব' অধ্যায় ১১ অনুচ্ছেদ; আহমাদ, ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে হা/২৬৬৮, সনদ ছহীহ।

Contents

নিষ্ঠুর দমন নীতির মাধ্যমে এবং অত্যন্ত নোংরা কুটচাল ও মিথ্যা অপবাদ সমূহের মাধ্যমে মূসার ঈমানী আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার চক্রান্ত করেছিল ফেরাঊন। কিন্তু এর ফলে জনগণের মধ্যে মূসার দাওয়াত দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল। তাতে ফেরাঊন ও তার অহংকারী পারিষদবর্গ নতুনভাবে দমন নীতির কৌশলপত্র প্রণয়ন করল। তারা নিজেরা বিধর্মী হ'লেও সাধারণ জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য ধর্মকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করল। অন্যদিকে 'বিভক্ত কর ও শাসন কর'-এই কুটনীতির অনুসরণে ফেরাঊনের ক্বিবতী সম্প্রদায়কে বাদ দিয়ে কেবল বনু ইস্রাঈলদের উপরে চূড়ান্ত যুলুম ও নির্যাতনের পরিকল্পনা করল।

১ম যুলুমঃ বনু ইস্রাঈলের নবজাতক পুত্রসন্তানদের হত্যার নির্দেশ জারি :

ফেরাঊনী সম্প্রদায়ের নেতারা ইতিপূর্বে ফেরাঊনকে বলেছিল, أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ 'আপনি কি মূসা ও তার সম্প্রদায়কে এমনি ছেড়ে দিবেন দেশময় ফাসাদ সৃষ্টি করার জন্য এবং আপনাকে ও আপনার উপাস্যদেরকে বাতিল করে দেবার জন্য? *(আ'রাফ ৭/১২৭)*। নেতারা মূসা ও হারূণের ঈমানী দাওয়াতকে 'ফাসাদ' বলে অভিহিত করেছিল। এক্ষণে দেশময় মূসার দাওয়াতের ব্যাপক প্রসার বন্ধ করার জন্য এবং ফেরাঊনের নিজ সম্প্রদায়ের সাধারণ লোকদের ব্যাপকহারে মূসার দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার স্রোত বন্ধ করার জন্য নিজেদের লোকদের কিছু না বলে নিরীহ বনু ইস্রাঈলদের উপরে অত্যাচার শুরু করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে ফেরাঊন বলল, سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِـــي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ- (الأعراف ١٢٧)- 'আমি এখুনি টুকরা টুকরা করে হত্যা করব ওদের পুত্র সন্তানদেরকে এবং বাঁচিয়ে রাখব ওদের কন্যা সন্তানদেরকে। আর আমরা তো ওদের উপরে (সবদিক দিয়েই) প্রবল' *(আ'রাফ ৭/১২৭)*। এভাবে মূসার জন্মকালে বনু ইস্রাঈলের সকল নবজাতক পুত্র হত্যা করার সেই ফেলে আসা লোমহর্ষক নির্যাতনের পুনরাবৃত্তির ঘোষণা প্রদান করা হ'ল।

দল ঠিক রাখার জন্য এবং সম্প্রদায়ের নেতাদের রোষাগ্নি প্রশমনের জন্য ফেরাঊন অনুরূপ ঘোষণা দিলেও মূসা ও হারূণ সম্পর্কে তার মুখ দিয়ে কোন কথা বের হয়নি। যদিও ইতিপূর্বে সে মূসাকে কারারুদ্ধ করার এমনকি হত্যা

করার হুমকি দিয়েছিল *(শো‘আরা ২৬/২৯; মুমিন ৪০/২৬)*। কিন্তু জাদুকরদের পরাজয়ের পর এবং নিজে মূসার সর্পরূপী লাঠির মু‘জেযা দেখে ভীত বিহ্বল হয়ে পড়ার পর থেকে মূসার দিকে তাকানোর মত সাহসও তার ছিল না।

যাই হোক ফেরাঊনের উক্ত নিষ্ঠুর ঘোষণা জারি হওয়ার পর বনু ইস্রাঈলগণ মূসার নিকটে এসে অনুযোগের সুরে বলল, أُوْذِينَا مِنْ قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ‘তোমার আগমনের পূর্বেও আমাদেরকে নির্যাতন করা হয়েছে। আবার এখন তোমার আগমনের পরেও তাই করা হচ্ছে’ *(আ‘রাফ ৭/১২৯)*। অর্থাৎ তোমার আগমনের পূর্বে তো এ আশায় আমাদের দিন কাটত যে, সত্বর আমাদের উদ্ধারের জন্য একজন নবীর আগমন ঘটবে। অথচ এখন তোমার আগমনের পরেও সেই একই নির্যাতনের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। তাহ’লে এখন আমাদের উপায় কি?

আসন্ন বিপদের আশংকায় ভীত-সন্ত্রস্ত কওমের লোকদের সান্ত্বনা দিয়ে মূসা (আঃ) বললেন, عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ‘তোমাদের পালনকর্তা শীঘ্রই তোমাদের শত্রুদের ধ্বংস করে দেবেন এবং তোমাদেরকে দেশে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন। তারপর দেখবেন, তোমরা কেমন কাজ কর’ *(আ‘রাফ ৭/১২৯)*। তিনি বললেন, اسْتَعِينُوا بِاللهِ وَاصْبِرُوْا إِنَّ الأَرْضَ لِلّهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ‘তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর আল্লাহ্‌র নিকটে এবং ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয়ই এ পৃথিবী আল্লাহ্‌র। তিনি স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন। বস্তুতঃ চূড়ান্ত পরিণাম ফল আল্লাহভীরুদের জন্যই নির্ধারিত’ *(আ‘রাফ ৭/১২৮)*।

মূসা (আঃ) তাদেরকে আরও বলেন,

يَا قَوْمِ إِنْ كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْا إِنْ كُنتُم مُّسْلِمِينَ- فَقَالُواْ عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ- وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ- (يونس ٨٤-٨٦)-

'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যদি আল্লাহ্‌র উপরে ঈমান এনে থাক, তবে তাঁরই উপরে ভরসা কর যদি তোমরা আনুগত্যশীল হয়ে থাক'। জবাবে তারা বলল, আমরা আল্লাহ্‌র উপরে ভরসা করছি। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের উপরে এ যালেম কওমের শক্তি পরীক্ষা করো না'। 'আর আমাদেরকে অনুগ্রহ করে কাফের সম্প্রদায়ের কবল থেকে মুক্তি দাও' *(ইউনুস ১০/৮৪-৮৬)*।

উপরোক্ত আয়াত সমূহে বুঝা যায় যে, পয়গম্বর সূলভ দরদ ও দূরদর্শিতার আলোকে মূসা (আঃ) স্বীয় ভীত-সন্ত্রস্ত কওমকে মূলতঃ দু'টি বিষয়ে উপদেশ দেন। **এক-** শত্রুর মোকাবেলায় আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করা এবং **দুই-** আল্লাহ্‌র সাহায্য না আসা পর্যন্ত সাহসের সাথে ধৈর্য ধারণ করা। সাথে সাথে একথাও স্মরণ করিয়ে দেন যে, সমগ্র পৃথিবীর মালিকানা আল্লাহ্‌র। তিনি যাকে খুশী এর উত্তরাধিকারী নিয়োগ করেন এবং নিঃসন্দেহে শেষফল মুত্তাক্বীদের জন্যই নির্ধারিত।

২য় যুলুমঃ ইবাদতগৃহ সমূহ ধ্বংস করা :

পুত্র শিশু হত্যাকাণ্ডের ব্যাপক যুলুমের সাথে সাথে ফেরাঊন বনু ইস্রাঈলদের ইবাদতগৃহ সমূহ ধ্বংস করার নির্দেশ দেয়। বনু ইস্রাঈলদের ধর্মীয় বিধান ছিল এই যে, তাদের সবাইকে বাধ্যতামূলকভাবে উপাসনালয়ে গিয়ে উপাসনা করতে হ'ত। এক্ষণে সেগুলি ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেওয়ায় বনু ইস্রাঈলগণ দিশেহারা হয়ে পড়ে। এ সময় মূসা ও হারূণের প্রতি আল্লাহ পাক নিম্নোক্ত নির্দেশ পাঠান-

وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتاً وَاجْعَلُوْا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ-(يونس ٨٧)-

'আর আমরা নির্দেশ পাঠালাম মূসা ও তার ভাইয়ের প্রতি যে, তোমরা তোমাদের সম্প্রদায়ের জন্য মিসরের মাটিতে বাসস্থান নির্ধারণ কর এবং তোমাদের ঘরগুলিকে কিবলামুখী করে তৈরী কর ও সেখানে ছালাত কায়েম কর এবং মুমিনদের সুসংবাদ দাও'।*(ইউনুস ১০/৮৭)*।

বলা বাহুল্য যে, উপরোক্ত বিধান নাযিলের ফলে বনু ইস্রাঈলগণ স্ব স্ব ঘরেই ছালাত আদায়ের সুযোগ লাভ করে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তাদেরকে যে ক্বিবলার দিকে ফিরে ছালাত আদায় করতে নির্দেশ দেন, সেটা ছিল কা'বা শরীফ' *(কুরতুবী, রূহুল মা'আনী)*। বরং কোন কোন বিদ্বান বলেছেন

যে, বিগত সকল নবীর ক্বিবলা ছিল কা‘বা গৃহ। লক্ষণীয় যে, মূসার অতুলনীয় নবুঅতী মো‘জেযা থাকা সত্ত্বেও এবং তাদেরকে সাহায্য করার ব্যাপারে আল্লাহ্র স্পষ্ট ওয়াদা থাকা সত্ত্বেও ফেরাঊনী যুলুমের বিরুদ্ধে আল্লাহ মূসাকে যুদ্ধ ঘোষণার নির্দেশ দেননি। বরং যুলুম বরদাশত করার ও ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দেন। ইবাদতগৃহ সমূহ ভেঙ্গে দিয়েছে বলে তা রক্ষার জন্য জীবন দিতে বলা হয়নি। *(টীকা: অতএব উপাসনালয় ধ্বংস করা ফেরাঊনী কাজ)*। বরং স্ব স্ব গৃহকে কেবলামুখী বানিয়ে সেখানেই ছালাত আদায় করতে বলা হয়েছে। এর দ্বারা একটা মূলনীতি বেরিয়ে আসে যে, পরাক্রান্ত যালেমের বিরুদ্ধে দুর্বল মযলূমের কর্তব্য হ’ল ধৈর্য ধারণ করা ও আল্লাহ্র উপরেই সবকিছু সোপর্দ করা।

ফেরাঊনের বিরুদ্ধে মূসার বদ দো‘আ :

وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالاً فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُوْا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الأَلِيمَ- قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلاَ تَتَّبِعَآنِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ- (يونس ٨٨-٨٩)-

‘মূসা বলল, হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি ফেরাঊনকে ও তার সর্দারদেরকে পার্থিব আড়ম্বর সমূহ ও সম্পদরাজি দান করেছ, যা দিয়ে তারা লোকদেরকে তোমার রাস্তা থেকে বিপথগামী করে। অতএব হে আমাদের প্রভু! তুমি তাদের সম্পদরাজি ধ্বংস করে দাও ও তাদের অন্তরগুলিকে শক্ত করে দাও, যাতে তারা অতক্ষণ পর্যন্ত ঈমান না আনে, যতক্ষণ না তারা মর্মান্তিক আযাব প্রত্যক্ষ করে’*(৮৮)*। জবাবে আল্লাহ বললেন, তোমাদের দো‘আ কবুল হয়েছে। অতএব তোমরা দু’জন অটল থাক এবং অবশ্যই তোমরা তাদের পথে চলো না, যারা জানে না’ *(ইউনুস ১০/৮৮-৮৯)*।

মূসা ও হারূণের উপরোক্ত দো‘আ আল্লাহ কবুল করলেন। কিন্তু তার বাস্তবায়ন সঙ্গে সঙ্গে করলেন না। বরং সময় নিলেন অন্যূন বিশ বছর। এরূপ প্রলম্বিত কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে আল্লাহ মাযলূমের ধৈর্য পরীক্ষার সাথে সাথে যালেমেরও পরীক্ষা নিয়ে থাকেন এবং তাদের তওবা করার ও হেদায়াত প্রাপ্তির সুযোগ দেন। যাতে পরে তাদের জন্য ওযর পেশ করার কোন সুযোগ না থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَوْ يَشَاءُ اللهُ لاَنتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَ

بَعْضَكُم بِبَعْضٍ 'আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের কতককে কতকের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান' *(মুহাম্মাদ ৪৭/৪)*।

প্রশ্ন হ'তে পারে, এত যুলুম সত্ত্বেও আল্লাহ তাদের হিজরত করার নির্দেশ না দিয়ে সেখানেই পুনরায় ঘর বানিয়ে বসবাসের নির্দেশ দিলেন কেন? এর জবাব দু'ভাবে দেওয়া যেতে পারে।

এক- ফেরাঊন তাদেরকে হিজরতে বাধা দিত। কারণ বনু ইস্রাঈলগণকে তারা তাদের জাতীয় উন্নয়নের সহযোগী হিসাবে এবং কর্মচারী ও সেবাদাস হিসাবে ব্যবহার করত। তাছাড়া পালিয়ে আসারও কোন পথ ছিল না। কেননা নীলনদ ছিল বড় বাধা। নদী পার হওয়ার চেষ্টা করলে ফেরাঊনী সেনারা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করত।

দুই- ফেরাঊনী সম্প্রদায়ের মধ্যে মূসা ও হারূণের দাওয়াত সম্প্রসারণ করা। মূলতঃ এটিই ছিল আল্লাহ্র মূল উদ্দেশ্য। কেননা যতদিন তারা মিসরে ছিলেন, সেখানকার অধিবাসীদের নিকটে দ্বীনের দাওয়াত পেশ করেছেন এবং তার ফলে বহু আল্লাহ্র বান্দা পথের সন্ধান পেয়ে ধন্য হয়েছেন। ফেরাঊন দেখেছিল তার দুনিয়াবী লাভ ও শান-শওকত। কিন্তু আল্লাহ চেয়েছিলেন তাওহীদের প্রচার ও প্রসার ও মানুষের হেদায়াত। সেটিই হয়েছে। ফেরাঊনেরা এখন মিসরের পিরামিডের দর্শনীয় বস্তুতে পরিণত হয়েছে। অথচ মিসর সহ বলা চলে পুরা আফ্রিকায় এখন ইসলামের জয়-জয়কার অব্যাহত রয়েছে। *ফালিল্লা-হিল হাম্‌দ।*

ফেরাঊনী আচরণ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ :

(১) দুষ্টু শাসকগণ তার পদে অন্য কাউকে ভাবতে পারে না। আল্লাহ বলেন, 'ফেরাঊন পৃথিবীতে উদ্ধত হয়ে উঠেছিল' *(ইউনুস ১০/৮৩)*। সে দাবী করেছিল, 'আমিই তোমাদের সর্বোচ্চ পালনকর্তা' *(নাযে'আত ৭৯/২৪)*। অতএব 'আমি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন উপাস্য আছে বলে আমি জানি না' *(ক্বাছাছ ২৮/৩৮)*। যেহেতু সে তৎকালীন পৃথিবীর এক সভ্যতাগর্বী ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্রের একচ্ছত্র সম্রাট ছিল, সেহেতু তার এ দাবী মিথ্যা ছিল না। এর দ্বারা সে নিজেকে 'সৃষ্টিকর্তা' দাবী করত না বটে, কিন্তু নিজস্ব বিধানে প্রজাপালনের কারণে নিজেকেই সর্বোচ্চ পালনকর্তা ভেবেছিল। তার অহংকার তার চক্ষুকে

নবী মূসার অহীর বিধান মান্য করা থেকে অন্ধ করে দিয়েছিল। যুগে যুগে আবির্ভূত স্বেচ্ছাচারী শাসকদের অবস্থা এ থেকে মোটেই পৃথক ছিল না। আজও নয়। প্রত্যেকে নিজেকে শ্রেষ্ঠ শাসক মনে করে এবং ঐ পদে কাউকে শরীক ভাবতে পারে না।

(২) তারা তাদের বিরোধীদেরকে ধর্ম বিরোধী ও সমাজ বিরোধী বলে। ফেরাঊন বলেছিল, তোমরা আমাকে ছাড়, মূসাকে হত্যা করতে দাও। সে ডাকুক তার পালনকর্তাকে। আমি আশংকা করছি যে, সে তোমাদের দ্বীন এবং প্রচলিত উৎকৃষ্ট রীতিনীতি পরিবর্তন করতে চায় এবং দেশে ফাসাদ সৃষ্টি করতে চায় *(মুমিন ৪০/২৬, ত্বোয়াহা ২০/৬৩)*। সকল যুগের ফেরাঊনরা তাদের বিরুদ্ধবাদীদের উক্ত কথাই বলে থাকে।

(৩) তারা সর্বদা নিজেদেরকে জনগণের মঙ্গলকামী বলে। নিজ সম্প্রদায়ের জনৈক গোপন ঈমানদার ব্যক্তি যখন মূসাকে হত্যা না করার ব্যাপারে ফেরাঊনকে উপদেশ দিল, তখন তার জবাবে ফেরাঊন বলল, ‘আমি তোমাদেরকে কেবল মঙ্গলের পথই দেখিয়ে থাকি’ *(মুমিন ৪০/২৯)*। সকল যুগের ফেরাঊনরাও একই কথা বলে আল্লাহ্র বিধানকে এড়িয়ে চলে এবং নিজেদের মনগড়া বিধান প্রতিষ্ঠায় জনগণের নামে জনগণের উপরে যুলুমের স্টীম রোলার চালিয়ে থাকে।

(৪) তাদের দেওয়া জেল-যুলুম ও হত্যার হুমকির বিপরীতে ঈমানদারগণ সর্বদা আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করেন ও পরিণামে মযলূম বিজয়ী হয় ও যালেম পর্যুদস্ত হয়। যেমন কারাদণ্ড ও হত্যার হুমকি ও ফেরাঊনী যুলুমের উত্তরে মূসার বক্তব্য ছিল: وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لاَّ يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ‘আমি আমার ও তোমাদের পালনকর্তার আশ্রয় প্রার্থনা করছি সকল অহংকারী থেকে যে বিচার দিবসে বিশ্বাস করে না’ *(মুমিন ৪০/২৭)*। ফলে ‘আল্লাহ তাকে তাদের চক্রান্তের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করলেন এবং পরে ফেরাঊন গোত্রকে শোচনীয় আযাব গ্রাস করল’ *(মুমিন ৪০/৪৫)*। এযুগেও মযলূমের কাতর প্রার্থনা আল্লাহ কবুল করে থাকেন ও যালেমকে বিভিন্নভাবে শাস্তি দিয়ে থাকেন।

ফেরাউনী সম্প্রদায়ের উপরে আপতিত গযব সমূহ এবং মূসা (আঃ)-এর মু'জেযা সমূহ :

ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী ফেরাঊনের জাদুকরদের সাথে শক্তি পরীক্ষার ঘটনার পর মূসা (আঃ) অন্যূন বিশ বছর যাবত মিসরে অবস্থান করে সেখানকার অধিবাসীদেরকে আল্লাহ্‌র বাণী শোনান এবং সত্য ও সরল পথের দিকে দাওয়াত দিতে থাকেন। এ সময়কালের মধ্যে আল্লাহ মূসা (আঃ)-কে প্রধান ৯টি মু'জেযা দান করেন। তবে প্লেগ মহামারী সহ *(আ'রাফ ৭/১৩৪)*। মোট নিদর্শনের সংখ্যা দাঁড়ায় ১০টি। যার মধ্যে প্রথম দু'টি শ্রেষ্ঠ মু'জেযা ছিল অলৌকিক লাঠি ও আলোকময় হস্ততালু। যার পরীক্ষা শুরুতেই ফেরাঊনের দরবারে এবং পরে জাদুকরদের সম্মুখে হয়ে গিয়েছিল। এরপর বাকীগুলি এসেছিল ফেরাঊনী কওমের হেদায়াতের উদ্দেশ্যে তাদেরকে সাবধান করার জন্য। মূলতঃ দুনিয়াতে প্রেরিত সকল এলাহী গযবের মূল উদ্দেশ্য থাকে মানুষের হেদায়াত। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ– (السجدة ٢١)– 'কাফির ও ফাসিকদেরকে (জাহান্নামের) কঠিন শাস্তির পূর্বে (দুনিয়াতে) আমরা অবশ্যই লঘু শাস্তি আস্বাদন করাব, যাতে তারা (আমার দিকে) ফিরে আসে' *(সাজদাহ ৩২/২১)*।

মযলূম বনু ইস্রাঈলদের কাতর প্রার্থনা এবং মূসা ও হারূণের দো'আ আল্লাহ কবুল করেছিলেন। সেমতে সর্বপ্রথম অহংকারী ফেরাঊনী কওমের দুনিয়াবী জৌলুস ও সম্পদরাজি ধ্বংসের গযব নেমে আসে। তারপর আসে অন্যান্য গযব বা নিদর্শন সমূহ। আমরা সেগুলি একে একে বর্ণনা করার প্রয়াস পাব। যাতে এযুগের মানুষ তা থেকে উপদেশ হাছিল করে।

মোট নিদর্শন সমূহ, যা মিসরে প্রদর্শিত হয়-

(১) লাঠি (২) প্রদীপ্ত হস্ততালু (৩) দুর্ভিক্ষ (৪) তূফান (৫) পঙ্গপাল (৬) উকুন (৭) ব্যাঙ (৮) রক্ত (৯) প্লেগ (১০) সাগরডুবি। প্রথম দু'টি এবং মূসার ব্যক্তিগত তোতলামি দূর হওয়াটা বাদ দিয়ে বাকী ৮টি নিদর্শন নিম্নে বর্ণিত হ'ল-

১ম নিদর্শন : দুর্ভিক্ষ

মূসা (আঃ)-এর দো‘আ কবুল হওয়ার পর ফেরাঊনী সম্প্রদায়ের উপরে প্রথম নিদর্শন হিসাবে দুর্ভিক্ষের গযব নেমে আসে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ– (أعراف ١٣٠)– ‘তারপর আমরা পাকড়াও করলাম ফেরাঊনের অনুসারীদেরকে দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে এবং ফল-ফসলের ক্ষয়-ক্ষতির মাধ্যমে, যাতে তারা উপদেশ হাছিল করে’ *(আ‘রাফ ৭/১৩০)*।

নিরীহ বনু ইস্রাঈলগণের উপরে দুর্ধর্ষ ফেরাঊনী যুলুম প্রতিরোধে এটা ছিল মযলূমদের সমর্থনে আল্লাহ প্রেরিত প্রথম হুঁশিয়ারী সংকেত। এর ফলে তাদের ক্ষেতের ফসল ও বাগ-বাগিচার উৎপাদন চরমভাবে হ্রাস পেয়েছিল। খাদ্যাভাবে তাদের মধ্যে হাহাকার পড়ে যায়। ফলে কোন উপায়ান্তর না দেখে ফেরাঊনী সম্প্রদায়ের নেতারা মূসা (আঃ)-এর কাছে এসে কাকুতি-মিনতি করতে থাকে। দয়ার্দ্রচিত্ত মূসা (আঃ) অবশেষে দো‘আ করলেন। ফলে দুর্ভিক্ষ রহিত হয়ে গেল এবং তাদের বাগ-বাগিচা ও মাঠ-ময়দান পুনরায় ফল-ফসলে ভরে উঠলো। কিন্তু ফেরাঊনী সম্প্রদায় এতে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় না করে বরং অহংকারে স্ফীত হয়ে খোদ মূসাকেই দায়ী করে তাঁকে ‘অলক্ষুণে-অপয়া’ বলে গালি দেয় এবং উদ্ধতভাবে বলে ওঠে যে, وَقَالُوْا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ– (الأعراف ١٣٢)– ‘আমাদের উপরে জাদু করার জন্য তুমি যে নিদর্শনই নিয়ে আস না কেন, আমরা তোমার উপরে কোন মতেই ঈমান আনব না’ *(আ‘রাফ ৭/১৩২)*। আল্লাহ বলেন,

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلاَتٍ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْماً مُّجْرِمِيْنَ– (الأعراف ١٣٣)–

‘অতঃপর আমরা তাদের উপরে পাঠিয়ে দিলাম তূফান, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ, রক্ত প্রভৃতি বহুবিধ নিদর্শন একের পরে এক। তারপরেও তারা অহংকার করতে থাকল। বস্তুতঃ তারা ছিল পাপী সম্প্রদায়’ *(আ‘রাফ ৭/১৩৩)*।

অত্র আয়াতে দুর্ভিক্ষের পরে পরপর পাঁচটি গযব নাযিলের কথা বলা হয়েছে। তারপর আসে প্লেগ মহামারী ও অন্যান্য ছোট-বড় আযাব' *(আ'রাফ ৭/১৩৪)*। এরপরে সর্বশেষ গযব হ'ল সাগরডুবি' *(ইউনুস ১০/৯০)*। যার মাধ্যমে এই গর্বিত অহংকারীদের একেবারে নিঃশেষ করে দেওয়া হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর তাফসীর অনুযায়ী آيَاتٌ مُفَصَّلاَتٌ বা 'একের পর এক আগত নিদর্শনসমূহ' অর্থ হ'ল, এগুলোর প্রত্যেকটি আযাবই নির্ধারিত সময় পর্যন্ত থেকে রহিত হয়ে যায় এবং কিছু দিন বিরতির পর অন্যান্য আযাবগুলি আসে'। ফেরাঊন সম্প্রদায়ের সুবিধাবাদী চরিত্র ফুটে ওঠে নিম্নোক্ত বর্ণনায়। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُواْ يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ- فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُم بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ- (الأعراف ١٣٤-١٣٥)

'আর যখন তাদের উপর কোন আযাব পতিত হ'ত, তখন তারা বলত, হে মূসা! তুমি আমাদের জন্য তোমার প্রভুর নিকট দো'আ কর, যা (কবুলের) ওয়াদা তিনি তোমাকে দিয়েছেন। যদি তুমি আমাদের উপর থেকে এ আযাব দূর করে দাও, তাহ'লে অবশ্যই আমরা তোমার উপর ঈমান আনব এবং তোমার সাথে বনু ইস্রাঈলদের অবশ্যই পাঠিয়ে দেব'। 'অতঃপর যখন আমরা তাদের উপর থেকে আযাব উঠিয়ে নিতাম নির্দিষ্ট একটা সময়ে, যে পর্যন্ত তাদের পৌঁছানো উদ্দেশ্য হ'ত, তখন তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করত' *(আ'রাফ ৭/১৩৪-৩৫)*। এই নির্ধারিত সময়ের মেয়াদ কত ছিল, সে বিষয়ে বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে, যার প্রায় সবই ধারণা প্রসূত। অতএব আমরা তা থেকে বিরত রইলাম।

এ ব্যাপারে কুরআনে একটি মৌলিক বক্তব্য এসেছে এভাবে যে,

فَإِذَا جَاءتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَـذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُواْ بِمُوْسَى وَمَن مَّعَهُ أَلاَ إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللهِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ- (الأعراف ١٣١)-

'যখন তাদের শুভদিন ফিরে আসত, তখন তারা বলত যে, এটাই আমাদের জন্য উপযুক্ত। পক্ষান্তরে অকল্যাণ উপস্থিত হ'লে তারা মূসা ও তার সাথীদের 'অলক্ষুণে' বলে অভিহিত করত। জেনে রাখ যে, তাদের অলক্ষুণে চরিত্র

আল্লাহ্র ইলমে রয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশ তা জানে না’ *(আ‘রাফ ৭/১৩১)*। এতে বুঝা যায় যে, একটা গযব শেষ হওয়ার পর শুভদিন আসতে এবং পিছনের ভয়াবহ দুর্দশার কথা ভুলতে ও পুনরায় গর্বে স্ফীত হ’তে নিশ্চয়ই বেশ দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হ’ত। আমরা পূর্বেই ঐতিহাসিক বর্ণনায় জেনেছি যে, জাদুকরদের সাথে পরীক্ষার পর মূসা (আঃ) বিশ বছরের মত মিসরে ছিলেন। তারপরে সাগর ডুবির গযব নাযিল হয়। অতএব জাদুকরদের সাথে মুকাবিলার পর হ’তে সাগর ডুবি পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে দুর্ভিক্ষ ও প্লেগ সহ আয়াতে বর্ণিত আটটি গযব নাযিল হয়েছিল বলে প্রতীয়মান হয়। ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনুল মুনযির যে বলেছেন যে, প্রতিটি আযাব শনিবারে এসে পরের শনিবারে চলে যেত এবং পরবর্তী আযাব আসা পর্যন্ত তিন সপ্তাহের অবকাশ দেওয়া হ’ত কথাটি তাই মেনে নেওয়া মুশকিল বৈ-কি।

২য় নিদর্শন : তূফান

দুর্ভিক্ষের পরে মূসা (আঃ)-এর দো‘আর বরকতে পুনরায় ভরা মাঠ ও ভরা ফসল পেয়ে ফেরাঊনী সম্প্রদায় পিছনের সব কথা ভুলে যায় ও গর্বে স্ফীত হয়ে মূসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে অপবাদ রটাতে থাকে। তারা সাধারণ লোকদের ঈমান গ্রহণে বাধা দিতে থাকে। তারা তাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে পুনরায় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে থাকে। ফলে তাদের উপরে গযব আকারে প্লাবন ও জলোচ্ছ্বাস নেমে আসে। যা তাদের মাঠ-ঘাট, বাগান-ফসল, ঘর-বাড়ি সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এতে ভীত হয়ে তারা আবার মূসা (আঃ)-এর কাছে এসে কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। আবার তারা ঈমান আনার প্রতিজ্ঞা করে ও আল্লাহ্র নিকটে দো‘আ করার জন্য মূসা (আঃ)-কে পীড়াপীড়ি করতে থাকে। ফলে মূসা (আঃ) দো‘আ করেন ও আল্লাহ্র রহমতে তূফান চলে যায়। পুনরায় তারা জমি-জমা আবাদ করে ও অচিরেই তা সবুজ-শ্যামল হয়ে ওঠে। এ দৃশ্য দেখে তারা আবার অহংকারী হয়ে ওঠে এবং বলতে থাকে, আসলে আমাদের জমির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্যেই প্লাবন এসেছিল, আর সেকারণেই আমাদের ফসল এবার সর্বকালের রেকর্ড ভঙ্গ করেছে ও বাম্পার ফলন হয়েছে। আসলে আমাদের কর্ম দক্ষতার ফল হিসাবে এটাই উপযুক্ত। এভাবে তারা অহংকারে মত্ত হয়ে আবার শুরু করল বনী ইস্রাঈলদের উপরে যুলুম-অত্যাচার। ফলে নেমে এল তৃতীয় গযব।

৩য় নিদর্শন : পঙ্গপাল

একদিন হঠাৎ হাযার হাযার পঙ্গপাল কোত্থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে এসে ফেরাঊনীদের সব ফসল খেয়ে ছাফ করে গেল। তারা তাদের বাগ-বাগিচার ফল-ফলাদি খেয়ে সাবাড় করে ফেলল। এমনকি কাঠের দরজা-জানালা, আসবাব-পত্র পর্যন্ত খেয়ে শেষ করল। অথচ পাশাপাশি বনু ইস্রাঈলদের ঘরবাড়ি, শস্যভূমি ও বাগ-বাগিচা সবই সুরক্ষিত থাকে।

এবারও ফেরাঊনী সম্প্রদায় ছুটে এসে মূসা (আঃ)-এর কাছে কাতর কণ্ঠে নিবেদন করতে থাকে, যাতে গযব চলে যায়। তারা এবার পাকা ওয়াদা করল যে, তারা ঈমান আনবে ও বনু ইস্রাঈলদের মুক্তি দেবে। মূসা (আঃ) দো‘আ করলেন ও আযাব চলে গেল। পরে ফেরাঊনীরা দেখল যে, পঙ্গপালে খেয়ে গেলেও এখনও যা অবশিষ্ট আছে, তা দিয়ে বেশ কিছুদিন চলে যাবে। ফলে তারা আবার শয়তানী ধোঁকায় পড়ে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করল ও পূর্বের ন্যায় ঔদ্ধত্য প্রদর্শন শুরু করল। ফলে নেমে এল পরবর্তী গযব ‘উকুন’।

৪র্থ নিদর্শন : উকুন

‘উকুন’ সাধারণতঃ মানুষের মাথার চুলে জন্মে থাকে। তবে এখানে ব্যাপক অর্থে ঘুণ পোকা ও কেড়ি পোকাকেও গণ্য করা হয়েছে। যা ফেরাঊনীদের সকল প্রকার কাঠের খুঁটি, দরজা-জানালা, খাট-পালংক ও আসবাব-পত্রে এবং খাদ্য-শস্যে লেগেছিল। তাছাড়া দেহের সর্বত্র সর্বদা উকুনের কামড়ে তারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। এভাবে উকুন ও ঘুণপোকার অত্যাচারে দিশেহারা হয়ে এক সময় তারা কাঁদতে কাঁদতে মূসা (আঃ)-এর দরবারে এসে লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা চাইতে লাগলো এবং প্রতিজ্ঞার পরে প্রতিজ্ঞা করে বলতে লাগলো যে, এবারে আযাব ফিরে গেলে তারা অবশ্যই ঈমান আনবে, তাতে বিন্দুমাত্র অন্যথা হবে না। মূসা (আঃ) তাদের জন্য দো‘আ করলেন এবং আযাব চলে গেল। কিন্তু তারা কিছু দিনের মধ্যেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করল এবং পূর্বের ন্যায় অবাধ্য আচরণ শুরু করল। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বারবার অবকাশ দেওয়াকে তারা তাদের ভালত্বের পক্ষে দলীল হিসাবে মনে করতে লাগল এবং হেদায়াত দূরে থাক, তাদের অহংকার ক্রমে বাড়তে লাগল। মূলতঃ এগুলো ছিল তাদের নেতৃস্থানীয় লোকদের অবস্থা। নইলে সাধারণ মানুষ মূসা ও হারূণের দাওয়াত অন্তরে কবুল করে যাচ্ছিল এবং তাদের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি

পাচ্ছিল। আর এতেই ছিল মূসা (আঃ)-এর সান্ত্বনা। আল্লাহ বলেন, وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا– (الإسراء ١٦)– 'যখন আমরা কোন জনপদকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করি, তখন সেখানকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে উদ্বুদ্ধ করি। অতঃপর তারা পাপাচারে লিপ্ত হয়। ফলে উক্ত জনগোষ্ঠীর উপরে আদেশ অবধারিত হয়ে যায়। অতঃপর আমরা উক্ত জনপদকে সমূলে বিধ্বস্ত করি' *(ইসরা ১৭/১৬)*। ফেরাঊনীদের উপরে সেই অবস্থা এসে গিয়েছিল। তাদের নেতারা স্বাভাবিক বুদ্ধি-বিবেচনা হারিয়ে ফেলেছিল। তারা তাদের লোকদের বুঝাতে লাগলো যে, এসবই মূসার জাদুর খেল। আসলে আল্লাহ বলে কিছুই নেই। ফলে নেমে এল এবার 'ব্যাঙ'-এর গযব।

৫ম নিদর্শন : ব্যাঙ

বারবার বিদ্রোহ করা সত্ত্বেও দয়ালু আল্লাহ তাদের সাবধান করার জন্য ও আল্লাহ্র পথে ফিরিয়ে আনার জন্য পুনরায় গযব পাঠালেন। এবার এল ব্যাঙ। ব্যাঙে ব্যাঙে ভরে গেল তাদের ঘর-বাড়ি, হাড়ি-পাতিল, জামা-কাপড়, বিছানা-পত্তর সবকিছু। বসতে ব্যাঙ, খেতে ব্যাঙ, চলতে ব্যাঙ, গায়ে-মাথায় সর্বত্র ব্যাঙের লাফালাফি। কোন জায়গায় বসা মাত্র শত শত ব্যাঙের নীচে তলিয়ে যেতে হ'ত। এই নরম জীবটির সরস অত্যাচারে পাগলপরা হয়ে উঠল পুরা ফেরাঊনী জনপদ। অবশেষে কান্নাকাটি করে ও কাকুতি-মিনতি করে তারা এসে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলো মূসা (আঃ)-এর কাছে। এবার পাকাপাকি ওয়াদা করল যে, আযাব চলে যাবার সাথে সাথে তারা ঈমান আনবেই। কিন্তু না, যথা পূর্বং তথা পরং। ফলে পুনরায় গযব অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল। এবারে এল 'রক্ত'।

৬ষ্ঠ নিদর্শন : রক্ত

তাদের অহংকার ও ঔদ্ধত্য চরমে উঠলে হঠাৎ একদিন দেখা গেল 'রক্ত'। খাদ্য ও পানপাত্রে রক্ত, কূয়া ও পুকুরে রক্ত, তরি-তরকারিতে রক্ত, কলসি-বালতিতে রক্ত। একই সাথে খেতে বসে বনু ইস্রাঈলের থালা-বাটি স্বাভাবিক। কিন্তু ফেরাঊনী ক্বিবতীর থালা-বাটি রক্তে ভরা। পানি মুখে নেওয়া মাত্র গ্লাসভর্তি রক্ত। অহংকারী নেতারা বাধ্য হয়ে বনু ইস্রাঈলী মযলূমদের

বাড়ীতে এসে খাদ্য ও পানি ভিক্ষা চাইত। কিন্তু যেমনি তাদের হাতে তা পৌঁছত, অমনি সেগুলো রক্তে পরিবর্তিত হয়ে যেত। ফলে তাদের খাওয়া-দাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। না খেয়ে তাদের মধ্যে হাহাকার পড়ে গেল। অবশেষে পূর্বের ন্যায় আবার এসে কান্নাকাটি। মূসা (আঃ) দয়া পরবশে আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করলেন। ফলে আযাব চলে গেল। কিন্তু ঐ নেতাগুলো পূর্বের মতই তাদের গোমরাহীতে অনড় রইল এবং ঈমান আনলো না। এদের এই হঠকারিতা ও কপট আচরণের কথা আল্লাহ বর্ণনা করেন এভাবে, فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ-(الأعراف ١٣٣)- 'অতঃপর তারা আত্মম্ভরিতা দেখাতে লাগলো। বস্তুতঃ এরা ছিল পাপাসক্ত জাতি' *(আ'রাফ ৭/১৩৩)*। ফলে নেমে এল এবার প্লেগ মহামারী।

৭ম নিদর্শন : প্লেগ

রক্তের আযাব উঠিয়ে নেবার পরও যখন ওরা ঈমান আনলো না, তখন আল্লাহ ওদের উপরে প্লেগ মহামারী প্রেরণ করেন *(আ'রাফ ৭/১৩৪)*। অনেকে এটাকে 'বসন্ত' রোগ বলেছেন। যাতে অল্প দিনেই তাদের সত্তর হাযার লোক মারা যায়। অথচ বনু ইস্রাঈলরা ভাল থাকে। এলাহী গযবের সাথে সাথে এগুলি ছিল মূসা (আঃ)-এর মু'জেযা এবং নবুঅতের নিদর্শন। কিন্তু জাহিল ও আত্মগর্বী নেতারা একে 'জাদু' বলে তাচ্ছিল্য করত।

প্লেগের মহামারীর ফলে ব্যাপক প্রাণহানিতে ভীত হয়ে তারা আবার এসে মূসা (আঃ)-এর নিকটে হাত জোড় করে ক্ষমা চাইতে লাগল। মূসা (আঃ) আবারও তাদের জন্য দো'আ করলেন। ফলে আযাব চলে গেল। কিন্তু তারা পূর্বের ন্যায় আবারো ওয়াদা ভঙ্গ করল। ফলে তাদের চূড়ান্ত ধ্বংস অবধারিত হয়ে গেল। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ- وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الأَلِيْمَ- (يونس ٩٦-٩٧)- 'নিশ্চয়ই যাদের উপরে তোমার প্রভুর আদেশ নির্ধারিত হয়ে গেছে, তারা কখনো বিশ্বাস আনয়ন করে না, যদিও সব রকমের নিদর্শনাবলী তাদের নিকটে পৌছে যায়, এমনকি তারা মর্মান্তিক আযাব প্রত্যক্ষ করে' *(ইউনুস ১০/৯৬-৯৭)*।

৮ম নিদর্শন : সাগর ডুবি

ক্রমাগত পরীক্ষা ও অবকাশ দানের পরও যখন কোন জাতি সম্বিত ফিরে পায় না। বরং উল্টা তাদের অহংকার বাড়তে বাড়তে তুঙ্গে ওঠে, তখন তাদের চূড়ান্ত ধ্বংস অনিবার্য হয়ে ওঠে। আল্লাহ পাক বলেন,

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ يَبَساً لاَّ تَخَافُ دَرَكاً وَّلاَ تَخْشَى- (طه ٧٧)-

‘আমরা মূসার প্রতি এই মর্মে অহী করলাম যে, আমার বান্দাদের নিয়ে রাত্রিযোগে বের হয়ে যাও এবং তাদের জন্য সমুদ্রে শুষ্কপথ নির্ধারণ কর। পিছন থেকে এসে তোমাদের ধরে ফেলার আশংকা কর না এবং (পানিতে ডুবে যাওয়ার) ভয় কর না’ *(ত্বোয়াহা ২০/৭৭)*।

আল্লাহ্র হুকুম পেয়ে মূসা (আঃ) রাত্রির সূচনা লগ্নে বনু ইস্রাঈলদের নিয়ে রওয়ানা হ’লেন। তাঁরা সমুদ্রের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। এ সমুদ্র কোনটা ছিল এ ব্যাপারে মুফতী মুহাম্মাদ শফী তাফসীর রূহুল মা‘আনীর বরাত দিয়ে ৮৬০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, ওটা ছিল ‘ভূমধ্যসাগর’।[৩০] একই তাফসীরে ৪৭৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ‘লোহিত সাগর’। কিন্তু মাওলানা মওদূদী খ্যাতনামা পাশ্চাত্য মনীষী লুইস গোল্ডিং-এর তথ্যানুসন্ধান মূলক ভ্রমণ কাহিনী IN THE STEPS OF MOSSES, THE LAW GIVER -এর বরাতে লিখেছেন যে, ওটা ছিল ‘লোহিত সাগর সংলগ্ন তিক্ত হ্রদ’। মিসরের আধুনিক তাফসীরকার তানতাভীও (মৃঃ ১৯৪০ খৃঃ) বলেন যে, লোহিত সাগরে ডুবে মরা ফেরাঊনের লাশ ১৯০০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে পাওয়া গিয়েছিল’।[৩১] যদিও তা ১৯০৭ সালে পাওয়া যায়।[৩২]

উল্লেখ্য যে, হযরত ইয়াকূব (আঃ)-এর বারো জন পুত্র মিসরে এসেছিলেন। পরবর্তী চারশত বছরে তাদের বংশ বৃদ্ধি পেয়ে ইস্রাঈলী বর্ণনা অনুযায়ী ছয় লাখ ৩০ হাযার ছাড়িয়ে যায়। মাওলানা মওদূদী বলেন, ঐ সময় মিসরে মুসলিম অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ১০ থেকে ২০ শতাংশের মাঝামাঝি।[৩৩] তবে কুরআন ও হাদীছ থেকে কেবল এতটুকু জানা যায় যে, তাদের বারোটি গোত্র ছিল এবং প্রত্যেক গোত্রের জনসংখ্যা ছিল বিপুল।

---

৩০. ঐ, তাফসীর মা‘আরেফুল কুরআন (বঙ্গানুবাদ সংক্ষেপায়িত) পৃঃ ৮৬০।

৩১. তাফসীর জাওয়াহের (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, তাবি) ৬/৮৪ তাফসীর সূরা ইউনুস ৯২ দ্রঃ।

৩২. দ্রঃ মওলানা মওদূদী, রাসায়েল ও মাসায়েল (বঙ্গানুবাদ) ২য় সংখ্যা, ১৯৯৬, ৫/৯৮-৯৯ পৃঃ।

৩৩. রাসায়েল ও মাসায়েল ৫/৫৫০ পৃঃ।

নবুঅত-পরবর্তী ৩য় পরীক্ষা ও নাজাত লাভ

মূসার নবুঅতী জীবনে এটি ছিল একটি চূড়ান্ত পরীক্ষা। ইবরাহীমের অগ্নি পরীক্ষার ন্যায় এটিও ছিল জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে এক মহা পরীক্ষা। পিছনে ফেরাঊনের হিংস্র বাহিনী, সম্মুখে অথৈ সাগর। এই কঠিন সময়ে বনু ইস্রাঈলের আতংক ও হাহাকারের মধ্যেও মূসা ছিলেন স্থির ও নিস্কম্প। দৃঢ় হিমাদ্রির ন্যায় তিনি আল্লাহ্র উপরে বিশ্বাসে অটল থাকেন এবং সাথীদের সান্ত্বনা দিয়ে আল্লাহ্র রহমত কামনা করেন। হিজরতের রাতে একইরূপ জীবন-মরণ পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)।

যাই হোক ফেরাঊন খবর জানতে পেরে তার সেনাবাহিনীকে বনু ইস্রাঈলদের পশ্চাদ্ধাবনের নির্দেশ দিল। আল্লাহ বলেন,

فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ- فَلَمَّا تَرَاءى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ- قَالَ كَلاَّ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ- فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ- وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ- وَأَنجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ- ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ- (الشعراء ٦٠-٦٦)-

'সূর্যোদয়ের সময় তারা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল' *(শো'আরা ২৬/৬০)*। 'অতঃপর যখন উভয় দল পরস্পরকে দেখল, তখন মূসার সঙ্গীরা (ভীত হয়ে) বলল, إِنَّا لَمُدْرَكُونَ 'আমরা তো এবার নিশ্চিত ধরা পড়ে গেলাম' *(৬১)*। 'তখন মূসা বললেন, কখনই নয়, আমার সাথে আছেন আমার পালনকর্তা। তিনি আমাকে সত্বর পথ প্রদর্শন করবেন'*(৬২)*। 'অতঃপর আমরা মূসাকে আদেশ করলাম, তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রকে আঘাত কর। ফলে তা বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং প্রত্যেক ভাগ বিশাল পাহাড় সদৃশ হয়ে গেল'*(৬৩)*। 'ইতিমধ্যে আমরা সেখানে অপরদলকে (অর্থাৎ ফেরাঊন ও তার সেনাবাহিনীকে) পৌঁছে দিলাম'*(৬৪)*। 'এবং মূসা ও তার সঙ্গীদের সবাইকে বাঁচিয়ে দিলাম'*(৬৫)*। 'অতঃপর অপর দলটিকে ডুবিয়ে দিলাম' *(শো'আরা ২৬/৬০-৬৬)*।

এখানে 'প্রত্যেক ভাগ' বলতে তাফসীরকারগণ বারো গোত্রের জন্য বারোটি ভাগ বলেছেন। প্রত্যেক ভাগের লোকেরা পানির দেওয়াল ভেদ করে পরস্পরকে দেখতে পায় ও কথা বলতে পারে, যাতে তারা ভীত না হয়ে পড়ে। আমরা মনে করি এগুলো কল্পনা না করলেও চলে। বরং উপরে বর্ণিত কুরআনী বক্তব্যের উপরে ঈমান আনাই যথেষ্ট। সাড়ে ছয় লক্ষ লোক এবং

তাদের সওয়ারী ও গবাদি পশু ও সাংসারিক দ্রব্যাদি নিয়ে নদী পার হবার জন্য যে বিরাট এলাকা প্রয়োজন, সেই এলাকাটুকু বাদে দু’পাশে দু’ভাগে যদি সাময়িকভাবে পানি দাঁড়িয়ে থাকে, তবে সেটাতে বিশ্বাস করাই শ্রেয়। ২০০৪ সালের ২৬শে ডিসেম্বরে ইন্দোনেশিয়া ও শ্রীলংকার সাগরে যে ‘সুনামী’ (TSUNAMI) হয়ে গেল, তাতে ৩৩ ফুট উঁচু ঢেউ দীর্ঘ সময় যাবত দাঁড়িয়ে ছিল বলে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তাই মূসার যামানায় সাগর বিদীর্ণ হয়ে তলদেশ থেকে দু’পাশে পানি দাঁড়িয়ে থাকা মোটেই বিচিত্র নয়। আল্লাহ্র হুকুমে সবকিছুই হওয়া সম্ভব।

মূসা ও বনু ইস্রাঈলকে সাগর পাড়ি দিয়ে ওপারে চলে যেতে দেখে ফেরাঊন সরোষে ঘোড়া দাবড়িয়ে সর্বাগ্রে শুষ্ক সাগর বক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পিছনে তার বিশাল বাহিনীর সবাই সাগরের মধ্যে নেমে এলো। যখন তারা সাগরের মধ্যস্থলে পৌঁছে গেল, তখন আল্লাহ্র হুকুমে দু’দিক থেকে বিপুল পানি রাশি ধেয়ে এসে তাদেরকে নিমেষে গ্রাস করে ফেলল। আল্লাহ বলেন, فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ- (طه ٧٨)- ‘অতঃপর ফেরাঊন তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল। কিন্তু সমুদ্র তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে ফেলল’ *(ত্বোয়াহা ২০/৭৮)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْياً وَعَدْواً حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لآ إِلَهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ- (يونس ٩٠)-

‘আর বনু ইস্রাঈলকে আমরা সাগর পার করে দিলাম। তারপর তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল ফেরাঊন ও তার সেনাবাহিনী বাড়াবাড়ি ও শত্রুতা বশতঃ। অতঃপর যখন সে (ফেরাঊন) ডুবতে লাগল, তখন বলে উঠল, আমি ঈমান আনছি এ বিষয়ে যে, সেই সত্তা ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, যার উপরে ঈমান এনেছে বনু ইস্রাঈলগণ এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের একজন’ *(ইউনুস ১০/৯০)*। আল্লাহ বললেন,

آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ- فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ- (يونس ٩١-٩٢)-

آلْآنَ 'এখন একথা বলছ? অথচ তুমি ইতিপূর্বে না-ফরমানী করেছিলে এবং ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে'। 'অতএব আজ আমরা তোমার দেহকে (বিনষ্ট হওয়া থেকে) বাঁচিয়ে দিচ্ছি। যাতে তোমার পশ্চাদ্বর্তীদের জন্য তুমি নিদর্শন হ'তে পার। বস্তুতঃ বহু লোক এমন রয়েছে যারা আমাদের নিদর্শনাবলীর বিষয়ে বেখবর' *(ইউনুস ১০/৯১-৯২)*।

স্মর্তব্য যে, সাগরডুবির দৃশ্য স্বচক্ষে দেখার পরেও ভীত-সন্ত্রস্ত বনু ইস্রাঈলীরা ফেরাঊন মরেছে কি-না বিশ্বাস করতে পারছিল না। ফলে মূসা (আঃ) আল্লাহ্র নিকট দো'আ করলেন। তখন আল্লাহ তার প্রাণহীন দেহ বের করে দিলেন। অতঃপর মূসার সাথীরা নিশ্চিন্ত হ'ল।[৩৪]

উল্লেখ্য যে, ফেরাঊনের মমিকৃত দেহ অক্ষতভাবে পাওয়া যায় ১৯০৭ সালে এবং বর্তমানে তা মিসরের পিরামিডে রক্ষিত আছে।

এতে একথাও প্রমাণিত হয় যে, ফেরাঊনের সময় মিসরীয় সভ্যতা অনেক উন্নত ছিল। তাদের সময়ে লাশ 'মমি' করার মত বৈজ্ঞানিক কলাকৌশল আবিষ্কৃত হয়। পিরামিড, স্ফিংক্স হাযার হাযার বছর ধরে আজও সেই প্রাচীন সভ্যতার স্মৃতি ধারণ করে আছে, যা নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর। আজকের যুগের কোন কারিগর প্রাচীন এসব কারিগরী কলা-কৌশলের ধারে-কাছেও যেতে পারবে কি-না সন্দেহ।

আশূরার ছিয়াম :

ফেরাঊনের সাগরডুবি ও মূসার মুক্তি লাভের এ অলৌকিক ঘটনাটি ঘটেছিল ১০ই মুহাররম আশূরার দিন। এ দিনের স্মরণে আল্লাহ্র শুকরিয়া স্বরূপ মূসা (আঃ) ও বনু ইস্রাঈলগণ প্রতি বছর এ দিন একটি নফল ছিয়াম পালন করেন। এই ছিয়াম যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। জাহেলী আরবেও এ ছিয়াম চালু ছিল। নবুঅত-পূর্ব কালে ও পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আশূরার ছিয়াম রাখতেন। ২রা হিজরীতে রামাযানের ছিয়াম ফরয হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আশূরার ছিয়াম মুসলমানদের জন্য 'ফরয' ছিল। এরপরে এটি নফল ছিয়ামে পরিণত হয়।[৩৫] হিজরতের পর মদীনায় ইহুদীদের এ ছিয়াম পালন করতে দেখে

---

৩৪. হাদীছুল ফুতূন, তাফসীর ইবনু কাছীর, ত্বোয়াহা ৩৯।
৩৫. মুসলিম, মিশকাত হা/২০৬৯ 'ছওম' অধ্যায়, 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ-৬।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমরাই মূসা (আঃ)-এর নাজাতে শুকরিয়া আদায় করার অধিক হকদার। আগামী বছর বেঁচে থাকলে আমি ৯ তারিখে (অর্থাৎ ৯ ও ১০ দু'দিন) ছিয়াম পালন করব'।[৩৬] অন্য হাদীছে ১০ ও ১১ দু'দিন ছিয়াম পালনের কথাও এসেছে।[৩৭] অতএব নাজাতে মূসার শুকরিয়া আদায়ের নিয়তে নফল ছিয়াম হিসাবে ১০ তারিখ সহ উক্ত দু'দিন অথবা কেবল ১০ই মুহাররম তারিখে আশূরার ছিয়াম পালন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কর্তব্য। এ ছিয়ামের ফলে মুমিনের বিগত এক বছরের সকল ছগীরা গুনাহ মাফ হয়ে যাবার কথা হাদীছে এসেছে।[৩৮]

উল্লেখ্য যে, ১০ই মুহাররম তারিখে পৃথিবীতে আরও বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ন্যায় ৬১ হিজরী সনে হযরত হোসায়েন (রাঃ)-এর মর্মান্তিক শাহাদাতের ঘটনাও ঘটেছে। কিন্তু সেজন্য নফল ছিয়াম পালনের বা কোন অনুষ্ঠান বা দিবস পালনের বিধান ইসলামে নেই। অতএব আশূরার ছিয়াম পালনের নিয়ত হবে 'নাজাতে মূসার শুকরিয়া' হিসাবে, 'শাহাদাতে হোসায়েন-এর শোক' হিসাবে নয়। এরূপ নিয়ত করলে নেকীর বদলে গোনাহ হবে।

বনু ইস্রাঈলের পরবর্তী গন্তব্য :

আল্লাহ বলেন,

فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غَافِلِيْنَ- وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِيْ بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوْا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ- (الأعراف ١٣٦-١٣٧)-

'ফলে আমরা তাদের কাছ থেকে (অর্থাৎ ফেরাঊনীদের কাছ থেকে) বদলা নিলাম ও তাদেরকে সাগরে ডুবিয়ে মারলাম। কারণ তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল আমাদের নিদর্শন সমূহকে ও তার প্রতি অনীহা প্রদর্শন করেছিল'। 'আর যাদেরকে দুর্বল মনে করা হ'ত, তাদেরকে আমরা উত্তরাধিকার দান

৩৬. মুসলিম, মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০৪১, ২০৬৭।
৩৭. বায়হাক্বী ৪/২৮৭; মির'আত ৭/৪৬।
৩৮. মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৪, 'ছওম' অধ্যায় 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ-৬।

করলাম সেই ভূখণ্ডের পূর্বের ও পশ্চিমের, যাতে আমরা বরকত নিহিত রেখেছি এবং এভাবে পূর্ণ হয়ে গেল তোমার প্রভুর (প্রতিশ্রুত) কল্যাণময় বাণীসমূহ বনু ইস্রাঈলীদের জন্য তাদের ধৈর্যধারণের কারণে। আর ধ্বংস করে দিলাম সে সবকিছু, যা তৈরী করেছিল ফেরাঊন ও তার সম্প্রদায় এবং যা কিছু তারা নির্মাণ করেছিল' *(আ'রাফ ৭/১৩৬-১৩৭)*।

উপরোক্ত আয়াত দু'টিতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি পরিস্ফুট হয়। (১) অহংকার ও সীমালংঘনের কারণে ফেরাঊন ও তার সাথীদেরকে ডুবিয়ে মারা হয় এবং তাদের সভ্যতার সুউচ্চ নির্মাণাদি ধ্বংস হয় (২) আল্লাহ্র উপরে পূর্ণ আস্থা ও ফেরাউনের যুলুমে ধৈর্যধারণের পুরস্কার হিসাবে বনু ইস্রাঈলগণকে উদয়াচল ও অস্তাচল সমূহের উপরে কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়। (৩) এখানে الَّذِينَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُونَ 'যাদেরকে হীন মনে করা হয়েছিল' বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা যে জাতির বা যে ব্যক্তির সহায় থাকেন, বাহ্যিক অবস্থাদৃষ্টে লোকেরা তাদের দুর্বল ভেবে বসে। কিন্তু আসলে তারা মোটেই হীন ও দুর্বল নয়। কারণ প্রকৃত শক্তি ও মর্যাদা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র হাতে। এখানে বাহ্যিক দৃষ্টিতে ফেরাঊন সবল হ'লেও আল্লাহ্র সাহায্য পাওয়ায় বনু ইস্রাঈলগণ অবশেষে বিজয়ী হয়েছে। এ কারণে হযরত হাসান বছরী বলেন, অত্র আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে এ বিষয়ে যে, মানুষ যদি এমন কোন লোক বা দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হয়, যাকে প্রতিহত করা তার ক্ষমতার বাইরে, তবে সে ক্ষেত্রে কৃতকার্যতা ও কল্যাণের সঠিক পথ হ'ল তার মুকাবিলা না করে ছবর করা। কেননা যখন সে যুলুমের পাল্টা যুলুমের মাধ্যমে প্রতিশোধ নেবার চিন্তা করে, আল্লাহ তখন তাকে তার শক্তি-সামর্থ্যের উপরে ছেড়ে দেন। পক্ষান্তরে যখন সে তার মুকাবিলায় ছবর করে এবং আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করে, তখন আল্লাহ স্বয়ং তার জন্য রাস্তা খুলে দেন'।

বনু ইস্রাঈলগণ মূসা (আঃ)-এর পরামর্শে আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করেছিল, رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এ যালেম কওমের ফেৎনায় নিক্ষেপ করো না'। 'এবং আমাদেরকে অনুগ্রহ করে কাফের সম্প্রদায়ের কবল থেকে মুক্তি

দাও’ *(ইউনুস ১০/৮৫-৮৬)*। বস্তুতঃ আল্লাহ তাদের প্রার্থনা কবুল করেছিলেন এবং যথাসময়ে তাদের মুক্তি দিয়েছিলেন।

এক্ষণে প্রশ্ন হ’ল, সাগরডুবি থেকে নাজাত পেয়েই কি বনু ইস্রাঈলগণ মিসরে প্রত্যাবর্তন করল এবং ফেরাঊনের অট্টালিকা সমূহ ধ্বংস করে ফেরাঊনী রাজত্বের মালিক বনে গেল? এ ব্যাপারে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখিত এতদসংক্রান্ত আয়াত সমূহে প্রমাণিত হয় যে, মূসা (আঃ) ও বনু ইস্রাঈলগণ ঐসময় মিসরে ফিরে যাননি। বরং তাঁরা আদি বাসস্থান কেন‘আনের উদ্দেশ্যে শাম-এর দিকে রওয়ানা হয়েছিলেন। অতঃপর পথিমধ্যে তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয় জিহাদ করে তাদের আদি বাসস্থান কেন‘আন দখল করার জন্য। সেখানে তখন আমালেক্বাদের রাজত্ব ছিল। যারা ছিল বিগত ‘আদ বংশের লোক এবং বিশালদেহী ও দুর্ধর্ষ প্রকৃতির। নবী মূসার মাধ্যমে আল্লাহ তাদের আগাম বিজয়ের সুসংবাদ দেন। তথাপি তারা ভীত হয় এবং জিহাদে যেতে অস্বীকার করে। শক্তিশালী ফেরাঊন ও তার বিশাল বাহিনীর চাক্ষুস ধ্বংস দেখেও তারা আল্লাহ্র রহমতের উপর ভরসা করতে পারেনি। ফলে আল্লাহ্র অবাধ্যতার শাস্তিস্বরূপ মিসর ও শামের মধ্যবর্তী তীহ্ প্রান্তরের উন্মুক্ত জেলখানায় তারা ৪০ বছর অবরুদ্ধ জীবন অতিবাহিত করতে বাধ্য হয় এবং সেখানে থাকা অবস্থাতেই হারূণ ও মূসা (আঃ)-এর মৃত্যু হয়। পরবর্তীতে মূসা (আঃ)-এর শিষ্য ও পরবর্তী নবী ইউশা‘ বিন নূন-এর নেতৃত্বে তারা জিহাদে অগ্রসর হয় এবং তার মাধ্যমে আমালেক্বাদের হারিয়ে কেন‘আন দখল করে তারা তাদের আদি বাসস্থানে ফিরে আসে। এভাবে আল্লাহ্র ওয়াদা সত্যে পরিণত হয়।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য সূরা আ‘রাফ ১৩৬-৩৭ আয়াত ছাড়াও শো‘আরা ৫৯, ক্বাছাছ ৫ ও দুখান ২৫-২৮ আয়াত সমূহে বাহ্যতঃ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, বনু ইস্রাঈলগণকে ফেরাঊনীদের পরিত্যক্ত সম্পদ সমূহের মালিক করা হয়েছিল। কিন্তু সেখানে এ বিষয়েরও সুস্পষ্ট অবকাশ বিদ্যমান রয়েছে যে, বনু ইস্রাঈলগণকে ফেরাঊনীদের ন্যায় বাগ-বাগিচা ও ধন-সম্পদের মালিক করা হয়েছিল। এর জন্য তাদের মিসরে প্রত্যাবর্তন করা যরূরী নয়। বরং

অনুরূপ বাগ-বাগিচা শাম দেশেও অর্জিত হ'তে পারে। সূরা আ'রাফের আলোচ্য ১৩৭ আয়াতে 'যাতে আমরা বরকত নিহিত রেখেছি' বলে শাম দেশকে বুঝানো হয়েছে। একই বাক্য সূরা বনু ইস্রাঈলের ১ম আয়াতেও বলা হয়েছে। সেকারণ ক্বাতাদাহ বলেন, উপরোক্ত মর্মের সকল আয়াতে শাম দেশকে বুঝানো হয়েছে। যেখানে গিয়ে বনু ইস্রাঈলগণ দুনিয়াবী শান-শওকতের মালিক হয়। পূর্বের ও পশ্চিমের বলে শামের চারপাশ বুঝানো হয়েছে। হ'তে পারে এ সময় মাশারেক্ব ও মাগারেব (পূর্ব ও পশ্চিম) তথা শাম ও মিসর উভয় ভূখণ্ডের উপরে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।[39]

প্রশ্ন হয়, ফেরাঊন ও তার সেনাবাহিনী সমূলে ধ্বংস হওয়ার পরও হযরত মূসা (আঃ) কেন মিসরে ফিরে গিয়ে তার সিংহাসন দখল করে বনু ইস্রাঈলের শাসন প্রতিষ্ঠা করলেন না? এর জবাব **প্রথমতঃ** এটাই যে, এ ব্যাপারে তিনি আল্লাহ্র নির্দেশ পাননি। **দ্বিতীয়তঃ** তাঁর দূরদর্শিতায় হয়ত এটাই প্রতীয়মান হয়েছিল যে, রাজনৈতিক বিজয়ের মাধ্যমে প্রকৃত অর্থে দ্বীনের বিজয় সম্ভব নয়। তাছাড়া দ্বীনের প্রচার-প্রসারের জন্য রাজনৈতিক সীমানা শর্ত নয়; বরং তা অঞ্চলগত সীমানা পেরিয়ে সর্বত্র প্রচার আবশ্যক। তাই তিনি মিসর এলাকায় দ্বীন প্রচারের দায়িত্ব পালন শেষে এবার শাম এলাকায় দ্বীন প্রচারের সিদ্ধান্ত নেন। **তৃতীয়তঃ** এটা হ'তে পারে যে, নবীগণের পিতা ইবরাহীম (আঃ) সহ বনু ইস্রাঈলের মূল ব্যক্তি হযরত ইয়াকূব (আঃ) ও অন্যান্য নবীগণের জন্মস্থান শাম এলাকার বরকতমণ্ডিত অঞ্চলে জীবনের শেষ মুহূর্তগুলো ব্যয় করার সুপ্ত বাসনা তাঁর মধ্যে কাজ করে থাকতে পারে। বস্তুতঃ আল্লাহ পাক তাঁর মৃত্যুর জন্য কেন'আনের মাটিকেই নির্ধারিত করেছিলেন এবং সেখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। বায়তুল মুক্বাদ্দাসের উপকণ্ঠে একটি লাল ঢিবি দেখিয়ে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর কবর নির্দেশ করেছিলেন।[৪০]

---

৩৯. *টীকা: মুফতী মুহাম্মাদ শফী স্বীয় তাফসীর মা'আরেফুল কুরআনে (বঙ্গানুবাদ সংক্ষেপায়িত) ৩২০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, মূসা (আঃ) ও বনু ইস্রাঈলগণ সাগরডুবি থেকে মুক্তি লাভের পর মিসরে আধিপত্য লাভ করেন। কিন্তু ৯৭৭ পৃষ্ঠায় বলেছেন, কুরআনের একাধিক আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে, ফেরাঊন সম্প্রদায়ের ধ্বংসের পর বনী ইসরাঈল মিসরে প্রত্যাবর্তন করেনি। ... এর পরেও ইতিহাস থেকে একথা প্রমাণিত হয় না যে, বনী ইসরাঈলগণ কোন সময় দলবদ্ধভাবে জাতিগত পরিচিতি ও মর্যাদা নিয়ে মিসরে প্রবেশ করেছিল।]*

৪০. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৭১৩ 'ক্বিয়ামতের অবস্থা' অধ্যায় ৯ অনুচ্ছেদ।*

উপরোক্ত আলোচনার উপসংহারে আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে, সাগরডুবি থেকে নাজাত পাবার পর মূসা (আঃ) ও বনু ইস্রাঈলগণ তখনই মিসরে ফিরে যাননি। বরং তারা কেন‘আনের উদ্দেশ্যে শাম অভিমুখে রওয়ানা হয়েছিলেন। শামে যাত্রাপথে এবং সেখানে পৌঁছে তাদেরকে নানাবিধ পরীক্ষার সম্মুখীন হ’তে হয়। এক্ষণে আমরা সেদিকে মনোনিবেশ করব।

বনু ইস্রাঈলের অবাধ্যতা ও তাদের উপরে আপতিত পরীক্ষা সমূহের বিবরণ:

১. মূর্তি পূজার আবদার

বনু ইস্রাঈল কওম মূসা (আঃ)-এর মু‘জেযার বলে লোহিত সাগরে নির্ঘাত ডুবে মরা থেকে সদ্য নাজাত পেয়ে এসেছিল এবং গোটা ফেরাঊনী গোষ্ঠীকে সাগরে ডুবে মরার মর্মান্তিক দৃশ্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে এসেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সিরিয়া আসার পথে কিছুদূর অগ্রসর হ’তেই তারা এমন এক জনপদের উপর দিয়ে অতিক্রম করল, যারা বিভিন্ন মূর্তির পূজায় লিপ্ত ছিল। তাদের পূজা-অর্চনার জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান দেখে তাদের মন সেদিকে আকৃষ্ট হ’ল এবং মূসা (আঃ)-এর কাছে গিয়ে আবেদন করল, اجْعَــل لَّنَــا إِلَــهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ‘তাদের মূর্তিসমূহের ন্যায় আমাদের জন্যও একটা মূর্তি বানিয়ে দিন’। মূসা বললেন, إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ‘তোমরা দেখছি মূর্খতায় লিপ্ত জাতি’। তিনি বলেন, إِنَّ هَــؤُلاءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُــونَ ‘এরা যে কাজে নিয়োজিত রয়েছে, তা ধ্বংস হবে এবং যা কিছু তারা করছে, তা সব বাতিল’। ‘তিনি আরও বললেন, أَغَيْرَ اللهِ أَبْغِيْكُمْ إِلَـــــهاً ‘আমি কি তোমাদের জন্য আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য সন্ধান করব? অথচ তিনি তোমাদেরকে সারা বিশ্বের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন’ *(আ‘রাফ ৭/১৩৮-১৪০)*।

বস্তুতঃ মানুষ সর্বদা আনুষ্ঠানিকতা প্রিয় এবং অদৃশ্য সত্তার চেয়ে দৃশ্যমান বস্তুর প্রতি অধিকতর আসক্ত। ফলে নূহ (আঃ)-এর যুগ থেকেই অদৃশ্য আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলের অসীলা কল্পনা করে নিজেদের হাতে গড়া দৃশ্যমান মূর্তি সমূহের পূজা-অর্চনা চলে আসছে। অবশেষে আল্লাহ্কে ও তাঁর বিধানকে ভুলে গিয়ে মানুষ মূর্তিকে ও নিজেদের মনগড়া বিধানকে মুখ্য গণ্য করেছে।

মক্কার মুশরিকরাও শেষনবীর কাছে তাদের মূর্তিপূজাকে আল্লাহ্র নৈকট্যের অসীলা বলে অজুহাত দিয়েছিল' *(যুমার ৩৯/৩)*। তাদের এই অজুহাত অগ্রাহ্য হয় এবং তাদের রক্ত হালাল গণ্য হয়। বদর, ওহোদ, খন্দক প্রভৃতি যুদ্ধসহ পরবর্তীকালের সকল জিহাদ মূলতঃ এই শিরকের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হয়। মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজ হাতে মূর্তি ভেঙ্গে অতঃপর পানি দিয়ে ধুয়ে কা'বা গৃহ ছাফ করেন এবং আয়াত পাঠ করেন, جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ 'সত্য এসে গেল, মিথ্যা বিদূরিত হ'ল' *(ইসরা ১৭/৮১)*।

কিন্তু দুর্ভাগ্য! মূর্তিপূজার সে স্থান আজ দখল করেছে মুসলমানদের মধ্যে কবর পূজা, ছবি-মূর্তি ও প্রতিকৃতি পূজা, স্মৃতিসৌধ, স্থানপূজা, শহীদ মিনার ও বেদী পূজা, শিখা ও আগুন পূজা ইত্যাদি। বস্তুতঃ এগুলি স্পষ্ট শিরক, যা থেকে নবীগণ যুগে যুগে মানুষকে সাবধান করেছেন। মূসা (আঃ) স্বীয় কওমকে তাদের মূর্খতাসুলভ আচরণের জন্য ধমকানোর পর তাদের হুঁশ ফিরলো এবং তারা বিরত হ'ল।

তওরাত লাভ :

অতঃপর আল্লাহ মূসাকে অহীর মাধ্যমে ওয়াদা করলেন যে, তাকে সত্বর 'কিতাব' (তওরাত) প্রদান করা হবে এবং এজন্য তিনি বনু ইস্রাঈলকে সাথে নিয়ে তাকে 'তূর পাহাড়ের দক্ষিণ পার্শ্বে' চলে আসতে বললেন *(ত্বোয়াহা ২০/৮৩-৮৪)*। অতঃপর মূসা (আঃ) আগে এসে আল্লাহ্র হুকুমে প্রথমে ত্রিশ দিন ছিয়াম ও এ'তেকাফে মগ্ন থাকেন। এরপর আল্লাহ আরও দশদিন মেয়াদ বাড়িয়ে দেন *(আ'রাফ ৭/১৪২)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এই দশদিন ছিল যিলহজ্জের প্রথম দশদিন, যা অতীব বরকতময়। ইবনু কাছীর বলেন, ১০ই যিলহজ্জ কুরবানীর দিন মূসার মেয়াদ শেষ হয় ও আল্লাহ্র সাথে কথা বলার সৌভাগ্য লাভ হয়। একই দিন শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর দ্বীন পরিপূর্ণতার আয়াত নাযিল হয় *(মায়েদাহ ৩)*।=*(ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা আ'রাফ ১৪২)*।

যথাসময়ে আল্লাহ মূসার সঙ্গে কথা বললেন *(আ'রাফ ৭/১৪৩)*। অতঃপর তাঁকে তওরাত প্রদান করলেন, যা ছিল সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী ও সরল পথ

প্রদর্শনকারী *(বাক্বারাহ ২/৫৩)*। দীর্ঘ বিশ বছরের অধিককাল পূর্বে মিসর যাওয়ার পথে এই স্থানেই মূসা প্রথম আল্লাহ্র সাথে কথোপকথনের ও নবুঅত লাভের মহা সৌভাগ্য লাভ করেন। আজ আবার সেখানেই বাক্যালাপ ছাড়াও এলাহী গ্রন্থ তওরাত পেয়ে খুশীতে অধিকতর সাহসী হয়ে তিনি আল্লাহ্র নিকটে দাবী করে বসলেন,

رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَـــكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَّخَرَّ مُوسَى صَعِقًا- فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ- (الأعراف ١٤٣)-

‘হে আমার পালনকর্তা! আমাকে দেখা দাও। আমি তোমাকে স্বচক্ষে দেখব। আল্লাহ বললেন, তুমি আমাকে (এ দুনিয়াতে) কখনোই দেখতে পাবে না। তবে তুমি (তূর) পাহাড়ের দিকে দেখতে থাক। সেটি যদি স্বস্থানে স্থির থাকে, তাহ’লে তুমি আমাকে দেখতে পাবে। অতঃপর যখন তার প্রভু উক্ত পাহাড়ের উপরে স্বীয় জ্যোতির বিকীরণ ঘটালেন, সেটিকে বিধ্বস্ত করে দিলেন এবং মূসা জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল। অতঃপর যখন তার জ্ঞান ফিরে এল, তখন বলল, হে প্রভু! মহা পবিত্র তোমার সত্তা! আমি তোমার নিকটে তওবা করছি এবং আমি বিশ্বাসীদের মধ্যে অগ্রণী’ *(আ‘রাফ ৭/১৪৩)*।

আল্লাহ বললেন,

قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاَتِي وَبِكَلاَمِيْ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ (١٤٤) وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيْلاً لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيْكُمْ دَارَ الْفَاسِقِيْنَ (الأعراف ١٤٤-١٤٥)-

হে মূসা! আমি আমার ‘রিসালাত’ তথা বার্তা পাঠানোর মাধ্যমে এবং বাক্যালাপের মাধ্যমে লোকদের (নবীগণের) উপরে তোমাকে বিশিষ্টতা দান করেছি। সুতরাং যা কিছু আমি তোমাকে দান করলাম তা গ্রহণ কর ও কৃতজ্ঞ থাক’। ‘আর আমরা তার জন্য ফলক সমূহে লিখে দিয়েছিলাম সর্বপ্রকার উপদেশ ও সকল বিষয় বিস্তারিতভাবে। অতএব

তুমি এগুলিকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং স্বজাতিকে এর কল্যাণকর বিষয়সমূহ দৃঢ়তার সাথে পালনের নির্দেশ দাও। শীঘ্রই আমি তোমাদেরকে দেখাব পাপাচারীদের বাসস্থান' *(আ'রাফ ৭/১৪৪-১৪৫)*।

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, তখতী বা ফলকে লিখিত অবস্থায় তাঁকে কিতাব প্রদান করা হয়েছিল। আর এই তখতীগুলোর নামই হ'ল 'তওরাত'।

(২) গো-বৎস পূজা :

মূসা যখন বনী ইস্রাঈলকে নিয়ে তূর পাহাড়ের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। তখন তিনি হারূণ (আঃ)-কে কওমের দায়িত্ব দিয়ে গেলেন এবং তাদেরকে পশ্চাতে আসার নির্দেশ দিয়ে নিজে আগে চলে গেলেন এবং সেখানে গিয়ে ৪০ দিন ছিয়াম ও ই'তেকাফে কাটানোর পরে তওরাত লাভ করলেন। তাঁর ধারণা ছিল যে, তার কওম নিশ্চয়ই তার পিছে পিছে তূর পাহাড়ের সন্নিকটে এসে শিবির স্থাপন করেছে। কিন্তু তাঁর ধারণা ছিল সম্পূর্ণ ভুল।

আল্লাহ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوْسَى- قَالَ هُمْ أُولاَءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى- قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ- (طه ٨٣-٨٥)- 'হে মূসা! তোমার সম্প্রদায়কে পিছনে ফেলে তুমি দ্রুত চলে এলে কেন?' 'তিনি বললেন, তারা তো আমার পিছে পিছেই আসছে এবং হে প্রভু! আমি তাড়াতাড়ি তোমার কাছে এলাম, যাতে তুমি খুশী হও'। আল্লাহ বললেন, 'আমি তোমার সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছি তোমার পর এবং সামেরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে' *(ত্বোয়াহা ২০/৮৩-৮৫)*।

একথা জেনে মূসা (আঃ) হতভম্ব হয়ে গেলেন এবং দুঃখে ও ক্ষোভে অস্থির হয়ে নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেলেন। যেমন আল্লাহ বলেন,

فَرَجَعَ مُوْسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي- قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ- فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا

–(طه ٨٦–٨٨) –هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ ‘অতঃপর মূসা তার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেলেন ক্রুদ্ধ ও অনুতপ্ত অবস্থায়। তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের পালনকর্তা কি তোমাদের একটি উত্তম প্রতিশ্রুতি (অর্থাৎ তওরাৎ দানের প্রতিশ্রুতি) দেননি? তবে কি প্রতিশ্রুতির সময়কাল (৪০ দিন) তোমাদের কাছে দীর্ঘ হয়েছে? না-কি তোমরা চেয়েছ যে তোমাদের উপর তোমাদের পালনকর্তার ক্রোধ নেমে আসুক, যে কারণে তোমরা আমার সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করলে’? *(৮৬)* ‘তারা বলল, আমরা আপনার সাথে কৃত ওয়াদা স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করিনি। কিন্তু আমাদের উপরে ফেরাঊনীদের অলংকারের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর আমরা তা নিক্ষেপ করে দিয়েছি এমনিভাবে সামেরীও নিক্ষেপ করেছে’*(৮৭)*। ‘অতঃপর সে তাদের জন্য (সেখান থেকে) বের করে আনলো একটা গো-বৎসের অবয়ব, যার মধ্যে হাম্বা হাম্বা রব ছিল। অতঃপর (সামেরী ও তার লোকেরা) বলল, এটাই তোমাদের উপাস্য এবং মূসারও উপাস্য, যা পরে মূসা ভুলে গেছে’ *(ত্বোয়াহা ২০/৮৬-৮৮)*।

ঘটনা ছিল এই যে, মিসর থেকে বিদায়ের দিন যাতে ফেরাঊনীরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন না করে এবং তারা কোনরূপ সন্দেহ না করে, সেজন্য (মূসাকে লুকিয়ে) বনু ইস্রাঈলরা প্রতিবেশী ক্বিবতীদের কাছ থেকে অলংকারাদি ধার নেয় এই কথা বলে যে, আমরা সবাই ঈদ উৎসব পালনের জন্য যাচ্ছি। দু’একদিনের মধ্যে ফিরে এসেই তোমাদের সব অলংকার ফেরৎ দিব। কিন্তু সাগর পার হওয়ার পর যখন আর ফিরে যাওয়া হ’ল না, তখন কুটবুদ্ধি ও মূসার প্রতি কপট বিশ্বাসী সামেরী মনে মনে এক ফন্দি আটলো যে, এর দ্বারা সে বনু ইস্রাঈলদের পথভ্রষ্ট করবে। অতঃপর মূসা (আঃ) যখন তার সম্প্রদায়কে হারূণের দায়িত্বে দিয়ে নিজে আগেভাগে তূর পাহাড়ে চলে যান, তখন সামেরী সুযোগ বুঝে তার ফন্দি কাজে লাগায়। সে ছিল অত্যন্ত চতুর। সাগর ডুবি থেকে নাজাত পাবার সময় সে জিব্রীলের অবতরণ ও তার ঘোড়ার প্রতি লক্ষ্য করেছিল। সে দেখেছিল যে, জিব্রীলের ঘোড়ার পা যে মাটিতে পড়ছে, সে স্থানের মাটি সজীব হয়ে উঠছে ও তাতে জীবনের স্পন্দন জেগে উঠছে। তাই সবার অলক্ষ্যে এ পদচিহ্নের এক মুঠো মাটি সে তুলে সযতনে রেখে দেয়।

মূসা (আঃ) চলে যাবার পর সে লোকদের বলে যে, ‘তোমরা ফেরাউনীদের যেসব অলংকারাদি নিয়ে এসেছ এবং তা ফেরত দিতে পারছ না, সেগুলি ভোগ-ব্যবহার করা তোমাদের জন্য হালাল হবে না। অতএব এগুলি একটি গর্তে নিক্ষেপ করে জ্বালিয়ে দাও’। কথাটি অবশেষে হারূণ (আঃ)-এর কর্ণগোচর হয়। নাসাঈ-তে বর্ণিত ‘হাদীছুল ফুতূনে’ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, হযরত হারূণ (আঃ) সব অলংকার একটি গর্তে নিক্ষেপ করে জ্বালিয়ে দেবার নির্দেশ দেন, যাতে সেগুলি একটি অবয়বে পরিণত হয় এবং মূসা (আঃ)-এর ফিরে আসার পর এ সম্পর্কে করণীয় নির্ধারণ করা যায়। হযরত হারূণ (আঃ)-এর নির্দেশ মতে সবাই যখন অলংকার গর্তে নিক্ষেপ করছে, তখন সামেরীও হাতের মুঠি বন্ধ করে সেখানে পৌঁছল এবং হযরত হারূণ (আঃ)-কে বলল, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হৌক- এই মর্মে আপনি দো‘আ করলে আমি নিক্ষেপ করব, নইলে নয়।’ হযরত হারূণ তার কপটতা বুঝতে না পেরে সরল মনে দো‘আ করলেন। আসলে তার মুঠিতে ছিল জিব্রীলের ঘোড়ার পায়ের সেই অলৌকিক মাটি। ফলে উক্ত মাটির প্রতিক্রিয়ায় হৌক কিংবা হযরত হারূণের দো‘আর ফলে হৌক- সামেরীর উক্ত মাটি নিক্ষেপের পরপরই গলিত অলংকারাদির অবয়বটি একটি গো-বৎসের রূপ ধারণ করে হাম্বা হাম্বা রব করতে থাকে। মুনাফিক সামেরী ও তার সঙ্গী-সাথীরা এতে উল্লসিত হয়ে বলে উঠল, هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَــسِيَ ‘এটাই হ’ল তোমাদের উপাস্য ও মূসার উপাস্য। যা সে পরে ভুলে গেছে’ *(ত্বোয়াহা ২০/৮৮)*।

মূসা (আঃ)-এর তূর পাহাড়ে গমনকে সে অপব্যাখ্যা দিয়ে বলল, মূসা বিভ্রান্ত হয়ে আমাদের ছেড়ে কোথাও চলে গিয়েছে। এখন তোমরা সবাই গো-বৎসের পূজা কর’। কিছু লোক তার অনুসরণ করল। বলা হয়ে থাকে যে, বনু ইস্রাঈল এই ফিৎনায় পড়ে তিন দলে বিভক্ত হয়ে গেল। ফলে মূসা (আঃ)-এর পিছে পিছে তূর পাহাড়ে গমনের প্রক্রিয়া পথিমধ্যেই বানচাল হয়ে গেল।

হারূণ (আঃ) তাদেরকে বললেন, وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي- قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى- (طه ٩٠-٩١)- কওম! তোমরা এই

গো-বৎস দ্বারা পরীক্ষায় পতিত হয়েছ। তোমাদের পালনকর্তা অতীব দয়ালু। অতএব তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মেনে চল’*(৯০)*। কিন্তু সম্প্রদায়ের লোকেরা বলল, ‘মূসা আমাদের কাছে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা এর পূজায় রত থাকব’ *(ত্বোয়াহা ২০/৯০-৯১)*।

অতঃপর মূসা (আঃ) এলেন এবং সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে সব কথা শুনলেন। হারূণ (আঃ)ও তাঁর বক্তব্য পেশ করলেন। সামেরীও তার কপটতার কথা অকপটে স্বীকার করল। অতঃপর মূসা (আঃ) আল্লাহ্র হুকুম অনুযায়ী শাস্তি ঘোষণা করলেন।

গো-বৎস পূজার শাস্তি :

মূসা (আঃ) গো-বৎস পূজায় নেতৃত্ব দানকারী হঠকারী লোকদের মৃত্যুদণ্ড দিলেন। যেমন আল্লাহ বলেন, ‘আর যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলল, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَـى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ... হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা গো-বৎসকে উপাস্য নির্ধারণ করে নিজেদের উপরে যুলুম করেছ। অতএব এখন তোমাদের প্রভুর নিকটে তওবা কর এবং নিজেদেরকে পরস্পরে হত্যা কর। এটাই তোমাদের জন্য তোমাদের স্রষ্টার নিকটে কল্যাণকর’... *(বাক্বারাহ ২/৫৪)*। এভাবে তাদের কিছু লোককে হত্যা করা হয়, কিছু লোক ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়।

তূর পাহাড় তুলে ধরা হ’ল :

এরপরেও কপট বিশ্বাসী ও হঠকারী কিছু লোক থাকে, যারা তওরাতকে মানতে অস্বীকার করে। ফলে তাদের মাথার উপরে আল্লাহ তূর পাহাড়ের একাংশ উঁচু করে ঝুলিয়ে ধরেন এবং অবশেষে নিরুপায় হয়ে তারা সবাই আনুগত্য করতে স্বীকৃত হয়। যেমন আল্লাহ বলেন, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَـا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ خُذُوْا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ- (البقرة ٦٣)-

‘আর যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তূর পাহাড়কে তোমাদের মাথার উপরে তুলে ধরেছিলাম এই বলে যে, তোমাদের

যে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তা মযবুতভাবে ধারণ কর এবং এতে যা কিছু রয়েছে তা স্মরণে রাখ, যাতে তোমরা আল্লাহভীরু হ'তে পার' *(বাক্বারাহ ২/৬৩)*। কিন্তু গো-বৎসের মহব্বত এদের হৃদয়ে এমনভাবে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, এতকিছুর পরেও তারা শিরক ছাড়তে পারেনি। আল্লাহ বলেন, وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ 'কুফরের কারণে তাদের অন্তরে গোবৎস প্রীতি পান করানো হয়েছিল' *(বাক্বারাহ ২/৯৩)*। যেমন কেউ সরাসরি শিরকে নেতৃত্ব দিয়েছে, কেউবা মুখে তওবা করলেও অন্তরে পুরোপুরি তওবা করেনি। কেউবা শিরককে ঘৃণা করতে পারেনি। কেউ বা মনে মনে ঘৃণা করলেও বাহ্যিকভাবে মেনে নিয়েছিল এবং বাধা দেওয়ার কোন চেষ্টা করেনি। আল্লাহ যখন তূর পাহাড় তুলে ধরে ভয় দেখিয়ে তাদের আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি নেন, তখনও তাদের কেউ কেউ (পরবর্তীতে) বলেছিল, سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا 'আমরা শুনলাম ও অমান্য করলাম' *(বাক্বারাহ ২/৯৩)*। যদিও অমান্য করলাম কথাটি ছিল পরের এবং তা প্রমাণিত হয়েছিল তাদের বাস্তব ক্রিয়াকর্মে। যেমন আল্লাহ এইসব প্রতিশ্রুতি দানকারীদের পরবর্তী আচরণ সম্বন্ধে বলেন,

ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلاَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِنَ الْخَاسِرِينَ- (البقرة ٦٤)-

'অতঃপর তোমরা উক্ত ঘটনার পরে (তোমাদের প্রতিশ্রুতি থেকে) ফিরে গেছ। যদি আল্লাহ্র বিশেষ করুণা ও অনুগ্রহ তোমাদের উপরে না থাকত, তাহ'লে অবশ্যই তোমরা ধ্বংস হয়ে যেতে' *(বাক্বারাহ ২/৬৪)*।

সামেরীর কৈফিয়ত :

সম্প্রদায়ের লোকদের শাস্তি দানের পর মূসা (আঃ) এবার সামেরীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে সামেরী! তোমার ব্যাপার কি?' 'সে বলল, আমি দেখলাম, যা অন্যেরা দেখেনি। অতঃপর আমি সেই প্রেরিত ব্যক্তির (অর্থাৎ জিব্রীলের) পদচিহ্নের নীচ থেকে এক মুষ্টি মাটি নিয়ে নিলাম। অতঃপর আমি তা (আগুনে গলিত অলংকারের অবয়বের প্রতি) নিক্ষেপ করলাম। আমার মন এটা করতে প্ররোচিত করেছিল (অর্থাৎ কারু পরামর্শে নয় বরং নিজস্ব চিন্তায়

Contents

ও শয়তানী কুমন্ত্রণায় আমি একাজ করেছি)’। ‘মূসা বললেন, দূর হ, তোর জন্য সারা জীবন এই শাস্তিই রইল যে, তুই বলবি, ‘আমাকে কেউ স্পর্শ করো না’ এবং তোর জন্য (আখেরাতে) একটা নির্দিষ্ট ওয়াদা রয়েছে (অর্থাৎ জাহান্নাম), যার ব্যতিক্রম হবে না। এক্ষণে তুই তোর সেই ইলাহের প্রতি লক্ষ্য কর, যাকে তুই সর্বদা পূজা দিয়ে ঘিরে থাকতিস। আমরা ওটাকে (অর্থাৎ কৃত্রিম গো-বৎসটাকে) অবশ্যই জ্বালিয়ে দেব এবং অবশ্যই ওকে বিক্ষিপ্ত করে সাগরে ছিটিয়ে দেব’ *(ত্বোয়াহা ৯৫-৯৭)*।

সামেরী ও তার শাস্তি :

পারস্য অথবা ভারতবর্ষের অধিবাসী সামেরী গো-পূজারী সম্প্রদায়ের লোক ছিল। পরে মিসরে পৌঁছে সে মূসা (আঃ)-এর উপরে বিশ্বাস স্থাপন করে। অত্যন্ত চতুর এই ব্যক্তিটি পরে কপট বিশ্বাসী ও মুনাফিক হয়ে যায়। কিন্তু বাইরে তা প্রকাশ না পাওয়ায় সে বনু ইস্রাঈলদের সাথে সাগর পার হওয়ার সুযোগ পায়। মূসা (আঃ)-এর বিপুল নাম-যশ ও অলৌকিক ক্ষমতায় সে তার প্রতি মনে মনে ঈর্ষা পরায়ণ ছিল। মূসার সান্নিধ্য ও নিজস্ব সুক্ষ্মদর্শিতার কারণে সে জিব্রাঈল ফেরেশতা সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠে। সেই আগ্রহের কারণেই সাগর পার হওয়ার সময় সে জিব্রীলকে চিনতে পারে ও তার ঘোড়ার পদচিহ্নের মাটি সংগ্রহ করে। তার ধারণা ছিল যে, মূসার যাবতীয় ক্ষমতার উৎস হ’ল এই ফেরেশতা। অতএব তার স্পর্শিত মাটি দিয়ে সেও এখন মূসার ন্যায় অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হবে।

মূসা (আঃ) সামেরীর জন্য পার্থিব জীবনে এই শাস্তি নির্ধারণ করেন যে, সবাই তাকে বর্জন করবে এবং কেউ তার কাছে ঘেঁষবে না। তিনি তাকেও নির্দেশ দেন যে, সে কারও গায়ে হাত লাগাবে না। সারা জীবন এভাবেই সে বন্য জন্তুর ন্যায় সবার কাছ থেকে আলাদা থাকবে। এটাও সম্ভবপর যে, পার্থিব আইনগত শাস্তির ঊর্ধ্বে খোদ তার সত্তায় আল্লাহ্র হুকুমে এমন বিষয় সৃষ্টি হয়েছিল, যদ্দরুন সে নিজেও অন্যকে স্পর্শ করতে পারত না এবং অন্যেরাও তাকে স্পর্শ করতে পারত না। যেমন এক বর্ণনায় এসেছে যে, মূসা (আঃ)-এর বদদো‘আয় তার মধ্যে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে, সে কাউকে হাত লাগালে বা কেউ তাকে হাত লাগালে উভয়েই জ্বরাক্রান্ত হয়ে যেত’ *(কুরতুবী, ত্বোয়াহা ৯৫)*। এই ভয়ে সে সবার কাছ থেকে আলাদা হয়ে উদ্ভ্রান্তের মত ঘোরাফেরা করত। কাউকে নিকটে আসতে দেখলেই সে চীৎকার করে বলে

উঠতো لَا مِسَاسَ ‘আমাকে কেউ স্পর্শ করো না’। বস্তুতঃ মৃত্যুদণ্ডের চাইতে এটিই ছিল কঠিন শাস্তি। যা দেখে অপরের শিক্ষা হয়। বলা বাহুল্য, আজও ভারতবর্ষের হিন্দুদের মধ্যে গো-মাতার পূজা অব্যাহত রয়েছে। যদিও উদারমনা উচ্চ শিক্ষিত হিন্দুগণ ক্রমেই এ অলীক বিশ্বাস থেকে বেরিয়ে আসছেন এবং গাভীকে দেবী নয় বরং মানুষের ব্যবহারযোগ্য ও খাদ্যযোগ্য প্রাণী হিসাবে বিশ্বাস করেন।

কুরতুবী বলেন, এর মধ্যে দলীল রয়েছে এ বিষয়ে যে, বিদ‘আতী ও পাপাচারী ব্যক্তি থেকে দূরে থাকা যরূরী। তাদের সঙ্গে কোনরূপ মেলামেশা ও আদান-প্রদান না করাই কর্তব্য। যেমন আচরণ শেষনবী (ছাঃ) জিহাদ থেকে পিছু হটা মদীনার তিনজন ধনীলোকের সাথে (তাদের তওবা কবুলের আগ পর্যন্ত) করেছিলেন *(কুরতুবী)*।

(৩) আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখার যিদ ও তার পরিণতি :

মূসা (আঃ) তূর পাহাড়ে তওরাৎ প্রাপ্ত হয়ে বনু ইস্রাঈলের কাছে ফিরে এসে তা পেশ করলেন এবং বললেন যে, এটা আল্লাহ প্রদত্ত কিতাব। তোমরা এর অনুসরণ কর। তখন কিছু সংখ্যক উদ্ধত লোক বলে উঠলো, যদি আল্লাহ স্বয়ং আমাদের বলে দেন যে, এটি তাঁর প্রদত্ত কিতাব, তাহ’লেই কেবল আমরা বিশ্বাস করব, নইলে নয়। হতে পারে তুমি সেখানে চল্লিশ দিন বসে বসে এটা নিজে লিখে এনেছ। তখন মূসা (আঃ) আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে তাদেরকে তাঁর সাথে তূর পাহাড়ে যেতে বললেন। বনু ইস্রাঈলরা তাদের মধ্যে বাছাই করা সত্তর জনকে মনোনীত করে মূসা (আঃ)-এর সাথে তূর পাহাড়ে প্রেরণ করল। সেখানে পৌঁছে তারা আল্লাহ্র বাণী স্বকর্ণে শুনতে পেল। এরপরেও তাদের অবাধ্য মন শান্ত হ’ল না। শয়তানী ধোঁকায় পড়ে তারা নতুন এক অজুহাত তুলে বলল, এগুলো আল্লাহ্র কথা না অন্য কারু কথা, আমরা বুঝবো কিভাবে? অতএব যতক্ষণ আমরা তাঁকে সশরীরে প্রকাশ্যে আমাদের সম্মুখে না দেখব, ততক্ষণ আমরা বিশ্বাস করব না যে, এসব আল্লাহ্র বাণী। কিন্তু যেহেতু এ পার্থিব জগতে চর্মচক্ষুতে আল্লাহকে দেখার ক্ষমতা কারু নেই, তাই তাদের এই চরম ধৃষ্টতার জবাবে আসমান থেকে ভীষণ এক নিনাদ এল, যাতে সব নেতাগুলোই চোখের পলকে অক্কা পেল।

অকস্মাৎ এমন ঘটনায় মূসা (আঃ) বিস্মিত ও ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়লেন। তিনি প্রার্থনা করে বললেন, হে আল্লাহ! এমনিতেই ওরা হঠকারী। এরপরে এদের এই মৃত্যুতে লোকেরা আমাকেই দায়ী করবে। কেননা মূল ঘটনার সাক্ষী কেউ থাকল না আমি ছাড়া। অতএব হে আল্লাহ! ওদেরকে পুনর্জীবন দান কর। যাতে আমি দায়মুক্ত হ’তে পারি এবং ওরাও গিয়ে সাক্ষ্য দিতে পারে। আল্লাহ মূসার দো‘আ কবুল করলেন এবং ওদের জীবিত করলেন। এ ঘটনা আল্লাহ বর্ণনা করেন এভাবে-

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ- ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ- (البقرة ٥٥-٥٦)-

‘আর যখন তোমরা বললে, হে মূসা! কখনোই আমরা তোমাকে বিশ্বাস করব না, যতক্ষণ না আমরা আল্লাহকে প্রকাশ্যে দেখতে পাব। তখন তোমাদেরকে পাকড়াও করল এক ভীষণ নিনাদ (বজ্রপাত), যা তোমাদের চোখের সামনেই ঘটেছিল’। ‘অতঃপর তোমাদের মৃত্যুর পর আমরা তোমাদেরকে পুনর্জীবিত করলাম, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর’ *(বাক্বারাহ ২/৫৫-৫৬)*।

(৪) বায়তুল মুক্বাদ্দাস অভিযানের নির্দেশ :

সাগরডুবি থেকে মুক্তি পাবার পর হ’তে সিনাই উপত্যকা পেরিয়ে তূর পাহাড়ে পৌঁছা পর্যন্ত সময়কালে মূর্তিপূজার আবদার, গো-বৎস পূজা ও তার শাস্তি, তওরাৎ লাভ ও তা মানতে অস্বীকার এবং তূর পাহাড় উঠিয়ে ভয় প্রদর্শন, আল্লাহ্কে স্বচক্ষে দেখার যিদ ও তার পরিণতি প্রভৃতি ঘটনা সমূহের পর এবার তাদের মূল গন্তব্যে যাত্রার জন্য আদেশ করা হ’ল।

অবাধ্য জাতিকে তাদের আদি বাসস্থানে রওয়ানার প্রাক্কালে মূসা (আঃ) তাদেরকে দূরদর্শিতাপূর্ণ উপদেশবাণী শুনান এবং যেকোন বাধা সাহসের সাথে অতিক্রম করার ব্যাপারে উৎসাহিত করেন। সাথে সাথে তিনি তাদেরকে বিগত দিনে আল্লাহ্র অলৌকিক সাহায্য লাভের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে অভয়বাণী শুনান। যেমন আল্লাহ্র ভাষায়,

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ أَنبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوْكاً وَآتَاكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَداً مِّنَ الْعَالَمِيْنَ- يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ

Contents

الْمُقَدَّسَةَ الَّتِيْ كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَرْتَدُّوْا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُــوْا خَاسِــرِيْنَ- (المائدة ٢٠-٢١)-

‘আর যখন মূসা স্বীয় সম্প্রদায়কে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহরাজি স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদের মধ্যে নবীগণকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাদেরকে রাজ্যাধিপতি বানিয়েছেন এবং তোমাদেরকে এমন সব বস্তু দিয়েছেন, যা বিশ্বজগতের কাউকে দেননি’। ‘হে আমার সম্প্রদায়! পবিত্র ভূমিতে (বায়তুল মুক্বাদ্দাস শহরে) প্রবেশ কর, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন। আর তোমরা পশ্চাদদিকে প্রত্যাবর্তন করবে না। তাতে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে’ *(মায়েদাহ ৫/২০-২১)*।

পবিত্র ভূমির পরিচিতি :

বিভিন্ন রেওয়ায়াত অনুযায়ী বায়তুল মুক্বাদ্দাস সহ সমগ্র শাম অর্থাৎ সিরিয়া অঞ্চল পবিত্র ভূমির অন্তর্গত। আমাদের রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক শাম পবিত্র ভূমি হওয়ার বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে।[৪১] আবহাওয়াগত দিক দিয়ে সিরিয়া প্রাচীন কাল থেকেই শস্য-শ্যামল এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে সমৃদ্ধ এলাকা হিসাবে খ্যাত। জাহেলী যুগে মক্কার ব্যবসায়ীগণ নিয়মিত ভাবে ইয়ামন ও সিরিয়ায় যথাক্রমে শীতকালে ও গ্রীষ্মকালে ব্যবসায়িক সফরে অভ্যস্ত ছিল। বলা চলে যে, এই দু’টি সফরের উপরেই মক্কাবাসীদের জীবিকা নির্ভর করত। সূরা কুরায়েশ-য়ে এ বিষয়ে উল্লেখিত হয়েছে।

আল্লাহ সূরা বনু ইস্রাঈলের ১ম আয়াতে এই এলাকাকে بَارَكْنَــا حَوْلَــهُ বা ‘বরকতময় এলাকা’ বলে অভিহিত করেছেন। এর বরকত সমূহ ছিল দ্বিবিধ: ধর্মীয় ও পার্থিব। ধর্মীয় দিকে বরকতের কারণ ছিল এই যে, এ অঞ্চলটি হ’ল, ইবরাহীম, ইয়াকূব, দাঊদ, সুলায়মান, ঈসা (আঃ) সহ কয়েক হাযার নবীর জন্মস্থান, বাসস্থান, কর্মস্থল ও মৃত্যুস্থান। মূসা (আঃ)-এর জন্ম মিসরে হ’লেও তাঁর মৃত্যু হয় এখানে এবং তাঁর কবর হ’ল বায়তুল মুক্কাদ্দাসের উপকণ্ঠে। নিকটবর্তী তীহ্ প্রান্তরে মূসা, হারূণ, ইউশা‘ প্রমুখ নবী বহু বৎসর

---

৪১. বুখারী, তিরমিযী, আবুদাঊদ, আহমাদ, বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৬২৬২, ৬৪, ৬৫, ৬৭, ৭১, ৭২ ‘মর্যাদা সমূহ’ অধ্যায়, ‘ইয়ামন, শাম ও ওয়ায়েস কুরনীর মর্যাদা’ অনুচ্ছেদ-১৩।

ধরে তাওহীদের প্রচার ও প্রসার ঘটিয়েছেন। তাঁদের প্রচারের ফল অন্ততঃ এটুকু ছিল এবং এখনও আছে যে, আরব উপদ্বীপে কোন নাস্তিক বা কাফির নেই।

অতঃপর পার্থিব বরকত এই যে, সিরিয়া অঞ্চল ছিল চিরকাল উর্বর এলাকা। এখানে রয়েছে অসংখ্য ঝরণা, বহমান নদ-নদী এবং অসংখ্য ফল-ফসলের বাগ-বাগিচা সমূহ। বিভিন্ন সুমিষ্ট ফল উৎপাদনের ক্ষেত্রে এ অঞ্চলটি সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে বলা যায় অতুলনীয়। একটি হাদীছে এসেছে, দাজ্জাল সমগ্র পৃথিবীতে বিচরণ করবে কিন্তু চারটি মসজিদে পৌঁছতে পারবে না; বায়তুল্লাহ, মসজিদে নববী, বায়তুল মুক্বাদ্দাস ও মসজিদে তূর’।[৪২]

মূসা (আঃ)-এর আগমনকালে বায়তুল মুক্বাদ্দাস সহ সমগ্র শাম এলাকা আমালেক্বা সম্প্রদায়ের অধীনস্থ ছিল। তারা ছিল কওমে ‘আদ-এর একটি শাখা গোত্র। দৈহিক দিক দিয়ে তারা ছিল অত্যন্ত সুঠাম, বলিষ্ঠ ও ভয়াবহ আকৃতি বিশিষ্ট। তাদের সাথে যুদ্ধ করে বায়তুল মুক্বাদ্দাস অধিকার করার নির্দেশ মূসা (আঃ) ও তাঁর সম্প্রদায়কে আল্লাহ দিয়েছিলেন। হযরত ইয়াকূব (আঃ)-এর মিসরে হিজরতের পর কেন‘আন সহ শাম এলাকা আমালেক্বাদের অধীনস্থ হয়। আয়াতে বর্ণিত ‘রাজ্যাধিপতি বানিয়েছেন’ বাক্যটি ভবিষ্যদ্বাণী হ’তে পারে, যার সম্পর্কে মূসা (আঃ) আল্লাহ্র নিকট থেকে নিশ্চিত ওয়াদা পেয়েছিলেন। তবে শর্ত ছিল যে, তারা জিহাদ করে কেন‘আন দখল করবে। অর্থাৎ আল্লাহ্র উপরে ভরসা করে জিহাদে অগ্রসর হ’লে তারা অবশ্যই জয়লাভ করবে। যেভাবে ফেরাঊনের বিরুদ্ধে তারা অলৌকিক বিজয় অর্জন করেছিল মাত্র কিছুদিন পূর্বে।

অতঃপর ‘তাদেরকে এমন সব বস্তু দেওয়া হয়েছে, যা বিশ্বের কাউকে দেওয়া হয়নি’ বলতে তাদের দেওয়া ধর্মীয় নেতৃত্ব ও সামাজিক নেতৃত্ব উভয়কে বুঝানো হয়েছে, যা একত্রে কাউকে ইতিপূর্বে দেওয়া হয়নি। এটাও ভবিষ্যদ্বাণী হ’তে পারে, যা তাদের বংশের পরবর্তী নবী দাঊদ ও সুলায়মানের সময়ে পূর্ণতা লাভ করেছিল। তাদের সময়েও এটা সম্ভব ছিল, যদি নাকি তারা নবী মূসা (আঃ)-এর নেতৃত্বে জিহাদে বেরিয়ে পড়ত। কিন্তু হতভাগারা তা পারেনি বলেই বঞ্চিত হয়েছিল।

---

৪২. আহমদ, মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্, শারহুস সুন্নাহ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৯৩৪।

নবুঅত-পরবর্তী ৪র্থ পরীক্ষা : বায়তুল মুক্বাদ্দাস অভিযান

আল্লাহ পাক মূসা (আঃ)-এর মাধ্যমে বনু ইস্রাঈলকে আমালেক্বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জিহাদ করে শাম দখল করতে বলেছিলেন। সাথে সাথে এ সুসংবাদও দিয়েছিলেন যে, শামের ভূখণ্ড তাদের ভাগ্যে লেখা হয়ে গেছে *(মায়েদাহ ৫/২১)*। কাজেই তোমাদের বিজয় সুনিশ্চিত। কিন্তু এইসব বিলাসী কাপুরুষেরা আল্লাহ্র কথায় দৃঢ় বিশ্বাস আনতে পারেনি।

মূসা (আঃ) আল্লাহ্র নির্দেশ পালনের জন্য বনী ইস্রাঈলকে সাথে নিয়ে মিসর থেকে শাম অভিমুখে রওয়ানা হ'লেন। যথা সময়ে তাঁরা জর্দান নদী পার হয়ে 'আরীহা' (أَرِيحَة) পৌঁছে শিবির স্থাপন করলেন। এটি ছিল পৃথিবীর প্রাচীনতম মহানগরী সমূহের অন্যতম, যা জর্দান নদী ও বায়তুল মুক্বাদ্দাসের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। যা আজও স্বনামে বিদ্যমান রয়েছে। মূসা (আঃ)-এর সময়ে এ শহরের অত্যাশ্চর্য জাঁক-জমক ও বিস্তৃতি ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে।

শিবির স্থাপনের পর মূসা (আঃ) বিপক্ষ দলের অবস্থা ও অবস্থান পর্যবেক্ষণের জন্য ১২ জন সর্দারকে প্রেরণ করলেন। যারা ছিলেন হযরত ইয়াকূব (আঃ)-এর বারো পুত্রের বংশধরগণের 'বারোজন প্রতিনিধি, যাদেরকে তিনি আগেই নির্বাচন করেছিলেন স্ব স্ব গোত্রের লোকদের দেখাশুনার জন্য' *(মায়েদাহ ৫/১২)*। তারা রওয়ানা হবার পর বায়তুল মুক্বাদ্দাস শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছলে বিপক্ষ দলের বিশালদেহী বিকট চেহারার একজন লোকের সঙ্গে সাক্ষাত হয়। ইস্রাঈলী রেওয়ায়াত সমূহে লোকটির নাম 'আউজ ইবনে ওনুক' (عوج بن عنق) বলা হয়েছে এবং তার আকার-আকৃতি ও শক্তি-সাহসের অতিরঞ্জিত বর্ণনা সমূহ উদ্ধৃত হয়েছে *(ইবনু কাছীর)*। যাই হোক উক্ত ব্যক্তি একাই বনু ইস্রাঈলের এই বার জন সরদারকে পাকড়াও করে তাদের বাদশাহ্র কাছে নিয়ে গেল এবং অভিযোগ করল যে, এই লোকগুলি আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মতলব নিয়ে এসেছে। বাদশাহ তার নিকটতম লোকদের সাথে পরামর্শের পর এদের ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেন এই উদ্দেশ্যে যে, এরা গিয়ে তাদের নেতাকে আমালেক্বাদের জাঁক-জমক ও শৌর্য-বীর্যের স্বচক্ষে দেখা কাহিনী বর্ণনা করবে। তাতে ওরা ভয়ে এমনিতেই পিছিয়ে যাবে। পরবর্তীতে দেখা গেল যে, বাদশাহ্র ধারণাই সত্যে পরিণত হয়েছিল। এই ভীত-

কাপুরুষ সর্দাররা জিহাদ দূরে থাক, ওদিকে তাকানোর হিম্মতও হারিয়ে ফেলেছিল।

বনু ইস্রাঈলের বারো জন সর্দার আমালেক্বাদের হাত থেকে মুক্ত হয়ে স্বজাতির কাছে ফিরে এল এবং আমালেক্বাদের বিস্ময়কর উন্নতি ও অবিশ্বাস্য শক্তি-সামর্থ্যের কথা মূসা (আঃ)-এর নিকটে বর্ণনা করল। কিন্তু মূসা (আঃ) এতে মোটেই ভীত হননি। কারণ তিনি আগেই অহী প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং বিজয় সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন। সেমতে তিনি গোত্রনেতাদের যুদ্ধ প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিলেন এবং আমালেক্বাদের শৌর্য-বীর্যের কথা অন্যের কাছে প্রকাশ করতে নিষেধ করলেন। কিন্তু দেখা গেল যে, ইউশা‘ বিন নূন ও কালেব বিন ইউক্বেন্না ব্যতীত বাকী সর্দাররা গোপনে সব ফাঁস করে দিল *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। ফলে যা হবার তাই হ’ল। এই ভীতু আরামপ্রিয় জাতি একেবারে বেঁকে বসলো।

قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْماً جَبَّارِيْنَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَّخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ- (المائدة ٢٢)-

‘তারা বলল, হে মূসা! সেখানে একটি প্রবল পরাক্রান্ত জাতি রয়েছে। আমরা কখনো সেখানে যাব না, যে পর্যন্ত না তারা সেখান থেকে বের হয়ে যায়। যদি তারা সেখান থেকে বের হয়ে যায়, তবে নিশ্চিতই আমরা সেখানে প্রবেশ করব’ *(মায়েদাহ ৫/২২)*। অর্থাৎ ওরা চায় যে, মূসা (আঃ) তার মু‘জেযার মাধ্যমে যেভাবে ফেরাঊনকে ডুবিয়ে মেরে আমাদের উদ্ধার করে এনেছেন, অনুরূপভাবে আমালেক্বাদের তাড়িয়ে দিয়ে তাদের পরিত্যক্ত অট্টালিকা ও সম্পদরাজির উপরে আমাদের মালিক বানিয়ে দিন। অথচ আল্লাহ্র বিধান এই যে, বান্দাকে চেষ্টা করতে হবে এবং আল্লাহ্র উপর ভরসা করতে হবে। কিন্তু বনু ইস্রাঈলরা এক পাও বাড়াতে রাযী হয়নি। এমতাবস্থায়

قَالَ رَجُلاَنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُوْنَ وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوْا إِنْ كُنْتُم مُّؤْمِنِيْنَ- (المائدة ٢٣)-

‘তাদের মধ্যকার দু’জন আল্লাহভীরু ব্যক্তি (সম্ভবতঃ পূর্বের দু’জন সর্দার হবেন, যাদের মধ্যে ইউশা‘ পরে নবী হয়েছিলেন), যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেন, তারা বলল, (মূসা (আঃ)-এর আদেশ মতে) ‘তোমরা

ওদের উপর আক্রমণ করে (শহরের মূল) দরজায় প্রবেশ কর। (কেননা আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস যে,) যখনই তোমরা তাতে প্রবেশ করবে, তখনই তোমরা অবশ্যই জয়ী হবে। আর তোমরা আল্লাহ্র উপরে ভরসা কর, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক' *(মায়েদাহ ৫/২৩)*।

কিন্তু ঐ দুই নেককার সর্দারের কথার প্রতি তারা দৃকপাত করল না। বরং আরও উত্তেজিত হয়ে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে মূসা (আঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলল, يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَداً مَا دَامُوْا فِيهَا، فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاَ، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُوْنَ– (المائدة ٢٤)– 'হে মূসা! আমরা কখনোই সেখানে প্রবেশ করব না, যতক্ষণ তারা সেখানে আছে। অতএব তুমি ও তোমার পালনকর্তা যাও এবং যুদ্ধ কর গে। আমরা এখানেই বসে রইলাম' *(মায়েদাহ ৫/২৪)*। নবীর অবাধ্যতার ফলস্বরূপ এই জাতিকে ৪০ বছর তীহ্ প্রান্তরের উন্মুক্ত কারাগারে বন্দী থাকতে হয় *(মায়েদাহ ৫/২৬)*। অতঃপর এইসব দুষ্টমতি নেতাদের মৃত্যুর পর পরবর্তী বংশধররা হযরত ইউশা' বিন নূন (আঃ)-এর নেতৃত্বে জিহাদ করে বায়তুল মুক্বাদ্দাস পুনর্দখল করে *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*।

বনু ইস্রাঈলের এই চূড়ান্ত বেআদবী ছিল কুফরীর নামান্তর এবং অত্যন্ত পীড়াদায়ক। যা পরবর্তীতে প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়ে গেছে। বদরের যুদ্ধের সময়ে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) কিছুটা অনুরূপ অবস্থায় পতিত হয়েছিলেন। অপর্যাপ্ত ব্যবস্থাপনা ও ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর অল্প সংখ্যক সবেমাত্র মুহাজির মুসলমানের মোকাবেলায় তিনগুণ শক্তিসম্পন্ন সুসজ্জিত বিরাট কুরায়েশ সেনাবাহিনীর আগমনে হতচকিত ও অপ্রস্তুত মুসলমানদের বিজয়ের জন্য যখন নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করছিলেন, তখন মিক্বদাদ ইবনুল আসওয়াদ আনছারী (রাঃ) দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে বলেছিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কস্মিনকালেও ঐকথা বলব না, যা মূসা (আঃ)-এর স্বজাতি তাঁকে বলেছিল, –فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاَ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُوْنَ 'তুমি ও তোমার প্রভু যাও যুদ্ধ করগে। আমরা এখানে বসে রইলাম' *(মায়েদাহ ৫/২৪)*। বরং আমরা আপনার ডাইনে, বামে, সামনে ও পিছনে থেকে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করব। আপনি নিশ্চিন্তে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করুন'। বিপদ মুহূর্তে সাথীদের এরূপ বীরত্বব্যঞ্জক কথায় আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) অত্যন্ত প্রীত হয়েছিলেন।[৪৩]

---

৪৩. মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতুম, পৃঃ ১৬৬।

Contents

মিসর থেকে হিজরতের কারণ :

ইউসুফ হ’তে মূসা পর্যন্ত দীর্ঘ চার/পাঁচশ’ বছর মিসরে অবস্থানের পর এবং নিজেদের বিরাট জনসংখ্যা ছাড়াও ফেরাঊনীদের বহু সংখ্যক লোক গোপনে অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও এবং মূসা (আঃ)-এর মত শক্তিশালী একজন নবীকে পাওয়া সত্ত্বেও বনু ইস্রাঈলকে কেন রাতের অন্ধকারে মিসর থেকে পালিয়ে আসতে হ’ল? অতঃপর পৃথিবীর কোথাও তারা আর স্থায়ীভাবে একত্রে বসবাস করতে পারেনি, তার একমাত্র কারণ ছিল ‘জিহাদ বিমুখতা’। এই বিলাসী, ভীরু ও কাপুরুষের দল ‘ফেরাঊন ও তার দলবলের ভয়ে এতই ভীত ছিল যে, তাদের নিষ্ঠুরতম নির্যাতনের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি করত না। বরং মূসা (আঃ)-এর কাছে পাল্টা অভিযোগ তুলতো যে, তোমার কারণেই আমরা বিপদে পড়ে গেছি’। যেমন সূরা আ‘রাফ ১২৯ আয়াতে এ বিষয়ে স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। ‘অথচ ঐ সময় মিসরে মুসলমানের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ১০ থেকে ২০ শতাংশ ছিল’।[৪৪]

মিসর থেকে বেরিয়ে বায়তুল মুক্বাদ্দাস নগরী দখলের জন্যও তাদেরকে যখন জিহাদের হুকুম দেওয়া হ’ল, তখনও তারা একইভাবে পিছুটান দিল। যার পরিণতি তারা সেদিনের ন্যায় আজও ভোগ করছে। বস্তুতঃ বিলাসী জাতি ভীরু হয় এবং জিহাদ বিমুখ জাতি কখনোই কোথাও মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না।

শিক্ষণীয় বিষয় :

মূসা (আঃ)-এর জীবনের এই শেষ পরীক্ষায় দৃশ্যত: তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন বলে অনুমিত হ’লেও প্রকৃত অর্থে তিনি ব্যর্থ হননি। বরং তিনি সকল যুগের ঈমানদারগণকে জানিয়ে গেছেন যে, কেবল মু‘জেযা বা কারামত দিয়ে দ্বীন বিজয়ী হয় না। তার জন্য প্রয়োজন আল্লাহ্র উপরে দৃঢ় বিশ্বাসী একদল মুমিনের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা। আর এটাই হ’ল জিহাদ। ৪০ বছর পর যখন তারা পুনরায় জিহাদে নামল, তখনই তারা বিজয়ী হ’ল। যুগে যুগে এটাই সত্য হয়েছে।

বাল‘আম বা‘ঊরার ঘটনা :

ফিলিস্তীন দখলকারী ‘জাব্বারীন’ তথা আমালেক্বা সম্প্রদায়ের শক্তিশালী নেতারা মূসা (আঃ) প্রেরিত ১২ জন প্রতিনিধিকে ফেরৎ পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত

৪৪. মাওলানা মওদূদী, রাসায়েল ও মাসায়েল ৫/২৫০।

থাকতে পারেনি। কারণ তারা মূসা (আঃ)-এর মু'জেযার কারণে ফেরাঊনের সসৈন্যে সাগরডুবির খবর আগেই জেনেছিল। অতএব মূসা (আঃ)-এর বায়তুল মুক্বাদ্দাস অভিযান বন্ধ করার জন্য তারা বাঁকা পথ তালাশ করল। তারা অত্যন্ত গোপনে বনু ইস্রাঈলের ঐ সময়কার একজন নামকরা সাধক ও দরবেশ আলেম বাল'আম ইবনে বা'ঊরার (بلعم بـــن بــاعوراء) কাছে বহু মূল্যবান উপঢৌকনাদিসহ লোক পাঠাল। বাল'আম তার স্ত্রীর অনুরোধে তা গ্রহণ করল। অতঃপর তার নিকটে আসল কথা পাড়া হ'ল যে, কিভাবে আমরা মূসার অভিযান ঠেকাতে পারি। আপনি পথ বাৎলে দিলে আমরা আরও মহামূল্যবান উপঢৌকনাদি আপনাকে প্রদান করব। বাল'আম উঁচুদরের আলেম ছিল। যে সম্পর্কে তার নাম না নিয়েই আল্লাহ বলেন,

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِيْنَ- (الأعراف ١٧٥)-

'আপনি তাদেরকে শুনিয়ে দিন সেই লোকটির অবস্থা, যাকে আমরা আমাদের নিদর্শন সমূহ দান করেছিলাম। অথচ সে তা পরিত্যাগ করে বেরিয়ে গেল। আর তার পিছনে লাগল শয়তান। ফলে সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল' *(আ'রাফ ৭/১৭৫)*।

কথিত আছে যে, বাল'আম 'ইসমে আযম' জানত। সে যা দো'আ করত, তা সাথে সাথে কবুল হয়ে যেত। আমালেক্বাদের অনুরোধ ও পীড়াপীড়িতে সে অবশেষে মূসার বিরুদ্ধে দো'আ করল। কিন্তু তার জিহ্বা দিয়ে উল্টা দো'আ বের হ'তে লাগল যা আমালেক্বাদের বিরুদ্ধে যেতে লাগল। তখন সে দো'আ বন্ধ করল। কিন্তু অন্য এক পৈশাচিক রাস্তা সে তাদের বাৎলে দিল। সে বলল, বনু ইস্রাঈলগণের মধ্যে ব্যভিচার ছড়িয়ে দিতে পারলে আল্লাহ তাদের উপরে নারায হবেন এবং তাতে মূসার অভিযান বন্ধ হয়ে যাবে'। আমালেক্বারা তার পরামর্শ গ্রহণ করল এবং তাদের সুন্দরী মেয়েদেরকে বনু ইস্রাঈলের নেতাদের সেবাদাসী হিসাবে অতি গোপনে পাঠিয়ে দিল। বড় একজন নেতা এফাঁদে পা দিল। আস্তে আস্তে তা অন্যদের মধ্যেও সংক্রমিত হ'ল। ফলে আল্লাহ্র গযব নেমে এল। বনু ইস্রাঈলীদের মধ্যে প্লেগ মহামারী

দেখা দিল। কথিত আছে যে, একদিনেই সত্তর হাযার লোক মারা গেল। এ ঘটনায় বাকী সবাই তওবা করল এবং প্রথম পথভ্রষ্ট নেতাকে প্রকাশ্যে হত্যা করে রাস্তার উপরে ঝুলিয়ে রাখা হ’ল। অতঃপর আল্লাহ্র গযব উঠে গেল। এগুলি ইস্রাঈলী বর্ণনা।=(*কুরতুবী ও ইবনু কাছীর উভয়ে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন উক্ত আয়াতের শানে নুযূল হিসাবে। আয়াতের মর্মে বুঝা যায় যে, ঘটনার কিছু সারবত্তা রয়েছে। যদিও সত্য বা মিথ্যা আল্লাহই ভালো জানেন। - লেখক*)।

সম্ভবতঃ সম্প্রদায়ের নেতাদের ক্রমাগত অবাধ্যতা, শঠতা ও পাপাচারে অতিষ্ঠ হ’য়ে এবং একসাথে এই বিরাট জনশক্তি বিনষ্ট হওয়ায় মূসা (আঃ) বায়তুল মুক্বাদ্দাস অভিযানের সংকল্প পরিত্যাগ করেন।

তীহ্ প্রান্তরে ৪০ বছরের বন্দীত্ব বরণ :

মূসা (আঃ)-এর প্রতি অবাধ্যতা ও জিহাদ থেকে বিমুখ হওয়ার শাস্তি স্বরূপ বনু ইস্রাঈলগণকে মিসর ও শাম-এর মধ্যবর্তী একটি উন্মুক্ত প্রান্তরে দীর্ঘ ৪০ বছরের জন্য বন্দী করা হয়। তাদের অবাধ্যতায় বিরক্ত ও হতাশ হয়ে নবী মূসা (আঃ) আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করেন,

قَالَ رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وَأَخِيْ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَــوْمِ الْفَاسِــقِيْنَ- (المائدة ٢٥)-

‘হে আমার পালনকর্তা! আমি কোন ক্ষমতা রাখি না কেবল আমার নিজের উপর ও আমার ভাইয়ের উপর ব্যতীত। অতএব আপনি আমাদের ও পাপাচারী কওমের মধ্যে ফায়ছালা করে দিন’ *(মায়েদাহ ৫/২৫)*। জবাবে আল্লাহ বলেন,

قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً يَتِيْهُوْنَ فِي الأَرْضِ فَلاَ تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ- (المائدة ٢٦)-

‘এদেশটি (বায়তুল মুক্বাদ্দাস সহ শামদেশ) চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হ’ল। এ সময় তারা ভূপৃষ্ঠে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ফিরবে। অতএব তুমি অবাধ্য কওমের জন্য দুঃখ করো না’ *(মায়েদাহ ৫/২৬)*। تَاهَ يَتِيْهُ تِيْهًــا অর্থ গর্ব করা, পথ হারিয়ে ঘোরা ইত্যাদি। এখান থেকেই উক্ত প্রান্তরের নাম হয়েছে

Contents

‘তীহ্’ (تِيْــه)। বস্তুতঃ এই উন্মুক্ত কারাগারে না ছিল কোন প্রাচীর, না ছিল কোন কারারক্ষী। তারা প্রতিদিন সকালে উঠে মিসর অভিমুখে রওয়ানা হ’ত। আর সারাদিন চলার পর রাতে আবার সেখানে এসেই উপস্থিত হ’ত, যেখান থেকে সকালে তারা রওয়ানা হয়েছিল। কিন্তু কোনভাবেই তারা অদৃশ্য কারা প্রাচীর ভেদ করে যেতে পারত না। এভাবে চল্লিশ বছর পর্যন্ত হতবুদ্ধি অবস্থায় দিগ্বিদিক ঘুরে এই হঠকারী অবাধ্য জাতি তাদের দুনিয়াবী শাস্তি ভোগ করতে থাকে। যেমন ইতিপূর্বে নূহ (আঃ)-এর অবাধ্য কওম দুনিয়াবী শাস্তি হিসাবে প্লাবণে ডুবে নিশ্চিহ্ন হয়েছিল। বস্তুতঃ চল্লিশ বছরের দীর্ঘ সময়ের মধ্যে হারূণ ও মূসা (আঃ)-এর তিন বছরের বিরতিতে মৃত্যু হয়। অতঃপর শাস্তির মেয়াদ শেষে পরবর্তী নবী ইউশা‘ বিন নূন-এর নেতৃত্বে জিহাদের মাধ্যমে তারা বায়তুল মুক্বাদ্দাস জয়ে সমর্থ হয় এবং সেখানে প্রবেশ করে। বর্ণিত হয়েছে যে, ১২ জন নেতার মধ্যে ১০ জন অবাধ্য ও ভীরু নেতা এরি মধ্যে মারা যায় এবং মূসার অনুগত ইউশা‘ ও কালেব দুই নেতাই কেবল বেঁচে থাকেন, যাদের হাতে বায়তুল মুক্বাদ্দাস বিজিত হয় *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর, তাফসীর মায়েদাহ ২৬)*।

তীহ্ প্রান্তরের ঘটনাবলী :

নবীর সঙ্গে যে বেআদবী তারা করেছিল, তাতে আল্লাহ্র গযবে তাদের ধ্বংস হয়ে যাওয়াটা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু আল্লাহ পাক হয়ত এ জাতিকে আরও পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন এবং আল্লাহ্র অপার অনুগ্রহপুষ্ট একটি জাতি নিজেদের অবাধ্যতা ও হঠকারিতার ফলে কিভাবে আল্লাহ্র অভিসম্পাৎগ্রস্ত হয় এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত চিরস্থায়ী লাঞ্ছনার শিকার হয়, পৃথিবীর মানুষের নিকটে দৃষ্টান্ত হিসাবে তা পেশ করতে চেয়েছিলেন। ঠিক যেভাবে দৃষ্টান্ত হয়েছে ফেরাঊন একজন অবাধ্য ও অহংকারী নরপতি হিসাবে। আর তাই বনু ইস্রাঈলের পরীক্ষার মেয়াদ আরও বর্ধিত হ’ল। নিম্নে তাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহের কিছু নিদর্শন বর্ণিত হ’ল।-

১. মেঘ দ্বারা ছায়া প্রদান :

ছায়াশূন্য তপ্ত বালুকা বিস্তৃত মরুভূমিতে কাঠফাটা রোদে সবচেয়ে প্রয়োজন যেসব বস্তুর, তন্মধ্যে ‘ছায়া’ হ’ল সর্বপ্রধান। হঠকারী উম্মতের অবাধ্যতায়

ত্যক্ত-বিরক্ত মূসা (আঃ) দয়াপরবশ হয়ে আল্লাহ্র নিকটে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রার্থনা নিবেদন করেছেন। দয়ালু আল্লাহ তাঁর দো‘আ সমূহ কবুল করেছেন এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে তাঁর বিশেষ রহমত সমূহ নাযিল করেছেন। তন্মধ্যে একটি হ’ল উন্মুক্ত তীহ্ প্রান্তরের উপরে শামিয়ানা সদৃশ মেঘমালার মাধ্যমে শান্তিদায়ক ছায়া প্রদান করা। যেমন আল্লাহ এই অকৃতজ্ঞ জাতিকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَـــامَ ‘স্মরণ কর সে কথা, যখন আমরা তোমাদেরকে ছায়া দান করেছিলাম মেঘমালার মাধ্যমে’ *(বাক্বারাহ ২/৫৭)*।

২. ঝর্ণাধারার প্রবাহ :

ছায়ার পরেই গুরুত্বপূর্ণ বস্তু হ’ল পানি। যার অপর নাম জীবন। পানি বিহনে তৃষ্ণার্ত পিপাসার্ত উম্মতের আহাজারিতে দয়া বিগলিত নবী মূসা স্বীয় প্রভুর নিকটে কাতর কণ্ঠে পানি প্রার্থনা করলেন। কুরআনের ভাষায়,

وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوْسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِن رِّزْقِ اللهِ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ- (البقرة ٦٠)-

‘আর মূসা যখন স্বীয় জাতির জন্য পানি চাইল, তখন আমি বললাম, তোমার লাঠি দিয়ে পাথরের উপরে আঘাত কর। অতঃপর তা থেকে বেরিয়ে এলো (১২টি গোত্রের জন্য) ১২টি ঝর্ণাধারা। তাদের সব গোত্রই চিনে নিল (অর্থাৎ মূসার নির্দেশ অনুযায়ী নির্ধারণ করে নিল) নিজ নিজ ঘাট। (আমি বললাম,) তোমরা আল্লাহ্র দেওয়া রিযিক খাও আর পান কর। খবরদার যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়িয়ো না’ *(বাক্বারাহ ২/৬০)*।

বস্তুতঃ ইহুদী জাতি তখন থেকে এযাবত পৃথিবী ব্যাপী ফাসাদ সৃষ্টি করেই চলেছে। তারা কখনোই আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেনি।

৩. মান্না ও সালওয়া খাদ্য পরিবেশন :

মরুভূমির বুকে চাষবাসের সুযোগ নেই। নেই শস্য উৎপাদন ও বাইরে গিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ। কয়েকদিনের মধ্যেই মওজুদ খাদ্য শেষ হয়ে

গেলে হাহাকার পড়ে গেল তাদের মধ্যে। নবী মূসা (আঃ) ফের দো‘আ করলেন আল্লাহ্‌র কাছে। এবার তাদের জন্য আসমান থেকে নেমে এলো জান্নাতী খাদ্য ‘মান্না ও সালওয়া’- যা পৃথিবীর আর কোন নবীর উম্মতের ভাগ্যে জুটেছে বলে জানা যায় না।

‘মান্না’ এক প্রকার খাদ্য, যা আল্লাহ তা‘আলা বনু ইস্রাঈলদের জন্য আসমান থেকে অবতীর্ণ করতেন। আর তা ছিল দুধের চেয়েও সাদা এবং মধুর চেয়েও মিষ্টি। আর ‘সালওয়া’ হচ্ছে আসমান থেকে আগত এক প্রকার পাখি।[৪৫] প্রথমটি দিয়ে রুটি ও দ্বিতীয়টি দিয়ে গোশতের অভাব মিটত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اَلْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ ‘কামআহ হ’ল মান্ন-এর অন্তর্ভুক্ত’।[৪৬] এতে বুঝা যায় ‘মান্ন’ কয়েক প্রকারের ছিল। ইংরেজীতে ‘কামআহ’ অর্থ করা হয়েছে ‘মাশরূম’ (Mashroom)। আধুনিক গবেষণায় বলা হয়েছে যে, মান্ন একপ্রকার আঠা জাতীয় উপাদেয় খাদ্য। যা শুকিয়ে পিষে রুটি তৈরী করে তৃপ্তির সাথে আহার করা যায়। ‘সালওয়া’ একপ্রকার চড়ুই পাখি, যা ঐসময় সিনাই এলাকায় প্রচুর পাওয়া যেত। ব্যাঙের ছাতার মত সহজলভ্য ও কাই জাতীয় হওয়ায় সম্ভবত একে মাশরূম-এর সাথে তুলনীয় মনে করা হয়েছে। তবে মাশরূম ও ব্যাঙের ছাতা সম্পূর্ণ পৃথক জিনিস। কয়েক লাখ বনু ইস্রাঈল কয়েক বছর ধরে মান্না ও সালওয়া খেয়ে বেঁচে ছিল। এতে বুঝা যায় যে, মান্ন ছিল চাউল বা গমের মত কার্বো-হাইড্রেট-এর উৎস এবং সালওয়া বা চড়ুই জাতীয় পাখির গোশত ছিল ভিটামিন ও চর্বির উৎস। সব মিলে তারা পরিপূর্ণ খাবার নিয়মিত খেয়ে বেঁচে থাকতে সক্ষম হয়েছিল। দক্ষিণ ইউরোপের সিসিলিতে, আরব উপদ্বীপের ইরাকে ও ইরানে, অস্ট্রেলিয়া ও ভারতবর্ষে মান্না জাতীয় খাদ্য উৎপন্ন হয়।[৪৭] অবাধ্য বনু ইস্রাঈলরা এগুলো সিরিয়ার তীহ্ প্রান্তরে ৪০ বছরের বন্দী জীবনে বিপুলভাবে পেয়েছিল আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমতে। ঈসার সাথী হাওয়ারীগণ এটা চেয়েছিল *(মায়েদাহ ৫/১১২-১১৫)*। কিন্তু পেয়েছিল কি-না, তা নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি।

---

৪৫. *ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ৫৭।*
৪৬. *তিরমিযী, হাদীছ হাসান; মিশকাত হা/৪৫৬৯ ‘চিকিৎসা ও মন্ত্র’ অধ্যায়।*
৪৭. *বিস্তারিত দ্রঃ ডঃ ইকতেদার হোসেন ফারুকী, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে কুরআনে বর্ণিত উদ্ভিদ ই,ফা,বা, ২০০৮, পৃঃ ১৩-২০।*

দুনিয়ায় বসেই জান্নাতের খাবার, এ এক অকল্পনীয় অনির্বচনীয় আনন্দের বিষয়। কিন্তু এই হতভাগারা তাতেও খুব বেশীদিন খুশী থাকতে পারেনি। তারা গম, তরকারি, ডাল-পেঁয়াজ ইত্যাদি খাওয়ার জন্য পাগল হয়ে উঠলো। যেমন আল্লাহ বলেন,

... وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلَـــكِنْ كَانُوْا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ- (البقرة ٥٧)-

‘... আমরা তোমাদের জন্য খাবার পাঠিয়েছি ‘মান্না’ ও ‘সালওয়া’। (আমরা বললাম) এসব পবিত্র বস্তু তোমরা ভক্ষণ কর (কিন্তু ওরা শুনল না, কিছু দিনের মধ্যেই তা বাদ দেওয়ার জন্য ও অন্যান্য নিম্নমানের খাদ্য খাবার জন্য যিদ ধরলো)। বস্তুতঃ (এর ফলে) তারা আমার কোন ক্ষতি করতে পারেনি, বরং নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করেছে’ *(বাক্বারাহ ২/৫৭)*।

আল্লাহ তাদের উদ্দেশ্যে বলেন,

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوْسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىَ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّـــا تُنْبِتُ الأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِيْ هُوَ أَدْنَى بِالَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ؟ إِهْبِطُوْا مِصْراً فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَـــيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآؤُوْا بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِآيَاتِ اللهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيِّيْنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ- (البقرة ٦١)-

‘যখন তোমরা বললে, হে মূসা! আমরা একই ধরনের খাদ্যের উপরে কখনোই ধৈর্য ধারণ করতে পারব না। কাজেই তুমি তোমার প্রভুর নিকটে আমাদের পক্ষে প্রার্থনা কর তিনি যেন আমাদের জন্য এমন খাদ্য-শস্য দান করেন, যা জমিতে উৎপন্ন হয়; যেমন তরি-তরকারি, কাকুড়, গম, রসুন, ডাল, পেঁয়াজ ইত্যাদি। মূসা বললেন, তোমরা উত্তম খাদ্যের বদলে এমন খাদ্য পেতে চাও যা নিম্নস্তরের? তাহ’লে তোমরা অন্য কোন শহরে চলে যাও। সেখানে তোমরা তোমাদের চাহিদা মোতাবেক সবকিছু পাবে’ *(বাক্বারাহ ২/৬১)*।

৪. পার্শ্ববর্তী জনপদে যাওয়ার হুকুম ও আল্লাহ্র অবাধ্যতা :

বনু ইস্রাঈলগণ যখন জান্নাতী খাদ্য বাদ দিয়ে দুনিয়াবী খাদ্য খাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে যিদ ধরে বসলো, তখন আল্লাহ তাদের পার্শ্ববর্তী জনপদে যেতে বললেন। যেখানে তাদের চাহিদামত খাদ্য-শস্যাদি তারা সর্বদা প্রাপ্ত হবে। উক্ত জনপদে প্রবেশের সময় আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করার জন্য তিনি কতগুলি আদব ও শিষ্টাচার মান্য করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তারা তাতে কর্ণপাত করল না। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا هَـــذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّداً وَّقُوْلُوْا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ- (البقرة ٥٨)-

'আর যখন আমরা বললাম, তোমরা প্রবেশ কর এ নগরীতে এবং এতে যেখানে খুশী খেয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে বিচরণ কর এবং নগরীর ফটক দিয়ে প্রবেশ করার সময় সিজদা কর ও বলতে থাক (হে আল্লাহ!) 'আমাদিগকে ক্ষমা করে দাও'- তাহ'লে আমরা তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দেব এবং সৎকর্মশীলদের আমরা সত্বর অতিরিক্তভাবে আরও দান করব' *(বাক্বারাহ ২/৫৮)*। কিন্তু এই অবাধ্য জাতি এতটুকু আনুগত্য প্রকাশ করতেও রাযী হয়নি। তাদেরকে শুকরিয়ার সিজদা করতে বলা হয়েছিল এবং আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা চেয়ে 'হিত্ত্বাহ' (حطة) অর্থাৎ حُط ذنوبنا অথবা احطط عنا ذنوبنا। حطـــة 'আমাদের পাপসমূহ পুরোপুরি মোচন করুন' বলতে বলতে শহরে প্রবেশের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বেআদবীর চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে তারা হিত্ত্বাহ-এর বদলে 'হিন্ত্বাহ' (حنطة) অর্থাৎ 'গমের দানা' বলতে বলতে এবং সিজদা বা মাথা নীচু করার পরিবর্তে পিছন দিকে পিঠ ফিরে প্রবেশ করল।[৪৮] এর মাধ্যমে তারা নিজেদেরকে আল্লাহ পূজারীর বদলে পেটপূজারী বলে প্রমাণ করল।

এখানে هـــذه القريـــة বা 'এই নগরী' বলতে বায়তুল মুক্বাদ্দাসকে বুঝানো হয়েছে। যার ব্যাখ্যা মায়েদাহ ২১ আয়াতে এসেছে, الأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ বলে।

---

৪৮. *বুখারী হা/৩৪০৩ 'নবীদের কাহিনী' অধ্যায়।*

তীহ্ প্রান্তরে ৪০ বছর বন্দী জীবন কাটানোর পর নবী ইউশা‘ বিন নূন-এর নেতৃত্বে জিহাদের মাধ্যমে তারা বিজয় লাভ করে ও নগরীতে প্রবেশ করে *(ইবনু কাছীর)*। এভাবে তাদের দীর্ঘ বন্দীত্বের অবসান ঘটে।

অথচ যদি প্রথমেই তারা মূসার হুকুম মেনে নিয়ে জিহাদে অবতীর্ণ হ’ত, তাহ’লে তখনই তারা বিজয়ী হয়ে নগরীতে প্রবেশ করত। কিন্তু নবীর অবাধ্যতা করার কারণেই তাদের ৪০ বছর কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হ’ল। পরিশেষে তাদেরকে সেই জিহাদই করতে হ’ল, যা তারা প্রথমে করেনি ভীরুতা ও কাপুরুষতার কারণে। বস্তুতঃ ভীরু ব্যক্তি ও জাতি কখনো সম্মানিত হয় না। উল্লেখ্য যে, বায়তুল মুক্বাদ্দাসের উক্ত প্রধান ফটককে আজও ‘বাব হিত্ত্বাহ’ (باب حطة) বলা হয়ে থাকে *(কুরতুবী)*।

আল্লাহ বলেন,

فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُواْ قَوْلاً غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجْزاً مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ- (البقرة ٥٩)-

‘অতঃপর যালেমরা সে কথা পাল্টে দিল, যা তাদেরকে বলতে বলা হয়েছিল। ফলে আমরা যালেমদের উপর তাদের অবাধ্যতার কারণে আসমান থেকে গযব নাযিল করলাম’ *(বাক্বারাহ ২/৫৯)*। তবে সেটা যে কি ধরনের গযব ছিল, সে বিষয়ে কুরআন পরিষ্কার করে কিছু বলেনি। ইতিহাসও এ ব্যাপারে নীরব। তবে সাধারণতঃ এগুলি প্লেগ-মহামারী, বজ্রনিনাদ, ভূমিকম্প প্রভৃতি হয়ে থাকে। যা বিভিন্ন নবীর অবাধ্য উম্মতদের বেলায় ইতিপূর্বে হয়েছে।

শিক্ষণীয় বিষয় :

হিনত্বাহ ও হিত্ত্বাহ বলার মাধ্যমে আল্লাহ বস্তুবাদী ও আদর্শবাদী দু’প্রকার মানুষের পার্থক্য তুলে ধরেছেন। বস্তুবাদীরা বস্তু পাওয়ার লোভে মানবতাকে ও মানব সভ্যতাকে ধ্বংস করে। পক্ষান্তরে ধার্মিক ও আদর্শবাদীরা তাদের ধর্ম ও আদর্শ রক্ষার জন্য বস্তুকে উৎসর্গ করে। ফলে মানবতা রক্ষা পায় ও মানব সভ্যতা স্থায়ী হয়। বাস্তবিক পক্ষে সে যুগ থেকে এ যুগ পর্যন্ত বিভিন্ন নামে বস্তুবাদীগণ মানবতার ধ্বংসকারী হিসাবে নিজেদেরকে চিহ্নিত করেছে। ১ম ও ২য় বিশ্বযুদ্ধ এবং বর্তমানের ইরাক ও আফগানিস্তানে স্রেফ তেল লুটের জন্য তথাকথিত গণতন্ত্রী, ধর্মনিরপেক্ষ ও বস্তুবাদী রাষ্ট্রগুলির নেতাদের হুকুমে

টন কে টন বোমা মেরে লাখ লাখ নিরীহ বনু আদমের হত্যাকাণ্ড এরই প্রমাণ বহন করে। অথচ কেবলমাত্র ধর্মই মানবতাকে বাঁচিয়ে রাখে।

তওরাতের শব্দগত ও অর্থগত পরিবর্তন :

ইহুদীরা তাদের এলাহী কিতাব তওরাতের শাব্দিক পরিবর্তন নবী মূসা (আঃ)-এর জীবদ্দশায় যেমন করেছিল, অর্থগত পরিবর্তনও তারা করেছিল। যেমন মূসা (আঃ) যখন তাদের ৭০ জন নেতাকে সাথে নিয়ে তূর পাহাড়ে গেলেন। অতঃপর আল্লাহ্র গযবে মৃত্যুবরণ করে পুনরায় তাঁর রহমতে জীবিত হয়ে ফিরে এল, তখনও এই গর্বিত জাতি তওরাত যে আল্লাহ্র নাযিলকৃত গ্রন্থ এ সাক্ষ্য দেওয়ার সাথে সাথে একথাও জুড়ে দিল যে, আল্লাহ তা'আলা সবশেষে একথাও বলেছেন যে, তোমরা যতটুকু পার, আমল কর। আর যা না পার তা আমি ক্ষমা করে দিব'। অথচ এটা ছিল সম্পূর্ণ বানোয়াট কথা। তাদের এই মিথ্যা সাক্ষ্যের ফলে লোকেরা বলে দিল যে, তওরাতের বিধান সমূহ মেনে চলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

তখনই আল্লাহ্র হুকুমে ফেরেশতাগণ তূর পাহাড়ের একাংশ উপরে তুলে ধরে তাদের হুকুম দিলেন, হয় তোমরা তওরাত মেনে নাও, না হয় ধ্বংস হও। তখন নিরুপায় হয়ে তারা তওরাত মেনে নেয়।[৪৯]

মূসা (আঃ)-এর মৃত্যুর পরেও তওরাত, যবূর ও ইঞ্জীল গ্রন্থগুলিতে তারা অসংখ্য শব্দগত ও অর্থগত পরিবর্তন ঘটিয়েছে। ফলে এই কিতাবগুলি আসল রূপে কোথাও আর পৃথিবীতে অবশিষ্ট নেই। ইহুদীদের তওরাত পরিবর্তনের ধরন ছিল তিনটি। এক. অর্থ ও মর্মগত পরিবর্তন, যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। দুই. শব্দগত পরিবর্তন যেমন আল্লাহ বলেন, مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، 'ইহুদীদের মধ্যে একটা দল আছে, যারা আল্লাহ্র কালামকে (যেখানে শেষনবীর আগমন সংবাদ ও তাঁর গুণাবলী সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে) তার স্বস্থান হ'তে পরিবর্তন করে দেয়' *(নিসা ৪/৪৬; মায়েদাহ ৫/১৩, ৪১)*। এই পরিবর্তন তারা নিজেদের দুনিয়াবী স্বার্থে শাব্দিকভাবে এবং মর্মগতভাবে উভয়বিধ প্রকারে করত। 'এভাবে তারা কখনো শব্দে, কখনো অর্থে এবং কখনো তেলাওয়াতে (মুখ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে) পরিবর্তন করত। পরিবর্তনের এ

---

৪৯. *দ্রঃ বাক্বারাহ ২/৬৩, ৯৩; আ'রাফ ৭/১৭১।*

Contents

প্রকারগুলি কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। আজকাল পাশ্চাত্যের কিছু সংখ্যক খ্রীষ্টানও একথা কিছু কিছু স্বীকার করে’।[৫০]

আল্লাহ্র কিতাবের এইসব পরিবর্তন তাদের মধ্যকার আলেম ও যাজক শ্রেণীর লোকেরাই করত, সাধারণ মানুষ যাদেরকে অন্ধ ভক্তির চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছে দিয়েছিল। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هَـــذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيْلاً– (البقرة ٧٩)–

‘ধ্বংস ঐসব লোকদের জন্য যারা নিজ হাতে কিতাব লিখে বলত, এটি আল্লাহ্র পক্ষ হ’তে অবতীর্ণ হয়েছে- যাতে এর বিনিময়ে তারা সামান্য অর্থ উপার্জন করতে পারে’ *(বাক্বারাহ ২/৭৯)*।

আল্লাহ বলেন, سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ‘এইসব লোকেরা মিথ্যা কথা শোনাতে এবং হারাম ভক্ষণে অভ্যস্ত’ *(মায়েদাহ ৫/৪২)*। জনগণ তাদের কথাকেই সত্য ভাবত এবং এর বিপরীত কিছুই তারা শুনতে চাইত না। এভাবে তারা জনগণের রব-এর আসন দখল করেছিল। যেমন আল্লাহ বলেন, اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّنْ دُونِ اللهِ ‘তারা তাদের আলেম ও দরবেশগণকে ‘রব’ হিসাবে গ্রহণ করেছিল আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে’ *(তওবাহ ৯/৩১)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, إِنَّهُمْ لَمْ يَأْمُرُوْهُمْ أَنْ يَّسْجُدُوْا لَهُمْ وَلَكِنْ أَمَرُوْهُمْ بِمَعْصِيَةِ اللهِ فَأَطَاعُوْهُمْ فَسَمَّاهُمُ اللهُ بِذَالِكَ أَرْبَاباً– ‘তারা তাদেরকে সিজদা করতে বলত না বটে। কিন্তু মানুষকে তারা আল্লাহ্র অবাধ্যতামূলক কাজের নির্দেশ দিত এবং তারা তা মেনে নিত। সেকারণ আল্লাহ তাদেরকে ‘রব’ বলে আখ্যায়িত করেন’। খৃষ্টান পণ্ডিত ‘আদী বিন হাতেম যখন বললেন যে, لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ ‘আমরা আমাদের আলেম-দরবেশদের পূজা করি না’। তখন তার জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَلَيْسَ يُحَرِّمُوْنَ مَا أَحَلَّ اللهُ فَتُحَرِّمُوْنَهُ وَ يُحِلُّوْنَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَتُحِلُّوْنَهُ ‘তারা কি আল্লাহকৃত

---

৫০. *মা‘আরেফুল কুরআন, পৃঃ ৩১৭ গৃহীত: তাফসীরে ওছমানী।*

হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করে না? আর তোমরাও কি সেটা মেনে নাও না? 'আদী বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, فَتِلْكَ عِبَـــادَتُهُمْ 'সেটাই তো ওদের ইবাদত হ'ল'।[৫১]

গাভী কুরবানীর হুকুম ও হত্যাকারী চিহ্নিত করণ :

বনু ইস্রাঈলের জনৈক যুবক তার একমাত্র চাচাতো বোনকে বিয়ে করে তার চাচার অগাধ সম্পত্তির একক মালিক বনতে চায়। কিন্তু চাচা তাতে রাযী না হওয়ায় সে তাকে গোপনে হত্যা করে। পরের দিন বাহ্যিকভাবে কান্নাকাটি করে চাচার রক্তের দাবীদার সেজে কওমের নেতাদের কাছে বিচার দেয়। কিন্তু সাক্ষীর অভাবে আসামী শনাক্ত করা যাচ্ছিল না। ইতিমধ্যে মূসা (আঃ) অহী মারফত জেনে গিয়েছিলেন যে, বাদী স্বয়ং আসামী এবং সেই-ই একমাত্র হত্যাকারী। এমতাবস্থায় সম্প্রদায়ের নেতারা এসে বিষয়টি ফায়ছালার জন্য মূসা (আঃ)-কে অনুরোধ করল। মূসা (আঃ) তখন আল্লাহ্র হুকুম মোতাবেক যে ফায়ছালা দিলেন, সে বিষয়ে আল্লাহ বলেন, وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّارَأْتُمْ فِيْهَا وَاللهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُـــوْنَ 'যখন তোমরা একজনকে হত্যা করে পরে সে সম্পর্কে একে অপরকে দায়ী করছিলে। অথচ আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিলেন, যা তোমরা গোপন করতে চাচ্ছিলে' *(বাক্বারাহ ২/৭২)*। কিভাবে আল্লাহ সেটা প্রকাশ করে দিলেন, তার বিবরণ নিম্নরূপ:

'যখন মূসা স্বীয় কওমকে বললেন, আল্লাহ তোমাদেরকে একটা গাভী যবেহ করতে বলেছেন। তারা বলল, আপনি কি আমাদের সাথে উপহাস করছেন? তিনি বললেন, জাহিলদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আমি আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করছি' *(বাক্বারাহ ৬৭)*। 'তারা বলল, তাহ'লে আপনি আপনার পালনকর্তার নিকটে আমাদের জন্য প্রার্থনা করুন, যেন তিনি বলে দেন, গাভীটি কেমন হবে? তিনি বললেন, আল্লাহ বলেছেন গাভীটি এমন হবে, যা না বুড়ী না বকনা, বরং দু'য়ের মাঝামাঝি বয়সের হবে। এখন তোমাদের যা আদেশ করা হয়েছে, তা সেরে ফেল' *(৬৮)*। 'তারা বলল, আপনার প্রভুর নিকটে

---

৫১. *ছহীহ তিরমিযী হা/২৪৭১; আহমাদ, বায়হাক্বী, ইবনু জারীর প্রমুখ।*

আমাদের পক্ষ থেকে প্রার্থনা করুন যে, গাভীটির রং কেমন হবে। তিনি বললেন, আল্লাহ বলেছেন, গাভীটি হবে চকচকে গাঢ় পীত বর্ণের, যা দর্শকদের চক্ষু শীতল করবে’ *(৬৯)*। ‘লোকেরা আবার বলল, আপনি আপনার প্রভুর নিকটে আমাদের পক্ষে প্রার্থনা করুন, যাতে তিনি বলে দেন যে, গাভীটি কিরূপ হবে। কেননা একই রংয়ের সাদৃশ্যপূর্ণ গাভী অনেক রয়েছে। আল্লাহ চাহে তো এবার আমরা অবশ্যই সঠিক দিশা পেয়ে যাব’ *(৭০)*। ‘তিনি বললেন, আল্লাহ বলেছেন, সে গাভীটি এমন হবে, যে কখনো ভূমি কর্ষণ বা পানি সেচনের শ্রমে অভ্যস্ত নয়, সুঠামদেহী ও খুঁৎহীন’। ‘তারা বলল, এতক্ষণে আপনি সঠিক তথ্য এনেছেন। অতঃপর তারা সেটা যবেহ করল। অথচ তারা (মনের থেকে) তা যবেহ করতে চাচ্ছিল না’ *(বাক্বারাহ ২/৬৭-৭১)*।

আল্লাহ বলেন, ‘অতঃপর আমি বললাম, যবেহকৃত গরুর গোশতের একটি টুকরা দিয়ে মৃত ব্যক্তির লাশের গায়ে আঘাত কর। এভাবে আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন এবং তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শন সমূহ প্রদর্শন করেন। যাতে তোমরা চিন্তা কর’ *(বাক্বারাহ ২/৭৩)*।

বলা বাহুল্য, গোশতের টুকরা দিয়ে আঘাত করার সাথে সাথে মৃত লোকটি জীবিত হ’ল এবং তার হত্যাকারী ভাতিজার নাম বলে দিয়ে পুনরায় মারা গেল। ধারণা করা চলে যে, মূসা (আঃ) সেমতে শাস্তি বিধান করেন এবং হত্যাকারী ভাতিজাকে হত্যার মাধ্যমে ‘ক্বিছাছ’ আদায় করেন।

কিন্তু এতবড় একটা অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেও এই হঠকারী কওমের হৃদয় আল্লাহ্র প্রতি অনুগত হয়নি। তাই আল্লাহ বলেন, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ‘অতঃপর তোমাদের হৃদয় শক্ত হয়ে গেল। যেন তা পাথর, এমনকি তার চেয়েও শক্ত... *(বাক্বারাহ ২/৭৪)*।

গাভী কুরবানীর ঘটনায় শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ :

(১) এখানে প্রথম যে বিষয়টি ফুটে উঠেছে, সেটি এই যে, আল্লাহ্র উপরে পূর্ণরূপে ভরসা করলে অনেক সময় যুক্তিগ্রাহ্য বস্তুর বাইরের বিষয় দ্বারা সত্য প্রকাশিত হয়। যেমন এখানে গরুর গোশতের টুকরা মেরে মৃতকে জীবিত

করার মাধ্যমে হত্যাকারী শনাক্ত করানোর ব্যবস্থা করা হ'ল। অথচ বিষয়টি ছিল যুক্তি ও স্বাভাবিক জ্ঞানের বিরোধী।

(২) মধ্যম বয়সী গাভী কুরবানীর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, নৈতিকভাবে মৃত জাতিকে পুনর্জীবিত করতে হ'লে পূর্ণ নৈতিকতা সম্পন্ন ঈমানদার যুবশক্তির চূড়ান্ত ত্যাগ ও কুরবানী আবশ্যক।

(৩) নবী-রাসূলগণের আনুগত্য এবং তাঁদের প্রদত্ত শারঈ বিধান সহজভাবে মেনে নেওয়ার মধ্যেই জাতির মঙ্গল নিহিত। বিতর্কে লিপ্ত হ'লে বিধান কঠোর হয় এবং আল্লাহ্র গযব অবশ্যম্ভাবী হয়। যেমন বনু ইস্রাঈলগণ যদি প্রথম নির্দেশ অনুযায়ী যেকোন একটা গাভী যবেহ করত, তবে তাতেই যথেষ্ট হ'ত। কিন্তু তারা যত বেশী প্রশ্ন করেছে, তত বেশী বিধান কঠোর হয়েছে। এমনকি অবশেষে হত্যাকারী চিহ্নিত হ'লেও আল্লাহ্র ক্রোধে তাদের হৃদয়গুলো পাথরের মত শক্ত হয়ে গেছে।

(৪) এই গুরুত্বপূর্ণ ও শিক্ষণীয় ঘটনাকে চির জাগরুক করে রাখার জন্য আল্লাহ পাক গাভীর নামে সূরা বাক্বারাহ নামকরণ করেন। এটিই কুরআনের ২৮৬টি আয়াত সমৃদ্ধ সবচেয়ে বড় ও বরকতমণ্ডিত সূরা। এই সূরার ফযীলত বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা তোমাদের গৃহগুলিকে কবরে পরিণত করো না। নিশ্চয়ই শয়তান ঐ ঘর থেকে পালিয়ে যায়, যে ঘরে সূরা বাক্বারাহ পাঠ করা হয়'।[৫২] এ সূরার মধ্যে আয়াতুল কুরসী (২৫৫ নং আয়াত) রয়েছে, যাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'শ্রেষ্ঠতম' (اعظم) আয়াত বলে বর্ণনা করেছেন।[৫৩]

চিরস্থায়ী গযবে পতিত হওয়া :

নবী মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে বারবার বেআদবী ও অবাধ্যতার পরিণামে এবং আল্লাহ্র আয়াত সমূহকে অস্বীকার ও পরবর্তীতে নবীগণকে অন্যায় ভাবে হত্যার কারণে আল্লাহ তাদের উপরে চিরস্থায়ী গযব ও অভিসম্পাৎ নাযিল করলেন। আল্লাহ বলেন, وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآؤُوْا بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ

---

৫২. *মুসলিম, মিশকাত হা/২১১৯ 'কুরআনের ফযীলত সমূহ' অধ্যায়।*
৫৩ . *মুসলিম, মিশকাত হা/২১২২।*

‘আর তাদের উপরে লাঞ্ছনা ও পরমুখাপেক্ষিতা আরোপিত হ’ল এবং তারা আল্লাহ্‌র রোষানলে পতিত হ’ল’ *(বাক্বারাহ ২/৬১)*।

ইবনু কাছীর বলেন, এ লাঞ্ছনা ও অবমাননার প্রকৃতি হ’ল, ইহুদীরা সর্বদা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অপরের দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ থাকবে। এ মর্মে সূরা আলে ইমরানে আল্লাহ বলেন, ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُواْ إِلاَّ بِحَبْلٍ مِّنَ اللهِ وَحَبْلٍ مِّـــنَ النَّـــاسِ ‘তাদের উপরে লাঞ্ছনা আরোপিত হ’ল যেখানেই তারা অবস্থান করুক না কেন। তবে আল্লাহ প্রদত্ত ও মানব প্রদত্ত মাধ্যম ব্যতীত’ *(আলে ইমরান ৩/১১২)*। ‘আল্লাহ প্রদত্ত মাধ্যম’ বলতে বুঝানো হয়েছে, যাদেরকে আল্লাহ নিজ চিরন্তন বিধান অনুযায়ী আশ্রয় ও অভয় দিয়েছেন। যেমন শিশু ও রমণীকুল এবং এমন সাধক ও উপাসকগণ, যারা যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে দূরে থাকেন। এরা নিরাপদে থাকবে। অতঃপর ‘মানব প্রদত্ত মাধ্যম’ হ’ল, অন্যের সাথে শান্তি চুক্তির মাধ্যমে নিরাপত্তা লাভ করা, যা মুসলমান বা অন্য যেকোন জাতির সাথে হ’তে পারে। যেমন বর্তমানে তারা আমেরিকা ও পাশ্চাত্য শক্তি বলয়ের সাথে গাটছড়া বেঁধে টিকে আছে।

ইহুদীদের উপর চিরস্থায়ী গযব নাযিলের ব্যাপারে সূরা আ‘রাফে আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَّسُوْمُهُمْ سُوْءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيْعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ- (الأعراف ١٦٧)-

‘স্মরণ কর সে সময়ের কথা, যখন তোমার প্রভু জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, নিশ্চয়ই তিনি তাদের (ইহুদীদের) উপরে প্রেরণ করতে থাকবেন ক্বিয়ামত পর্যন্ত এমন সব শাসক, যারা তাদের প্রতি পৌঁছাতে থাকবে কঠিন শাস্তি সমূহ। নিশ্চয়ই তোমার প্রভু দ্রুত বদলা গ্রহণকারী এবং নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান’ *(আ‘রাফ ৭/১৬৭)*।

উপরোক্ত আয়াত সমূহের আলোকে আমরা ইহুদীদের উপরে বিগত ও বর্তমান যুগের লাঞ্ছনা ও অবমাননার দীর্ঘ ইতিহাস পর্যালোচনা করতে পারি। তবে এখানে এতটুকু বলা আবশ্যক যে, হাযার বছর ধরে বসবাসকারী

ফিলিস্তীনের স্থায়ী মুসলিম নাগরিকদের তাড়িয়ে দিয়ে ১৯৪৮ সাল থেকে বৃটেন, আমেরিকা, রাশিয়া প্রমুখ অশুভ শক্তি বলয়ের মাধ্যমে যবরদস্তি মূলকভাবে প্রতিষ্ঠিত তথাকথিত 'ইস্রাঈল' নামক রাষ্ট্র মূলতঃ কোন রাষ্ট্রই নয়। বরং মধ্যপ্রাচ্যের তৈলভাণ্ডার নিজেদের করায়ত্তে রাখার জন্য বৃহৎ শক্তিবর্গের বিশেষ করে আমেরিকা ও বৃটেনের ঘাঁটি বা অস্ত্রগুদাম মাত্র। বৃহৎ শক্তিগুলো হাত গুটিয়ে নিলে তারা একমাসও নিজের শক্তিতে টিকতে পারবে কি-না সন্দেহ। এতেই কুরআনী সত্য حَبْـــلٍ مِّـــنَ النَّـــاسِ বা 'মানব প্রদত্ত মাধ্যম'-এর বাস্তব রূপ প্রকাশিত হয়। ইনশাআল্লাহ এ মাধ্যমও তাদের ছিন্ন হবে এবং তাদেরকে এই পবিত্র ভূমি মুসলমানদের হাতে ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চলে যেতে হবে অথবা ইসলাম কবুল করে শান্তিতে বসবাস করতে হবে।

মূসা ও খিযিরের কাহিনী :

এ ঘটনাটি বনু ইস্রাঈলের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। বরং ঘটনাটি ব্যক্তিগতভাবে মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে জড়িত। পিতা ইবরাহীম (আঃ) সহ বড় বড় নবী-রাসূলগণের জীবনে পদে পদে পরীক্ষা দিতে হয়েছে। মূসা (আঃ)-এর জীবনে এটাও ছিল অনুরূপ একটি পরীক্ষা। যে পরীক্ষায় জ্ঞানীদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ রয়েছে। আনুষঙ্গিক বিবরণ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, ঘটনাটি তীহ্ প্রান্তরের উন্মুক্ত বন্দীশালায় থাকাকালীন সময়ে ঘটেছিল। ঘটনাটি নিম্নরূপ:

ছহীহ বুখারী ও মুসলিমে হযরত উবাই বিন কা'ব (রাঃ) প্রমুখাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছ হ'তে[৫৪] এবং সূরা কাহফ ৬০ হ'তে ৮২ পর্যন্ত ২৩টি আয়াতে বর্ণিত বিবরণ থেকে যা জানা যায়, তার সংক্ষিপ্ত সার নিম্নে বিবৃত হ'ল।-

ঘটনার প্রেক্ষাপট :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, একদিন হযরত মূসা (আঃ) বনু ইস্রাঈলের এক সভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, লোকদের মধ্যে আপনার চেয়ে অধিক জ্ঞানী কেউ আছে কি? ঐ সময়ে যেহেতু মূসা ছিলেন শ্রেষ্ঠ নবী এবং তাঁর জানা মতে আর কেউ তাঁর চাইতে অধিক জ্ঞানী ছিলেন না, তাই তিনি সরলভাবে 'না' সূচক জবাব দেন। জবাবটি আল্লাহ্র

৫৪. বুখারী হা/৪৭২৫-২৭ প্রভৃতি; 'তাফসীর' অধ্যায় ও অন্যান্য; মুসলিম, হা/৬১৬৫ 'ফাযায়েল' অধ্যায় ৪৬ অনুচ্ছেদ।

Contents

পসন্দ হয়নি। কেননা এতে কিছুটা অহংকার প্রকাশ পেয়েছিল। ফলে আল্লাহ তাঁকে পরীক্ষায় ফেললেন। তাঁর উচিৎ ছিল একথা বলা যে, ‘আল্লাহই সর্বাধিক অবগত’। আল্লাহ তাঁকে বললেন, ‘হে মূসা! দুই সমুদ্রের সংযোগস্থলে অবস্থানকারী আমার এক বান্দা আছে, যে তোমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী’। একথা শুনে মূসা (আঃ) প্রার্থনা করে বললেন, হে আল্লাহ! আমাকে ঠিকানা বলে দিন, যাতে আমি সেখানে গিয়ে জ্ঞান লাভ করতে পারি’। আল্লাহ বললেন, থলের মধ্যে একটি মাছ নিয়ে নাও এবং দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলের (সম্ভবতঃ লোহিত সাগর ও ভূমধ্যসাগরের মিলনস্থল) দিকে সফরে বেরিয়ে পড়। যেখানে পৌঁছার পর মাছটি জীবিত হয়ে বেরিয়ে যাবে, সেখানেই আমার সেই বান্দার সাক্ষাৎ পাবে’। মূসা (আঃ) স্বীয় ভাগিনা ও শিষ্য (এবং পরবর্তীকালে নবী) ইউশা‘ বিন নূনকে সাথে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। পথিমধ্যে এক স্থানে সাগরতীরে পাথরের উপর মাথা রেখে দু’জন ঘুমিয়ে পড়েন। হঠাৎ সাগরের ঢেউয়ের ছিটা মাছের গায়ে লাগে এবং মাছটি থলের মধ্যে জীবিত হয়ে নড়েচড়ে ওঠে ও থলে থেকে বেরিয়ে সাগরে গিয়ে পড়ে। ইউশা‘ ঘুম থেকে উঠে এই বিস্ময়কর দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন। কিন্তু মূসা (আঃ) ঘুম থেকে উঠলে তাঁকে এই ঘটনা বলতে ভুলে গেলেন। অতঃপর তারা আবার পথ চলতে শুরু করলেন এবং একদিন একরাত চলার পর ক্লান্ত হয়ে এক স্থানে বিশ্রামের জন্য বসলেন। অতঃপর মূসা (আঃ) নাশতা দিতে বললেন। তখন তার মাছের কথা মনে পড়ল এবং ওযর পেশ করে আনুপূর্বিক সব ঘটনা মূসা (আঃ)-কে বললেন এবং বললেন যে, ‘শয়তানই আমাকে একথা ভুলিয়ে দিয়েছিল’ *(কাহফ ১৮/৬৩)*। তখন মূসা (আঃ) বললেন, ঐ স্থানটিই তো ছিল আমাদের গন্তব্য স্থল।

ফলে তাঁরা আবার সেপথে ফিরে চললেন। অতঃপর সেখানে পৌঁছে দেখতে পেলেন যে, একজন লোক আপাদ-মস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। মূসা (আঃ) তাকে সালাম করলেন। লোকটি মুখ বের করে বললেন, এদেশে সালাম? কে আপনি? বললেন, আমি বনু ইস্রাঈলের মূসা। আপনার কাছ থেকে ঐ জ্ঞান অর্জন করতে এসেছি, যা আল্লাহ আপনাকে বিশেষভাবে দান করেছেন’।

খিযির বললেন, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না হে মূসা! আল্লাহ আমাকে যে জ্ঞান দান করেছেন, তা তিনি আপনাকে দেননি। পক্ষান্তরে আপনাকে তিনি যে জ্ঞান দান করেছেন, তা আমাকে দেননি’। মূসা

বললেন, 'আল্লাহ চাহেন তো আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আমি আপনার কোন আদেশ অমান্য করব না' *(কাহফ ১৮/৬৯)*। খিযির বললেন, 'যদি আপনি আমার অনুসরণ করেনই, তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যে পর্যন্ত না আমি নিজে সে সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলি'।

(১) অতঃপর তাঁরা চলতে লাগলেন। কিছু দূর গিয়ে নদী পার হওয়ার জন্য একটা নৌকা পেলেন। অতঃপর নৌকা থেকে নামার সময় তাতে ছিদ্র করে দিলেন। শারঈ বিধানের অধিকারী নবী মূসা বিষয়টিকে মেনে নিতে পারলেন না। কেননা বিনা দোষে অন্যের নৌকা ছিদ্র করে দেওয়া স্পষ্টভাবেই অন্যায়। তিনি বলেই ফেললেন, 'নিশ্চয়ই আপনি একটা গুরুতর মন্দ কাজ করলেন'। তখন খিযির বললেন, আমি কি পূর্বেই বলিনি যে, 'আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না'। মূসা ক্ষমা চাইলেন। ইতিমধ্যে একটা কালো চড়ুই পাখি এসে নৌকার এক প্রান্তে বসল এবং সমুদ্র থেকে এক চঞ্চু পানি তুলে নিল। সে দিকে ইঙ্গিত করে খিযির মূসা (আঃ)-কে বললেন, علمي و علمك و علم الخلائق فى علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور منقاره 'আমার ও আপনার এবং সমস্ত সৃষ্টিজগতের জ্ঞান মিলিতভাবে আল্লাহ্‌র জ্ঞানের মুকাবিলায় সমুদ্রের বুক থেকে পাখির চঞ্চুতে উঠানো এক ফোঁটা পানির সমতুল্য'।[৫৫]

(২) তারপর তাঁরা সমুদ্রের তীর বেয়ে চলতে থাকলেন। কিছু দূর গিয়ে তাঁরা সাগরপাড়ে খেলায় রত একদল বালককে দেখলেন। খিযির তাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ও বুদ্ধিমান ছেলেটিকে ধরে এনে নিজ হাতে তাকে হত্যা করলেন। এ দৃশ্য দেখে মূসা আৎকে উঠে বললেন, একি! একটা নিষ্পাপ শিশুকে আপনি হত্যা করলেন? এ যে মস্তবড় গোনাহের কাজ'। খিযির বললেন, আমি তো পূর্বেই বলেছিলাম, আপনি ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না'। মূসা আবার ক্ষমা চাইলেন এবং বললেন, 'এরপর যদি আমি কোন প্রশ্ন করি, তাহ'লে আপনি আমাকে আর সাথে রাখবেন না' *(কাহফ ১৮/৭৫)*।

৫৫. *বুখারী হা/৪৭২৭*।

(৩) ‘অতঃপর তারা চলতে লাগলেন। অবশেষে যখন একটি জনপদে পৌঁছলেন, তখন তাদের কাছে খাবার চাইলেন। কিন্তু তারা তাদের আতিথেয়তা করতে অস্বীকার করল। অতঃপর তারা সেখানে একটি পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখতে পেয়ে সেটাকে সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিলেন। তখন মূসা বললেন, আপনি ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে এর বিনিময়ে পারিশ্রমিক নিতে পারতেন’। খিযির বললেন هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً ‘এখানেই আমার ও আপনার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হ’ল। এখন যেসব বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধারণ করতে পারেননি, আমি সেগুলির তাৎপর্য বলে দিচ্ছি’ *(কাহফ ১৮/৭৮)*।

তাৎপর্য সমূহ :

প্রথমতঃ নৌকা ছিদ্র করার বিষয়। সেটা ছিল কয়েকজন মিসকীন দরিদ্র ব্যক্তির। তারা এ দিয়ে সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষণ করত। আমি সেটিকে ছিদ্র করে দিলাম এজন্য যে, ঐ অঞ্চলে ছিল এক যালেম বাদশাহ। সে বলপ্রয়োগে লোকদের নৌকা ছিনিয়ে নিত’। নিশ্চয়ই ছিদ্র নৌকা সে নিবে না। ফলে দরিদ্র লোকগুলি নৌকার সামান্য ত্রুটি সেরে নিয়ে পরে তাদের কাজে লাগাতে পারবে।

দ্বিতীয়তঃ বালকটিকে হত্যার ব্যাপার। তার পিতা-মাতা ছিল ঈমানদার। আমি আশংকা করলাম যে, সে বড় হয়ে অবাধ্য হবে ও কাফের হবে। যা তার বাপ-মায়ের জন্য ফিৎনার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তাই আমি চাইলাম যে, দয়ালু আল্লাহ তার পিতা-মাতাকে এর বদলে উত্তম সন্তান দান করুন, যে হবে সৎকর্মশীল ও বিশুদ্ধ চরিত্রের অধিকারী। যে তার পিতা-মাতাকে শান্তি দান করবে’।

তৃতীয়তঃ পতনোন্মুখ প্রাচীর সোজা করে দেওয়ার ব্যাপার। উক্ত প্রাচীরের মালিক ছিল নগরীর দু’জন পিতৃহীন বালক। ঐ প্রাচীরের নীচে তাদের নেককার পিতার রক্ষিত গুপ্তধন ছিল। আল্লাহ চাইলেন যে, বালক দু’টি যুবক হওয়া পর্যন্ত প্রাচীরটি খাড়া থাক এবং তারা তাদের প্রাপ্য গুপ্তধন হস্তগত করুক। (খিযির বলেন,) وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِيْ ‘বস্তুতঃ আমি নিজ ইচ্ছায় এ সবের কিছুই করিনি’ *(কাহফ ১৮/৮২)*।

শিক্ষণীয় বিষয় :

(১) বড় যুলুম থেকে বাঁচানোর জন্য কারু উপরে ছোট-খাট যুলুম করা যায়। যেমন নৌকা ছিদ্র করা থেকে এবং বালকটিকে হত্যা করা থেকে প্রমাণিত হয়। তবে শরী'আতে মুহাম্মাদীতে এগুলি সবই সামাজিক বিধি-বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বিশেষ করে হত্যাকাণ্ডের মত বিষয় একমাত্র রাষ্ট্রানুমোদিত বিচার কর্তৃপক্ষ ব্যতীত কারু জন্য অনুমোদিত নয়। (২) পিতা-মাতার সৎকর্মের ফল সন্তানরাও পেয়ে থাকে। যেমন সৎকর্মশীল পিতার রেখে যাওয়া গুপ্তধন তার সন্তানরা যাতে পায়, সেজন্য খিযির সাহায্য করলেন। তাছাড়া এ বিষয়েও ইঙ্গিত রয়েছে যে, আলেম ও সৎকর্মশীলগণের সন্তানদের প্রতি সকলেরই স্নেহ পরায়ণ হওয়া কর্তব্য। (৩) মানুষ অনেক সময় অনেক বিষয়কে ভাল মনে করে। কিন্তু সেটি তার জন্য ক্ষতির কারণ হয়। যেমন আল্লাহ বলেন,

عَسَى أَن تَكْرَهُوْا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوْا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ- (البقرة ٢١٦)-

'তোমরা অনেক বিষয়কে অপসন্দ কর। অথচ সেটি তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আবার অনেক বিষয় তোমরা ভাল মনে কর, কিন্তু সেটি তোমাদের জন্য ক্ষতিকর। বস্তুতঃ আল্লাহই প্রকৃত অবস্থা জানেন, তোমরা জানো না' *(বাক্বারাহ ২/২১৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَيَقْضِي اللهُ للمؤمن من قضاءٍ الا كان خيرًا له 'আল্লাহ তার মুমিন বান্দার জন্য যা ফায়ছালা করেন, তা কেবল তার মঙ্গলের জন্যই হয়ে থাকে'।[৫৬]

(৪) অতঃপর আরেকটি মৌলিক বিষয় এখানে রয়েছে যে, মূসা ও খিযিরের এ শিহরণমূলক কাহিনীটি ছিল 'আগাগোড়া একটি বিশেষ প্রশিক্ষণের বহিঃপ্রকাশ'। থলের মধ্যেকার মরা মাছ জীবিত হয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে সাগরে চলে যাওয়া যেমন সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত বিষয়, তেমনি আল্লাহ পাক কোন

---

৫৬. *আহমাদ হা/১২৯২৯ 'সনদ ছহীহ, -আরনাউত্ব।*

ফেরেশতাকে খিযিরের রূপ ধারণ করে মূসাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যও পাঠিয়ে থাকতে পারেন। যাকে তিনি সাময়িকভাবে শরী‘আতী ইলমের বাইরে অলৌকিক ও অতীন্দ্রিয় জ্ঞান দিয়ে পাঠিয়েছিলেন, যা মূসার জ্ঞানের বাইরে ছিল। এর দ্বারা আল্লাহ মূসা সহ সকল মানুষের জ্ঞানের স্বল্পতার কথা জানিয়ে দিয়েছেন।

(৫) বান্দার জন্য যে অহংকার নিষিদ্ধ, অত্র ঘটনায় সেটাই সবচেয়ে বড় শিক্ষণীয় বিষয়।

খিযির কে ছিলেন?

কুরআনে তাঁকে عَبْداً مِّنْ عِبَادِنَا ‘আমাদের বান্দাদের একজন’ *(কাহফ ১৮/৬৫)* বলা হয়েছে। বুখারী শরীফে তাঁর নাম খিযির (خــــضر) বলে উল্লেখ করা হয়েছে’। সেখানে তাঁকে নবী বলা হয়নি। জনশ্রুতি মতে তিনি একজন ওলী ছিলেন এবং মৃত্যু হয়ে গেলেও এখনও মানুষের বেশ ধরে যেকোন সময় যেকোন মানুষের উপকার করেন। ফলে জঙ্গলে ও সাগর বক্ষে বিপদাপদ থেকে বাঁচার জন্য আজও অনেকে খিযিরের অসীলা পাবার জন্য তার উদ্দেশ্যে মানত করে থাকে। এসব ধারণার প্রসার ঘটেছে মূলতঃ বড় বড় প্রাচীন মনীষীদের নামে বিভিন্ন তাফসীরের কেতাবে উল্লেখিত কিছু কিছু ভিত্তিহীন কল্পকথার উপরে ভিত্তি করে।

যারা তাকে নবী বলেন, তাদের দাবীর ভিত্তি হ’ল, খিযিরের বক্তব্য وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ‘আমি এসব নিজের মতে করিনি’ *(কাহফ ১৮/৮২)*। অর্থাৎ সবকিছু আল্লাহ্র নির্দেশে করেছি। অলীগণের কাশ্ফ-ইলহাম শরী‘আতের দলীল নয়। কিন্তু নবীগণের স্বপ্নও আল্লাহ্র অহী হয়ে থাকে। যেজন্য ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় পুত্রকে যবেহ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। অতএব বালক হত্যার মত ঘটনা কেবলমাত্র নবীর পক্ষেই সম্ভব, কোন অলীর পক্ষে আদৌ নয়। কিন্তু সেখানেও প্রশ্ন থেকে যায় যে, নবী কখনো শরী‘আত বিরোধী কাজ করতে পারেন না। ঐ সময় শরী‘আতধারী নবী ও রাসূল ছিলেন হযরত মূসা (আঃ)। আর সে কারণেই খিযিরের শরী‘আত বিরোধী কাজ দেখে তিনি বারবার প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেছিলেন। এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, খিযির কোন কেতাবধারী রাসূল ছিলেন না, বা তাঁর কোন উম্মত ছিল না।

এখানে আমরা যদি বিষয়টিকে কুরআনের প্রকাশ্য অর্থের উপরে ছেড়ে দিই এবং তাঁকে 'আল্লাহ্র একজন বান্দা' হিসাবে গণ্য করি, যাঁকে আল্লাহ্র ভাষায় آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْماً 'আমরা আমাদের পক্ষ হ'তে বিশেষ রহমত দান করেছিলাম এবং আমাদের পক্ষ হ'তে দিয়েছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান' *(কাহফ ১৮/৬৫)*। তাহ'লে তিনি নবী ছিলেন কি অলী ছিলেন, তিনি এখনো বেঁচে আছেন, না মারা গেছেন, এসব বিতর্কের আর কোন অবকাশ থাকে না। যেভাবে মূসার মায়ের নিকটে আল্লাহ অহী (অর্থাৎ ইলহাম) করেছিলেন এবং যার ফলে তিনি তার সদ্য প্রসূত সন্তান মূসাকে বাক্সে ভরে সাগরে নিক্ষেপ করতে সাহসী হয়েছিলেন *(ত্বোয়াহা ২০/৩৮-৩৯)* এবং যেভাবে জিব্রীল মানুষের রূপ ধরে এসে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ছাহাবীগণকে দ্বীনের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন[৫৭] একই ধরনের ঘটনা মূসা ও খিযিরের ক্ষেত্রে হওয়াটাও বিস্ময়কর কিছু নয়।

মনে রাখা আবশ্যক যে, লোকমান অত্যন্ত উঁচুদরের একজন জ্ঞানী মানুষ ছিলেন। তাঁর জ্ঞানপূর্ণ উপদেশসমূহ কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এবং তার নামে একটি সূরা নাযিল হয়েছে। কিন্তু তিনি নবী ছিলেন না। লোকমানকে আল্লাহ যেমন বিশেষ 'হিকমত' দান করেছিলেন *(লোকমান ৩১/১২)*। খিযিরকেও তেমনি বিশেষ 'ইল্ম' দান করেছিলেন *(কাহফ ১৮/৬৫)*। এটা বিচিত্র কিছু নয়।

সংশয় নিরসন

(১) মূসা (আঃ)-এর সিন্দুক ও নবীগণের ছবি :

<u>বাক্বারাহ ২৪৮</u> : إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَّأْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ 'তাদের নবী (শ্যামুয়েল) তাদেরকে বললেন (ত্বালূতের) রাজা হওয়ার নিদর্শন এই যে, তোমাদের নিকটে সেই 'তাবূত' (সিন্দুক) আসবে...।'

এখানে তাবূত-এর ব্যাখ্যায় (ক) তাফসীর জালালাইনে বলা হয়েছে, الصندوق كان فيه صور الأنبياء، أنزله الله على أدم– 'সেই সিন্দুক, যা আল্লাহ আদম (আঃ)-এর উপরে নাযিল করেন এবং যার মধ্যে রয়েছে

৫৭. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২।*

নবীদের ছবিসমূহ’। (খ) তাফসীর কাশশাফে বলা হয়েছে, التابوت هي صورة كانت فيه من زبرجد أو ياقوت لها رأس كرأس الهر وذنب كذنبه وجناحان ‘উক্ত তাবূত হ’ল একটি মূর্তি, যার মধ্যে যবরজদ ও ইয়াকূত মণি-মুক্তা সমূহ রয়েছে। উক্ত তাবূতের মাথা ও লেজ মদ্দা বিড়ালের মাথা ও লেজের ন্যায়, যার দু’টি ডানা রয়েছে।’ (গ) তাফসীর বায়যাবীতে বলা হয়েছে, وفيه صورة الأنبياء من آدم إلى محمد ‘তাতে নবীগণের ছবি রয়েছে আদম (আঃ) থেকে মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত।’

(ঘ) ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত বঙ্গানুবাদ কুরআন শরীফে *(পৃঃ ৬৩ টীকা ১৭০)* বলা হয়েছে, ‘বিধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা কালে হযরত মূসা (আঃ) ইহা সম্মুখে স্থাপন করিতেন’।

উপরে বর্ণিত কোন ব্যাখ্যাই কুরআন ও হাদীছ সম্মত নয়। বরং প্রকৃত কথা এই যে, এটি হ’ল আল্লাহ্র হুকুম মোতাবেক মূসা (আঃ)-এর তৈরী সেই সিন্দুক, যার মধ্যে তাঁর লাঠি, তাওরাত এবং তাঁর ও হারূণ (আঃ)-এর পরিত্যক্ত অন্যান্য পবিত্র বস্তুসমূহ সংরক্ষিত ছিল। বনু ইস্রাঈলগণ এটিকে বরকত হিসাবে ও বিজয়ের নিদর্শন হিসাবে মনে করত।

(২) তাওরাতের পৃষ্ঠা সমূহ :

<u>আ‘রাফ ১৪৫</u> : وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَّتَفْصِيْلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ ‘আমরা তার (মূসা) জন্য ফলকে (তাওরাতে পৃষ্ঠাসমূহে) সকল বিষয়ে উপদেশ ও স্পষ্ট ব্যাখ্যাসমূহ লিখে দিয়েছি’। এর ব্যাখ্যায় তাফসীরে জালালাইনে বলা হয়েছে, أي ألواح التوراة وكانت من سدر الجنة أو زبرجد أو زمرد سبعة أو عشرة ‘অর্থাৎ তাওরাতের ফলক সমূহ, যা ছিল জান্নাতের পত্র সমূহ বা যবরজাদ অথবা যুমুর্রুদ, যা ছিল ৭টি অথবা ১০টি’। অথচ এসব কথার কোন ভিত্তি নেই। ঐ ফলকগুলির সংখ্যা কত ছিল, কি দিয়ে তৈরী ছিল, কতটুকু তার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ছিল, কি দিয়ে ও কিভাবে সেখানে লেখা ছিল, এগুলি বিষয় জানা বা তার উপরে ঈমান আনার কোন বাধ্যবাধকতা আমাদের উপরে নেই। কুরআন-হাদীছ এবিষয়ে চুপ রয়েছে। আমরাও এ বিষয়ে চুপ থাকব। বস্তুতঃ এগুলি স্রেফ ইস্রাঈলী কল্পকাহিনী মাত্র।

Contents

মূসা ও ফেরাঊনের কাহিনীতে শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ :

১. আল্লাহ্ যালেম শাসক ও ব্যক্তিদেরকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে থাকেন। কিন্তু তারা সংশোধিত না হ'লে সরাসরি আসমানী বা যমীনী গযব প্রেরণ করেন অথবা অন্য কোন মানুষকে দিয়ে তাকে শাস্তি দেন ও যুলুম প্রতিরোধ করেন। যেমন আল্লাহ্ উদ্ধত ফেরাঊনের কাছে প্রথমে মূসাকে পাঠান। ২০ বছরের বেশী সময় ধরে তাকে উপদেশ দেওয়ার পরেও এবং নানাবিধ গযব পাঠিয়েও তার ঔদ্ধত্য দমিত না হওয়ায় অবশেষে সাগরডুবির গযব পাঠিয়ে আল্লাহ্ তাদেরকে সমূলে উৎখাত করেন।

২. দুনিয়াদার সমাজনেতারা সর্বদা যালেম শাসকদের সহযোগী থাকে। পক্ষান্তরে মযলূম দ্বীনদার ব্যক্তিগণ সর্বদা দ্বীনদার সমাজ সংস্কারক নেতৃত্বের মুখাপেক্ষী থাকে।

৩. দুনিয়া লোভী আন্দোলন নিজেকে অপদস্থ ও সমাজকে ধ্বংস করে। পক্ষান্তরে আখেরাত পিয়াসী আন্দোলন নিজেকে সম্মানিত ও সমাজকে উন্নত করে। যেমন দুনিয়াদার শাসক ফেরাঊন নিজেকে ও নিজের সমাজকে ধ্বংস করেছে এবং নিজে এমনভাবে অপদস্থ হয়েছে যে, তার নামে কেউ নিজ সন্তানের নাম পর্যন্ত রাখতে চায় না। পক্ষান্তরে মূসা (আঃ)-এর দ্বীনী আন্দোলন তাঁকে ও তাঁর ঈমানদার সাথীদেরকে বিশ্ব মাঝে স্থায়ী সম্মান দান করেছে।

৪. দুনিয়াতে যালেম ও মযলূম উভয়েরই পরীক্ষা হয়ে থাকে। যালেম তার যুলুমের চরম সীমায় পৌঁছে গেলে তাকে ধ্বংস করা হয়। অনুরূপভাবে মযলূম সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র উপরে ভরসা করলে নির্দিষ্ট সময়ে তাকে সাহায্য করা হয়। অধিকন্তু পরকালে সে জান্নাত লাভে ধন্য হয়।

৫. দ্বীনদার সংস্কারককে সর্বদা আল্লাহ্র সাহায্যের উপরে নির্ভরশীল থাকতে হয় এবং কথায় ও আচরণে সামান্যতম অহংকার প্রকাশ করা হ'তে বিরত থাকতে হয়। মূসা ও খিযিরের ঘটনায় আল্লাহ এ প্রশিক্ষণ দিয়ে সবাইকে সেকথা বুঝিয়ে দিয়েছেন।

৬. অহীর বিধানের অবাধ্যতা করলে আল্লাহ্র রহমতপ্রাপ্ত জাতিও চিরস্থায়ী গযবের শিকার হ'তে পারে। বনু ইস্রাঈলগণ তার জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ। নবীগণের শিক্ষার বিরোধিতা করায় তাদের উপর থেকে আল্লাহ্র রহমত উঠে যায় এবং তারা চিরস্থায়ী গযব ও লাঞ্ছনার শিকার হয়। ব্যক্তির ক্ষেত্রেও এটি

একইভাবে প্রযোজ্য। ইস্রাঈলী দরবেশ আলেম বাল‘আম বা‘ঊরার ঘটনা এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

৭. জিহাদ বিমুখ জাতি কখনোই সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে দুনিয়ায় বাঁচতে পারে না। আর সেকারণেই মিসরীয় জনগণের ১০ হ’তে ২০ শতাংশ হওয়া সত্ত্বেও বনু ইস্রাঈলগণকে রাতের অন্ধকারে সেদেশ ছেড়ে পালিয়ে আসতে হয়। অতঃপর জিহাদে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করায় তারা তাদের পিতৃভূমি বায়তুল মুক্বাদ্দাস অধিকারে ব্যর্থ হয়। যার শাস্তি স্বরূপ দীর্ঘ চল্লিশ বছর যাবত তীহ প্রান্তরের উন্মুক্ত কারাগারে তারা বন্দীত্ব বরণে বাধ্য হয়। অবশেষে নবী ইউশা-র নেতৃত্বে জিহাদ করেই তাদের পিতৃভূমি দখল করতে হয়।

৮. সংস্কারককে জাতির নিকট থেকে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়। দুনিয়ায় তাঁর নিঃস্বার্থ সঙ্গী হাতে গণা কিছু লোক হয়ে থাকে। তাঁকে স্রেফ আল্লাহ্র উপরে ভরসা করেই চলতে হয়। বিনিময়ে তিনি আখেরাতে পুরস্কৃত হন ও পরবর্তী বংশধরের নিকটে যুগ যুগ ধরে প্রেরণার উৎস হয়ে থাকেন। যেমন মূসার প্রকৃত সাথী ছিলেন তার ভাই হারূণ ও ভাগিনা ইউশা‘ বিন নূন। বাকী অধিকাংশ ছিল তাকে কষ্ট দানকারী ও স্বার্থপর সাথী । মূসা (আঃ) তাই দুঃখ করে তার কওমকে বলেন, لِمَ تُؤْذُوْنَنِيْ وَقَد تَّعْلَمُوْنَ أَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ إِلَـيْكُمْ ‘কেন তোমরা আমাকে কষ্ট দাও? অথচ তোমরা জানো যে, আমি তোমাদের নিকটে আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল’ *(ছফ ৬১/৫)*।

উপসংহার :

মূসা ও হারূণ *(আলাইহিমাস সালাম)*-এর দীর্ঘ কাহিনীর মাধ্যমে নবীদের কাহিনীর একটা বিরাট অংশ সমাপ্ত হ’ল। হারূণ ও মূসার জীবনীতে ব্যক্তি মূসা ও গোষ্ঠী বনু ইস্রাঈলের উত্থান-পতনের যে ঘটনাবলী বিবৃত হয়েছে, তা রীতিমত বিস্ময়কর ও শিহরণ মূলক। একই সাথে তা মানবীয় চরিত্রের তিক্ত ও মধুর নানাবিধ বাস্তবতায় মুখর। সমাজ সংস্কারক ও সমাজ সচেতন যেকোন পাঠকের জন্য এ কাহিনী হবে খুবই শিক্ষণীয় ও তাৎপর্যমণ্ডিত। এক্ষণে আমাদের উচিত হবে এর আলোকে সমাজ সংস্কারে ব্রতী হওয়া এবং গভীর ধৈর্যের সাথে আমাদের স্ব স্ব পরিবার, সমাজ ও জাতিকে অহি-র বিধানের আলোকে গড়ে তোলা। আল্লাহ আমাদের সুপথ প্রদর্শন করুন- আমীন!

১৬. হযরত ইউনুস *(আলাইহিস সালাম)*

হযরত ইউনুস বিন মাত্তা (আঃ)-এর কথা পবিত্র কুরআনের মোট ৬টি সূরার ১৮টি আয়াতে[৫৮] বর্ণিত হয়েছে। সূরা ইউনুস ৯৮ আয়াতে তাঁর নাম ইউনুস, সূরা আম্বিয়া ৮৭ আয়াতে 'যুন-নূন' (ذو النون) এবং সূরা ক্বলম ৪৮ আয়াতে তাঁকে 'ছাহেবুল হূত' (صاحب الحوت) বলা হয়েছে। 'নূন' ও 'হূত' উভয়ের অর্থ মাছ। যুন-নূন ও ছাহেবুল হূত অর্থ মাছওয়ালা। একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে তিনি উক্ত নামে পরিচিত হন। সামনে তা বিবৃত হবে।

ইউনুস (আঃ)-এর কওম :

ইউনুস (আঃ) বর্তমান ইরাকের মূছেল নগরীর নিকটবর্তী 'নীনাওয়া' (نينوى) জনপদের অধিবাসীদের প্রতি প্রেরিত হন। তিনি তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দেন এবং ঈমান ও সৎকর্মের প্রতি আহ্বান জানান। কিন্তু তারা তাঁর প্রতি অবাধ্যতা প্রদর্শন করে। বারবার দাওয়াত দিয়ে প্রত্যাখ্যাত হ'লে আল্লাহ্র হুকুমে তিনি এলাকা ত্যাগ করে চলে যান। ইতিমধ্যে তার কওমের উপরে আযাব নাযিল হওয়ার পূর্বাভাস দেখা দিল। জনপদ ত্যাগ করার সময় তিনি বলে গিয়েছিলেন যে, তিনদিন পর সেখানে গযব নাযিল হ'তে পারে। তারা ভাবল, নবী কখনো মিথ্যা বলেন না। ফলে ইউনুসের কওম ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে দ্রুত কুফর ও শিরক হ'তে তওবা করে এবং জনপদের সকল আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা এবং গবাদিপশু সব নিয়ে জঙ্গলে পালিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে তারা বাচ্চাদের ও গবাদিপশু গুলিকে পৃথক করে দেয় এবং নিজেরা আল্লাহ্র দরবারে কায়মনোচিত্তে কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। তারা সর্বান্ত:করণে তওবা করে এবং আসন্ন গযব হ'তে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করে। ফলে আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করেন এবং তাদের উপর থেকে আযাব উঠিয়ে নেন। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন,

فَلَوْلاَ كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيْمَانُهَا إِلاَّ قَوْمَ يُوْنُسَ لَمَّا آمَنُوْا كَشَفْنَا عَـــنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِيْنٍ- (يونس ٩٨)-

---

৫৮. যথাক্রমে (১) সূরা নিসা ৪/১৬৩; (২) আন'আম ৬/৮৬; (৩) ইউনুস ১০/৯৮; (৪) আম্বিয়া ২১/৮৭-৮৮; (৫) ছাফফাত ৩৭/১৩৯-১৪৮; (৬) ক্বলম ৬৮/৪৮-৫০। সর্বমোট = ১৮টি ॥

‘অতএব কোন জনপদ কেন এমন হ’ল না যে, তারা এমন সময় ঈমান নিয়ে আসত, যখন ঈমান আনলে তাদের উপকারে আসত? কেবল ইউনুসের কওম ব্যতীত। যখন তারা ঈমান আনল, তখন আমরা তাদের উপর থেকে পার্থিব জীবনের অপমানজনক আযাব তুলে নিলাম এবং তাদেরকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত জীবনোপকরণ ভোগ করার অবকাশ দিলাম’ *(ইউনুস ১০/৯৮)*। অত্র আয়াতে ইউনুসের কওমের প্রশংসা করা হয়েছে।

ওদিকে ইউনুস (আঃ) ভেবেছিলেন যে, তাঁর কওম আল্লাহ্র গযবে ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু পরে যখন তিনি জানতে পারলেন যে, আদৌ গযব নাযিল হয়নি, তখন তিনি চিন্তায় পড়লেন যে, এখন তার কওম তাকে মিথ্যাবাদী ভাববে এবং মিথ্যাবাদীর শাস্তি হিসাবে প্রথা অনুযায়ী তাকে হত্যা করবে। তখন তিনি জনপদে ফিরে না গিয়ে অন্যত্র হিজরতের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। এ সময় আল্লাহ্র হুকুমের অপেক্ষা করাটাই যুক্তিযুক্ত ছিল। কিন্তু তিনি তা করেননি।

মাছের পেটে ইউনুস :

আল্লাহ বলেন,

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ- إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ- فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ- فَالْتَقَمَهُ الْحُوْتُ وَهُوَ مُلِيْمٌ- (الصافات ١٣٩-١٤٢)-

‘আর ইউনুস ছিল পয়গম্বরগণের একজন’। ‘যখন সে পালিয়ে যাত্রী বোঝাই নৌকায় গিয়ে পৌঁছল’। ‘অতঃপর লটারীতে সে অকৃতকার্য হ’ল’। ‘অতঃপর একটি মাছ তাকে গিলে ফেলল। এমতাবস্থায় সে ছিল নিজেকে ধিক্কার দানকারী’ *(ছাফফাত ৩৭/১৩৯-১৪২)*।

আল্লাহ্র হুকুমের অপেক্ষা না করে নিজস্ব ইজতিহাদের ভিত্তিতে ইউনুস (আঃ) নিজ কওমকে ছেড়ে এই হিজরতে বেরিয়েছিলেন বলেই অত্র আয়াতে তাকে মনিবের নিকট থেকে পলায়নকারী বলা হয়েছে। যদিও বাহ্যত এটা কোন অপরাধ ছিল না। কিন্তু পয়গম্বর ও নৈকট্যশীলগণের মর্তবা অনেক ঊর্ধ্বে। তাই আল্লাহ তাদের ছোট-খাট ত্রুটির জন্যও পাকড়াও করেন। ফলে তিনি আল্লাহ্র পরীক্ষায় পতিত হন।

হিজরতকালে নদী পার হওয়ার সময় মাঝ নদীতে হঠাৎ নৌকা ডুবে যাবার উপক্রম হ'লে মাঝি বলল, একজনকে নদীতে ফেলে দিতে হবে। নইলে সবাইকে ডুবে মরতে হবে। এজন্য লটারী হ'লে পরপর তিনবার তাঁর নাম আসে। ফলে তিনি নদীতে নিক্ষিপ্ত হন। সাথে সাথে আল্লাহ্‌র হুকুমে বিরাটকায় এক মাছ এসে তাঁকে গিলে ফেলে। কিন্তু মাছের পেটে তিনি হযম হয়ে যাননি। বরং এটা ছিল তাঁর জন্য নিরাপদ কয়েদখানা *(ইবনে কাছীর, আম্বিয়া ৮৭-৮৮)*। মাওয়ার্দী বলেন, মাছের পেটে অবস্থান করাটা তাঁকে শাস্তি দানের উদ্দেশ্যে ছিল না। বরং আদব শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ছিল। যেমন পিতা তার শিশু সন্তানকে শাসন করে শিক্ষা দিয়ে থাকেন' *(কুরতুবী, আম্বিয়া ৮৭)*।

ইউনুস (আঃ) মাছের পেটে কত সময় বা কতদিন ছিলেন, সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। যেমন- (১) এক ঘণ্টা ছিলেন (২) তিনি পূর্বাহ্নে প্রবেশ করে অপরাহ্নে বেরিয়ে আসেন (৩) ৩ দিন ছিলেন (৪) ৭ দিন ছিলেন (৫) ২০ দিন ছিলেন (৬) ৪০ দিন ছিলেন।[৫৯] আসলে এইসব মতভেদের কোন গুরুত্ব নেই। কেননা এসবের রচয়িতা হ'ল ইহুদী গল্পকারগণ। প্রকৃত ঘটনা আল্লাহ ভাল জানেন।

ইউনুস কেন মাছের পেটে গেলেন?

এ বিষয়ে জনৈক আধুনিক মুফাসসির বলেন, রিসালাতের দায়িত্ব পালনে ত্রুটি ঘটায় এবং সময়ের পূর্বেই এলাকা ত্যাগ করায় তাকে এই পরীক্ষায় পড়তে হয়েছিল। আর নবী চলে যাওয়ার কারণেই তার সম্প্রদায়কে আযাব দানে আল্লাহ সম্মত হননি'। অথচ পুরা দৃষ্টিকোণটাই ভুল। কেননা কোন নবী থেকেই তাঁর নবুঅতের দায়িত্ব পালনে ত্রুটির কল্পনা করা নবীগণের নিষ্পাপত্বের আক্বীদার ঘোর বিপরীত। বরং তিনদিন পর আযাব আসবে, আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে এরূপ নির্দেশনা পেয়ে তাঁর হুকুমেই তিনি এলাকা ত্যাগ করেছিলেন। আর তার কওম থেকে আযাব উঠিয়ে নেওয়া হয়েছিল তাদের আন্তরিক তওবার কারণে, নবী চলে যাওয়ার কারণে নয়।[৬০]

---

৫৯. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/২১৮ পৃঃ; কুরতুবী, তাফসীর সূরা ছাফফাত ১৪৪*।
৬০. *দ্রঃ তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন (বঙ্গানুবাদ, সংক্ষেপায়িত) পৃঃ ৬১৭-১৮*।

ইউনুস মুক্তি পেলেন :

আল্লাহ বলেন,

فَلَوْلاَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ- لَلَبِثَ فِيْ بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ- فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيْمٌ- وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَّقْطِيْنٍ- وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيْدُوْنَ- فَآمَنُوْا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِيْنٍ- (الصافات ١٤٣-١٤٨)-

‘অতঃপর যদি সে আল্লাহ্র গুণগানকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হ’ত’*(ছাফফাত ১৪৩)*। ‘তাহ’লে সে ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত মাছের পেটেই থাকত’? *(১৪৪)*।‘অতঃপর আমরা তাকে একটি বিজন প্রান্তরে নিক্ষেপ করলাম, তখন সে রুগ্ন ছিল’*(১৪৫)*। ‘আমরা তার উপরে একটি লতা বিশিষ্ট বৃক্ষ উদ্গত করলাম’*(১৪৬)*। ‘এবং তাকে লক্ষ বা তদোধিক লোকের দিকে প্রেরণ করলাম’*(১৪৭)*। ‘তারা ঈমান আনল। ফলে আমরা তাদেরকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত জীবন উপভোগ করার সুযোগ দিলাম’ *(ছাফফাত ৩৭/১৪৩-১৪৮)*।

আলোচ্য আয়াতে ‘ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত সে মাছের পেটেই থাকত’-এর অর্থ সে আর জীবিত বেরিয়ে আসতে পারতো না। বরং মাছের পেটেই তার কবর হ’ত এবং সেখান থেকেই ক্বিয়ামতের দিন তার পুনরুত্থান হ’ত।

অন্যত্র আল্লাহ তাঁর শেষনবীকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلاَ تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُوْمٌ- لَوْلاَ أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُوْمٌ- فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِيْنَ- (القلم ٤٨-٥٠)-

‘তুমি তোমার পালনকর্তার আদেশের অপেক্ষায় ধৈর্য ধারণ কর এবং মাছওয়ালার (ইউনুসের) মত হয়ো না। যখন সে দুঃখাকুল মনে প্রার্থনা করেছিল’। ‘যদি তার পালনকর্তার অনুগ্রহ তাকে সামাল না দিত, তাহ’লে সে নিন্দিত অবস্থায় জনশূন্য প্রান্তরে পড়ে থাকত’। ‘অতঃপর তার পালনকর্তা তাকে মনোনীত করলেন এবং তাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন’ *(ক্বলম ৬৮/৪৮-৫০)*।

‘যদি আল্লাহ্র অনুগ্রহ তাকে সামাল না দিত, তাহ’লে সে নিন্দিত অবস্থায় জনশূন্য প্রান্তরে পড়ে থাকত’-এর অর্থ আল্লাহ যদি তাকে তওবা করার

তাওফীক্ব না দিতেন এবং তার দো‘আ কবুল না করতেন, তাহ’লে তাকে জীবিত অবস্থায় নদী তীরে মাটির উপর ফেলতেন না। যেখানে গাছের পাতা খেয়ে তিনি পুষ্টি ও শক্তি লাভ করেন। বরং তাকে মৃত অবস্থায় নদীর কোন বালুচরে ফেলে রাখা হ’ত, যা তার জন্য লজ্জাষ্কর হ’ত।

‘অতঃপর তার পালনকর্তা তাকে মনোনীত করলেন’ অর্থ এটা নয় যে, ইতিপূর্বে আল্লাহ ইউনুসকে মনোনীত করেননি; বরং এটা হ’ল বর্ণনার আগপিছ মাত্র। কুরআনের বহু স্থানে এরূপ রয়েছে। এখানে এর ব্যাখ্যা এই যে, ইউনুস মাছের পেটে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করায় আল্লাহ তাকে পুনরায় কাছে টানলেন ও সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করলেন।

অন্যত্র ইউনুসের ক্রুদ্ধ হয়ে নিজ জনপদ ছেড়ে চলে আসা, মাছের পেটে বন্দী হওয়া এবং ঐ অবস্থায় আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَذَا النُّوْنِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَن لَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ- فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ-(الأنبياء ٨٧-٨٨)-

‘এবং মাছওয়ালা (ইউনুস)-এর কথা স্মরণ কর, যখন সে (আল্লাহ্র অবাধ্যতার কারণে লোকদের উপর) ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিল এবং বিশ্বাসী ছিল যে, আমরা তার উপরে কোনরূপ কষ্ট দানের সিদ্ধান্ত নেব না’।[৬১] ‘অতঃপর সে (মাছের পেটে) ঘন অন্ধকারের মধ্যে আহ্বান করল (হে আল্লাহ!) তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি পবিত্র। আমি সীমা লংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত’। ‘অতঃপর আমরা তার আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং তাকে দুশ্চিন্তা হ’তে মুক্ত করলাম। আর এভাবেই আমরা বিশ্বাসীদের মুক্তি দিয়ে থাকি’ *(আম্বিয়া ২১/৮৭-৮৮)*।

---

৬১. *অধিকাংশ তাফসীর গ্রন্থে এখানে অনুবাদে মারাত্মক ভুল করা হয়েছে। যেমন (১) বঙ্গানুবাদ তাফসীর ইবনু কাছীরে বলা হয়েছে ‘তিনি মনে করেছিলেন আমি তার উপর কোন ক্ষমতা রাখি না’। অথচ কোন নবী কখনো আল্লাহ সম্পর্কে এরূপ ধারণা করতে পারেন না। এখানে অনুবাদক ‘কুদরত’ মাদ্দাহ থেকে শব্দার্থ করেছেন, যেটা এখানে ভুল শুধু নয় বরং অন্যায়। (২) সঊদী সরকার প্রকাশিত বঙ্গানুবাদ তাফসীর মা‘আরেফুল কুরআনে বলা হয়েছে, ‘তিনি মনে করেছিলেন যে, আমি তাকে ধৃত করতে পারব না’ (৩) একই মর্মে অনুবাদ করা হয়েছে সঊদী সরকার প্রকাশিত উর্দূ তাফসীরে এবং (৪) আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলী অনূদিত ইংরেজী তাফসীরে।*

ইউনুস (আঃ)-এর উক্ত দো‘আ ‘দো‘আয়ে ইউনুস’ নামে পরিচিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

دعوةُ ذى النون إذْ دعا رَبَّهُ وهو فى بطن الحوتِ (لآ إله إلا أنت سُبْحَانَكَ إنى كنتُ من الظالمين) لم يَدْعُ بها رجلٌ مسلمٌ فى شيءٍ إلاَّ اسْتَجَابَ لَهُ، رواه الترمذى–

‘বিপদগ্রস্ত কোন মুসলমান যদি (নেক মকছূদ হাছিলের নিমিত্তে) উক্ত দো‘আ পাঠ করে, তবে আল্লাহ তা কবুল করেন’।[৬২] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

لا تُفَضِّلُوْا بين أنبياء الله وما يَنْبَغِيْ لعبدٍ أن يَّقولَ : إنِّي خيرٌ مِّنْ يُـــوْنُسَ بْـــنِ مَتَّى، متفق عليه–

‘তোমরা আল্লাহ্র নবীগণের মধ্যে মর্যাদার তারতম্য করো না। আর কোন বান্দার জন্য এটা বলা উচিত নয় যে, আমি ইউনুস বিন মাত্তার চাইতে উত্তম’।[৬৩] কুরতুবী এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) এটা এজন্য বলেছেন যে, তিনি যেমন (মি‘রাজে) সিদরাতুল মুনতাহায় আল্লাহ্র নিকটবর্তী হয়েছিলেন, নদীর অন্ধকার গর্ভে মাছের পেটের মধ্যে তেমনি আল্লাহ ইউনুস-এর নিকটবর্তী হয়েছিলেন *(কুরতুবী, আম্বিয়া ৮৭)*। বস্তুতঃ এটা ছিল রাসূলের নিরহংকার স্বভাব ও বিনয়ের বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

উপরোক্ত আয়াত সমূহে প্রতীয়মান হয় যে, ইউনুস (আঃ) মাছের পেটে থাকার পরে আল্লাহ্র হুকুমে নদীতীরে নিক্ষিপ্ত হন। মাছের পেটে থাকার ফলে স্বাভাবিকভাবেই তিনি রুগ্ন ছিলেন। ঐ অবস্থায় সেখানে উদ্গত লাউ জাতীয় গাছের পাতা তিনি খেয়েছিলেন, যা পুষ্টিসমৃদ্ধ ছিল। অতঃপর সুস্থ হয়ে তিনি আল্লাহ্র হুকুমে নিজ কওমের নিকটে চলে যান। যাদের সংখ্যা এক লক্ষ বা তার বেশী ছিল। তারা তাঁর উপরে ঈমান আনলো। ফলে পুনরায় শিরকী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তাদেরকে অনুগ্রহ করেন এবং দুনিয়া ভোগ করার সুযোগ দেন।

---

৬২. *তিরমিযী হা/৩৭৫২ ‘দো‘আ সমূহ’ অধ্যায়, ৮৫ অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/২২৯২ ‘দো‘আ সমূহ’ অধ্যায় ‘আল্লাহ্র নাম সমূহ’ অনুচ্ছেদ-২।*

৬৩. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৭০৯-১০, ক্বিয়ামতের অবস্থা’ অধ্যায়, ‘সৃষ্টির সূচনা ও নবীগণের আলোচনা’ অনুচ্ছেদ- ৯।*

Contents

শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ :

(১) বিভ্রান্ত কওমের দুর্ব্যবহারে অতিষ্ট হয়ে তাদেরকে ছেড়ে চলে যাওয়া কোন সমাজ সংস্কারকের উচিত নয়।

(২) আল্লাহ তার নেক বান্দার উপর শাস্তি আরোপ করবেন না, যেকোন সংকটে এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে।

(৩) আল্লাহ্‌র পরীক্ষা কিরূপ হবে, তা পরীক্ষা আগমনের এক সেকেণ্ড পূর্বেও জানা যাবে না।

(৪) কঠিনতম কষ্টের মুহূর্তে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র কাছেই সাহায্য চাইতে হবে।

(৫) খালেছ তওবা ও আকুল প্রার্থনার ফলে অনেক সময় আল্লাহ গযব উঠিয়ে নিয়ে থাকেন। যেমন ইউনুসের কওমের উপর থেকে আল্লাহ গযব ফিরিয়ে নিয়েছিলেন।

(৬) আল্লাহ ইচ্ছা করলে যেকোন পরিবেশে ঈমানদারকে রক্ষা করে থাকেন।

(৭) পশু-পক্ষী, বৃক্ষ-লতা ও জলচর প্রাণী সবাই আল্লাহ্‌র হুকুমে ঈমানদার ব্যক্তির সেবায় নিয়োজিত হয়। যেমন মাছ ও লতা জাতীয় গাছ ইউনুসের সেবায় নিযুক্ত হয়েছিল।

(৮) বাহ্যদৃষ্টিতে কোন বস্তু খারাব মনে হ'লেও নেককার ব্যক্তির জন্য আল্লাহ উত্তম ফায়ছালা করে থাকেন। যেমন লটারীতে নদীতে নিক্ষেপের সিদ্ধান্ত নিজের জন্য অতীব খারাব মনে হ'লেও আল্লাহ ইউনুসের জন্য উত্তম ফায়ছালা দান করেন ও তাকে মুক্ত করেন।

(৯) আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য ব্যতীত দো'আ কবুল হয় না। যেমন গভীর সংকটে নিপতিত হবার আগে ও পরে ইউনুস আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্যশীল ছিলেন। ফলে আল্লাহ তার দো'আ কবুল করেন।

(১০) আল্লাহ্‌র প্রতিটি কর্ম তার নেককার বান্দার জন্য কল্যাণকর হয়ে থাকে। যা বান্দা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে না পারলেও পরে বুঝতে পারে। যেমন ইউনুস পরে বুঝতে পেরে আল্লাহ্‌র প্রতি অধিক অনুগত হন এবং এজন্য তিনি আল্লাহ্‌র প্রতি অধিক প্রত্যাবর্তনশীল (أَوَّابٌ) বলে আল্লাহ্‌র প্রশংসা পান।

১৭. হযরত দাঊদ *(আলাইহিস সালাম)*

বিপুল শক্তি ও রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী নবী ছিলেন মাত্র দু’জন। তাঁরা হ’লেন পিতা ও পুত্র দাঊদ ও সুলায়মান (আঃ)। বর্তমান ফিলিস্তীন সহ সমগ্র ইরাক ও শাম (সিরিয়া) এলাকায় তাঁদের রাজত্ব ছিল। পৃথিবীর অতুলনীয় ক্ষমতার অধিকারী হয়েও তাঁরা ছিলেন সর্বদা আল্লাহ্‌র প্রতি অনুগত ও সদা কৃতজ্ঞ। সেকারণ আল্লাহ তার শেষনবীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّـــهُ أَوَّابٌ-(ص ١٧)- ‘তারা যেসব কথা বলে তাতে তুমি ছবর কর এবং আমার শক্তিশালী বান্দা দাঊদকে স্মরণ কর। সে ছিল আমার প্রতি সদা প্রত্যাবর্তনশীল’ *(ছোয়াদ ৩৮/১৭)*। দাঊদ হলেন আল্লাহ্‌র একমাত্র বান্দা, যাকে খুশী হয়ে পিতা আদম স্বীয় বয়স থেকে ৪০ বছর কেটে তাকে দান করার জন্য আল্লাহ্‌র নিকটে সুফারিশ করেছিলেন এবং সেমতে দাঊদের বয়স ৬০ হ’তে ১০০ বছরে বৃদ্ধি পায়[৬৪]

উল্লেখ্য যে, হযরত দাঊদ (আঃ) সম্পর্কে কুরআনের ৯টি সূরায় ২৩টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।[৬৫] তিনি ছিলেন শেষনবী (ছাঃ)-এর আগমনের প্রায় দেড় হাযার বছরের পূর্বেকার নবী[৬৬] দাঊদ কেবল রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে পেয়েই শক্তিশালী হননি, বরং তিনি জন্মগতভাবেই ছিলেন দৈহিকভাবে শক্তিশালী এবং একই সাথে ঈমানী শক্তিতে বলিয়ান। নিম্নোক্ত ঘটনায় তা বর্ণিত হয়েছে।-

জালূত ও তালূতের কাহিনী এবং দাঊদের বীরত্ব :

সাগরডুবি থেকে নাজাত পেয়ে মূসা ও হারূণ (আঃ) যখন বনু ইস্রাঈলদের নিয়ে শামে এলেন এবং শান্তিতে বসবাস করতে থাকলেন, তখন আল্লাহ তাদেরকে তাদের পিতৃভূমি ফিলিস্তীনে ফিরে যাবার আদেশ দিলেন এবং ফিলিস্তীন দখলকারী শক্তিশালী আমালেক্বাদের সঙ্গে জিহাদের নির্দেশ দিলেন। সাথে সাথে এ ওয়াদাও দিলেন যে, জিহাদে নামলেই তোমাদের

---

৬৪. *তিরমিযী, হাসান ছহীহ, মিশকাত হা/১১৮, ‘ঈমান’ অধ্যায় ‘তাক্বদীরে বিশ্বাস’ অনুচ্ছেদ-৩।*
৬৫. *যথাক্রমে (১) বাক্বারাহ ২/২৫১; (২) নিসা ৪/১৬৩; (৩) মায়েদাহ ৫/৭৮; (৪) আন‘আম ৬/৮৪; (৫) ইসরা ১৭/৫৫; (৬) আম্বিয়া ২১/৭৮-৮০; (৭) নমল ২৭/১৫-১৬; (৮) সাবা ৩৪/১০-১১,১৩; (৯) ছোয়াদ ৩৮/১৭-২৬= ১০; মোট ২৩টি আয়াত।*
৬৬. *তাফসীর মা‘আরেফুল কুরআন পৃঃ ৯৯০।*

বিজয় দান করা হবে *(মায়েদাহ ৫/২৩)*। কিন্তু এই ভীতু ও জিহাদ বিমুখ বিলাসী জাতি তাদের নবী মূসাকে পরিষ্কার বলে দিল, اذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُوْنَ-(المائدة ٢٥)- 'তুমি ও তোমার রব গিয়ে যুদ্ধ কর গে। আমরা এখানে বসে রইলাম' *(মায়েদাহ ৫/২৪)*। এতবড় বেআদবীর পরে মূসা (আঃ) তাদের ব্যাপারে নিরাশ হ'লেন এবং কিছু দিনের মধ্যেই দু'ভাই পরপর তিন বছরের ব্যবধানে মৃত্যু বরণ করলেন।

জিহাদের আদেশ অমান্য করার শাস্তি স্বরূপ মিসর ও শামের মধ্যবর্তী তীহ প্রান্তরে চল্লিশ বছর যাবত উন্মুক্ত কারাগারে অতিবাহিত করার পর মূসার শিষ্য ও ভাগিনা এবং পরবর্তীতে নবী ইউশা' বিন নূনের নেতৃত্বে জিহাদ সংঘটিত হয় এবং আমালেক্বাদের হটিয়ে তারা ফিলিস্তীন দখল করে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে তারা পুনরায় বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দেয় এবং নানাবিধ অনাচারে লিপ্ত হয়। তখন আল্লাহ তাদের উপরে পুনরায় আমালেক্বাদের চাপিয়ে দেন। বনু ইস্রাঈলরা আবার নিগৃহীত হ'তে থাকে। এভাবে বহু দিন কেটে যায়। এক সময় শ্যামুয়েল (شمويل) নবীর যুগ আসে। লোকেরা বলে আপনি আমাদের জন্য একজন সেনাপতি দানের জন্য আল্লাহ্র নিকট দো'আ করুন, যাতে আমরা আমাদের পূর্বের ঐতিহ্য ফিরে পাই এবং বর্তমান দুর্দশা থেকে মুক্তি পাই। এই ঘটনা আল্লাহ তার শেষনবীকে শুনিয়েছেন নিম্নোক্ত ভাষায়-

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوْا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكاً نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلاَّ تُقَاتِلُوْا قَالُوْا وَمَا لَنَا أَلاَّ نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَآئِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِيْنَ- (البقرة ٢٤٦)-

'তুমি কি মূসার পরে বনু ইস্রাঈলদের একদল নেতাকে দেখনি, যখন তারা তাদের নবীকে বলেছিল, আমাদের জন্য একজন শাসক প্রেরণ করুন, যাতে আমরা (তার নেতৃত্বে) আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করতে পারি। নবী বললেন, তোমাদের প্রতি কি এমন ধারণা করা যায় যে, লড়াইয়ের নির্দেশ দিলে

তোমরা লড়াই করবে? তারা বলল, আমাদের কি হয়েছে যে, আমরা আল্লাহ্র পথে লড়াই করব না? অথচ আমরা বিতাড়িত হয়েছি নিজেদের ঘর-বাড়ি ও সন্তান-সন্ততি হ’তে! অতঃপর যখন লড়াইয়ের নির্দেশ হ’ল তখন সামান্য কয়েকজন ছাড়া বাকীরা সবাই ফিরে গেল। বস্তুতঃ আল্লাহ যালেমদের ভাল করেই জানেন’ *(বাক্বারাহ ২/২৪৬)*। ঘটনাটি ছিল নিম্নরূপ:-

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكاً قَالُوْا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَّشَآءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ- وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَّأْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوْسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلآئِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِنْ كُنْتُم مُّؤْمِنِيْنَ-(البقرة ٢٤٧-٢٤٨)-

‘তাদের নবী তাদের বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তালূতকে তোমাদের জন্য শাসক নিযুক্ত করেছেন। তারা বলল, সেটা কেমন করে হয় যে, তার শাসন চলবে আমাদের উপরে। অথচ আমরাই শাসন ক্ষমতা পাওয়ার অধিক হকদার। তাছাড়া সে ধন-সম্পদের দিক দিয়েও সচ্ছল নয়। জওয়াবে নবী বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপরে তাকে মনোনীত করেছেন এবং স্বাস্থ্য ও জ্ঞানের দিক দিয়ে তাকে প্রাচুর্য দান করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান করেন। তিনি হ’লেন প্রাচুর্য দানকারী ও সর্বজ্ঞ’। ‘নবী তাদেরকে বললেন, তালূতের নেতৃত্বের নিদর্শন এই যে, তোমাদের কাছে (তোমাদের কাংখিত) সিন্দুকটি আসবে তোমাদের প্রভুর পক্ষ হ’তে তোমাদের হৃদয়ের প্রশান্তি রূপে। আর তাতে থাকবে মূসা, হারূণ ও তাদের পরিবার বর্গের ব্যবহৃত কিছু পরিত্যক্ত সামগ্রী। সিন্দুকটিকে বহন করে আনবে ফেরেশতাগণ। এতেই তোমাদের (শাসকের) জন্য নিশ্চিত নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও’ *(বাক্বারাহ ২/২৪৭-২৪৮)*।

বিষয়টি এই যে, বনু ইস্রাঈলগণের নিকটে একটা সিন্দুক ছিল। যার মধ্যে তাদের নবী মূসা, হারূণ ও তাঁদের পরিবারের ব্যবহৃত কিছু পরিত্যক্ত সামগ্রী ছিল। তারা এটাকে খুবই বরকতময় মনে করত এবং যুদ্ধকালে একে সম্মুখে

রাখত। একবার আমালেক্বাদের সাথে যুদ্ধের সময় বনু ইস্রাঈলগণ পরাজিত হ'লে আমালেক্বাদের বাদশাহ জালূত উক্ত সিন্দুকটি নিয়ে যায়। এক্ষণে যখন বনু ইস্রাঈলগণ পুনরায় জিহাদের সংকল্প করল, তখন আল্লাহ তাদেরকে উক্ত সিন্দুক ফিরিয়ে দিতে মনস্থ করলেন। অতঃপর এই সিন্দুকটির মাধ্যমে তাদের মধ্যেকার নেতৃত্ব নিয়ে ঝগড়ার নিরসন করেন। সিন্দুকটি তালূতের বাড়ীতে আগমনের ঘটনা এই যে, জালূতের নির্দেশে কাফেররা যেখানেই সিন্দুকটি রাখে, সেখানেই দেখা দেয় মহামারী ও অন্যান্য বিপদাপদ। এমনিভাবে তাদের পাঁচটি শহর ধ্বংস হয়ে যায়। অবশেষে অতিষ্ট হয়ে তারা একে তার প্রকৃত মালিকদের কাছে পাঠিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিল এবং গরুর গাড়ীতে উঠিয়ে হাঁকিয়ে দিল। তখন ফেরেশতাগণ আল্লাহ্র নির্দেশমতে গরুর গাড়ীটিকে তাড়িয়ে এনে তালূতের ঘরের সম্মুখে রেখে দিল। বনু ইস্রাঈলগণ এই দৃশ্য দেখে সবাই একবাক্যে তালূতের নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করল। অতঃপর তালূত আমালেক্বাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার প্রস্তুতি শুরু করলেন।

সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হ'লে তিনি কথিত মতে ৮০,০০০ হাযার সেনাদল নিয়ে রওয়ানা হন। ইবনু কাছীর এই সংখ্যায় সন্দেহ পোষণ করে বলেন, ক্ষুদ্রায়তন ফিলিস্তীন ভূমিতে এই বিশাল সেনাদলের সংকুলান হওয়াটা অসম্ভব ব্যাপার।[৬৭] অল্প বয়স্ক তরুণ দাঊদ ছিলেন উক্ত সেনা দলের সদস্য। পথিমধ্যে সেনাপতি তালূত তাদের পরীক্ষা করতে চাইলেন। সম্মুখেই ছিল এক নদী। মৌসুম ছিল প্রচণ্ড গরমের। পিপাসায় ছিল সবাই কাতর। এ বিষয়টি কুরআন বর্ণনা করেছে নিম্নরূপ:

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ قَالَ إِنَّ اللهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّيْ إِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوْا مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا مَعَهُ قَالُوْا لاَ طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهِ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ أَنَّهُم مُّلاَقُو اللهِ: كَم مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِإِذْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِيْنَ-(البقرة ٢٤٩)-

৬৭. *ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ২/৮; আমরা মনে করি স্থান সংকুলান বড় কথা নয়। যুদ্ধটাই বড় কথা। কেননা আমরা দেখেছি যে, পরবর্তীতে এর পাশেই আজনাদাইন ও ইয়ারমূক যুদ্ধে ২,৪০,০০০ রোমক সৈন্যের মুকাবিলায় মুসলমানরা ৪০,০০০ সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করেছে ও বিজয়ী হয়েছে (ঐ, ৭/৭)।*

‘অতঃপর তালূত যখন সৈন্যদল নিয়ে বের হ’ল, তখন সে বলল, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন একটি নদীর মাধ্যমে। যে ব্যক্তি সেই নদী হ’তে পান করবে, সে ব্যক্তি আমার দলভুক্ত নয়। আর যে ব্যক্তি স্বাদ গ্রহণ করবে না, সেই-ই আমার দলভুক্ত হবে। তবে হাতের এক আঁজলা মাত্র। অতঃপর সবাই সে পানি থেকে পান করল, সামান্য কয়েকজন ব্যতীত। পরে তালূত যখন নদী পার হ’ল এবং তার সঙ্গে ছিল মাত্র কয়েকজন ঈমানদার ব্যক্তি (তখন অধিক পানি পানকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ) লোকেরা বলতে লাগল, আজকের দিনে জালূত ও তার সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই। (পক্ষান্তরে) যাদের বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ্‌র সম্মুখে তাদের একদিন উপস্থিত হ’তেই হবে, তারা বলল, কত ছোট ছোট দল বিজয়ী হয়েছে বড় বড় দলের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র হুকুমে। নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদের সাথে আল্লাহ থাকেন’ *(বাক্বারাহ ২/২৪৯)*।

বস্তুতঃ নদী পার হওয়া এই স্বল্প সংখ্যক ঈমানদারগণের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩১৩ জন, যা শেষনবীর সাথে কাফেরদের বদর যুদ্ধকালে যুদ্ধরত ছাহাবীগণের সংখ্যার সাথে মিলে যায়। পানি পানকারী হাযারো সৈনিক নদী পারে আলস্যে ঘুমিয়ে পড়ল। অথচ পানি পান করা থেকে বিরত থাকা স্বল্প সংখ্যক ঈমানদার সাথী নিয়েই তালূত চললেন সেকালের সেরা সেনাপতি ও শৌর্য-বীর্যের প্রতীক আমালেক্বাদের বাদশাহ জালূতের বিরুদ্ধে। বস্তুবাদীগণের হিসাব মতে এটা ছিল নিতান্তই আত্মহননের শামিল। এই দলেই ছিলেন দাঊদ। আল্লাহ বলেন,

وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهِ قَالُوْا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً وَّثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ-(البقرة ٢٥٠)-

‘আর যখন তারা জালূত ও তার সেনাবাহিনীর সম্মুখীন হ’ল, তখন তারা বলল, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের ধৈর্য দান কর ও আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখ এবং আমাদেরকে তুমি কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য কর’ *(বাক্বারাহ ২/২৫০)*।

জালূত বিরাট সাজ-সজ্জা করে হাতীতে সওয়ার হয়ে সামনে এসে আস্ফালন করতে লাগল এবং সে যুগের যুদ্ধরীতি অনুযায়ী প্রতিপক্ষের সেরা যোদ্ধাকে

আহ্বান করতে থাকল। অল্পবয়ষ্ক বালক দাঊদ নিজেকে সেনাপতি তালূতের সামনে পেশ করলেন। তালূত তাকে পাঠাতে রাযী হ'লেন না। কিন্তু দাঊদ নাছোড় বান্দা। অবশেষে তালূত তাকে নিজের তরবারি দিয়ে উৎসাহিত করলেন এবং আল্লাহ্র নামে জালূতের মোকাবিলায় প্রেরণ করলেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি এ ঘোষণা আগেই দিয়েছিলেন যে, যে ব্যক্তি জালূতকে বধ করে ফিলিস্তীন পুনরুদ্ধার করতে পারবে, তাকে রাজ্য পরিচালনায় শরীক করা হবে। অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত জালূতকে মারা খুবই কঠিন ছিল। কেননা তার সারা দেহ ছিল লৌহ বর্মে আচ্ছাদিত। তাই তরবারি বা বল্লম দিয়ে তাকে মারা অসম্ভব ছিল। আল্লাহ্র ইচ্ছায় দাঊদ ছিলেন পাথর ছোঁড়ায় উস্তাদ। সমবয়সীদের সাথে তিনি মাঠে গিয়ে নিশানা বরাবর পাথর মারায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। দাঊদ পকেট থেকে পাথর খণ্ড বের করে হাতীর পিঠে বসা জালূতের চক্ষু বরাবর নিশানা করে এমন জোরে মারলেন যে, তাতেই জালূতের চোখশুদ্ধ মাথা ফেটে মগয বেরিয়ে চলে গেল। এভাবে জালূত মাটিতে লুটিয়ে পড়লে তার সৈন্যরা পালিয়ে গেল। যুদ্ধে তালূত বিজয় লাভ করলেন। যেমন আল্লাহ বলেন,

فَهَزَمُوْهُمْ بِإِذْنِ اللهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوْتَ وَآتَاهُ اللهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَآءُ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَـكِنَّ اللهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِيْنَ-(البقرة ٢٥١)-

'অতঃপর তারা আল্লাহ্র হুকুমে তাদেরকে পরাজিত করল এবং দাঊদ জালূতকে হত্যা করল। আর আল্লাহ দাঊদকে দান করলেন রাজ্য ও দূরদর্শিতা এবং তাকে শিক্ষা দান করলেন, যা তিনি চাইলেন। বস্তুতঃ আল্লাহ যদি এভাবে একজনকে অপরজনের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহ'লে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ বিশ্ববাসীর প্রতি একান্তই দয়াশীল' *(বাক্বারাহ ২/২৫১)*।

শিক্ষণীয় বিষয় :

(১) নেতৃত্বের জন্য সর্বাধিক প্রয়োজন হ'ল জ্ঞান ও দৈহিক স্বাস্থ্য, যা তালূতের মধ্যে ছিল।

(২) নেতৃত্বের জন্য বংশ ও অর্থ-সম্পদের চাইতে বড় প্রয়োজন দৃঢ় ঈমান ও আল্লাহ্র উপরে নির্ভরশীলতা।

(৩) নেতার জন্য অবশ্য কর্তব্য হ’ল কর্মীদের পরীক্ষার মাধ্যমে বাছাই করা। যেমন তালূত করেছিলেন।

(৪) চিরকাল সংখ্যালঘু ঈমানদারগণ সংখ্যাগুরু অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে থাকে। যা তালূত ও জালূতের ঘটনায় প্রমাণিত হয়।

(৫) আল্লাহ্র উপরে নির্ভরশীল, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও কুশলী সেনাপতি এবং স্বল্পসংখ্যক নিবেদিত প্রাণ লোকই যথেষ্ট হয় বিজয় লাভের জন্য। তালূত ও দাঊদ যার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ।

(৬) অস্ত্রবল ও জনবলের চাইতে ঈমানী বল যেকোন বিজয়ের মূল শক্তি।

(৭) উপরোক্ত ঘটনায় আরেকটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, তালূত কর্তৃক পরীক্ষা গ্রহণের ফলে তাঁর আমলেই বনু ইস্রাঈলগণের মধ্যে দু’টি দলের সৃষ্টি হয়। একদল তালূতের অনুগত মুমিন। যারা নিজেদেরকে ‘বনূ ইস্রাঈল’ বলেই পরিচিত করে। অর্থ ‘আল্লাহ্র দাস’-এর বংশ। অপর দল ছিল মুনাফিক- যাদেরকে ‘ইয়াহুদী’ বলা হ’ত। প্রকৃত বনু ইস্রাঈলগণ ‘ইয়াহুদী’ নামকে ঘৃণার সাথে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। আজও পৃথিবীতে তারা ঘৃণিত হয়েই আছে। অতদিন কিয়ামত হবেনা যতদিন না মুসলমানরা একে একে এদেরকে হত্যা করবেন। গাছ ও পাথর পর্যন্ত এদের পালিয়ে থাকা অবস্থান মুসলমানদের জানিয়ে দেবে।[৬৮]

দাঊদ (আঃ)-এর কাহিনী :

তালূত ‘আমালেক্বা দখলদারদের হটিয়ে শামের শাসনকর্তার পদ লাভ করেন। অতঃপর দাঊদ কতদিন পরে নবী হন এবং তালূতের পরে কখন তিনি শাসনক্ষমতায় আসেন, এ বিষয়ে স্পষ্ট কিছু জানা যায় না। তবে অন্যান্য নবীদের ন্যায় তিনি চল্লিশ বছর বয়সে নবুঅত লাভ করেন বলে আমরা ধরে নিতে পারে। তিনি শতায়ু ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁর পুত্র সন্তানের সংখ্যা ছিল ১৯ জন। তন্মধ্যে সুলায়মান (আঃ) নবুঅত ও শাসন ক্ষমতা উভয় দিক দিয়ে *(নমল ২৭/১৬)* পিতার স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন। আল্লাহ পিতা ও পুত্রকে অনন্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে সৃষ্টি করেছিলেন। আমরা কুরআন থেকে যা প্রাপ্ত হয়েছি সেটুকুই পেশ করব সত্যসন্ধানী পাঠকের

---

৬৮. মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪১৪ ‘ফিতান’ অধ্যায়, ১ অনুচ্ছেদ।

জন্য। মনে রাখা আবশ্যক যে, কুরআন কোন গল্পগ্রন্থ নয়। মানুষের হেদায়াতের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই মাত্র সেখানে পাওয়া যায়। বাকী তথ্যাবলীর উৎস হ'ল ইস্রাঈলী বর্ণনা সমূহ, যার কোন নির্ভরযোগ্য ভিত্তি নেই। বরং সেখানে অন্যান্য নবীগণের ন্যায় দাঊদ ও সুলায়মানের চরিত্রকে মসীলিপ্ত করা হয়েছে। আর সেইসব নোংরা কাহিনীকে ভিত্তি করে আরবী, উর্দূ, ফার্সী এমনকি বাংলা ভাষায়ও লিখিত হয়েছে 'নবীদের কাহিনী' নামে বহু বাজে বই-পুস্তিকা। নবীগণের নিষ্পাপত্বে বিশ্বাসী ঈমানদার পাঠকগণ ঐসব বইপত্র থেকে দূরে থাকবেন, এটাই আমরা একান্তভাবে কামনা করব। বরং আমাদের পরামর্শ থাকবে, ঐসব উদ্ভট ও নোংরা গল্পগুজবে ভরা তথাকথিত ধর্মীয় (?) বই-পত্র আগুনে পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিন। তাতে নিজের ও পরিবারের এবং অন্যদের ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে বেঁচে যাবে।

দাঊদ (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্য সমূহ :

আল্লাহ প্রত্যেক নবীকে স্বতন্ত্র কিছু বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। সেমতে দাঊদ (আঃ)-কে প্রদত্ত বৈশিষ্ট্য সমূহ নিম্নে বিবৃত হ'ল।-

১. আল্লাহ দাঊদ (আঃ)-কে আধ্যাত্মিক ও দৈহিক শক্তিতে বলিয়ান করে সৃষ্টি করেছিলেন। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ-(ص ١٧)- 'স্মরণ কর, আমার বান্দা দাঊদকে। সে ছিল শক্তিশালী এবং আমার প্রতি সদা প্রত্যাবর্তনশীল' *(ছোয়াদ ৩৮/১৭)*। আয়াতের প্রথমাংশে তাঁর দৈহিক ও দুনিয়াবী শাসন শক্তির কথা বলা হয়েছে এবং শেষাংশে তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তির কথা বলা হয়েছে। এজন্য যে, বিরাট ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাদশাহ হওয়া সত্ত্বেও তিনি সর্বদা আল্লাহ্র প্রতি নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। সকল কাজে তাঁর দিকেই ফিরে যেতেন।

বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলার নিকটে সর্বাধিক পসন্দনীয় ছালাত হ'ল দাঊদ (আঃ)-এর ছালাত এবং সর্বাধিক পসন্দনীয় ছিয়াম ছিল দাঊদ (আঃ)-এর ছিয়াম। তিনি অর্ধরাত্রি পর্যন্ত ঘুমাতেন। অতঃপর এক তৃতীয়াংশ ছালাতে কাটাতেন এবং শেষ ষষ্ঠাংশে নিদ্রা যেতেন। তিনি একদিন অন্তর একদিন ছিয়াম রাখতেন। শত্রুর মোকাবিলায় তিনি কখনো পশ্চাদপসরণ করতেন না'।[৬৯]

---

৬৯. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১২২৫ 'রাত্রিতে নফল ছালাতে উৎসাহ দান' অনুচ্ছেদ-৩৩।*

২. পাহাড় ও পক্ষীকুল তাঁর অনুগত ছিল। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّـــا سَـــخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ- وَالطَّيْرَ مَحْشُوْرَةً، كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ-(ص ١٨-١٩)- ‘আমরা পর্বতমালাকে তার অনুগত করে দিয়েছিলাম। তারা সকাল-সন্ধ্যায় তার সাথে পবিত্রতা বর্ণনা করত’। ‘আর পক্ষীকুলকেও, যারা তার কাছে সমবেত হ’ত। সবাই ছিল তার প্রতি প্রত্যাবর্তনশীল’ *(ছোয়াদ ৩৮/১৮-১৯)*। একই মর্মে বক্তব্য এসেছে সূরা সাবা ১০ আয়াতে। অন্যদিকে আল্লাহ দাঊদ-পুত্র সুলায়মানের অধীনস্ত করে দিয়েছিলেন বায়ুকে ও জিনকে। পাহাড় ও পক্ষীকুল হযরত দাঊদ (আঃ)-এর কিভাবে আনুগত্য করত- সে বিষয়ে কোন বক্তব্য কুরআনে আসেনি। তাফসীরবিদগণ নানাবিধ সম্ভাবনা ব্যক্ত করেছেন। আমরা সেগুলিকে এড়িয়ে গেলাম। কেননা ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, أَبْهِمُوا مَا أَبْهَمَهُ اللهُ ‘আল্লাহ যে বিষয়কে অস্পষ্ট রেখেছেন, তোমরাও তাকে অস্পষ্ট থাকতে দাও’।[৭০]

৩, ৪ ও ৫. তাঁকে দেওয়া হয়েছিল সুদৃঢ় সাম্রাজ্য, গভীর প্রজ্ঞা ও অনন্য বাগ্মিতা। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَـــابِ-(ص ٢٠)- ‘আমরা তার সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম এবং তাকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও ফায়ছালাকারী বাগ্মিতা’ *(ছোয়াদ ৩৮/২০)*। উল্লেখ্য, আবু মূসা আশ‘আরী (রাঃ) ও ইমাম শাবী বলেন যে, ‘তিনিই সর্বপ্রথম বক্তৃতায় হাম্‌দ ও ছালাতের পর أما بعـــد (‘অতঃপর’) শব্দ যুক্ত করেন’।[৭১] পূর্বেই আমরা বলেছি যে, তাঁর এই সাম্রাজ্য ছিল শাম ও ইরাক ব্যাপী। যা আধুনিক সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান, ফিলিস্তীন ও ইরাককে শামিল করে। আল্লাহ বলেন,

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ إِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ-(ص ٢٦)-

---

৭০. বায়হাক্বী, মা‘রেফাতুস সুনান ওয়াল আছার, হা/৪৩৮৮।
৭১. কুরতুবী বলেন, ‘যদি উক্ত বক্তব্য সঠিক হয়, তবে সেটি ছিল দাঊদ (আঃ)-এর নিজের ভাষায়, আরবী ভাষায় নয়’ (ঐ, তাফসীর ছোয়াদ ২০)।

Contents

'হে দাঊদ! আমরা তোমাকে পৃথিবীতে খলীফা করেছি। অতএব তুমি মানুষের মাঝে ন্যায়সঙ্গত ফায়ছালা কর এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর না। তাহ'লে তা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ হ'তে বিচ্যুত করবে। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্‌র পথ হ'তে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি এ কারণে যে, তারা হিসাব দিবসকে ভুলে যায়' *(ছোয়াদ ৩৮/২৬)*।

৬. লোহাকে আল্লাহ তাঁর জন্য নরম করে দিয়েছিলেন। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلاً يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ- أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوْا صَالِحاً إِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ- (سبا ١٠-١١)-

'...এবং আমরা তার জন্য লোহাকে নরম করে দিয়েছিলাম' 'এবং তাকে বলেছিলাম প্রশস্ত বর্ম তৈরী কর ও কড়াসমূহ যথাযথভাবে সংযুক্ত কর এবং তোমরা সৎকর্ম সম্পাদন কর। তোমরা যা কিছু কর, তা আমরা দেখে থাকি' *(সাবা ৩৪/১০-১১)*।

উল্লেখ্য যে, হযরত দাঊদ (আঃ) একজন দক্ষ কর্মকার ছিলেন। বিশেষ করে শত্রুর মোকাবিলার জন্য উন্নত মানের বর্ম নির্মাণে তিনি ছিলেন একজন কুশলী কারিগর। যা বিক্রি করে তিনি সংসার যাত্রা নির্বাহ করতেন। রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে নিজের ভরণপোষণের জন্য কিছুই নিতেন না। যদিও সেটা নেওয়া কোন দোষের ছিল না। এখানে লোহাকে বাস্তবে মোমের মত নরম করার প্রকাশ্য অর্থ নিলে সেটা হবে তাঁর জন্য মু'জেযা স্বরূপ, যা মোটেই অসম্ভব নয়। অবশ্য নরম করে দেওয়ার অর্থ লোহাকে সহজে ইচ্ছামত রূপ দেওয়ার ও উন্নতমানের নির্মাণ কৌশল শিক্ষাদানও হ'তে পারে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُوْنَ-(الأنبياء ٨٠)-

'আর আমরা তাকে তোমাদের জন্য বর্ম নির্মাণ কৌশল শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে তা যুদ্ধের সময় তোমাদেরকে রক্ষা করে। অতএব তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে? *(আম্বিয়া ২১/৮০)*।

ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ভারতবর্ষের বাদশাহ আওরঙ্গযেব (১৬৫৮-১৭০৭ খৃ:) নিজ হাতে টুপী সেলাই করে তা বাজারে বিক্রি করে জীবিকা

নির্বাহ করতেন। রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে কিছুই নিতেন না। বস্তুতঃ নবী-রাসূলগণই ছিলেন সকল উন্নত চরিত্রের পথিকৃৎ।

৭. আল্লাহ পাক দাঊদকে নবুঅত দান করেন এবং তাকে এলাহী কিতাব ‘যবূর’ দান করে কিতাবধারী রাসূলের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেন। যেমন তিনি বলেন, -وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُوْراً ‘আমরা দাঊদকে ‘যবূর’ প্রদান করেছিলাম’ *(নিসা ৪/১৬৩)*। হযরত দাঊদকে যে আল্লাহ অতুলনীয় সাম্রাজ্য দান করছিলেন, সেটা যেন যবূরের ভবিষ্যদ্বাণীরই বাস্তব রূপ। কেননা যবূরে আল্লাহ তাঁর সৎকর্মশীল বান্দাদেরকে পৃথিবীর অধিকারী হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُوْرِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُوْنَ- (الأنبياء ١٠٥)-

‘আমরা বিভিন্ন উপদেশের পর যবূরে একথা লিখে দিয়েছি যে, আমার সৎকর্মশীল বান্দাগণ অবশেষে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হবে’ *(আম্বিয়া ২১/১০৫)*।

৮. তাঁকে অপূর্ব সুমধুর কণ্ঠস্বর দান করা হয়েছিল। যখন তিনি যবূর তেলাওয়াত করতেন, তখন কেবল মানুষ নয়, পাহাড় ও পক্ষীকুল পর্যন্ত তা একমনে শুনত। এ দিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلاً يَا جِبَالُ أَوِّبِيْ مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ- (سبا ١٠)-

‘আমরা দাঊদের প্রতি আমাদের পক্ষ হ’তে অনুগ্রহ প্রদান করেছিলাম এই মর্মে আদেশ দান করে যে, হে পর্বতমালা! তোমরা দাঊদের সাথে বারবার তাসবীহ সমূহ আবৃত্তি কর এবং (একই নির্দেশ দিয়েছিলাম আমরা) পক্ষীকুলকেও ...’ *(সাবা ৩৪/১০)*। আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করে দিয়েছে যে, পাহাড় ও মাটির এক ধরনের জীবন রয়েছে, যা তাদের জন্য উপযোগী।[৭২] এ বিষয়টি আল্লাহ অন্যত্র বলেন এভাবে,

وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِيْنَ-(الأنبياء ٧٩)-

৭২. *দ্রঃ হামীম সাজদাহ ৪১/১১; মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, স্রষ্টা ও সৃষ্টিতত্ত্ব (ই,ফা,বা, ২০০৩) পৃঃ ৩৫৭, ৩৮৬-৮৯।*

'আমরা পাহাড়কে ও পক্ষীকুলকে দাঊদের অনুগত করে দিয়েছিলাম, তারা তাসবীহ পাঠ করত এবং আমরা এটা করে থাকি' *(আম্বিয়া ২১/৭৯)*।

অতএব দাঊদের কণ্ঠস্বর শোনা, তাঁর অনুগত হওয়া ও আল্লাহ্র বাণী যবূরের আয়াতসমূহের প্রতি মনোযোগী হওয়া এবং আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা করা পাহাড় ও পক্ষীকুলের জন্য মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয়। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জন্য বনের পশু, পাহাড়, বৃক্ষ তাঁর সামনে মাথা নুইয়েছে ও ছায়া করেছে, এমনকি স্বস্থান থেকে উঠে এসে বৃক্ষ তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়েছে, এগুলি সব চাক্ষুষ ঘটনা।[৭৩] একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর তিন সাথী আবুবকর, ওমর ও ওছমান একটি পাহাড়ে উঠলেন। তখন পাহাড়টি কাঁপতে শুরু করল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পাহাড়টিকে ধমক দিয়ে বললেন, স্থির হও! তোমার উপরে আছেন একজন নবী, একজন ছিদ্দীক্ব ও দু'জন শহীদ'।[৭৪] এর দ্বারা উদ্ভিদ ও পর্বতের জীবন ও অনুভূতি প্রমাণিত হয়। অতএব আল্লাহ্র অপর নবী দাঊদ (আঃ)-এর জন্য পাহাড়, পক্ষী, লৌহ ইত্যাদি অনুগত হবে, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। যদিও বস্তুবাদীরা চিরকাল সন্দেহের অন্ধকারে থেকেছে, আজও থাকবে। আল্লাহ্র রহমত না হ'লে ওরা অন্ধকারের ক্রিমিকীট হয়েই মরবে।

দাঊদ (আঃ)-এর জীবনের স্মরণীয় ঘটনাবলী :

(১) ছাগপাল ও শস্যক্ষেতের মালিকের বিচার: ইমাম বাগাভী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, ক্বাতাদাহ ও যুহরী থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা দু'জন লোক হযরত দাঊদের নিকটে একটি বিষয়ে মীমাংসার জন্য আসে। তাদের একজন ছিল ছাগপালের মালিক এবং অন্যজন ছিল শস্য ক্ষেতের মালিক। শস্যক্ষেতের মালিক ছাগপালের মালিকের নিকট দাবী পেশ করল যে, তার ছাগপাল রাত্রিকালে আমার শস্যক্ষেতে চড়াও হয়ে সম্পূর্ণ ফসল বিনষ্ট করে দিয়েছে। আমি এর প্রতিকার চাই। সম্ভবতঃ শস্যের মূল্য ও ছাগলের মূল্যের হিসাব সমান বিবেচনা করে হযরত দাঊদ (আঃ) শস্যক্ষেতের মালিককে তার বিনষ্ট ফসলের বিনিময় মূল্য হিসাবে পুরা

---

৭৩. *তিরমিযী, শারহুস সুন্নাহ, দারেমী, মিশকাত হা/৫৯১৮, ২২,২৪-২৬ 'মো'জেযা' অনুচ্ছেদ-৯।*
৭৪. *তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/৬০৬৬ 'ওছমানের মর্যাদা' অনুচ্ছেদ; হাদীছ হাসান, ইরওয়া হা/১৫৯৪-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য, ৬/৩৯-৪০ পৃঃ। এর দ্বারা আরেকটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, আমৃত্যু ওছমান (রাঃ) ছিলেন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর তার বিরোধীরা ছিল স্রেফ মিথ্যারোপকারী। এযুগেও তারা মিথ্যা রটনাকারী। অতএব সত্যসন্ধানীরা এদের অপপ্রচার থেকে সাবধান থাকবেন। -লেখক ।*

Contents

ছাগপাল শস্যক্ষেতের মালিককে দিয়ে দিতে বললেন। বাদী ও বিবাদী উভয়ে বাদশাহ দাঊদ-এর আদালত থেকে বেরিয়ে আসার সময় দরজার মুখে পুত্র সুলায়মানের সাথে দেখা হয়। তিনি মোকদ্দমার রায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা সব খুলে বলল। তিনি পিতা দাঊদের কাছে গিয়ে বললেন, আমি রায় দিলে তা ভিন্নরূপ হ’ত এবং উভয়ের জন্য কল্যাণকর হ’ত’। অতঃপর পিতার নির্দেশে তিনি বললেন, ছাগপাল শস্যক্ষেতের মালিককে সাময়িকভাবে দিয়ে দেওয়া হউক। সে এগুলোর দুধ, পশম ইত্যাদি দ্বারা উপকার লাভ করুক। পক্ষান্তরে শস্যক্ষেতটি ছাগপালের মালিককে অর্পণ করা হউক। সে তাতে শস্য উৎপাদন করুক। অতঃপর শস্যক্ষেত্র যখন ছাগপালে বিনষ্ট করার পূর্বের অবস্থায় পৌঁছে যাবে, তখন তা ক্ষেতের মালিককে ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং ছাগপাল তার মালিককে ফেরৎ দেওয়া হবে’। হযরত দাঊদ (আঃ) রায়টি অধিক উত্তম গণ্য করে সেটাকেই কার্যকর করার নির্দেশ দেন। এই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেন,

وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ- فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلاًّ آتَيْنَا حُكْماً وَّعِلْماً- (الأنبياء ٧٨-٧٩)-

‘আর স্মরণ কর দাঊদ ও সুলায়মানকে, যখন তারা একটি শস্যক্ষেত সম্পর্কে বিচার করেছিল, যাতে রাত্রিকালে কারু মেষপাল ঢুকে পড়েছিল। আর তাদের বিচারকার্য আমাদের সম্মুখেই হচ্ছিল’। ‘অতঃপর আমরা সুলায়মানকে মোকদ্দমাটির ফায়ছালা বুঝিয়ে দিলাম এবং আমরা উভয়কে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করেছিলাম’ *(আম্বিয়া ২১/৭৮-৭৯)*।

বস্তুতঃ উভয়ের রায় সঠিক ও সুধারণা প্রসূত ছিল। কিন্তু অধিক উত্তম বিবেচনায় হযরত দাঊদ স্বীয় পুত্রের দেওয়া পরামর্শকেই কার্যকর করার নির্দেশ দেন। আর সেকারণেই আল্লাহ উভয়কে সমগুণে ভূষিত করে বলেছেন যে, ‘আমরা উভয়কে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেছি’। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিচারক উত্তম মনে করলে তার পূর্বের রায় বাতিল করে নতুন রায় প্রদান করতে পারেন।

(২) ইবাদত খানায় প্রবেশকারী বাদী-বিবাদীর বিচারঃ হযরত দাঊদ (আঃ) যেকোন ঘটনায় যদি বুঝতেন যে, এটি আল্লাহ্র তরফ থেকে পরীক্ষা, তাহ'লে তিনি সাথে সাথে আল্লাহ্র দিকে রুজু হ'তেন ও ক্ষমা প্রার্থনায় রত হ'তেন। এরই একটি উদাহরণ বর্ণিত হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতগুলিতে। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ- إِذْ دَخَلُوْا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوْا لاَ تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلاَ تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ- إِنَّ هَذَا أَخِيْ لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُوْنَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيْهَا وَعَزَّنِيْ فِي الْخِطَابِ- قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيْراً مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِيْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلاَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعاً وَّأَنَابَ- فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ (ص ٢١-٢٥)-

'আপনার কাছে কি সেই বাদী-বিবাদীর খবর পৌঁছেছে, যখন তারা পাঁচিল টপকিয়ে দাঊদের ইবাদতখানায় ঢুকে পড়েছিল'? *(ছোয়াদ ২১)* 'যখন তারা দাঊদের কাছে অনুপ্রবেশ করল এবং দাঊদ তাদের থেকে ভীত হয়ে পড়ল, তখন তারা বলল, আপনি ভয় পাবেন না, আমরা দু'জন বিবদমান পক্ষ। আমরা একে অপরের প্রতি বাড়াবাড়ি করেছি। অতএব আমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করুন, অবিচার করবেন না। আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন' *(২২)*। '(বিষয়টি এই যে,) সে আমার ভাই। সে ৯৯টি দুম্বার মালিক আর আমি মাত্র একটি মাদী দুম্বার মালিক। এরপরও সে বলে যে, এটি আমাকে দিয়ে দাও। সে আমার উপরে কঠোর ভাষা প্রয়োগ করে' *(২৩)*। 'দাঊদ বলল, সে তোমার দুম্বাটিকে নিজের দুম্বাগুলির সাথে যুক্ত করার দাবী করে তোমার প্রতি অবিচার করেছে। শরীকদের অনেকে একে অপরের প্রতি বাড়াবাড়ি করে থাকে, কেবল তারা ব্যতীত, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে। অবশ্য এরূপ লোকের সংখ্যা কম। (অত্র ঘটনায়) দাঊদ ধারণা করল যে, আমরা তাকে পরীক্ষা করছি। অতঃপর সে তার পালনকর্তার নিকটে ক্ষমা

প্রার্থনা করল এবং সিজদায় লুটিয়ে পড়ল ও আমার দিকে প্রণত হ’ল’ *(২৪)*। অতঃপর আমরা তাকে ক্ষমা করে দিলাম। নিশ্চয়ই তার জন্য আমাদের নিকটে রয়েছে নৈকট্য ও সুন্দর প্রত্যাবর্তন স্থল’ *(ছোয়াদ ৩৮/২১-২৫)*।

উপরোক্ত পাঁচটি আয়াতে বা অন্য কোথাও এরূপ কোন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি যে, সে পরীক্ষা কি ছিল, দাঊদ (আঃ) কি ভুল করেছিলেন, যে কারণে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন এবং যা আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। ফলে সেই প্রাচীন যুগের কোন ঘটনার ব্যাখ্যা নবী ব্যতীত অন্য কারু পক্ষে এ যুগে দেওয়া সম্ভব নয়। তাই ধারণা ও কল্পনার মাধ্যমে যেটাই বলা হবে, তাতে ভ্রান্তির আশংকা থেকেই যাবে। কিন্তু পথভ্রষ্ট ইহুদী পণ্ডিতেরা তাদের স্বগোত্রীয় এই মর্যাদাবান নবীর উক্ত ঘটনাকে এমন নোংরাভাবে পেশ করেছে, যা কল্পনা করতেও গা শিউরে ওঠে। বলা হয়েছে, দাঊদ (আঃ)-এর নাকি ৯৯ জন স্ত্রী ছিল। এ সত্ত্বেও তিনি তাঁর এক সৈন্যের স্ত্রীকে জোরপূর্বক অপহরণ করেন। অতঃপর উক্ত সৈনিককে হত্যা করে তার স্ত্রীকে বিয়ে করেন। এই ঘটনার নিন্দা জানিয়ে আল্লাহ দু’জন ফেরেশতাকে বাদী ও বিবাদীর বেশে পাঠিয়ে তাকে শিক্ষা দেন *(নাঊযুবিল্লাহ)*।

(৩) শনিবার ওয়ালাদের পরিণতি: বনু ইস্রাঈলদের জন্য শনিবার ছিল সাপ্তাহিক ছুটির দিন এবং ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট ও পবিত্র দিন। এ দিন তাদের জন্য মৎস্য শিকার নিষিদ্ধ ছিল। তারা সমুদ্রোপকুলের বাসিন্দা ছিল এবং মৎস্য শিকার ছিল তাদের পেশা। ফলে দাঊদ (আঃ)-এর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই তারা ঐদিন মৎস্য শিকার করতে থাকে। এতে তাদের উপরে আল্লাহ্র পক্ষ হ’তে ‘মস্খ’ বা আকৃতি পরিবর্তনের শাস্তি নেমে আসে এবং তিনদিনের মধ্যেই তারা সবাই মৃত্যু মুখে পতিত হয়। ঘটনাটি পবিত্র কুরআনে নিম্নরূপে বর্ণিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ মদীনার ইহুদীদের উদ্দেশ্যে বলেন,

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خَاسِئِيْنَ- فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ- (البقرة ٦٥-٦٦)-

‘আর তোমরা তো তাদেরকে ভালভাবে জানো, যারা শনিবারের ব্যাপারে সীমা লংঘন করেছিল। আমরা তাদের বলেছিলাম, তোমরা নিকৃষ্ট বানর হয়ে যাও’। ‘অতঃপর আমরা এ ঘটনাকে তাদের সমসাময়িক ও পরবর্তীদের জন্য

দৃষ্টান্ত হিসাবে এবং আল্লাহভীরুদের জন্য উপদেশ হিসাবে রেখে দিলাম' *(বাক্বারাহ ২/৬৫-৬৬)*।

তাফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে যে, ইহুদীরা প্রথমে গোপনে ও বিভিন্ন কৌশলে এবং পরে ব্যাপকভাবে নিষিদ্ধ দিনে মৎস্য শিকার করতে থাকে। এতে তারা দু'দলে বিভক্ত হয়ে যায়। সৎ ও বিজ্ঞ লোকেরা একাজে বাধা দেন। অপরদল বাধা অমান্য করে মাছ ধরতে থাকে। ফলে প্রথম দলের লোকেরা শেষোক্তদের থেকে পৃথক হয়ে যান। তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এমনকি তাদের বাসস্থানও পৃথক করে নেন। একদিন তারা অবাধ্যদের এলাকায় চরম নীরবতা লক্ষ্য করেন। অতঃপর তারা সেখানে পৌঁছে দেখলেন যে, সবাই বানর ও শূকরে পরিণত হয়ে গেছে। ক্বাতাদাহ বলেন যে, বৃদ্ধরা শূকরে এবং যুবকেরা বানরে পরিণত হয়েছিল। রূপান্তরিত বানরেরা নিজ নিজ আত্মীয়-স্বজনকে চিনতে পেরেছিল এবং তাদের কাছে গিয়ে অঝোর নয়নে অশ্রু বিসর্জন করেছিল।

উক্ত বিষয়ে সূরা আ'রাফের ১৬৪-৬৫ আয়াতের বর্ণনায় প্রতীয়মান হয় যে, সেখানে তৃতীয় আরেকটি দল ছিল, যারা উপদেশ দানকারীদের উপদেশ দানে বিরত রাখার চেষ্টা করত। বাহ্যতঃ এরা ছিল শান্তিবাদী এবং অলস ও সুবিধাবাদী। এরাও ফাসেকদের সাথে শূকর-বানরে পরিণত হয় ও ধ্বংস হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَإِذَ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اَللهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً شَدِيداً، قَالُوْا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ- فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُونَ- (الأعراف ١٦٤-١٦٥)-

'আর যখন তাদের মধ্যকার একদল বলল, কেন আপনারা ঐ লোকদের উপদেশ দিচ্ছেন, যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করে দিতে চান কিংবা তাদের আযাব দিতে চান কঠিন আযাব? ঈমানদারগণ বলল, তোমাদের পালনকর্তার নিকট ওযর পেশ করার জন্য এবং এজন্য যাতে ওরা সতর্ক হয়'। 'অতঃপর তারা যখন উপদেশ ভুলে গেল, যা তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল, তখন আমরা

সেসব লোকদের মুক্তি দিলাম, যারা মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করত এবং পাকড়াও করলাম যালেমদেরকে নিকৃষ্ট আযাবের মাধ্যমে তাদের পাপাচারের কারণে’ *(আ‘রাফ ৭/১৬৪-৬৫)*।

এতে স্পষ্ট বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধকারীদের পক্ষাবলম্বন না করে নিরপেক্ষতা অবলম্বনকারী ব্যক্তিগণ যালেম ও ফাসেকদের সাথেই আল্লাহ্র গযবে ধ্বংস হবে। অতএব হকপন্থীদের জন্য জীবনের সর্বক্ষেত্রে আমর বিল মা‘রূফ ও নাহি ‘আনিল মুনকার ব্যতীত অন্য কোন পথ খোলা নেই।

ছহীহ মুসলিমে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাস‘ঊদ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত হয়েছে যে, একদা কয়েকজন ছাহাবী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে রাসূল! এ যুগের বানর-শূকরগুলো কি সেই আকৃতি পরিবর্তিত ইহুদী সম্প্রদায়? তিনি বললেন, আল্লাহ তা‘আলা যখন কোন সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেন, কিংবা তাদের উপরে আকৃতি পরিবর্তনের আযাব নাযিল করেন, তখন তাদের বংশধারা থাকে না। আর বানর-শূকর পৃথিবীতে পূর্বেও ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে।[৭৫] ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, তারা খায় না, পান করে না এবং তিন দিনের বেশী বাঁচে না।[৭৬]

তালূতের পরে বনু ইস্রাঈলগণের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় পর্যায়ে চলে যায়। যালেম বাদশাহদের দ্বারা তারা শাম দেশ হ’তে বিতাড়িত হয়। বিশেষ করে পারস্যরাজ বুখতানছর যখন তাদেরকে শাম থেকে বহিষ্কার করলেন, তখন তাদের একদল হেজাযে গিয়ে বসবাসের সিদ্ধান্ত নিল। এই উদ্দেশ্যে যে, আমরা দাঊদ ও সুলায়মানের নির্মিত বায়তুল মুক্বাদ্দাস হারিয়েছি। ফলে এক্ষণে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষ ইবরাহীম-ইসমাঈলের নির্মিত কা‘বা গৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। যাতে আমরা বা আমাদের বংশধররা শেষনবীর সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হয়। সেমতে তারা আরবে হিজরত করে এবং ইয়াছরিবে বসবাস শুরু করে।

---

৭৫. *মুসলিম, ‘তাক্বদীর’ অধ্যায় হা/৬৭৭০।*
৭৬. *কুরতুবী, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ৬৫, পৃঃ ১/৪৭৯।*

সংশয় নিরসন

(১) দাঊদ (আঃ)-এর উপরে প্রদত্ত তোহমত :

ছোয়াদ ২৪ : وَظَنَّ دَاوُوْدُ أَنَّمَا فَتَنَّـــاهُ 'দাঊদ ধারণা করল যে, আমরা তাকে পরীক্ষা করছি'। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে জালালাইনে বলা হয়েছে, أوقعناه في فتنة أى بلية بمحبته تلك المرأة 'অর্থাৎ উক্ত মহিলার প্রতি আসক্তির মাধ্যমে আমরা তাকে পরীক্ষায় ফেলেছি'। ভিত্তিহীন এই তাফসীরের মাধ্যমে নবীগণের উচ্চ মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করা হয়েছে। বিশেষ করে দাঊদ (আঃ)-এর মত একজন মহান রাসূলের উপরে পরনারীর প্রতি আসক্ত হওয়ার অমার্জনীয় তোহমত আরোপ করা হয়েছে। অথচ এটি পরিষ্কারভাবে ইহূদী-নাছারাদের বানোয়াট গল্প ব্যতীত কিছুই নয়। যারা তাদের নবীদের বিরুদ্ধে চুরি, যেনা ও অনুরূপ অসংখ্য নোংরা তোহমত লাগিয়েছে ও হাযার হাযার নবীকে হত্যা করেছে *(বাক্বারাহ ৯১)*। তাদের রচিত তথাকথিত তওরাত-ইঞ্জীল সমূহ *(বাক্বারাহ ৭৯)* এ ধরনের কুৎসায় ভরপুর হয়ে আছে।

(২) একই সূরায় ২২ আয়াতের ব্যাখ্যায় মাননীয় তাফসীরকার বর্ননা করেছেন যে, দাঊদ (আঃ)-এর ৯৯ জন স্ত্রী ছিল। অথচ তিনি অন্যজনের একমাত্র স্ত্রীকে তলব করেন এবং তাকে বিবাহ করেন ও তার সাথে সহবাস করেন' (নাঊযুবিল্লাহ)। একাজটি যে অন্যায় ছিল, সেটা বুঝানোর জন্য দু'জন ফেরেশতা মানুষের বেশ ধরে বাদী-বিবাদী সেজে অতর্কিতভাবে তাঁর এবাদতখানায় প্রবেশ করে। অতঃপর বিবাদী তাকে বলে যে, সে আমার ভাই। সে ৯৯টি দুম্বার মালিক আর আমি মাত্র একটি দুম্বার মালিক। এরপরেও সে বলে এটি আমাকে দিয়ে দাও এবং কথাবার্তায় আমার উপরে কঠোরতা আরোপ করে' *(ছোয়াদ ২৩)*। দাঊদ (আঃ) এটিকে অন্যায় হিসাবে বর্ণনা বর্ণনা করলেন। অতঃপর তিনি বুঝতে পারলেন যে, এর মাধ্যমে তাঁকে পরীক্ষা করা হয়েছে। ফলে তিনি আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন ও সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন, যা ২৪ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

এ ঘটনাটিকে সাদা চোখে দেখলে একেবারেই স্বাভাবিক বিষয় বলে মনে হয় হবে, যা সাধারণতঃ যেকোন বিচারকের নিকটে বা রাজদরবারে হয়ে থাকে। অথচ কাল্পনিকভাবে দু'জনকে ফেরেশতা সাজিয়ে ও দুম্বাকে স্ত্রী কল্পনা করে তাফসীরের নামে রসালো গল্প পরিবেশন করা হয়েছে।

প্রশ্ন হ’তে পারে, তাহ’লে দাঊদ (আঃ)-এর ক্ষমা প্রার্থনা করার কারণ কি?

জবাব এই যে, দাঊদ (আঃ) আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য একটা সময় নির্দিষ্ট করেছিলেন। ঐ সময়টুকু তিনি কেবল ইবাদতেই রত থাকতেন। কিন্তু হঠাৎ পাঁচিল টপকিয়ে দু’জন অপরিচিত লোক ইবাদতখানায় প্রবেশ করায় তিনি ভড়কে যান। কিন্তু পরে তাদের বিষয়টি বুঝতে পারেন ও ফায়ছালা করে দেন। তাদের থেকে ভীত হওয়ার বিষয়টি যদিও কোন দোষের ব্যাপার ছিল না, তবুও এটাকে তিনি আল্লাহ্র উপরে তাওয়াক্কুলের খেলাফ মনে করে লজ্জিত হন এবং বুঝতে পারেন যে, এই ঘটনার দ্বারা আল্লাহ তাঁর তাওয়াক্কুলের পরীক্ষা নিলেন। দ্বিতীয়তঃ অধিক ইবাদতের কারণে প্রজাস্বার্থের ক্ষতি হচ্ছে মনে করে তিনি লজ্জিত হন এবং এজন্য আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করেন ও সিজদায় লুটিয়ে পড়েন।

দাঊদ (আঃ)-এর জীবনীতে শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ :

১. নেতৃত্বের জন্য প্রয়োজন স্বাস্থ্যবান ও আমানতদার হওয়া। আরও প্রয়োজন প্রজ্ঞা, ন্যায়নিষ্ঠা ও উন্নতমানের বাগ্মিতা। যার সব কয়টি গুণ হযরত দাঊদ (আঃ)-এর মধ্যে সর্বাধিক পরিমাণে ছিল।

২. এলাহী বিধান দ্বীন ও দুনিয়া দু’টিকেই নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে। বরং দ্বীনদার শাসকের হাতেই দুনিয়া শান্তিময় ও নিরাপদ থাকে। হযরত দাঊদ-এর শাসনকাল তার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ।

৩. দ্বীনদার শাসককে আল্লাহ বারবার পরীক্ষা করেন। যাতে তার দ্বীনদারী অক্ষুণ্ন থাকে। দাঊদ (আঃ) সে পরীক্ষা দিয়েছেন এবং উত্তীর্ণ হয়েছেন। বস্তুতঃ তিনি ছিলেন আল্লাহ্র দিকে সদা প্রত্যাবর্তনশীল।

৪. যে শাসক যত বেশী আল্লাহ্র শুকরগুযারী করেন, আল্লাহ তার প্রতি তত বেশী সদয় হন এবং ঐ রাজ্যে শান্তি ও সমৃদ্ধি নাযিল করেন। বস্তুতঃ দাঊদ (আঃ) সর্বাধিক ইবাদতগুযার ছিলেন এবং একদিন অন্তর একদিন ছিয়াম পালন করতেন।

৫. যে শাসক আল্লাহ্র প্রতি অনুগত হন, আল্লাহ দুনিয়ার সকল সৃষ্টিকে তার প্রতি অনুগত করে দেন। যেমন দাঊদ (আঃ)-এর জন্য পাহাড়-পর্বত, পক্ষীকুল এবং লোহাকে অনুগত করে দেওয়া হয়েছিল।

১৮. হযরত সুলায়মান *(আলাইহিস সালাম)*

হযরত দাঊদ (আঃ)-এর মৃত্যুর পর সুযোগ্য পুত্র সুলায়মান তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আবির্ভাবের ন্যূনাধিক দেড় হাযার বছর পূর্বে তিনি নবী হন। সুলায়মান ছিলেন পিতার ১৯জন পুত্রের অন্যতম। আল্লাহ পাক তাকে জ্ঞানে, প্রজ্ঞায় ও নবুঅতের সম্পদে সমৃদ্ধ করেন। এছাড়াও তাঁকে এমন কিছু নে'মত দান করেন, যা অন্য কোন নবীকে দান করেননি। ইমাম বাগাভী ইতিহাসবিদগণের বরাতে বলেন, সুলায়মান (আঃ)-এর মোট বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর। তের বছর বয়সে রাজকার্য হাতে নেন এবং শাসনের চতুর্থ বছরে বায়তুল মুক্বাদ্দাসের নির্মাণ কাজ শুরু করেন। তিনি ৪০ বছর কাল রাজত্ব করেন *(মাযহারী, কুরতুবী)*। তবে তিনি কত বছর বয়সে নবী হয়েছিলেন সে বিষয়ে কিছু জানা যায় না। শাম ও ইরাক অঞ্চলে পিতার রেখে যাওয়া রাজ্যের তিনি বাদশাহ ছিলেন। তাঁর রাজ্য তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে সুখী ও শক্তিশালী রাজ্য ছিল। কুরআনে তাঁর সম্পর্কে ৭টি সূরায় ৫১টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।[৭৭] আমরা সেগুলিকে একত্রিত করে কাহিনীরূপে পেশ করার চেষ্টা পাব ইনশাআল্লাহ।

বাল্যকালে সুলায়মান :

(১) আল্লাহ পাক সুলায়মানকে তার বাল্যকালেই গভীর প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টি দান করেছিলেন। ছাগপালের মালিক ও শস্যক্ষেতের মালিকের মধ্যে পিতা হযরত দাঊদ (আঃ) যেভাবে বিরোধ মীমাংসা করেছিলেন, বালক সুলায়মান তার চাইতে উত্তম ফায়ছালা পেশ করেছিলেন। ফলে হযরত দাঊদ (আঃ) নিজের পূর্বের রায় বাতিল করে পুত্রের দেওয়া প্রস্তাব গ্রহণ করেন ও সে মোতাবেক রায় দান করেন।

উক্ত ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেন,

وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِيْنَ- فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلاًّ آتَيْنَا حُكْماً وَّعِلْماً (الأنبياء ٧٨-٧٩)-

৭৭. *যথাক্রমে (১) সূরা বাক্বারাহ ২/১০২; (২) নিসা ৪/১৬৩; (৩) আন'আম ৬/৮৪; (৪) আম্বিয়া ২১/৭৮-৭৯, ৮১-৮২; (৫) নমল ২৭/১৫-৪৪=৩০; (৬) সাবা ৩৪/১২-১৪; (৭) ছোয়াদ ৩৮/৩০-৪০=১১; মোট ৫১টি আয়াত।*

‘আর স্মরণ কর দাঊদ ও সুলায়মানকে, যখন তারা একটি শস্যক্ষেত সম্পর্কে বিচার করছিল, যাতে রাত্রিকালে কারু মেষপাল ঢুকে পড়েছিল। আর তাদের বিচারকার্য আমাদের সম্মুখেই হচ্ছিল’। ‘অতঃপর আমরা সুলায়মানকে মোকদ্দমাটির ফায়ছালা বুঝিয়ে দিলাম এবং আমরা উভয়কে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করেছিলাম’ *(আম্বিয়া ২১/৭৮-৭৯)*।

ছোটবেলা থেকেই জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় ভূষিত সুলায়মানকে পরবর্তীতে যথার্থভাবেই পিতার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করা হয়। যেমন আল্লাহ বলেন, وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ ‘সুলায়মান দাঊদের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন’ *(নমল ২৭/১৬)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّـــهُ أَوَّابٌ (ص ٣٠)– ‘আমরা দাঊদের জন্য সুলায়মানকে দান করেছিলাম। কতই না সুন্দর বান্দা সে এবং সে ছিল (আমার প্রতি) সদা প্রত্যাবর্তনশীল’ *(ছোয়াদ ৩৮/৩০)*।

(২) আরেকটি ঘটনা হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, যা নিম্নরূপ: ‘দু’জন মহিলার দু’টি বাচ্চা ছিল। একদিন নেকড়ে বাঘ এসে একটি বাচ্চাকে নিয়ে যায়। তখন প্রত্যেকে বলল যে, তোমার বাচ্চা নিয়ে গেছে। যেটি আছে ওটি আমার বাচ্চা। বিষয়টি ফায়ছালার জন্য দুই মহিলা খলীফা দাঊদের কাছে এলো। তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলার পক্ষে রায় দিলেন। তখন তারা বেরিয়ে সুলায়মানের কাছে এলো এবং সবকথা খুলে বলল। সুলায়মান তখন একটি ছুরি আনতে বললেন এবং বাচ্চাটাকে দু’টুকরা করে দু’মহিলাকে দিতে চাইলেন। তখন বয়োকনিষ্ঠ মহিলাটি বলল, *ইয়ারহামুকাল্লাহু* ‘আল্লাহ আপনাকে অনুগ্রহ করুন’ বাচ্চাটি ঐ মহিলার। তখন সুলায়মান কনিষ্ঠ মহিলার পক্ষে রায় দিলেন’।[৭৮]

সুলায়মানের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

দাঊদ (আঃ)-এর ন্যায় সুলায়ামন (আঃ)-কেও আল্লাহ বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য দান করেছিলেন, যা আর কাউকে দান করেননি। যেমন: (১) বায়ু প্রবাহ অনুগত হওয়া (২) তামাকে তরল ধাতুতে পরিণত করা (৩) জিনকে অধীনস্ত করা (৪) পক্ষীকূলকে অনুগত করা (৫) পিপীলিকার ভাষা বুঝা (৬) অতুলনীয় সাম্রাজ্য দান করা (৭) প্রাপ্ত অনুগ্রহ রাজির হিসাব না রাখার অনুমতি পাওয়া। নিম্নে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হ’ল:

---

৭৮. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৭১৯ ‘ক্বিয়ামতের অবস্থা’ অধ্যায় ‘সৃষ্টির সূচনা ও নবীগণের আলোচনা’ অনুচ্ছেদ-৯।*

১. বায়ু প্রবাহকে তাঁর অনুগত করে দেওয়া হয়েছিল। তাঁর হুকুম মত বায়ু তাঁকে তাঁর ইচ্ছামত স্থানে বহন করে নিয়ে যেত। তিনি সদলবলে বায়ুর পিঠে নিজ সিংহাসনে সওয়ার হয়ে দু'মাসের পথ একদিনে পৌঁছে যেতেন। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ...–(سبا ٣٤)–

'এবং আমরা সুলায়মানের অধীন করে দিয়েছিলাম বায়ুকে, যা সকালে এক মাসের পথ ও বিকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করত...' *(সাবা ৩৪/১২)*।

উল্লেখ্য যে, ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর নামে যে কথা বর্ণিত হয়েছে যে, মানুষ ও জিনের চার লক্ষ আসন বিশিষ্ট বিশাল বহর নিয়ে সুলায়মান বায়ু প্রবাহে যাত্রা করতেন এবং সারা পথ ছালাতে রত থাকতেন ও এই মহা নে'মত প্রদানের জন্য আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করতেন। এত দ্রুত চলা সত্ত্বেও বায়ু তরঙ্গে তাঁদের উপরে কোনরূপ চাপ সৃষ্টি হ'ত না এবং রোদ বৃষ্টি থেকে রক্ষার জন্য মাথার উপর দিয়ে লাখ লাখ পাখি তাদেরকে ছায়া করে যেত' ইত্যাদি যেসব কথা তাফসীরের কেতাব সমূহে বর্ণিত হয়েছে তার সবই ভিত্তিহীন ইস্রাঈলী উপকথা মাত্র।

আল্লাহ বলেন,

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِيْ بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِيْ بَارَكْنَا فِيْهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِيْنَ– (الأنبياء ٨١)–

'আর আমরা সুলায়মানের অধীন করে দিয়েছিলাম প্রবল বায়ুকে। যা তার আদেশে প্রবাহিত হ'ত ঐ দেশের দিকে, যেখানে আমরা কল্যাণ রেখেছি। আর আমরা সকল বিষয়ে সম্যক অবগত রয়েছি' *(আম্বিয়া ২১/৮১)*। অন্যত্র আল্লাহ উক্ত বায়ুকে رُخَاء বলেছেন *(ছোয়াদ ৩৮/৩৬)*। যার অর্থ মৃদু বায়ু, যা শূন্যে তরঙ্গ-সংঘাত সৃষ্টি করে না। عَاصِفَةً ও رُخَاء দু'টি বিশেষণের সমন্বয় এভাবে হ'তে পারে যে, কোনরূপ তরঙ্গ সংঘাত সৃষ্টি না করে তীব্র বেগে বায়ু প্রবাহিত হওয়াটা ছিল আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমত এবং সুলায়মানের অন্যতম মু'জেযা।

উল্লেখ্য যে, হাসান বাছরীর নামে যেকথা বলা হয়ে থাকে যে, একদিন ঘোড়া তদারকি করতে গিয়ে সুলায়মানের আছরের ছালাত ক্বাযা হয়ে যায়। সেই ক্ষোভে তিনি সব ঘোড়া যবেহ করে দেন। ফলে তার বিনিময়ে আল্লাহ তাঁকে

Contents

পুরস্কার স্বরূপ বায়ু প্রবাহকে অনুগত করে দেন বলে যেকথা তাফসীরের কেতাবসমূহে চালু আছে, তার কোন ভিত্তি নেই। এগুলি হিংসুক ইহুদীদের রটনা মাত্র।[৭৯]

২. তামার ন্যায় শক্ত পদার্থকে আল্লাহ সুলায়মানের জন্য তরল ধাতুতে পরিণত করেছিলেন। যেমন আল্লাহ বলেন, وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ... ‘আমরা তার জন্য গলিত তামার একটি ঝরণা প্রবাহিত করেছিলাম...’ *(সাবা ৩৪/১২)*। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, ঐ গলিত ধাতু উত্তপ্ত ছিল না। বরং তা দিয়ে অতি সহজে পাত্রাদি তৈরী করা যেত। সুলায়মানের পর থেকেই তামা গলিয়ে পাত্রাদি তৈরী করা শুরু হয় বলে কুরতুবী বর্ণনা করেছেন। পিতা দাঊদের জন্য ছিল লোহা গলানোর মু‘জেযা এবং পুত্র সুলায়মানের জন্য ছিল তামা গলানোর মু‘জেযা। আর এজন্যেই আয়াতের শেষে আল্লাহ বলেন, اِعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْراً وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ‘হে দাঊদ পরিবার! কৃতজ্ঞতা সহকারে তোমরা কাজ করে যাও। বস্তুতঃ আমার বান্দাদের মধ্যে অল্প সংখ্যকই কৃতজ্ঞ’ *(সাবা ৩৪/১৩)*।

দু’টি সূক্ষ্মতত্ত্ব :

(ক) দাঊদ (আঃ)-এর জন্য আল্লাহ তা‘আলা সর্বাধিক শক্ত ও ঘন পদার্থ লোহাকে নরম ও সুউচ্চ পর্বতমালাকে অনুগত করে দিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে সুলায়মান (আঃ)-এর জন্য আল্লাহ শক্ত তামাকে গলানো এবং বায়ু, জিন ইত্যাদি এমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্তুকে অনুগত করে দিয়েছিলেন, যা চোখেও দেখা যায় না। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ্র শক্তি বড়-ছোট সবকিছুর মধ্যে পরিব্যাপ্ত।

(খ) এখানে আরেকটি বিষয়ে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ্র তাক্বওয়াশীল অনুগত বান্দারা আল্লাহ্র হুকুমে বিশ্বচরাচরের সকল সৃষ্টির উপরে আধিপত্য করতে পারে এবং সবকিছুকে বশীভূত করে তা থেকে খিদমত নিতে পারে।

৩. জিনকে তাঁর অধীন করে দিয়েছিলেন। যেমন আল্লাহ বলেন, وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ...(سبا ١٢)– ‘আর জিনের মধ্যে কিছুসংখ্যক

---

৭৯. *কুরতুবী, সাবা **১২** আয়াতের টীকা দ্রষ্টব্য।*

তার (সুলায়মানের) সম্মুখে কাজ করত তার পালনকর্তার (আল্লাহ্‌র) আদেশে...’ *(সাবা ৩৪/১২)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَمِنَ الشَّيَاطِيْنِ مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَهُ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلاً دُوْنَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِيْنَ-(الأنبياء ٨٢)-

‘এবং আমরা তার অধীন করে দিয়েছিলাম শয়তানদের কতককে, যারা তার জন্য ডুবুরীর কাজ করত এবং এছাড়া অন্য আরও কাজ করত। আমরা তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতাম’ *(আম্বিয়া ২১/৮২)*।

অন্যত্র বলা হয়েছে,

وَالشَّيَاطِيْنَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَّغَوَّاصٍ- وَآخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِي الْأَصْفَادِ- (ص ٣٧-٣٨)-

‘আর সকল শয়তানকে তার অধীন করে দিলাম, যারা ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী’। ‘এবং অন্য আরও অনেককে অধীন করে দিলাম, যারা আবদ্ধ থাকত শৃংখলে’ *(ছোয়াদ ৩৮/৩৭-৩৮)*।

বস্তুতঃ জিনেরা সাগরে ডুব দিয়ে তলদেশ থেকে মূল্যবান মণি-মুক্তা, হীরা-জহরত তুলে আনত এবং সুলায়মানের হুকুমে নির্মাণ কাজ সহ যেকোন কাজ করার জন্য সদা প্রস্তুত থাকত। ঈমানদার জিনেরা তো ছওয়াবের নিয়তে স্বেচ্ছায় আনুগত্য করত। কিন্তু দুষ্ট জিনগুলো বেড়ীবদ্ধ অবস্থায় সুলায়মানের ভয়ে কাজ করত। এই অদৃশ্য শৃংখল কেমন ছিল, তা কল্পনা করার দরকার নেই। আদেশ পালনে সদাপ্রস্তুত থাকাটাও এক প্রকার শৃংখলবদ্ধ থাকা বৈ কি!

‘শয়তান’ হচ্ছে আগুন দ্বারা সৃষ্ট বুদ্ধি ও চেতনা সম্পন্ন এক প্রকার সূক্ষ্ম দেহধারী জীব। জিনের মধ্যকার অবাধ্য ও কাফির জিনগুলিকেই মূলতঃ ‘শয়তান’ নামে অভিহিত করা হয়। আয়াতে ‘শৃংখলবদ্ধ’ কথাটি এদের জন্যেই বলা হয়েছে। আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রণে থাকায় এরা সুলায়মানের কোন ক্ষতি করতে পারত না। বরং সর্বদা তাঁর হুকুম পালনের জন্য প্রস্তুত থাকত। তাদের বিভিন্ন কাজের মধ্যে আল্লাহ নিজেই কয়েকটি কাজের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন,

يَعْمَلُوْنَ لَهُ مَا يَشَآءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُوْرٍ رَّاسِيَاتٍ... (سبا ١٣)-

‘তারা সুলায়মানের ইচ্ছানুযায়ী দুর্গ, ভাস্কর্য, হাউয সদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং চুল্লীর উপরে স্থাপিত বিশাল ডেগ নির্মাণ করত...’ *(সাবা ৩৪/১৩)*। উল্লেখ্য যে, تماثيل তথা ভাস্কর্য কিংবা চিত্র ও প্রতিকৃতি অংকন বা স্থাপন যদি গাছ বা প্রাকৃতিক দৃশ্যের হয়, তাহ’লে ইসলামে তা জায়েয রয়েছে। কিন্তু যদি তা প্রাণীদেহের হয়, তবে তা নিষিদ্ধ।

৪. পক্ষীকুলকে সুলায়মানের অনুগত করে দেওয়া হয়েছিল এবং তিনি তাদের ভাষা বুঝতেন। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ – (نمل ١٦)-

‘সুলায়মান দাঊদের উত্তরাধিকারী হয়েছিল এবং বলেছিল, হে লোক সকল! আমাদেরকে পক্ষীকুলের ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং আমাদেরকে সবকিছু দেওয়া হয়েছে। নিশ্চয়ই এটি একটি সুস্পষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব’ *(নমল ২৭/১৬)*।

পক্ষীকুল তাঁর হুকুমে বিভিন্ন কাজ করত। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পত্র তিনি হুদহুদ পাখির মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী ‘সাবা’ রাজ্যের রাণী বিলক্বীসের কাছে প্রেরণ করেছিলেন। এ ঘটনা পরে বিবৃত হবে।

৫. পিপীলিকার ভাষাও তিনি বুঝতেন। যেমন আল্লাহ বলেন,

حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِي النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسَاكِنَكُمْ لاَ يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لاَ يَشْعُرُوْنَ- فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِّن قَوْلِهَا...- (نمل ١٨-١٩)-

‘অবশেষে সুলায়মান তার সৈন্যদল নিয়ে পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌঁছল। তখন পিপীলিকা (নেতা) বলল, হে পিপীলিকা দল! তোমরা স্ব স্ব গৃহে প্রবেশ কর। অন্যথায় সুলায়মান ও তার বাহিনী অজ্ঞাতসারে তোমাদের

পিষ্ট করে ফেলবে'। 'তার এই কথা শুনে সুলায়মান মুচকি হাসল... *(নমল ২৭/১৮-১৯)*।

৬. তাঁকে এমন সাম্রাজ্য দান করা হয়েছিল, যা পৃথিবীতে আর কাউকে দান করা হয়নি। এজন্য আল্লাহ্র হুকুমে তিনি আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করেছিলেন। যেমন আল্লাহ বলেন,

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَهَبْ لِيْ مُلْكاً لاَّ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ- (ص ٣٥)-

'সুলায়মান বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে এমন এক সাম্রাজ্য দান কর, যা আমার পরে আর কেউ যেন না পায়। নিশ্চয়ই তুমি মহান দাতা' *(ছোয়াদ ৩৮/৩৫)*।

উল্লেখ্য যে, পয়গম্বরগণের কোন দো'আ আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতিরেকে হয় না। সে হিসাবে হযরত সুলায়মান (আঃ) এ দো'আটিও আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমেই করেছিলেন। কেবল ক্ষমতা লাভ এর উদ্দেশ্য ছিল না। বরং এর পিছনে আল্লাহ্র বিধানাবলী বাস্তবায়ন করা এবং তাওহীদের ঝাণ্ডাকে সমুন্নত করাই মূল উদ্দেশ্য ছিল। কেননা আল্লাহ জানতেন যে, রাজত্ব লাভের পর সুলায়মান তাওহীদ ও ইনছাফ প্রতিষ্ঠার জন্যই কাজ করবেন এবং তিনি কখনোই অহংকারের বশীভূত হবেন না। তাই তাঁকে এরূপ দো'আর অনুমতি দেওয়া হয় এবং সে দো'আ সর্বাংশে কবুল হয়।

ইসলামে নেতৃত্ব ও শাসন ক্ষমতা চেয়ে নেওয়া নিষিদ্ধ। আল্লামা জুবাঈ বলেন, আল্লাহ্র অনুমতিক্রমেই তিনি এটা চেয়েছিলেন। কেননা নবীগণ আল্লাহ্র হুকুম ব্যতীত কোন সুফারিশ করতে পারেন না। তাছাড়া এটা বলাও সঙ্গত হবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, বর্তমানে (জাদু দ্বারা বিপর্যস্ত এই দেশে) তুমি ব্যতীত দ্বীনের জন্য কল্যাণকর এবং যথার্থ শাসনের যোগ্যতা অন্য কারু মধ্যে নেই। অতএব তুমি প্রার্থনা করলে আমি তোমাকে তা দান করব।' সেমতে তিনি দো'আ করেন ও আল্লাহ তাকে তা প্রদান করেন।[৮০]

---

৮০. *মাহমূদ আলূসী (মৃ: ১২৭০হি:), রূহুল মা'আনী (বৈরুত: দার এহইয়াউত তুরাছিল 'আরাবী, তাবি), তাফসীর সূরা ছোয়াদ ৩৫, ২৩/২০১ পৃ:।*

৭. প্রাপ্ত অনুগ্রহরাজির হিসাব রাখা বা না রাখার অনুমতি প্রদান। আল্লাহ পাক হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর রাজত্ব লাভের দো‘আ কবুল করার পরে তার প্রতি বায়ু, জিন, পক্ষীকুল ও জীব-জন্তু সমূহকে অনুগত করে দেন। অতঃপর বলেন,

هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ، وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ- (ص ٣٩-٤٠)-

‘এসবই আমার অনুগ্রহ। অতএব এগুলো তুমি কাউকে দাও অথবা নিজে রেখে দাও, তার কোন হিসাব দিতে হবে না’। ‘নিশ্চয়ই তার (সুলায়মানের) জন্য আমার কাছে রয়েছে নৈকট্য ও শুভ পরিণতি’ *(ছোয়াদ ৩৮/৩৯-৪০)*।

বস্তুতঃ এটি ছিল সুলায়মানের আমানতদারী ও বিশ্বস্ততার প্রতি আল্লাহ্র পক্ষ হ’তে প্রদত্ত একপ্রকার সনদপত্র। পৃথিবীর কোন ব্যক্তির জন্য সরাসরি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এ ধরনের কোন সত্যায়নপত্র নাযিল হয়েছে বলে জানা যায় না। অথচ এই মহান নবী সম্পর্কে ইহুদী-নাছারা বিদ্বানরা বাজে কথা রটনা করে থাকে।

সুলায়মানের জীবনে উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী :

(১) ন্যায় বিচারের ঘটনা : ছাগপালের মালিক ও শস্যক্ষেতের মালিকের মধ্যকার বিরোধ মীমাংসায় তাঁর দেওয়া প্রস্তাব বাদশাহ দাঊদ (আঃ) গ্রহণ করেন ও নিজের দেওয়া পূর্বের রায় বাতিল করে পুত্র সুলায়মানের দেওয়া পরামর্শ অনুযায়ী রায় দেন ও তা কার্যকর করেন। এটি ছিল সুলায়মানের বাল্যকালের ঘটনা, যা আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন *(দ্রঃ আম্বিয়া ২১/৭৮-৭৯)*। এ ঘটনা আমরা দাঊদ (আঃ)-এর কাহিনীতে বলে এসেছি।

(২) পিপীলিকার ঘটনা : হযরত সুলায়মান (আঃ) একদা তাঁর বিশাল সেনাবাহিনী সহ একটি এলাকা অতিক্রম করছিলেন। ঐ সময় তাঁর সাথে জিন, মানুষ পক্ষীকুল ছিল। যে এলাকা দিয়ে তাঁরা যাচ্ছিলেন সে এলাকায় বালির ঢিবি সদৃশ পিপীলিকাদের বহু বসতঘর ছিল। সুলায়মান বাহিনীকে আসতে দেখে পিপীলিকাদের সর্দার তাদেরকে বলল, তোমরা শীঘ্র পালাও। নইলে পাদপিষ্ট হয়ে শেষ হয়ে যাবে। সুলায়মান (আঃ) পিপীলিকাদের এই বক্তব্য শুনতে পেলেন। এ বিষয়ে কুরআনী বর্ণনা নিম্নরূপ:

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ- وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ- حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِي النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لاَ يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ- فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ- (نمل ١٦-١٩)-

‘সুলায়মান দাঊদের স্থলাভিষিক্ত হ’ল এবং বলল, হে লোক সকল! আমাদেরকে পক্ষীকুলের ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং আমাদেরকে সবকিছু দেওয়া হয়েছে। নিশ্চয়ই এটি একটি সুস্পষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব’ *(নমল ১৬)*। ‘অতঃপর সুলায়মানের সম্মুখে তার সোনাবাহিনীকে সমবেত করা হ’ল জিন, মানুষ ও পক্ষীকুলকে। তারপর তাদেরকে বিভিন্ন ব্যূহে বিভক্ত করা হ’ল’ *(১৭)*। ‘অতঃপর যখন তারা একটি পিপীলিকা অধ্যুষিত এলাকায় উপনীত হ’ল, তখন এক পিপীলিকা বলল, ‘হে পিপীলিকা দল! তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর। অন্যথায় সুলায়মান ও তার বাহিনী অজ্ঞাতসারে তোমদেরকে পিষ্ট করে ফেলবে’ *(১৮)*। ‘তার কথা শুনে সুলায়মান মুচকি হাসল এবং বলল, ‘হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমাকে ক্ষমতা দাও, যেন আমি তোমার নে‘মতের শুকরিয়া আদায় করতে পারি, যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছ এবং যাতে আমি তোমার পসন্দনীয় সৎকর্মাদি করতে পারি এবং তুমি আমাকে নিজ অনুগ্রহে তোমার সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর’ *(নমল ২৭/১৬-১৯)*।

উপরোক্ত আয়াতগুলিতে প্রমাণিত হয় যে, সুলায়মান (আঃ) কেবল পাখির ভাষা নয়, বরং সকল জীবজন্তু এমনকি ক্ষুদ্র পিঁপড়ার কথাও বুঝতেন। এজন্য তিনি মোটেই গর্ববোধ না করে বরং আল্লাহ্র অনুগ্রহের প্রতি শুকরিয়া আদায় করেন এবং নিজেকে যাতে আল্লাহ অন্যান্য সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করেন সে প্রার্থনা করেন। এখানে আরেকটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, তিনি কেবল জিন-ইনসানের নয় বরং তাঁর সময়কার সকল জীবজন্তুরও নবী

ছিলেন। তাঁর নবুঅতকে সবাই স্বীকার করত এবং সকলে তাঁর প্রতি আনুগত্য পোষণ করত। যদিও জিন ও ইনসান ব্যতীত অন্য প্রাণী শরী‘আত পালনের হকদার নয়।

(৩) ‘হুদহুদ’ পাখির ঘটনা : হযরত সুলায়মান (আঃ) আল্লাহ্র হুকুমে পক্ষীকুলের আনুগত্য লাভ করেন। একদিন তিনি পক্ষীকুলকে ডেকে একত্রিত করেন ও তাদের ভাল-মন্দ খোঁজ-খবর নেন। তখন দেখতে পেলেন যে, ‘হুদহুদ’ পাখিটা নেই। তিনি অনতিবিলম্বে তাকে ধরে আনার জন্য কড়া নির্দেশ জারি করলেন। সাথে তার অনুপস্থিতির উপযুক্ত কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করলেন। উক্ত ঘটনা কুরআনের ভাষায় নিম্নরূপ:

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لاَ أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ- لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَاباً شَدِيداً أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ- فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَّقِينٍ- (نمل ٢٠-٢٢)-

‘সুলায়মান পক্ষীকুলের খোঁজ-খবর নিল। অতঃপর বলল, কি হ’ল হুদহুদকে দেখছি না যে? না-কি সে অনুপস্থিত’ *(নমল ২০)*। সে বলল, ‘আমি অবশ্যই তাকে কঠোর শাস্তি দেব কিংবা যবহ করব অথবা সে উপস্থিত করবে উপযুক্ত কারণ’ *(২১)*। ‘কিছুক্ষণ পরেই হুদহুদ এসে হাযির হয়ে বলল, (হে বাদশাহ!) আপনি যে বিষয়ে অবগত নন, আমি তা অবগত হয়েছি। আমি আপনার নিকটে ‘সাবা’ থেকে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে আগমন করেছি’ *(নমল ২৭/২০-২২)*।

এ পর্যন্ত বলেই সে তার নতুন আনীত সংবাদের রিপোর্ট পেশ করল। হুদহুদের মাধ্যমে একথা বলানোর মাধ্যমে আল্লাহ আমাদেরকে একথা জানিয়ে দিলেন যে, নবীগণ গায়েবের খবর রাখেন না। তাঁরা কেবল অতটুকুই জানেন, যতটুকু আল্লাহ তাদেরকে অবহিত করেন।

উল্লেখ্য যে, ‘হুদহুদ’ এক জাতীয় ছোট্ট পাখির নাম। যা পক্ষীকুলের মধ্যে অতীব ক্ষুদ্র ও দুর্বল এবং যার সংখ্যাও দুনিয়াতে খুবই কম। বর্ণিত আছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) একদা নওমুসলিম ইহুদী পণ্ডিত আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, এতসব পাখী থাকতে বিশেষভাবে ‘হুদহুদ’ পাখির খোঁজ নেওয়ার কারণ কি ছিল? জওয়াবে তিনি

বলেন, সুলায়মান (আঃ) তাঁর বিশাল বাহিনীসহ ঐসময় এমন এক অঞ্চলে ছিলেন, যেখানে পানি ছিল না। আল্লাহ তা'আলা হুদহুদ পাখিকে এই বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যে, সে ভূগর্ভের বস্তু সমূহকে এবং ভূগর্ভে প্রবাহিত পানি উপর থেকে দেখতে পায়। হযরত সুলায়মান (আঃ) হুদহুদকে এজন্যেই বিশেষভাবে খোঁজ করছিলেন যে, এতদঞ্চলে কোথায় মরুগর্ভে পানি লুক্কায়িত আছে, সেটা জেনে নিয়ে সেখানে জিন দ্বারা খনন করে যাতে দ্রুত পানি উত্তোলনের ব্যবস্থা করা যায়'। একদা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) 'হুদহুদ' পাখি সম্পর্কে বর্ণনা করছিলেন। তখন নাফে' ইবনুল আযরক্ব তাঁকে বলেন,

قِفْ يا وَقَّافُ ! كيف يَرَى الهدهدُ باطنَ الأرضِ وهو لا يَرَى الْفَخَّ حِيْنَ يَقَعُ فيه–

'জেনে নিন হে মহা জ্ঞানী! হুদহুদ পাখি মাটির গভীরে দেখতে পায়। কিন্তু (তাকে ধরার জন্য) মাটির উপরে বিস্তৃত জাল সে দেখতে পায় না। যখন সে তাতে পতিত হয়'। জবাবে ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, إذا جاء القَــدَرُ عَمِـــيَ البَـــصَرُ 'যখন তাক্বদীর এসে যায়, চক্ষু অন্ধ হয়ে যায়'। চমৎকার এ জবাবে মুগ্ধ হয়ে ইবনুল 'আরাবী বলেন, لايَقْدِرُ على هذا الجوابِ إلا عـــالِمُ القـــرانِ 'এরূপ জওয়াব দিতে কেউ সক্ষম হয় না, কুরআনের আলেম ব্যতীত'।[৮১]

(৪) রাণী বিলক্বীসের ঘটনা : হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর শাম ও ইরাক সাম্রাজ্যের পার্শ্ববর্তী ইয়ামন তথা 'সাবা' রাজ্যের রাণী ছিলেন বিলক্বীস বিনতুস সারাহ বিন হাদাহিদ বিন শারাহীল। তিনি ছিলেন সাম বিন নূহ (আঃ)-এর ১৮তম অধঃস্তন বংশধর। তাঁর ঊর্ধ্বতন ৯ম পিতামহের নাম ছিল 'সাবা'।[৮২] সম্ভবতঃ তাঁর নামেই 'সাবা' সাম্রাজ্যের নামকরণ হয়। আল্লাহ তাদের সামনে জীবনোপকরণের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং নবীগণের মাধ্যমে এসব নে'মতের শুকরিয়া আদায় করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে তারা ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয় এবং 'সূর্য পূজারী'

---

৮১. *কুরতুবী, তাফসীর সূরা নমল ২০ আয়াত।*
৮২. *কুরতুবী, তাফসীর সূরা নমল ৪৪ ও ২৩ আয়াত।*

Contents

হয়ে যায়। ফলে তাদের উপরে প্লাবণের আযাব প্রেরিত হয় ও সবকিছু ধ্বংস হয়ে যায়। আল্লাহ সূরা সাবা ১৫ হ’তে ১৭ আয়াতে এই সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।

দুনিয়াবী দিক দিয়ে এই ‘সাবা’ সাম্রাজ্য খুবই সমৃদ্ধ এবং শান-শওকতে পূর্ণ ছিল। তাদের সম্পর্কে হযরত সুলায়মানের কিছু জানা ছিল না বলেই কুরআনী বর্ণনায় প্রতীয়মান হয়। তাঁর এই না জানাটা বিস্ময়কর কিছু ছিল না। ইয়াকূব (আঃ) তাঁর বাড়ীর অনতিদূরে তাঁর সন্তান ইউসুফকে কূয়ায় নিক্ষেপের ঘটনা জানতে পারেননি। স্ত্রী আয়েশার গলার হারটি হারিয়ে গেল। অথচ স্বামী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তা জানতে পারেননি। বস্ততঃ আল্লাহ যতটুকু ইল্ম বান্দাকে দেন, তার বেশী জানার ক্ষমতা কারু নেই। পার্শ্ববর্তী ‘সাবা’ সাম্রাজ্য সম্পর্কে পূর্বে না জানা এবং পরে জানার মধ্যে যে কি মঙ্গল নিহিত ছিল, তা পরবর্তী ঘটনাতেই প্রমাণিত হয়েছে এবং রাণী বিলক্বীস মুসলমান হয়ে যান। বস্ততঃ হুদহুদ পাখি তাদের সম্পর্কে হযরত সুলায়মানের নিকটে এসে প্রথম খবর দেয়। তার বর্ণিত প্রতিবেদনটি ছিল কুরআনের ভাষায় নিম্নরূপ :

إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ- وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لاَ يَهْتَدُونَ- (نمل ٢٣-٢٤)-

‘আমি এক মহিলাকে সাবা বাসীদের উপরে রাজত্ব করতে দেখেছি। তাকে সবকিছুই দেওয়া হয়েছে এবং তার একটা বিরাট সিংহাসন আছে’ *(২৩)*। ‘আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করছে। শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যাবলীকে সুশোভিত করেছে। অতঃপর তাদেরকে সত্যপথ থেকে নিবৃত্ত করেছে। ফলে তারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হয় না’ *(নমল ২৭/২৩-২৪)*।

সুলায়মান বলল,

قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ (٢٧) اذْهَبْ بِكِتَابِيْ هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُوْنَ (٢٨) قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ

إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيْمٌ (٢٩) إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (٣٠) أَلاَّ تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُوْنِي مُسْلِمِيْنَ (٣١) قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُوْنِي فِيْ أَمْرِيْ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُوْنِ (٣٢) قَالُوا نَحْنُ أُوْلُوْ قُوَّةٍ وَأُوْلُوْ بَأْسٍ شَدِيْدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِيْ مَاذَا تَأْمُرِيْنَ (٣٣) قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوْكَ إِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً أَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُوْنَ (٣٤) وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ (٣٥) فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّوْنَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ (٣٦) ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُوْدٍ لاَ قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُوْنَ (٣٧) قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِيْنِيْ بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِيْنَ (٣٨) قَالَ عِفْرِيْتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيْكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُوْمَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِيْنٌ (٣٩) قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيْكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَّرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيْمٌ (٤٠) قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لاَ يَهْتَدُوْنَ (٤١) فَلَمَّا جَاءَتْ قِيْلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ (٤٢) وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِيْنَ (٤٣) قِيْلَ لَهَا ادْخُلِيْ الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيْرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ- (نمل ٢٧-٤٤)-

'এখন আমরা দেখব তুমি সত্য বলছ, না তুমি মিথ্যাবাদীদের একজন' (২৭)। 'তুমি আমার এই পত্র নিয়ে যাও এবং এটা তাদের কাছে অর্পণ কর। অতঃপর তাদের কাছ থেকে সরে পড় এবং দেখ, তারা কি জওয়াব দেয়'

(২৮)। ‘বিলক্বীস বলল, হে সভাসদ বর্গ! আমাকে একটি মহিমান্বিত পত্র দেওয়া হয়েছে’ *(২৯)*। ‘সেই পত্র সুলায়মানের পক্ষ হ’তে এবং তা হ’ল এই: করুণাময় কৃপানিধান আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)’ *(৩০)*। ‘আমার মোকাবেলায় তোমরা শক্তি প্রদর্শন করো না এবং বশ্যতা স্বীকার করে আমার নিকটে উপস্থিত হও’ *(৩১)*। ‘বিলক্বীস বলল, হে আমার পারিষদ বর্গ! আমাকে আমার কাজে পরামর্শ দিন। আপনাদের উপস্থিতি ব্যতিরেকে আমি কোন কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না’ *(৩২)*। ‘তারা বলল, আমরা শক্তিশালী এবং কঠোর যোদ্ধা। এখন সিদ্ধান্ত আপনার হাতে। অতএব ভেবে দেখুন আপনি আমাদের কি আদেশ করবেন’ *(৩৩)*।

‘রাণী বলল, রাজা-বাদশাহরা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে, তখন তাকে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং সেখানকার সম্ভ্রান্ত লোকদের অপদস্থ করে। তারাও এরূপ করবে’ *(৩৪)*। ‘অতএব আমি তাঁর নিকটে কিছু উপঢৌকন পাঠাই। দেখি, প্রেরিত লোকেরা কি জওয়াব নিয়ে আসে’ *(৩৫)*। ‘অতঃপর যখন দূত সুলায়মানের কাছে আগমন করল, তখন সুলায়মান বলল, তোমরা কি ধন-সম্পদ দ্বারা আমাকে সাহায্য করতে চাও? আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন, তা তোমাদের দেওয়া বস্তু থেকে অনেক উত্তম। বরং তোমরাই তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে সুখে থাক’ *(৩৬)*। ‘ফিরে যাও তাদের কাছে। এখন অবশ্যই আমরা তাদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী সহ আগমন করব, যার মোকাবেলা করার শক্তি তাদের নেই। আমরা অবশ্যই তাদেরকে অপদস্থ করে সেখান থেকে বহিষ্কার করব এবং তারা হবে লাঞ্ছিত’ *(৩৭)*। ‘অতঃপর সুলায়মান বলল, হে আমার পারিষদবর্গ! তারা আত্মসমর্পণ করে আমার কাছে আসার পূর্বে কে আছ বিলক্বীসের সিংহাসন আমাকে এনে দেবে?’ *(৩৮)* ‘জনৈক দৈত্য-জ্বিন বলল, আপনি আপনার স্থান থেকে ওঠার পূর্বেই আমি তা এনে দেব এবং আমি একাজে শক্তিবান ও বিশ্বস্ত’ *(৩৯)*। ‘(কিন্তু) কিতাবের জ্ঞান যার ছিল সে বলল, তোমার চোখের পলক ফেলার পূর্বেই আমি তা এনে দিব। অতঃপর সুলায়মান যখন তা সামনে রক্ষিত দেখল, তখন বলল, এটা আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি শুকরিয়া আদায় করি, না অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে নিজের কল্যাণের জন্য তা করে থাকে এবং যে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে জানুক যে, আমার পালনকর্তা অভাবমুক্ত ও কৃপাময়’ *(নমল ৪০)*।

'সুলায়মান বলল, বিলক্বীসের সিংহাসনের আকৃতি বদলিয়ে দাও, দেখব সে সঠিক বস্তু চিনতে পারে, না সে তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা সঠিক পথ খুঁজে পায় না?' *(৪১)* 'অতঃপর যখন বিলক্বীস এসে গেল, তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হ'ল: আপনার সিংহাসন কি এরূপই? সে বলল, মনে হয় এটা সেটিই হবে। আমরা পূর্বেই সবকিছু অবগত হয়েছি এবং আমরা আজ্ঞাবহ হয়ে গেছি' *(৪২)*। 'বস্তুতঃ আল্লাহ্র পরিবর্তে সে যার উপাসনা করত, সেই-ই তাকে ঈমান থেকে বিরত রেখেছিল। নিশ্চয়ই সে কাফের সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল' *(৪৩)*। 'তাকে বলা হ'ল, প্রাসাদে প্রবেশ করুন। অতঃপর যখন সে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করল, তখন ধারণা করল যে, এটা স্বচ্ছ গভীর জলাশয়। ফলে সে তার পায়ের গোছা খুলে ফেলল। সুলায়মান বলল, এটা তো স্বচ্ছ স্ফটিক নির্মিত প্রাসাদ। বিলক্বীস বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমি তো নিজের প্রতি যুলুম করেছি। আমি সুলায়মানের সাথে বিশ্বজাহানের পালনকর্তা আল্লাহ্র নিকটে আত্মসমর্পণ করলাম' *(নমল ২৭/২৭-৪৪)*।

সূরা নমল ২২ হ'তে ৪৪ আয়াত পর্যন্ত উপরে বর্ণিত ২৩টি আয়াতে রাণী বিলক্বীসের কাহিনী শেষ হয়েছে। এর মধ্যে ৪০তম আয়াতে 'যার কাছে কিতাবের জ্ঞান ছিল' বলে কাকে বুঝানো হয়েছে, এ বিষয়ে তাফসীরবিদগণ মতভেদ করেছেন। তার মধ্যে প্রবল মত হ'ল এই যে, তিনি ছিলেন স্বয়ং হযরত সুলায়মান (আঃ)। কেননা আল্লাহ্র কিতাবের সর্বাধিক জ্ঞান তাঁরই ছিল। তিনি এর দ্বারা উপস্থিত জিন ও মানুষ পারিষদ বর্গকে বুঝিয়ে দিলেন যে, তোমাদের সাহায্য ছাড়াও আল্লাহ অন্যের মাধ্যমে অর্থাৎ ফেরেশতাদের মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করে থাকেন। 'আর এটি হ'ল আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ' *(নমল ৪০)*। দ্বিতীয়তঃ গোটা ব্যাপারটাই ছিল একটা মু'জেযা এবং রাণী বিলক্বীসকে আল্লাহ্র সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রদর্শন করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ এতে তিনি সফল হয়েছিলেন এবং সুদূর ইয়ামন থেকে বায়তুল মুক্বাদ্দাসে বিলক্বীস তার সিংহাসনের আগাম উপস্থিতি দেখে অতঃপর স্ফটিক স্বচ্ছ প্রাসাদে প্রবেশকালে অনন্য কারুকার্য দেখে এবং তার তুলনায় নিজের ক্ষমতা ও প্রাসাদের দীনতা বুঝে লজ্জিত ও অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। অতঃপর তিনি আল্লাহ্র নিকটে আত্মসমর্পণ করে মুসলমান হয়ে যান। মূলতঃ এটাই ছিল হযরত সুলায়মানের মূল উদ্দেশ্য, যা শতভাগ সফল হয়েছিল।

এর পরবর্তী ঘটনাবলী, যা বিভিন্ন তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে যেমন সুলায়মানের সাথে বিলক্বীসের বিবাহ হয়েছিল। সুলায়মান তার রাজত্ব বহাল রেখে ইয়ামনে পাঠিয়ে দেন। প্রতি মাসে সুলায়মান একবার করে সেখানে যেতেন ও তিনদিন করে থাকতেন। তিনি সেখানে বিলক্বীসের জন্য তিনটি নযীরবিহীন প্রাসাদ নির্মাণ করে দেন- ইত্যাদি সবকথাই ধারণা প্রসূত। যার কোন বিশুদ্ধ ভিত্তি নেই।

জনৈক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উৎবাকে জিজ্ঞেস করেন, সুলায়মান (আঃ)-এর সাথে বিলক্বীসের বিয়ে হয়েছিল কি? জওয়াবে তিনি বলেন, বিলক্বীসের বক্তব্য وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ‘আমি সুলায়মানের সাথে বিশ্ব জাহানের পালনকর্তা আল্লাহ্র নিকটে আত্মসমর্পণ করলাম’ *(নমল ৪৪)*-এ পর্যন্তই শেষ হয়ে গেছে। কুরআন এর পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে নিশ্চুপ রয়েছে। অতএব আমাদের এ বিষয়ে খোঁজ নেওয়ার প্রয়োজন নেই *(তাফসীর বাগাভী)*।

(৫) অশ্ব কুরবানীর ঘটনা :

পিতা দাঊদের ন্যায় পুত্র সুলায়মানকেও আল্লাহ বারবার পরীক্ষায় ফেলেছেন তাকে সর্বদা আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তনশীল রাখার জন্য। ফলে তাঁর জীবনের এক একটি পরীক্ষা এক একটি ঘটনার জন্ম দিয়েছে। কুরআন সেগুলির সামান্য কিছু উল্লেখ করেছে, যতটুকু আমাদের উপদেশ হাছিলের জন্য প্রয়োজন। কিন্তু পথভ্রষ্ট ইহুদী-নাছারা পণ্ডিতগণ সেই সব ঘটনার উপরে রং চড়িয়ে এবং নিজেদের পক্ষ থেকে উদ্ভট সব গল্পের অবতারণা করে তাদেরই স্বগোত্র বনু ইস্রাঈলের এইসব মহান নবীগণের চরিত্র হনন করেছে। মুসলিম উম্মাহ বিগত সকল নবীকে সমানভাবে সম্মান করে। তাই ইহুদী-নাছারাদের অপপ্রচার থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখে এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বর্ণনার উপরে নির্ভর করে। সেখানে যতটুকু পাওয়া যায়, তার উপরেই তারা বাক সংযত রাখে।

আলোচ্য অশ্ব কুরবানীর ঘটনাটি সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বর্ণনা নিম্নরূপ :

إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ- فَقَالَ إِنِّيْ أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّيْ حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ- رُدُّوْهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوْقِ وَالْأَعْنَاقِ- (ص ٣١-٣٣)-

‘যখন তার সামনে অপরাহ্নে উৎকৃষ্ট অশ্বরাজি পেশ করা হ’ল’ *(ছোয়াদ ৩১)*। ‘তখন সে বলল, আমি তো আমার প্রভুর স্মরণের জন্যই ঘোড়াগুলিকে মহব্বত করে থাকি (কেননা এর দ্বারা আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ হয়ে থাকে। অতঃপর সে ঘোড়াগুলিকে দৌড়িয়ে দিল,) এমনকি সেগুলি দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেল’ *(৩২)*। ‘(অতঃপর সে বলল,) ঘোড়াগুলিকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনো। অতঃপর সে তাদের গলায় ও পায়ে (আদর করে) হাত বুলাতে লাগল’ *(ছোয়াদ ৩৮/৩১-৩৩)*।

উপরোক্ত তরজমাটি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর ব্যাখ্যার অনুসরণে ইবনু জারীরের গৃহীত ব্যাখ্যার অনুকূলে করা হয়েছে।

অনেকে উপরোক্ত তাফসীরের সাথে বিভিন্ন কথা যোগ করেছেন। যেমন ঘোড়া পরিদর্শনে মগ্ন হওয়ার কারণে হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর আছরের ছালাত ক্বাযা হয়ে যায়। তাতে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে সব ঘোড়া কুরবানী করে দেন। কেউ বলেছেন, তিনি আল্লাহ্র নিকটে সূর্যকে ফিরিয়ে দেবার আবেদন করেন। সেমতে সূর্যকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং তিনি আছরের ছালাত আদায় করে নেন। তারপর সূর্য অস্তমিত হয়। বস্তুতঃ এইসব কথার পক্ষে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের কোন দলীল নেই। অতএব এসব থেকে বিরত থাকাই উত্তম।

(৬) সিংহাসনের উপরে একটি নিষ্প্রাণ দেহ প্রাপ্তির ঘটনা :

আল্লাহ বলেন- وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ (ص ٣٤)

‘আমরা সুলায়মানকে পরীক্ষা করলাম এবং রেখে দিলাম তার সিংহাসনের উপর একটি নিষ্প্রাণ দেহ। অতঃপর সে রুজু হ’ল’ *(ছোয়াদ ৩৮/৩৪)*। এ বিষয়ে কুরআনের বর্ণনা কেবল এতটুকুই। এক্ষণে সেই নিষ্প্রাণ দেহটি কিসের ছিল, একে সিংহাসনের উপর রাখার হেতু কি ছিল, এর মাধ্যমে কি ধরনের পরীক্ষা হ’ল- এসব বিবরণ কুরআন বা ছহীহ হাদীছে কিছুই বর্ণিত হয়নি। অতএব এ বিষয়ে কেবল এতটুকু ঈমান রাখা কর্তব্য যে, সুলায়মান (আঃ) এভাবে পরীক্ষায় পতিত হয়েছিলেন। যার ফলে তিনি আল্লাহ্র প্রতি আরো বেশী রুজু হন ও ক্ষমা প্রার্থনা করেন। যা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র প্রতি তাঁর অটুট আনুগত্যের পরিচয় বহন করে।

উক্ত ঘটনাকে রং চড়িয়ে ইস্রাঈলী রেওয়ায়াত সমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, সুলায়মানের রাজত্বের গুঢ় রহস্য তার আংটির মধ্যে নিহিত ছিল। একদিন এক শয়তান তাঁর আংটিটা হাতিয়ে নেয় এবং নিজেই সুলায়মান সেজে সিংহাসনে বসে। এদিকে আংটি হারা সুলায়মান (আঃ) সিংহাসন হারিয়ে পথে পথে ঘুরতে থাকেন। একদিন ঘটনাক্রমে একটি মাছের পেট থেকে সুলায়মান উক্ত আংটি উদ্ধার করেন ও চল্লিশ দিন পর পুনরায় সিংহাসন লাভ করেন’। সিংহাসনে বসা ঐ শয়তানের রাখা কোন বস্তুকে এখানে আল্লাহ নিষ্প্রাণ দেহ বলেছেন।

বস্তুতঃ এসবই বানোয়াট কাহিনী। ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, আহলে কিতাবের একটি দল হযরত সুলায়মান (আঃ)-কে নবী বলেই স্বীকার করে না। বাহ্যতঃ এসব কাহিনী তাদেরই অপকীর্তি’।

(৭) ‘ইনশাআল্লাহ’ না বলার ফল :

ছহীহ বুখারী ও মুসলিমে এ বিষয়ে বর্ণিত ঘটনার সারমর্ম এই যে, একবার হযরত সুলায়মান (আঃ) এ মনোভাব ব্যক্ত করলেন যে, রাত্রিতে আমি (আমার ৯০ বা ১০০) সকল স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হব। যাতে প্রত্যেকের গর্ভ থেকে একটি করে পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে ও পরে তারা আল্লাহ্র পথে ঘোড় সওয়ার হয়ে জিহাদ করবে। কিন্তু এ সময় তিনি ‘ইনশাআল্লাহ’ (অর্থঃ ‘যদি আল্লাহ চান’) বলতে ভুলে গেলেন। নবীর এ ত্রুটি আল্লাহ পসন্দ করলেন না। ফলে মাত্র একজন স্ত্রীর গর্ভ থেকে একটি অপূর্ণাঙ্গ ও মৃত শিশু ভূমিষ্ট হ’ল’।[৮৩] এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, সুলায়মান বিশ্বের সর্বাধিক ক্ষমতাসম্পন্ন বাদশাহ হ’লেও এবং জিন, বায়ু, পক্ষীকুল ও সকল জীবজন্তু তাঁর হুকুম বরদার হ’লেও আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতীত তার কিছুই করার ক্ষমতা ছিল না। অতএব তাঁর ‘ইনশাআল্লাহ’ বলতে ভুলে যাওয়াটা ছোটখাট কোন অপরাধ নয়। এ ঘটনায় এটাও স্পষ্ট হয় যে, যারা যত বড় পদাধিকারী হবেন, তাদের ততবেশী আল্লাহ্র অনুগত হ’তে হবে এবং সর্বাবস্থায় সকল কাজে আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে। সর্বদা বিনীত হয়ে চলতে হবে এবং কোন অবস্থাতেই অহংকার করা চলবে না।

---

৮৩. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৭২০ ‘ক্বিয়ামতের অবস্থা’ অধ্যায় ‘সৃষ্টির সূচনা ও নবীগণের আলোচনা’ অনুচ্ছেদ-৯।*

অনেক তাফসীরবিদ সূরা ছোয়াদ ৩৪ আয়াতে বর্ণিত 'সিংহাসনের উপরে নিষ্প্রাণ দেহ' রাখার ঘটনার সাথে কিছুটা সাদৃশ্য দেখে ছহীহ বুখারীতে বর্ণিত উপরোক্ত ঘটনাকে উক্ত আয়াতের তাফসীর হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন। তারা বলেন যে, সিংহাসনে নিষ্প্রাণ দেহ রাখার অর্থ এই যে, সুলায়মান (আঃ)-এর জনৈক চাকর উক্ত মৃত সন্তানকে এনে তাঁর সিংহাসনে রেখে দেয়। এতে সুলায়মান (আঃ) বুঝে নেন যে, এটা তাঁর 'ইনশাআল্লাহ' না বলার ফল। সেমতে তিনি আল্লাহ্র দিকে রুজু হ'লেন ও ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। ক্বাযী আবুস সাঊদ, আল্লামা আলূসী, আশরাফ আলী থানভী প্রমুখ এ তাফসীর বর্ণনা করেছেন। এতদ্ব্যতীত ইমাম রাযীও আরেকটি তাফসীর করেছেন যে, সুলায়মান (আঃ) একবার গুরুতর অসুস্থ হয়ে এমন দুর্বল হয়ে পড়েন যে, সিংহাসনে বসালে তাঁকে নিষ্প্রাণ দেহ বলে মনে হ'ত। পরে সুস্থ হ'লে তিনি আল্লাহ্র দিকে রুজু হন...। এ তাফসীর একেবারেই অনুমান ভিত্তিক। কুরআনী বর্ণনার সাথে এর কোন মিল নেই।

প্রকৃত প্রস্তাবে ছহীহ বুখারীতে বর্ণিত ঘটনাকে উক্ত আয়াতের অকাট্ট তাফসীর বলা যায় না। কেননা এ ঘটনায় বর্ণিত রেওয়ায়াত সমূহের কোনটাতেই এরূপ ইঙ্গিত পাওয়া যায় না যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আলোচ্য ঘটনাটিকে উক্ত আয়াতের তাফসীর হিসাবে বর্ণনা করেছেন। সম্ভবতঃ এ কারণেই অত্র হাদীছটি ছহীহ বুখারীর 'জিহাদ' 'আম্বিয়া' 'শপথসমূহ' প্রভৃতি অধ্যায়ে একাধিক সনদে আনা হ'লেও সূরা ছোয়াদের উপরোক্ত ৩৪ আয়াতের তাফসীরে ইমাম বুখারী আনেননি। এতে বুঝা যায় যে, ইমাম বুখারীর মতেও আলোচ্য হাদীছটি উক্ত আয়াতের তাফসীর নয়। বরং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অন্যান্য পয়গম্বরের যেমন বহু ঘটনা বর্ণনা করেছেন, এটাও তেমনি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র। এটা কোন আয়াতের তাফসীর নয়।

বস্তুতঃ কুরআন পাকে এই ঘটনা উল্লেখ করার আসল উদ্দেশ্য হ'ল মানুষকে একথা বুঝানো যে, তারা কোন বিপদাপদে বা পরীক্ষায় পতিত হ'লে যেন পূর্বাপেক্ষা অধিকভাবে আল্লাহ্র দিকে রুজু হয়। যেমন সুলায়মান (আঃ) হয়েছিলেন।

(৮) হারূত ও মারূত ফেরেশতাদ্বয়ের কাহিনী :

সুলায়মান (আঃ)-এর রাজত্বকালে বেঈমান জিনেরা লোকদের ধোঁকা দিত এই বলে যে, সুলায়মান জাদুর জোরে সবকিছু করেন। তিনি কোন নবী নন। শয়তানদের ভেল্কিবাজিতে বহু লোক বিভ্রান্ত হচ্ছিল। এমনকি শেষনবী

(ছাঃ)-এর সময়েও যখন তিনি সুলায়মান (আঃ)-এর প্রশংসা করেন, তখন ইহুদী নেতারা বলেছিল, আশ্চর্যের বিষয় যে, মুহাম্মাদ সুলায়মানকে নবীদের মধ্যে শামিল করে হক ও বাতিলের মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটাচ্ছেন। অথচ তিনি ছিলেন একজন জাদুকর মাত্র। কেননা স্বাভাবিকভাবে কোন মানুষ কি বায়ুর পিঠে সওয়ার হয়ে চলতে পারে? *(ইবনু জারীর)*।

এক্ষণে সুলায়মান (আঃ) যে সত্য নবী, তিনি যে জাদুকর নন, জনগণকে সেটা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য এবং নবীগণের মু‘জেযা ও শয়তানদের জাদুর মধ্যে পার্থক্য বুঝাবার জন্য আল্লাহ পাক হারূত ও মারূত নামে দু’জন ফেরেশতাকে ‘বাবেল’ শহরে মানুষের বেশে পাঠিয়ে দেন। ‘বাবেল’ হ’ল ইরাকের একটি প্রাচীন নগরী, যা ঐসময় জাদু বিদ্যার কেন্দ্র ছিল। ফেরেশতাদ্বয় সেখানে এসে জাদুর স্বরূপ ও ভেল্কিবাজি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করতে থাকেন এবং জাদুকরদের অনুসরণ থেকে বিরত হয়ে যেন সবাই সুলায়মানের নবুঅতের অনুসারী হয়, সেকথা বলতে লাগলেন।

জাদু ও মু‘জেযার পার্থক্য এই যে, জাদু প্রাকৃতিক কারণের অধীন। কারণ ব্যতীত জাদু সংঘটিত হয় না। কিন্তু দর্শক সে কারণ সম্পর্কে অবহিত থাকে না বলেই তাতে বিভ্রান্ত হয়। এমনকি কুফরীতে লিপ্ত হয় এবং ঐ জাদুকরকেই সকল ক্ষমতার মালিক বলে ধারণা করতে থাকে। আজকের যুগে ভিডিও চিত্রসহ হাযার মাইল দূরের ভাষণ ঘরে বসে শুনে এবং দেখে যেকোন অজ্ঞ লোকের পক্ষে নিঃসন্দেহে বিভ্রান্তিতে পড়া স্বাভাবিক। তেমনি সেযুগেও জাদুকরদের বিভিন্ন অলৌকিক বস্তু দেখে অজ্ঞ মানুষ বিভ্রান্তিতে পড়ত।

পক্ষান্তরে মু‘জেযা কোন প্রাকৃতিক কারণের অধীন নয়। বরং তা সরাসরি আল্লাহ্র নির্দেশে সম্পাদিত হয়। নবী ব্যতীত আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাদের প্রতি তাঁর ‘কারামত’ বা সম্মান প্রদর্শনের বিষয়টিও একইভাবে সম্পাদিত হয়। এতে প্রাকৃতিক কারণের যেমন কোন সম্পৃক্ততা নেই, তেমনি সম্মানিত ব্যক্তির নিজস্ব কোন ক্ষমতা বা হাত নেই। উভয় বস্তুর পার্থক্য বুঝার সহজ উপায় এই যে, মু‘জেযা কেবল নবীগণের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়। যারা আল্লাহভীতি, উন্নত চরিত্র মাধুর্য এবং পবিত্র জীবন যাপন সহ সকল মানবিক গুণে সর্বকালে সকলের আদর্শ স্থানীয় হন।

আর নবী ও অলীগণের মধ্যে পার্থক্য এই যে, নবীগণ প্রকাশ্যে নবুঅতের দাবী করে থাকেন। কিন্তু অলীগণ কখনোই নিজেকে অলী বলে দাবী করেন না। অলীগণ সাধারণভাবে নেককার মানুষ। কিন্তু নবীগণ আল্লাহ্র বিশেষভাবে নির্বাচিত বান্দা, যাদেরকে তিনি নবুঅতের গুরুদায়িত্ব অর্পণ করে থাকেন। নবীগণের মু'জেযা প্রকাশে তাদের নিজস্ব কোন ক্ষমতা বা কৃতিত্ব নেই। পক্ষান্তরে দুষ্ট লোকেরাই জাদুবিদ্যা শিখে ও তার মাধ্যমে নিজেদের দুনিয়া হাছিল করে থাকে। উভয়ের চরিত্র জনগণের মাঝে পরিষ্কারভাবে পার্থক্য সৃষ্টি করে।

বস্তুতঃ সুলায়মান (আঃ)-এর নবুঅতের সমর্থনেই আল্লাহ তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে হারূত ও মারূত ফেরেশতাদ্বয়কে বাবেল শহরে পাঠিয়ে ছিলেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِيْنُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَـــكِنَّ الشَّيْاطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُوْلاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ، وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ- وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوْا واتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللهِ خَيْرٌ، لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ- (البقرة ١٠٢-١٠٣)-

'(ইহুদী-নাছারাগণ) ঐ সবের অনুসরণ করে থাকে, যা সুলায়মানের রাজত্বকালে শয়তানরা আবৃত্তি করত। অথচ সুলায়মান কুফরী করেননি, বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে জাদু বিদ্যা শিক্ষা দিত এবং বাবেল শহরে হারূত ও মারূত দুই ফেরেশতার উপরে যা নাযিল হয়েছিল, তা শিক্ষা দিত। বস্তুতঃ তারা (হারূত-মারূত) উভয়ে একথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, আমরা এসেছি পরীক্ষা স্বরূপ। কাজেই তুমি (জাদু শিখে) কাফির হয়ো না। কিন্তু তারা তাদের কাছ থেকে এমন জাদু শিখত, যার দ্বারা

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। অথচ আল্লাহ্র আদেশ ব্যতীত তদ্বারা তারা কারু ক্ষতি করতে পারত না। লোকেরা তাদের কাছে শিখত ঐসব বস্তু যা তাদের ক্ষতি করে এবং তাদের কোন উপকার করে না। তারা ভালভাবেই জানে যে, যে কেউ জাদু অবলম্বন করবে, তার জন্য আখেরাতে কোন অংশ নেই। যার বিনিময়ে তারা আত্মবিক্রয় করেছে, তা খুবই মন্দ, যদি তারা জানতো’। ‘যদি তারা ঈমান আনত ও আল্লাহভীরু হ’ত, তবে আল্লাহ্র কাছ থেকে উত্তম প্রতিদান পেত, যদি তারা জানত’ *(বাক্বারাহ ২/১০২-১০৩)*।

বলা বাহুল্য, সুলায়মান (আঃ)-কে জিন, বায়ু, পক্ষীকুল ও জীবজন্তুর উপরে একচ্ছত্র ক্ষমতা দান করা ছিল আল্লাহ্র এক মহা পরীক্ষা। শয়তান ও তাদের অনুসারী দুষ্ট লোকেরা সর্বদা এটাকে বস্তুবাদী দৃষ্টিতে দেখেছে এবং যুক্তিবাদের ধূম্রজালে পড়ে পথ হারিয়েছে। অথচ আল্লাহ্র নবী সুলায়মান (আঃ) সর্বদা আল্লাহ্র নে‘মতের শুকরিয়া আদায় করেছেন। আমরাও তার নবুঅতের প্রতি দ্বিধাহীনভাবে বিশ্বাস স্থাপন করি।

(৯) বায়তুল মুক্বাদ্দাস নির্মাণ ও সুলায়মান (আঃ)-এর মৃত্যুর বিস্ময়কর ঘটনা :

বায়তুল মুক্বাদ্দাসের নির্মাণ সর্বপ্রথম ফেরেশতাদের মাধ্যমে অথবা আদম (আঃ)-এর কোন সন্তানের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় কা‘বাগৃহ নির্মাণের চল্লিশ বছর পরে। অতঃপর স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে হযরত ইয়াকূব (আঃ) তা পুনর্নির্মাণ করেন। তার প্রায় হাযার বছর পরে দাঊদ (আঃ) তার পুনর্নির্মাণ শুরু করেন এবং সুলায়মান (আঃ)-এর হাতে তা সমাপ্ত হয়। কিন্তু মূল নির্মাণ কাজ শেষ হ’লেও আনুসঙ্গিক কিছু কাজ তখনও বাকী ছিল। এমন সময় হযরত সুলায়মানের মৃত্যুকাল ঘনিয়ে এল। এই কাজগুলি অবাধ্যতাপ্রবণ জিনদের উপরে ন্যস্ত ছিল। তারা হযরত সুলায়মানের ভয়ে কাজ করত। তারা তাঁর মৃত্যু সংবাদ জানতে পারলে কাজ ফেলে রেখে পালাতো। ফলে নির্মাণ কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যেত। তখন সুলায়মান (আঃ) আল্লাহ্র নির্দেশে মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হয়ে তাঁর কাঁচ নির্মিত মেহরাবে প্রবেশ করলেন। যাতে বাইরে থেকে ভিতরে সবকিছু দেখা যায়। তিনি বিধানানুযায়ী ইবাদতের উদ্দেশ্যে লাঠিতে ভর করে দাঁড়িয়ে গেলেন, যাতে রূহ বেরিয়ে যাবার পরেও লাঠিতে ভর দিয়ে দেহ স্বস্থানে দাঁড়িয়ে থাকে। সেটাই হ’ল। আল্লাহ্র হুকুমে তাঁর দেহ উক্ত লাঠিতে ভর করে এক বছর দাঁড়িয়ে থাকল। দেহ পচলো না, খসলো না বা

পড়ে গেল না। জিনেরা ভয়ে কাছে যায়নি। ফলে তারা হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে কাজ শেষ করে ফেলল। এভাবে কাজ সমাপ্ত হ'লে আল্লাহ্র হুকুমে কিছু উই পোকার সাহায্যে লাঠি ভেঙ্গে দেওয়া হয় এবং সুলায়মান (আঃ)-এর লাশ মাটিতে পড়ে যায়। উক্ত কথাগুলি আল্লাহ বলেন নিম্নোক্ত ভাবে-

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلاَّ دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوْا فِي الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ- (سبا ١٤)-

'অতঃপর যখন আমরা সুলায়মানের মৃত্যু ঘটালাম, তখন ঘুনপোকাই জিনদেরকে তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত করল। সুলায়মানের লাঠি খেয়ে যাচ্ছিল। অতঃপর যখন তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন, তখন জিনেরা বুঝতে পারল যে, যদি তারা অদৃশ্য বিষয় জানতো, তাহ'লে তারা (মসজিদ নির্মাণের) এই হাড়ভাঙ্গা খাটুনির আযাবের মধ্যে আবদ্ধ থাকতো না' *(সাবা ৩৪/১৪)*। সুলায়মানের মৃত্যুর এই ঘটনা আংশিক কুরআনের আলোচ্য আয়াতের এবং আংশিক ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ থেকে বর্ণিত হয়েছে *(ইবনে কাছীর)*।

সুলায়মানের এই অলৌকিক মৃত্যু কাহিনীর মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ :

(১) মৃত্যুর নির্ধারিত সময় উপস্থিত হ'লে নবী-রাসূল যে-ই হৌন না কেন, এক সেকেণ্ড আগপিছ হবে না।

(২) আল্লাহ কোন মহান কাজ সম্পন্ন করতে চাইলে যেকোন উপায়ে তা সম্পন্ন করেন। এমনকি মৃত লাশের মাধ্যমেও করতে পারেন।

(৩) ইতিপূর্বে জিনেরা বিভিন্ন আগাম খবর এনে বলত যে, আমরা গায়েবের খবর জানি। অথচ চোখের সামনে মৃত্যুবরণকারী সুলায়মান (আঃ)-এর খবর তারা জানতে পারেনি এক বছরের মধ্যে। এতে তাদের অদৃশ্য জ্ঞানের দাবী অসার প্রমাণিত হয়।

সংশয় নিরসন

(১) সুলায়মানের আংটি চুরি ও রাজত্ব হরণ :

বাক্বারাহ ১০২ : وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِيْنُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ ‘এবং সুলায়মানের রাজত্বে শয়তানগণ যা আবৃত্তি করত, তারা (ইহুদীরা) তার অনুসরণ করত’।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীর জালালাইনে বলা হয়েছে, من السحر، وكانت دفنته تحت كرسيه لَمَّا نُزِعَ ملكُه- ‘(শয়তানেরা) জাদু হ’তে (আবৃত্তি করত), যা সুলায়মান-এর সিংহাসনের নীচে তারা দাফন করেছিল তাঁর রাজত্ব ছিনিয়ে নেওয়ার প্রাক্কালে। আমরা বলি, সুলায়মান (আঃ) একজন জলীলুল ক্বদর নবী ছিলেন। তিনি জাদুকর ছিলেন না বা জাদুর শক্তির বলে তিনি সবকিছুকে অনুগত করেননি। তাঁর সিংহাসনের নীচে কোন জাদুও কেউ লুকিয়ে রাখেনি। তাছাড়া তাঁর রাজত্ব ছিনিয়ে নেবার মত কোন অঘটন ঘটেনি এবং এমন কোন খবরও আল্লাহ বা তাঁর রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে দেননি। এগুলি নবীগণের মর্যাদার বরখেলাফ এবং স্রেফ ইস্রাঈলী কল্পকাহিনী মাত্র।

অতএব উক্ত আয়াত সমূহের প্রকাশ্য অর্থ এই যে, সুলায়মান (আঃ)-এর অতুলনীয় সাম্রাজ্যে ঈর্ষান্বিত শয়তানেরা সর্বত্র রটিয়ে দেয় যে, জিন-ইনসান ও পশু-পক্ষী সবার উপরে সুলায়মানের একাধিপত্যের মূল কারণ হ’ল তাঁর পঠিত কিছু কালেমা, যার কিছু কিছু আমরা জানি। যারা এগুলি শিখবে ও তার উপরে আমল করবে, তারাও অনুরূপ ক্ষমতা অর্জন করতে পারবে। তখন লোকেরা ঐসব জাদু বিদ্যা শিখতে ঝুঁকে পড়ল ও তাদের অনুসারী হ’ল এবং কুফরী করতে শুরু করল। বর্ণিত আয়াতে এর প্রতিবাদ করা হয়েছে এবং সুলায়মান (আঃ)-এর নির্দোষিতা ঘোষণা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, সুলায়মান জাদুর বলে নয়, বরং আল্লাহ্‌র দেওয়া ক্ষমতা বলে দেশ শাসন করেন। মূল কথা হ’ল, ইহুদীরা সকল নবীকে গালি দিয়েছে এবং সেভাবে সুলায়মান (আঃ)-কেও তোহমত দিয়েছে।

(২) হারূত ও মারূতের কাহিনী :

একই আয়াতে হারূত ও মারূত দুই ফেরেশতা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। যেখানে মাননীয় তাফসীরকার বলেছেন, قال إبن عباس : هما ساحران، كانا

–يعلمان السحر ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'তারা ছিলেন দু'জন জাদুকর। তারা জাদু শিক্ষা দিতেন'। অথচ তাঁরা জাদুকর ছিলেন না। বরং ফেরেশতা ছিলেন। যারা কখনোই আল্লাহ্র অবাধ্য ছিলেন না। জাদুকর বলে তাদের উপরে তোহমত লাগানো হয়েছে মাত্র।

এতদ্ব্যতীত বাহ্রুল মুহীত্ব, বায়যাবী প্রভৃতি তাফসীর গ্রন্থে যেমন বলা হয়েছে যে, (ক) আল্লাহ তাদেরকে পরীক্ষা স্বরূপ মানুষ হিসেবে দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন। পরে তারা মানুষের ন্যায় মহাপাপে লিপ্ত হয়। (খ) তখন শাস্তি স্বরূপ তাদের পায়ে বেড়ী দিয়ে বাবেল শহরে একটি পাহাড়ের গুহার মধ্যে আটকিয়ে রাখা হয়। যারা যেখানে ক্বিয়ামত পর্যন্ত অবস্থান করবে। (গ) আর যে সুন্দরী মেয়েটির সঙ্গে তারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল, সে মেয়েটি আসমানে 'যোহরা' তারকা হিসেবে ক্বিয়ামত পর্যন্ত ঝুলন্ত থাকবে'-- এগুলি সব তাফসীরের নামে উদ্ভট গল্প মাত্র, যা সুলায়মানের শত্রু ইহুদী-নাছারাদের উর্বর মস্তিষ্কের ফসল ছাড়া কিছুই নয়।

মূল ঘটনা এই যে, ঐ সময় ইরাকের বাবেল বা ব্যবিলন শহর জাদু বিদ্যায় শীর্ষে ছিল। সুলায়মানের বিশাল ক্ষমতাকে শয়তান ও দুষ্ট লোকেরা উক্ত জাদু বিদ্যার ফল বলে রটনা করত। তখন নবুঅত ও জাদুর মধ্যে পার্থক্য বুঝানোর জন্য আল্লাহ হারূত ও মারূত নামক দু'জন ফেরেশতাকে সেখানে শিক্ষক হিসাবে মানুষের বেশে পাঠান। তারা লোকদের জাদু বিদ্যার অনিষ্টকারিতা ও নবুঅতের কল্যাণকারিতা সম্পর্কে বুঝাতে থাকেন। কিন্তু লোকেরা অকল্যাণকর বিষয়গুলিই শিখতে চাইত। যা কুরআনের উক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

(৩) সুলায়মানের (আঃ)-এর উপরে প্রদত্ত তোহমত :

ছোয়াদ ৩৪ : وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ 'আমি সোলায়মানকে পরীক্ষা করলাম এবং তার আসনের উপরে রেখে দিলাম একটি নিষ্প্রাণ দেহ। অতঃপর সে বিনত হ'ল।' এখানে তাফসীর জালালাইনে বলা হয়েছে,

ابتليناه بسبب ملكه، وذلك لتزوجه بامرأة هواها، وكانت تعبد الصنم في داره من غير علمه وكان مُلكه في خاتمه، فنزعه مرة عند إرادة الخلاء عند أمرأة المسماة بالأمينة على عادته، فجاءها جنّي في صورة سليمان فأخذه

منها... ثم أناب : رجع سليمان إلى مُلكه بعد أيام، بأن وصـــل إلى الخـــاتم فلبسه وجلس على كرسيه–

‘আমরা তাকে তার রাজত্বের কারণে পরীক্ষা করলাম। সেটা এই যে, তিনি একজন মহিলাকে বিবাহ করেন, যার প্রতি তিনি আসক্ত হয়েছিলেন। ঐ মহিলা তার গৃহে তার অগোচরে মূর্তি পূজা করত। আর সুলায়মানের রাজত্ব ছিল তার আংটির কারণে। একদিন তিনি টয়লেটে যাবার সময় অভ্যাসবশতঃ আংটিটি খুলে তাঁর উক্ত স্ত্রী ‘আমীনা’-র নিকটে রেখে যান। এমন সময় একটি জিন সুলায়মানের রূপ ধারণ করে সেখানে উপস্থিত হয় ও তার নিকট থেকে আংটিটি নিয়ে নেয়।...অতঃপর সুলায়মান বেরিয়ে এসে দেখেন তাঁর সিংহাসনে অন্যজন বসে আছে এবং লোকেরা সবাই তাকে অস্বীকার করে।...‘অতঃপর সে বিনত হ’ল’ অর্থাৎ সুলায়মান কিছু দিন পরে তাঁর আংটির নিকটে পৌঁছে যান। অতঃপর আংটি পরিধান করে নিজ রাজ আসনে উপবেশন করেন’।

আমরা বলি, এই ব্যাখ্যার মধ্যে মারাত্মক ক্রটি রয়েছে। কেননা এই ব্যাখ্যা দ্বারা নবী ও তাঁর পবিত্র স্ত্রীদের মর্যাদাহানি করা হয়েছে। যেখানে নবীদের ইয্যতের হেফাযতের দায়িত্ব আল্লাহ্র, সেখানে এ ধরনের তাফসীর বাতিল প্রতিপন্ন হওয়া স্বাভাবিক বিষয়। সুলায়মান (আঃ)-কে আল্লাহ পরীক্ষা করেছিলেন এবং সে পরীক্ষার ফলে তিনি আল্লাহ্র দিকে অধিকতর রুজু হয়েছিলেন। কুরআন মাজীদে এই ঘটনা আমাদেরকে শুনানোর উদ্দেশ্য হ’ল যাতে আমরাও কোন পরীক্ষায় নিপতিত হ’লে দিশেহারা না হয়ে যেন আল্লাহ্র দিকে অধিকতর রুজু ও বিনীত হই- একথা বুঝানো। এখানে মূল ঘটনা বর্ণনা করা আল্লাহ্র উদ্দেশ্য নয়। তার কোন প্রয়োজনও নেই এবং তার জানার যথার্থ কোন উপায়ও আমাদের কাছে নেই।

এ সম্পর্কে মাননীয় তাফসীরকার যে আংটির ঘটনা উল্লেখ করেছেন, তাছাড়াও তাঁর আংটি শয়তানের করায়ত্ত হওয়া, ৪০দিন পরে তা মাছের পেট থেকে উদ্ধার করে পুনরায় সিংহাসন ফিরে পাওয়া ইত্যাদি গল্পকে হাফেয ইবনু কাছীর স্রেফ ইস্রাঈলী উপকথা বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

নবী সুলায়মানের স্বীয় স্ত্রীদের সাথে ঘটনার যে বিবরণ ছহীহ বুখারী সহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে এসেছে, সেটিকে ক্বাযী আবুস সঊদ, আল্লামা আলূসী, আশরাফ আলী থানভী প্রমুখ মুফাসসিরগণের ন্যায় অনেকে অত্র আয়াতের

Contents

তাফসীর ভেবেছেন। কিন্তু সেটাও ঠিক নয়। ইমাম বুখারী স্বয়ং উক্ত হাদীছকে অত্র আয়াতের তাফসীরে আনেননি। বরং বিভিন্ন নবীর ঘটনা বর্ণনার ন্যায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সুলায়মান নবী সম্বন্ধেও একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন মাত্র। অত্র আয়াতের শানে নুযূল বা ব্যাখ্যা হিসাবে নয়। উল্লেখ্য যে, ই.ফা.বা. ঢাকা-র অনুবাদের টীকাতেও উক্ত ঘটনাকে অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় আনা হয়েছে (পৃঃ ৭৪৪ টীকা ১৪১)। যা নিতান্তই ভুল।

সুলায়মান (আঃ)-এর জীবনী থেকে শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ :

১. নবুঅত ও খেলাফত একত্রে একই ব্যক্তির মাধ্যমে পরিচালিত হওয়া সম্ভব।

২. ধর্মই রাজনীতির প্রধান চালিকা শক্তি। ধর্মীয় রাজনীতির মাধ্যমেই পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

৩. প্রকৃত মহান তিনিই, যিনি সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হয়েও অহংকারী হন না। বরং সর্বদা আল্লাহ্র প্রতি বিনীত থাকেন।

৪. শত্রুমুক্ত কোন মানুষ দুনিয়াতে নেই। সুলায়মানের মত একচ্ছত্র এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাদশাহ্র বিরুদ্ধেও চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র ও মিথ্যাচার চালানো হয়েছে।

৫. সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে প্রজাসাধারণের কাজ করলেও তারা অনেক সময় না বুঝে বিরোধিতা করে। যেমন বায়তুল মুক্বাদ্দাস মসজিদের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত না হওয়ায় আল্লাহ বাকী সময়ের জন্য সুলায়মানের প্রাণহীন দেহকে লাঠিতে ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখেন জিন মিস্ত্রী ও জোগাড়েদের ভয় দেখানোর জন্য। যাতে তারা কাজ ফেলে রেখে চলে না যায় এবং নতুন চক্রান্তে লিপ্ত হবার সুযোগ না পায়।

সুলায়মানের মৃত্যু ও রাজত্বকাল :

সুলায়মান (আঃ) ৫৩ বছর বেঁচেছিলেন। তন্মধ্যে ৪০ বছর তিনি রাজত্ব করেন। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র রাহবা‘আম (رحبعـــام) ১৭ বছর রাজত্ব করেন। অতঃপর বনু ইস্রাঈলের রাজত্ব বিভক্ত হয়ে যায়।[৮৪] সুলায়মান মনছূরপুরীর হিসাব মতে শেষনবী (ছাঃ)-এর আবির্ভাবের প্রায় ১৫৪৬ বছর পূর্বে সুলায়মান (আঃ) মৃত্যুবরণ করেন।[৮৫]

৮৪. *ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ২/২৯-৩০।*
৮৫. *মানছূরপুরী, রহমাতুল লিল আলামীন ৩/১০৯ পৃঃ।*

১৯. হযরত ইলিয়াস *(আলাইহিস সালাম)*

পবিত্র কুরআনে মাত্র দু’জায়গায় হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর আলোচনা দেখা যায়। সূরা আন‘আম ৮৫ আয়াতে ও সূরা ছাফফাত ১২৩-১৩২ আয়াতে। সূরা আন‘আমে ৮৩-৮৫ আয়াতে ১৮ জন নবীর তালিকায় তাঁর নাম রয়েছে। সেখানে কোন আলোচনা স্থান পায়নি। তবে সূরা ছাফফাতে সংক্ষেপে হ’লেও তাঁর দাওয়াতের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। ঐতিহাসিক বর্ণনায় এ বিষয়ে প্রায় সবাই একমত যে, তিনি হযরত হিয্ক্বীল (আঃ)-এর পর এবং হযরত আল-ইয়াসা‘ (আঃ)-এর পূর্বে দামেষ্কের পশ্চিমে বা‘লা বাক্কা (بعلبك) অঞ্চলের বনু ইস্রাঈলগণের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। এই সময় হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর উত্তরসুরীদের অপকর্মের দরুণ বনু ইস্রাঈলের সাম্রাজ্য দু’ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। এক ভাগকে ‘ইয়াহূদিয়াহ’ বলা হ’ত এবং তাদের রাজধানী ছিল বায়তুল মুক্বাদ্দাসে। অপর ভাগের নাম ছিল ‘ইস্রাঈল’ এবং তাদের রাজধানী ছিল তৎকালীন সামেরাহ এবং বর্তমান নাবলুসে।

ইলিয়াসের জন্মস্থান :

হযরত ইলিয়াস (আঃ) ফিলিস্তীনের পার্শ্ববর্তী জর্ডানের আল‘আদ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। আল্লাহ পাক তাঁকে নবী হিসাবে মনোনীত করেন এবং ফিলিস্তীন অঞ্চলে তাওহীদের প্রচার ও প্রসারের নির্দেশ দান করেন।

ফিলিস্তীনের ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থা :

এই সময় ফিলিস্তীনের বায়তুল মুক্বাদ্দাস ও নাবলুস অঞ্চলে বনু ইস্রাঈলদের দুই গ্রুপের দু’টি রাজধানী ছিল। তারা আপোষে পরস্পরে মারমুখী ছিল। ফেলে আসা নবুঅতী সমাজ ব্যবস্থা থেকে তারা অনেক দূরে একটি পতিত সমাজে পরিণত হয়েছিল। কিতাবধারী ও কিতাবহীন জাহেলী সমাজের মধ্যে পার্থক্য করার কোন উপায় ছিল না।

তখনকার ‘ইস্রাঈল’-এর শাসনকর্তার নাম ছিল ‘আখিয়াব’ বা ‘আখীব’। তার স্ত্রী ছিল ‘ইযবীল’। যে বা‘ল (بعـــل) নামক এক দেবমূর্তির পূজা করত। সে বা‘ল মূর্তির নামে এক বিশাল উপাসনালয় তৈরী করে এবং সেখানে সকল

বনু ইস্রাঈলকে মূর্তিপূজায় আহ্বান করে। দলে দলে লোক সেদিকে আকৃষ্ট হচ্ছিল। মূসা-হারূণ, দাঊদ ও সুলায়মান নবীর উম্মতেরা বিনা দ্বিধায় শিরকের মহাপাতকে আত্মাহুতি দিচ্ছিল। এমন এক মর্মান্তিক অবস্থায় আল্লাহ পাক তাদের নিকটে তাওহীদের বাণী প্রচারের জন্য ইলিয়াসকে নবী হিসাবে প্রেরণ করেন।

ইলিয়াসের দাওয়াত :

শিরকে আচ্ছন্ন ফিলিস্তীনবাসীকে হযরত ইলিয়াস (আঃ) তাওহীদের দাওয়াত দেন এবং শিরক পরিত্যাগ করার আহ্বান জানান। কেননা শিরক ও তাওহীদের একত্র সহাবস্থান কখনোই সম্ভব নয়। ইলিয়াস ও তাঁর দাওয়াত সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ- إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلاَ تَتَّقُوْنَ- أَتَدْعُوْنَ بَعْلاً وَتَذَرُوْنَ أَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ- اللهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِيْنَ- فَكَذَّبُوْهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ- إِلاَّ عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِيْنَ- وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِيْنَ- سَلاَمٌ عَلَى إِلْ يَاسِيْنَ- إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ- إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ- (الصافات ١٢٣-١٣٢)-

'নিশ্চয়ই ইলিয়াস ছিল প্রেরিত রাসূলগণের অন্যতম' *(ছাফফাত ১২৩)*। 'যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা কি ভয় কর না'? *(১২৪)* 'তোমরা কি বা'ল দেবতার পূজা করবে আর সর্বোত্তম স্রষ্টাকে পরিত্যাগ করবে'? *(১২৫)* 'যিনি আল্লাহ, তোমাদের পালনকর্তা ও তোমাদের পূর্বপুরুষদের পালনকর্তা' *(১২৬)*। 'অতঃপর তারা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। অতএব তারা অবশ্যই গ্রেফতার হয়ে আসবে' *(১২৭)*। 'কিন্তু আল্লাহ্র খাঁটি বান্দাগণ ব্যতীত' *(১২৮)*। আমরা এই নিয়মের উপরে পরবর্তীদেরকেও রেখে দিয়েছি' *(১২৯)*। 'ইলিয়াস-এর উপরে শান্তি বর্ষিত হৌক' *(১৩০)*। 'এভাবেই আমরা সৎকর্মীদের প্রতিদান দিয়ে থাকি' *(১৩১)*। 'নিশ্চয়ই ইলিয়াস ছিল আমাদের বিশ্বাসী বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত' *(ছাফফাত ৩৭/১২৩-১৩২)*।

দাওয়াতের ফলশ্রুতি :

বিগত নবীগণের যে দুরবস্থা হয়েছিল, ইলিয়াস (আঃ)-এর ভাগ্যে তার ব্যতিক্রম হয়নি। তিনি ইস্রাঈলের শাসক আখিয়াব ও তার প্রজাবৃন্দকে বা‘ল দেবমূর্তির পূজা করতে নিষেধ করলেন এবং এক আল্লাহ্র প্রতি ইবাদতের আহ্বান জানালেন। কিন্তু দু’একজন হকপন্থী ব্যক্তি ছাড়া কেউ তাঁর কথায় কর্ণপাত করল না। তারা ইলিয়াস (আঃ)-এর বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচারে লিপ্ত হ’ল। তাকে যত্রতত্র অপমান-অপদস্থ করা শুরু করল। এমনকি দৈহিক নির্যাতনও শুরু হয়ে গেল। কিন্তু ইলিয়াস (আঃ) তাঁর দাওয়াত চালিয়ে যেতে থাকেন। অবশেষে রাজা ও রাণী তাঁকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেন। ফলে তিনি রাজধানী ছেড়ে অনেক দূরে এক পাহাড়ের গুহায় আত্মগোপন করলেন এবং দুর্ভিক্ষ নাযিলের জন্য আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করলেন। ফলে সারা দেশে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। ইলিয়াস (আঃ) মনে করলেন দুর্ভিক্ষ দূর করার জন্য তিনি যদি তাদেরকে মো‘জেযা প্রদর্শন করেন, তাহ’লে হয়ত তারা শিরক বর্জন করে তাওহীদ কবুল করবে এবং এক আল্লাহ্র ইবাদতে ফিরে আসবে।

বাদশাহ্র দরবারে ইলিয়াসের উপস্থিতি :

আল্লাহ্র হুকুমে হযরত ইলিয়াস (আঃ) তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে সরাসরি ইস্রাঈলের বাদশাহ আখিয়াবের দরবারে হাযির হ’লেন। তিনি বললেন, দেশব্যাপী এই দুর্ভিক্ষের কারণ হ’ল আল্লাহ্র নাফরমানী। তোমরা নাফরমানী থেকে বিরত হ’লে এ আযাব দূর হ’তে পারে। তোমরা বলে থাক যে, তোমাদের বা‘ল দেবতার নাকি সাড়ে চারশ’ নবী (!) আছে। তাই যদি হয়, তাহ’লে তুমি তাদের সবাইকে একত্রিত কর। তারা এই দুর্ভিক্ষ দূর করার জন্য বা‘ল দেবতার নামে কুরবানী করুক। আর আমি একই উদ্দেশ্যে আল্লাহ্র নামে কুরবানী পেশ করি। যার কুরবানী আসমান থেকে আগুন এসে ভস্ম করে দেবে, তার ধর্মই সত্য বলে গণ্য হবে। ইলিয়াস (আঃ)-এর এ প্রস্তাব সবাই সানন্দে মেনে নিল।

আল্লাহ ও বা‘ল দেবতার নামে কুরবানীর ঘটনা :

পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ‘কোহে কারমাল’ নামক পাহাড়ী উপত্যকায় সকলে সমবেত হ’ল। বা‘ল দেবতার নামে তার মিথ্যা নবীরা কুরবানী পেশ করল।

সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বা'ল দেবতার উদ্দেশ্যে আকুতি-মিনতি ও কান্নাকাটি করে প্রার্থনা করা হ'ল। কিন্তু দেবতার কোন সাড়া পাওয়া গেল না। আসমান থেকে কোন আগুন নাযিল হ'ল না।

অতঃপর হযরত ইলিয়াস (আঃ) আল্লাহ্‌র নামে কুরবানী করলেন এবং যথাসময়ে আসমান থেকে আগুন এসে তা খেয়ে গেল। বস্তুতঃ এটাই ছিল কুরবানী কবুল হওয়ার নিদর্শন। এভাবেই কবুল হয়েছিল আদমপুত্র হাবীলের কুরবানী। তখনকার সময় মুশরিকদের মধ্যেও এ রীতি গ্রহণযোগ্য ছিল, যা ইলিয়াসের বর্তমান ঘটনায় প্রমাণিত হয়।

আসমান থেকে আগুন এসে কুরবানী কবুলের এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখে অনেকে সাথে সাথে সিজদায় পড়ে গেল এবং ইলিয়াসের দ্বীন কবুল করে নিল। সকলের নিকটে ইলিয়াস (আঃ)-এর সত্যতা স্পষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু বা'ল পূজারী কথিত ধর্মনেতারা তাদের যিদের উপরে অটল রইল। এইসব মিথ্যা নবীরা ও তাদের স্বার্থান্ধ অনুসারীরা ঈমান আনল না।

ইলিয়াস (আঃ)-কে পুনরায় হত্যার ষড়যন্ত্র :

ওদিকে আখিয়াবের স্ত্রী ইখবীল হযরত ইলিয়াস (আঃ)-কে পুনরায় হত্যার চক্রান্ত শুরু করে দিল। ফলে তিনি রাজধানী সামেরাহ (নাবলুস) ছেড়ে চলে গেলেন এবং কিছুদিন পর বনু ইস্রাঈলের অপর রাজ্য পার্শ্ববর্তী ইয়াহূদিয়াহতে উপস্থিত হ'লেন। ঐসময় বা'ল পূজার ঢেউ এখানেও লেগেছিল। হযরত ইলিয়াস (আঃ) সেখানে পৌঁছে তাওহীদের দাওয়াত শুরু করলেন। সেখানকার সম্রাট 'ইহুরাম'-এর কাছেও তিনি দাওয়াত দিলেন। কিন্তু নিরাশ হ'লেন। অবশেষে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হ'ল।

কয়েক বছর পর ইলিয়াস (আঃ) পুনরায় 'ইস্রাঈলে' ফিরে এলেন এবং 'আখিয়াব' ও তার পুত্র 'আখযিয়া'-কে সত্য পথে আনার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তারা তাদের শিরকী ধ্যান-ধারণায় অটল রইল। অবশেষে তাদের উপরে বৈদেশিক আক্রমণ ও মারাত্মক রোগ-ব্যধির গযব নাযিল হ'ল। অতঃপর আল্লাহ পাক তাঁর নবীকে উঠিয়ে নিলেন।

হযরত ইলিয়াস (আঃ) জীবিত আছেন কি?

সুয়ূত্বী, ইবনে আসাকির, হাকেম প্রমুখের বিভিন্ন বর্ণনায় প্রতীয়মান হয় যে, চারজন নবী জীবিত আছেন। তন্মধ্যে খিযির ও ইলিয়াস দুনিয়াতে এবং

ইদরীস ও ঈসা আসমানে রয়েছেন। কিন্তু হাকেম ও ইবনু কাছীর এসব বর্ণনাকে বিশুদ্ধ বলেননি। সারকথা, হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর জীবিত থাকার বিষয়টি কোন ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। অতএব এসব বর্ণনার প্রতি কর্ণপাত করার কোন প্রয়োজন নেই। ইলিয়াস (আঃ) স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় মৃত্যুবরণ করেছেন বলেই আমরা বিশ্বাস করব।

বা‘ল দেবতার পরিচয় :

সূরা ছাফফাত ১২৫ আয়াতে যে বা‘ল (بعـــل) দেবতার কথা বলা হয়েছে, আরবী ভাষায় এর অর্থ স্বামী বা মালিক। কিন্তু সম্ভবতঃ এটি হিব্রু শব্দ। কেননা তখনকার সময় ফিলিস্তীন অঞ্চলের ভাষা ইবরানী বা হিব্রু ছিল। এটি ইস্রাঈলীদের পূজিত দেবমূর্তির নাম। হযরত মূসা (আঃ)-এর সময়ে শাম অঞ্চলে এর পূজা হ’ত এবং এটাই ছিল তাদের সর্বাধিক জনপ্রিয় দেবতা। বা‘ল বাক্কা (بعلبك) শব্দটি مركب بنـــائى বা অপরিবর্তনীয় যৌগিক শব্দের উদাহরণ হিসাবে আরবী ব্যাকরণের একটি অতি পরিচিত শব্দ। এটি লেবাননের একটি প্রসিদ্ধ শহরের নাম, যা উক্ত বা‘ল দেবতার নামেই নামকরণ করা হয়েছে। কারু কারু মতে জাহেলী আরবদের প্রসিদ্ধ দেবমূর্তি ‘হোবল’ (هبـــل) এই বা‘লেরই অপর নাম। মক্কার খুযা‘আহ গোত্রের নেতা আমর বিন লুহাই সর্বপ্রথম সিরিয়া থেকে বহু মূল্যের বিনিময়ে এই মূর্তি নিয়ে এসে কা‘বা গৃহে স্থাপন করেন এবং জনগণকে এই বলে আশ্বস্ত করেন যে, সিরিয়রা এই মূর্তির অসীলায় পানি প্রার্থনা করে। আমরাও এর অসীলায় পানি প্রার্থনা করব। তাতে সিরিয়ার ন্যায় মক্কা অঞ্চলেও প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে এবং এলাকা শস্য-শ্যামল হয়ে উঠবে। এটাই ছিল কা‘বা গৃহে স্থাপিত প্রথম দেবমূর্তি। পরে অন্যান্য ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন সময়ে আরও মূর্তি এনে স্থাপন করে। এভাবে রাসূলের আবির্ভাবকালে তার সংখ্যা ৩৬০-য়ে গিয়ে দাঁড়ায়। তবে তারা এর দ্বারা তাদের দাবী মতে ইবরাহীমী ধর্মের তাওহীদ বিশ্বাসে কোন ত্রুটি হচ্ছে বলে মনে করত না। তারা এটাকে শিরক ভাবত না; বরং আল্লাহ্‌র নৈকট্য হাছিলের অসীলা মনে করত *(যুমার ৩৯/৩)*।[৮৬]

---

৮৬. পুরা আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: দ্র: তাফসীর মা‘আরেফুল কুরআন পৃঃ ১১৫৩-৫৫; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/৩১৪। তবে বর্ণিত আলোচনার সবটাকেই অকাট্য সত্য বলা যাবে

শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ :

(১) আহলে কিতাব হওয়া সত্ত্বেও এবং নিজেদের গোত্রে হাযার হাযার নবীর আগমন সত্ত্বেও বনু ইস্রাঈলগণ মূর্তিপূজায় অভ্যস্ত হয়েছিল প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রচারের অভাবে। একইভাবে যদি ইসলামের বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমলের প্রচার ও প্রসার না থাকে, তবে একদিন মুসলিমদের হাতেই ইসলামের চূড়ান্ত ক্ষতি হবে। ইতিমধ্যে মুসলিম দেশ সমূহের অভ্যন্তরে দুনিয়াপূজারী ধর্মনেতাদের হাত দিয়ে পীরপূজা, কবর পূজা ইত্যাদির মাধ্যমে উক্ত শিরকের রমরমা বাজার চলছে।

(২) শিরকের প্রবর্তন রাষ্ট্র ও সমাজনেতাদের মাধ্যমে হ'লে তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং স্থায়িত্ব লাভ করে। যেমন ইস্রাঈলের রাণী ইযবীলের মাধ্যমে বা'ল মূর্তির পূজা শুরু হয়েছিল। পরে সারা দেশে তা চালু হয়ে যায়।

(৩) সমাজ সংস্কারক ব্যক্তিকে আপোষহীনভাবে স্রেফ আল্লাহ্র উপরে ভরসা করে তাওহীদ বিরোধী কাজের সংস্কারে নামতে হয়। যেভাবে ইলিয়াস (আঃ) একাকী উক্ত কাজে নেমেছিলেন।

(৪) মৃত ব্যক্তি বা তার কবরের কোন প্রভাব জীবিত ব্যক্তিদের উপরে পড়ে না। যেমন বায়তুল মুক্বাদ্দাসের আশপাশে হযরত ইবরাহীম, ইসহাক্ব, ইয়াকূব, মূসা, হারূণ, দাঊদ, সুলায়মান সহ বিগত যুগের শত শত জলীলুল ক্বদর নবীর কবর থাকা সত্ত্বেও তাদের বুকের উপরে সংঘটিত বা'ল দেবমূর্তি পূজার ব্যাপারে তাদের কোন প্রভাব তাদের স্বগোত্রীয় বনু ইস্রাঈলদের উপরে পড়েনি।

(৫) সর্বদা সমাজের কিছু ন্যায়নিষ্ঠ মানুষকে তাওহীদের প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করতে হয়। সবাইকে দিয়ে একাজ সম্ভব নয়। যেমন ইসরাঈলে যোগ্য লোক না থাকায় আল্লাহ পাক জর্ডান থেকে ইলিয়াসকে পাঠান তাদের হেদায়াতের জন্য।

না। কেননা এগুলি ঐতিহাসিক বর্ণনা। যাতে ভুল তথ্য থাকতে পারে। কেবল কুরআনী বর্ণনাটুকুই আমাদের নিকট নিশ্চিতভাবে গ্রহণীয়। -লেখক।

Contents

২০. হযরত আল-ইয়াসা‘ *(আলাইহিস সালাম)*

পবিত্র কুরআনে এই নবী সম্পর্কে সূরা আন‘আম ৮৬ ও সূরা ছোয়াদ ৪৮ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে অন্য নবীগণের নামের সাথে। সূরা আন‘আম ৮৩ হ’তে ৮৬ আয়াত পর্যন্ত ইলিয়াস ও আল-ইয়াসা‘ সহ ১৭ জন নবীর নামের শেষদিকে বলা হয়েছে-

وَإِسْمَاعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوْطاً وَكُلاًّ فضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِيْنَ- (الأنعام ٨٦)-

‘ইসমাঈল, আল-ইয়াসা‘, ইউনুস, লূত্ব তাদের প্রত্যেককেই আমরা বিশ্বের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি’ *(আন‘আম ৬/৮৬)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ- (ص ٤٨)- ‘আর তুমি বর্ণনা কর ইসমাঈল, আল-ইয়াসা‘ ও যুল-কিফলের কথা। তারা সকলেই ছিল শ্রেষ্ঠগণের অন্তর্ভুক্ত’ *(ছোয়াদ ৩৮/৪৮)*। উক্ত বর্ণনায় বুঝা যায় যে, আল-ইয়াসা‘ (আঃ) নিঃসন্দেহে একজন উঁচুদরের নবী ছিলেন।

তিনি ইফরাঈম বিন ইউসুফ বিন ইয়াকূব-এর বংশধর ছিলেন। তিনি ইলিয়াস (আঃ)-এর চাচাতো ভাই এবং তাঁর নায়েব বা প্রতিনিধি ছিলেন। হযরত ইলিয়াস (আঃ) সুলায়মান (আঃ) পরবর্তী পথভ্রষ্ট বনু ইস্রাঈলগণের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁর পরে আল-ইয়াসা‘ নবী হন এবং তিনি ইলিয়াস (আঃ)-এর শরী‘আত অনুযায়ী[৮৭] ফিলিস্তীন অঞ্চলে জনগণকে পরিচালিত করেন ও তাওহীদের দাওয়াত অব্যাহত রাখেন। বাইবেলে তাঁর বিস্তারিত অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। সেখানে তাঁর নাম ‘ইলিশা ইবনে সাকিত’ বলে উল্লেখিত হয়েছে।[৮৮]

---

৮৭. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ২/৪ পৃঃ।*
৮৮. *তাফসীর মা‘আরেফুল কুরআন পৃঃ ১১৭০।*

২১. হযরত যুল-কিফ্ল *(আলাইহিস সালাম)*

পবিত্র কুরআনে কেবল সূরা আম্বিয়া ৮৫-৮৬ ও ছোয়াদ ৪৮ আয়াতে যুল-কিফলের নাম এসেছে। তিনি আল-ইয়াসা'-এর পরে নবী হন এবং ফিলিস্তীন অঞ্চলে বনু ইস্রাঈলগণের মধ্যে তাওহীদের দাওয়াত দেন।

আল্লাহ বলেন,

وَإِسْمَاعِيْلَ وَإِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِيْنَ- وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِيْ رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِيْنَ- (الأنبياء ٨٥-٨٦)-

'আর তুমি স্মরণ কর ইসমাঈল, ইদরীস ও যুল-কিফলের কথা। তারা প্রত্যেকেই ছিল ছবরকারী'। 'আমরা তাদেরকে আমাদের রহমতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। তারা ছিল সৎকর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত' *(আম্বিয়া ২১/৮৫-৮৬)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ- (ص ٤٨)- 'আর তুমি বর্ণনা কর ইসমাঈল, আল-ইয়াসা' ও যুল-কিফলের কথা। তারা সকলেই ছিল শ্রেষ্ঠগণের অন্তর্ভুক্ত' *(ছোয়াদ ৩৮/৪৮)*।

ইবনু কাছীর বলেন, শ্রেষ্ঠ নবীগণের সাথে একত্রে বর্ণিত হওয়ায় প্রতীয়মান হয় যে, যুল-কিফল একজন উঁচুদরের নবী ছিলেন'। সুলায়মান পরবর্তী নবী হিসাবে তিনিও শাম অঞ্চলে প্রেরিত হন বলে নিশ্চিত ধারণা হয়।

ইবনু জারীর তাবেঈ বিদ্বান মুজাহিদ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, পূর্বতন নবী আল-ইয়াসা' বার্ধক্যে উপনীত হ'লে একজনকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি তার সকল সাথীকে একত্রিত করে বললেন, যার মধ্যে তিনটি গুণ বিদ্যমান থাকবে, তাকেই আমি আমার খলীফা নিযুক্ত করব। গুণ তিনটি এই যে, তিনি হবেন (১) সর্বদা ছিয়াম পালনকারী (২) আল্লাহ্র ইবাদতে রাত্রি জাগরণকারী এবং (৩) তিনি কোন অবস্থায় রাগান্বিত হন না।

এ ঘোষণা শোনার পর সমাবেশ স্থল থেকে ঈছ বিন ইসহাক্ব বংশের জনৈক ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালেন। সে নবীর প্রতিটি প্রশ্নের জওয়াবে হাঁ বললেন। কিন্তু তিনি সম্ভবতঃ তাকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। তাই দ্বিতীয় দিন আবার সমাবেশ আহ্বান করলেন এবং সকলের সম্মুখে পূর্বোক্ত ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করলেন। কিন্তু সবাই চুপ রইল, কেবল ঐ একজন ব্যক্তিই উঠে দাঁড়ালেন। তখন আল-ইয়াসা‘ (আঃ) উক্ত ব্যক্তিকেই তাঁর খলীফা নিযুক্ত করলেন, যিনি তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর নবুঅতী মিশন চালিয়ে নিবেন এবং মৃত্যুর পরেও তা অব্যাহত রাখবেন। বলা বাহুল্য, উক্ত ব্যক্তিই হ’লেন ‘যুল-কিফল’ (দায়িত্ব বহনকারী), পরবর্তীতে আল্লাহ যাকে নবুঅত দানে ধন্য করেন *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*।

যুল-কিফলের জীবনে পরীক্ষা :

‘যুল-কিফল’ উক্ত মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হয়েছেন দেখে ইবলীস হিংসায় জ্বলে উঠল। সে তার বাহিনীকে বলল, যেকোন মূল্যে তার পদস্খলন ঘটাতেই হবে। কিন্তু সাঙ্গ-পাঙ্গরা বলল, আমরা ইতিপূর্বে বহুবার তাকে ধোঁকা দিতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছি। অতএব আমাদের পক্ষে একাজ সম্ভব নয়। তখন ইবলীস স্বয়ং এ দায়িত্ব নিল।

যুল-কিফল সারা রাত্রি ছালাতের মধ্যে অতিবাহিত করার কারণে কেবলমাত্র দুপুরে কিছুক্ষণ নিদ্রা যেতেন। ইবলীস তাকে রাগানোর জন্য ঐ সময়টাকেই বেছে নিল। একদিন সে ঠিক দুপুরে তার নিদ্রার সময় এসে দরজার কড়া নাড়লো। কাঁচা ঘুম থেকে উঠে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে? উত্তর এল, আমি একজন বৃদ্ধ মযলূম। তিনি দরজা খুলে দিলে সে ভিতরে এসে বসলো এবং তার উপরে যুলুমের দীর্ঘ ফিরিস্তি বর্ণনা শুরু করল। এভাবে দুপুরে নিদ্রার সময়টা পার করে দিল। যুল-কিফল তাকে বললেন, আমি যখন বাইরে যাব, তখন এসো। আমি তোমার উপরে যুলুমের বিচার করে দেব’।

যুল-কিফল বাইরে এলেন এবং আদালত কক্ষে বসে লোকটির জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু সে এলো না। পরের দিন সকালেও তিনি তার জন্য অপেক্ষা করলেন, কিন্তু সে এলো না। কিন্তু দুপুরে যখন তিনি কেবল নিদ্রা গেছেন, ঠিক তখনই এসে কড়া নাড়ল। তিনি উঠে দরজা খুলে দিয়ে তাকে বললেন, আমি কি তোমাকে বলিনি যে, আদালত কক্ষে মজলিস বসার পর

Contents

এসো। কিন্তু তুমি কালও আসনি, আজও সকালে আসলে না। তখন লোকটি ইনিয়ে-বিনিয়ে চোখের পানি ফেলে বিরাট কৈফিয়তের এক দীর্ঘ ফিরিস্তি পেশ করল। সে বলল, হুযুর! আমার বিবাদী খুবই ধূর্ত প্রকৃতির লোক। আপনাকে আদালতে বসতে দেখলেই সে আমার প্রাপ্য পরিশোধ করবে বলে কথা দেয়। কিন্তু আপনি চলে গেলেই সে তা প্রত্যাহার করে নেয়'। এইসব কথাবার্তার মধ্যে ঐদিন দুপুরের ঘুম মাটি হ'ল।

তৃতীয় দিন দুপুরে তিনি ঢুলতে ঢুলতে পরিবারের সবাইকে বললেন, আমি ঘুমিয়ে গেলে কেউ যেন দরজার কড়া না নাড়ে। বৃদ্ধ এদিন এলো এবং কড়া নাড়তে চাইল। কিন্তু বাড়ীর লোকেরা তাকে বাধা দিল। তখন সে সবার অলক্ষ্যে জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল এবং দরজায় ধাক্কা-ধাক্কি শুরু করল। এতে যুল-কিফলের ঘুম ভেঙ্গে গেল। দেখলেন সেই বৃদ্ধ ঘরের মধ্যে অথচ ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। তিনি বুঝে ফেললেন যে, এটা শয়তান ছাড়া কেউ নয়। তখন তিনি বললেন, তুমি তাহ'লে আল্লাহ্র দুশমন ইবলীস? সে মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ। আমি আজ আপনার কাছে ব্যর্থ হ'লাম। আপনাকে রাগানোর জন্যই গত তিনদিন যাবত আপনাকে ঘুমানোর সময় এসে জ্বালাতন করছি। কিন্তু আপনি রাগান্বিত হলেন না। ফলে আপনাকে আমার জালে আটকাতে পারলাম না। ইতিপূর্বে আমার শিষ্যরা বারবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। আজ আমি ব্যর্থ হ'লাম। আমি চেয়েছিলাম, যাতে আল-ইয়াসা' নবীর সাথে আপনার কৃত ওয়াদা ভঙ্গ হয়। আর সে উদ্দেশ্যেই আমি এতসব কাণ্ড ঘটিয়েছি। কিন্তু অবশেষে আপনিই বিজয়ী হলেন'।

উক্ত ঘটনার কারণেই তাঁকে 'যুল-কিফল' (ذو الكفــل)। উপাধি দেওয়া হয়। যার অর্থ, দায়িত্ব পূর্ণকারী ব্যক্তি।[৮৯]

শিক্ষণীয় বিষয় :

(১) নবীদের প্রতিনিধি হওয়ার জন্য রক্ত, বর্ণ ও গোত্রীয় মর্যাদা শর্ত নয়। বরং মৌলিক শর্ত হ'ল- তাক্বওয়া ও আনুগত্যশীলতা।

(২) শয়তান বিশেষ করে পরহেযগার মুমিনের প্রকাশ্য দুশমন। কিন্তু ঈমানী দৃঢ়তার কাছে সে পরাজিত হয়।

---

৮৯. *তাফসীর কুরতুবী ও ইবনু কাছীর, সূরা আম্বিয়া ৮৫-৮৬ গৃহীত: ইবনু জারীর; হাদীছ মুরসাল; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/২১০-১১ পৃঃ।*

(৩) ধৈর্যগুণ হ’ল সফলতার মাপকাঠি। তাক্বওয়া ও ছবর একত্রিত হ’লে মুমিন সর্বদা বিজয়ী থাকে।

(৪) শুধু নিজস্ব ইবাদতই যথেষ্ট নয়। বরং জনগণের খেদমতে সময় ব্যয় করাই হল প্রকৃত মুমিনের কর্তব্য।

(৫) শয়তানের শয়তানী ধরে ফেলাটা মুমিনের সুক্ষ্মদর্শিতার অন্যতম লক্ষণ। অতএব কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কোন চিন্তা ও পরামর্শ সম্মুখে উপস্থিত হ’লেই বুঝে নিতে হবে যে, এটি শয়তানী ধোঁকা মাত্র।

সংশয় নিরসন :

যুল-কিফল একজন নবী ও একজন সৎকর্মশীল ব্যক্তি ছিলেন। পবিত্র কুরআনে তাঁকে নবীদের সাথেই দু’স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন,

(১) সূরা আম্বিয়া ৮৫-৮৬ আয়াতে বলা হয়েছে,

وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُم مِّنَ الصَّالِحِينَ- (الأنبياء ٨٥-٨٦)-

‘আর ইসমাঈল, ইদরীস ও যুল-কিফল, সকলেই ছিল ধৈর্যশীলগণের অন্তর্ভুক্ত’। ‘আর আমরা তাদেরকে আমাদের অনুগ্রহের মধ্যে প্রবেশ করিয়েছিলাম। নিশ্চয়ই তারা ছিল সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত’ *(আম্বিয়া ২১/৮৫-৮৬)*।

(ক) উক্ত আয়াত দ্বয়ের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو نبي- ‘পূর্বাপর সম্পর্কে এটা স্পষ্ট যে, নবীগণের তালিকায় নবী ব্যতীত অন্যদের নাম যুক্ত হয় না। তবে অন্যেরা কেউ বলেছেন, তিনি একজন সৎকর্মশীল ব্যক্তি ছিলেন, কেউ বলেছেন, তিনি একজন ন্যায়পরায়ন শাসক ছিলেন। ইবনু জারীর এ ব্যাপারে চুপ থেকেছেন’।

(খ) কুরতুবী এখানে যুল-কিফল সম্পর্কিত আবু ঈসা তিরমিযী (২০৯-২৭৯ হিঃ) এবং হাকীম তিরমিযী (মৃঃ ৩৬০হিঃ) বর্ণিত দু’টি যঈফ হাদীছ উল্লেখ করে ক্ষান্ত হয়েছেন। জামে‘ তিরমিযী (হা/২৪৯৬)-তে এসেছে আল-কিফল (الكفل) এবং হাকীম তিরমিযী-র কিতাব *‘নাওয়াদিরুল উছূল’*-য়ে এসেছে

'যুল-কিফল' (ذو الكفل)। দু'টিই ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে যঈফ সুত্রে বর্ণিত হয়েছে *(তাহকীক কুরতুবী হা/৪৩৫২-৫৩)।* ইবনু কাছীর বলেন, তিরমিযীর হাদীছটি 'হাসান' বলা হ'লেও সেখানে 'আল-কিফল' বলা হয়েছে, যিনি কুরআনে বর্ণিত নবী 'যুল-কিফল' নন। বরং অন্য ব্যক্তি' *(ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা আম্বিয়া ৮৫; আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ হা/৪০৮৩)।*

(গ) সম্ভবতঃ ইবনু ওমর (রাঃ) বর্ণিত উপরোক্ত যঈফ হাদীছের উপরে ভিত্তি করেই ইমাম শাওকানী মন্তব্য করেছেন, الصحيح أنه رجل من بني إسرائيل، كان لا يتورع عن شيئ من المعاصي فتاب فغفر الله له، ليس نبي، وقال جماعة هو نبي- 'সঠিক কথা এই যে, তিনি বনু ইস্রাঈলের একজন ব্যক্তি ছিলেন। যিনি কোন পাপের কাজে দ্বিধা করতেন না। পরে তিনি তওবা করেন। অতঃপর আল্লাহ তাকে মাফ করেন। তিনি নবী নন। তবে একদল বলেছেন যে, তিনি নবী' *(ফাৎহুল ক্বাদীর, তাফসীর সূরা আম্বিয়া ৮৫)।*

(ঘ) কুরতুবী আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) প্রমুখাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে আরেকটি হাদীছ এনেছেন যে, إن ذا الكفل لم يكن نبيًا ولكنه عبدا صالحًا 'নিশ্চয়ই যুল-কিফল নবী ছিলেন না। বরং তিনি একজন সৎকর্মশীল বান্দা ছিলেন'। অথচ ইবনু জারীর বর্ণিত উক্ত হাদীছটির অবস্থা এই যে, لا أصل له في المرفوع بل موقوف ضعيف أخرجه الطبري وهو منقطع- 'এর মরফূ' হওয়ার অর্থাৎ রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণিত হওয়ার কোন ভিত্তি নেই। বরং এটি মওকূফ, অর্থাৎ আবু মূসার নিজস্ব উক্তি। অথচ যার সূত্র যঈফ এবং যা ইবনু জারীর স্বীয় তাফসীরে মুনক্বাতি' অর্থাৎ ছিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন *(তাহকীক কুরতুবী, আম্বিয়া ৮৫)।*

(২) সূরা ছোয়াদ ৪৮ আয়াতে বলা হয়েছে, وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ 'আর তুমি বর্ণনা কর ইসমাঈল, আল-ইয়াসা' ও যুল-কিফল সম্পর্কে। আর তারা সকলেই ছিল শ্রেষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত' *(ছোয়াদ ৩৮/৪৮)।*

(ক) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় কুরতুবী বলেন, أي ممن أختير للنبوة অর্থাৎ তারা ছিলেন সেই সকল ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত, যাদেরকে নবুঅতের জন্য মনোনীত করা হয়েছিল' *(কুরতুবী, তাফসীর সূরা ছোয়াদ ৪৮)।*

(খ) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় শাওকানী স্বীয় তাফসীরে বলেন, أهم من جملة من صبر من الأنبياء وتحملوا الشدائد في دين الله– ‘তারা হ’লেন সেই সকল নবীগণের অন্তর্ভুক্ত যারা আল্লাহ্র পথে বহু কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করেছেন’ অত:পর وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ -এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, الذين اختارهم الله لنبوّته واصطفاهم من خلقه ‘যাদেরকে আল্লাহ স্বীয় নবুঅতের জন্য মনোনীত করেছেন এবং সৃষ্টিকুলের মধ্য হ’তে বাছাই করে নিয়েছেন’। অত:পর এর কারণ হিসাবে তিনি বলেন, أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يذكرهم؛ ليسلك مسلكهم في الصبر– ‘আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে নির্দেশ দিচ্ছেন, যেন তিনি ঐ সকল নবীদের কথা স্মরণ করেন, যাতে আল্লাহ্র পথে ধৈর্য ধারণের ব্যাপারে তিনি তাদের অনুসৃত পথে চলতে পারেন।’

অথচ ইতিপূর্বে সূরা আম্বিয়া ৮৫ আয়াতের তাফসীরে তিনি যুল-কিফলকে নবী বলেননি।

(গ) আশ্চর্যের বিষয় যে, আধুনিক মুফাসসির আবুবকর জাবের আল-জাযায়েরী স্বীয় *‘আয়সারুত তাফাসীরে’* সূরা আম্বিয়া ৮৫ আয়াতের তাফসীরের টীকায় লিখেছেন, وأرجح الأقوال ما رواه أبو موسى رضي الله عنه عن النبي صـــ أنه قال: ‘সব কথার সেরা কথা হ’ল যা বর্ণনা করেছেন আবূ মূসা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হতে’- বলেই তিনি পূর্বে বর্ণিত যঈফ হাদীছটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করেছেন, যা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে *(অর্থাৎ তিনি নবী ছিলেন না)।* অথচ সূরা ছোয়াদ ৪৮-এর আলোচনায় ৩০ হ’তে ৪৮ আয়াত পর্যন্ত বর্ণিত দাঊদ (আঃ) হ’তে যুল-কিফল পর্যন্ত সকলকে তিনি নবীগণের অন্তর্ভুক্ত বলে মন্তব্য করেছেন।

এক্ষণে আমাদের বক্তব্য হ’ল, কুরআন যখন ইসমাঈল, ইদরীস, আল-ইয়াসা‘ প্রমুখ নবীগণের সাথে যুল-কিফলের নাম একসাথে বর্ণনা করেছে, তখন তিনি যে ‘নবী’ ছিলেন, এ বিশ্বাসই রাখতে হবে। এর বিপরীতে কোন বিশুদ্ধ দলীল নেই। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

২২-২৩. হযরত যাকারিয়া ও ইয়াহ্ইয়া *(আলাইহিমাস সালাম)*

যাকারিয়া ও ইয়াহইয়া সুলায়মান পরবর্তী দুই নবী পরস্পরে পিতা-পুত্র ছিলেন এবং বায়তুল মুক্বাদ্দাসের অধিবাসী ছিলেন। ইয়াহইয়া ছিলেন পরবর্তী নবী ঈসা (আঃ)-এর আপন খালাতো ভাই এবং বয়সে ছয় মাসের বড়। তিনি ঈসার ছয় মাস পূর্বেই দাওয়াতের কাজ শুরু করেন।[৯০] হযরত যাকারিয়া ও ইয়াহ্ইয়া (আঃ) সম্পর্কে ৪টি সূরার ২২টি আয়াতে[৯১] বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে সূরা আন'আমে কেবল ১৮জন নবীর নামের তালিকায় তাঁদের নাম উল্লেখিত হয়েছে। বাকী অন্য সূরাগুলিতে খুবই সংক্ষেপে কেবল ইয়াহ্ইয়ার জন্ম বৃত্তান্ত সম্পর্কে বর্ণনা এসেছে।

যাকারিয়া (আঃ) সম্পর্কে কুরআনে কেবল এতটুকু বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি মারিয়ামের লালন-পালনকারী ছিলেন। এ বিষয়ে আল্লাহ সূরা আলে-ইমরানে যা বলেন, তার সার-সংক্ষেপ এই যে, ইমরানের স্ত্রী মানত করেছিলেন যে, আমার গর্ভের সন্তানকে আমি আল্লাহ্র জন্য উৎসর্গ করে দিলাম। তিনি ধারণা করেছিলেন যে, তাঁর একটি পুত্র সন্তান হবে এবং তাকে তিনি আল্লাহ্র ঘর বায়তুল মুক্বাদ্দাসের খিদমতে নিয়োগ করবেন। কিন্তু পুত্রের স্থলে কন্যা সন্তান অর্থাৎ মারিয়াম জন্মগ্রহণ করলে তিনি হতাশ হয়ে পড়েন। আল্লাহ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, لَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنْثَى 'এই কন্যার মত কোন পুত্রই নেই' *(আলে-ইমরান ৩/৩৬)*।

এক্ষণে যেহেতু মানত অনুযায়ী তাকে মসজিদের খেদমতে উৎসর্গ করতে হবে। কিন্তু সেখানে তার অভিভাবক কে হবে? সম্ভবতঃ ঐসময় মারিয়ামের পিতা জীবিত ছিলেন না। বংশের লোকেরা সবাই এই পবিত্র মেয়েটির অভিভাবক হ'তে চায়। ফলে অবশেষে লটারীর ব্যবস্থা হয়। সেখানে

---

৯০. *মানছূরপুরী, রহমাতুল লিল আলামীন ৩/১১০।*

৯১. *যথাক্রমে (১) সূরা আলে-ইমরান ৩/৩৭-৪১=৫; (২) আন'আম ৬/৮৫, (৩) মারিয়াম ১৯/২-১৫=১৪; এবং (৪) সূরা আম্বিয়া ২১/৮৯-৯০। মোট ২২টি ॥*

মারিয়ামের খালু এবং তৎকালীন নবী হযরত যাকারিয়া (আঃ)-এর নাম আসে। এ ঘটনাটিই আল্লাহপাক তাঁর শেষনবীকে শুনাচ্ছেন নিম্নোক্ত ভাষায়-

ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُون أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ- (آل عمران ٤٤)-

‘(মারিয়ামের বিষয়টি) হলো গায়েবী সংবাদ, যা আমরা আপনাকে প্রত্যাদেশ করছি। আপনি তো তাদের কাছে ছিলেন না, যখন তারা লটারীর মাধ্যমে প্রতিযোগিতা করছিল এ ব্যাপারে যে, কে মারিয়ামকে প্রতিপালন করবে? আর আপনি তাদের কাছে ছিলেন না, যখন তারা এ বিষয়ে ঝগড়া করছিল’ *(আলে ইমরান ৩/৪৪)*। ‘অতঃপর আল্লাহ তাকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে অর্পণ করলেন’ *(আলে ইমরান ৩/৩৭)*।

মারিয়াম মসজিদের সংলগ্ন মেহরাবে থাকতেন। যাকারিয়া (আঃ) তাকে নিয়মিত দেখাশুনা করতেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ছিল এই যে, যখনই তিনি মেহরাবে আসতেন, তখনই সেখানে নতুন নতুন তাজা ফল-ফলাদি ও খাদ্য-খাবার দেখতে পেতেন। তিনি একদিন এ বিষয়ে মারিয়ামকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, هُوَ مِنْ عِنــــدِ اللهِ ‘এসব আল্লাহ্র নিকট থেকে আসে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান করেন’ *(আলে ইমরান ৩/৩৭)*।

সন্তান লাভের জন্য যাকারিয়ার দো‘আ :

সম্ভবতঃ শিশু মারিয়ামের উপরোক্ত কথা থেকেই নিঃসন্তান বৃদ্ধ যাকারিয়ার মনের কোণে আশার সঞ্চার হয় এবং চিন্তা করেন যে, যিনি ফলের মৌসুম ছাড়াই মারিয়ামকে তাজা ফল সরবরাহ করেছেন, নিশ্চয়ই তিনি বৃদ্ধ দম্পতিকে সন্তান দান করবেন। অতঃপর তিনি বুকে সাহস বেঁধে আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করেন। যেমন আল্লাহ বলেন,

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءَ- (آل عمران ٣٨)-

‘সেখানেই যাকারিয়া তার পালনকর্তার নিকটে প্রার্থনা করল এবং বলল, হে আমার পালনকর্তা! তোমার নিকট থেকে আমাকে পূত-পবিত্র সন্তান দান কর। নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী’ *(আলে ইমরান ৩/৩৮)*। একথাটি অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে নিম্নোক্ত ভাবে-

كهيعص- ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا- إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا- قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا- وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا- يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا- (مريم ٢-٦)-

‘এটি আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহের বিবরণ তার বান্দা যাকারিয়ার প্রতি’*(মারিয়াম ২)*। ‘যখন সে তার পালনকর্তাকে আহ্বান করেছিল নিভৃতে’। ‘সে বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমার অস্থি দুর্বল হয়ে গেছে এবং বার্ধক্যের কারণে মস্তক শ্বেত-শুভ্র হয়ে গেছে। হে প্রভু! আপনাকে ডেকে আমি কখনো নিরাশ হইনি’। ‘আমি ভয় করি আমার পরবর্তী বংশধরের। অথচ আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। অতএব আপনি নিজের পক্ষ থেকে আমাকে একজন উত্তরাধিকারী দান করুন’। ‘সে আমার স্থলাভিষিক্ত হবে এবং উত্তরাধিকারী হবে ইয়াকূব-বংশের এবং হে প্রভু! আপনি তাকে করুন সদা-সন্তুষ্ট’ *(মারিয়াম ১৯/২-৬)*।

জবাবে আল্লাহ বললেন,

يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلاَمٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا- قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلاَمٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِراً وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا- قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا- قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَ لَيَالٍ سَوِيًّا- فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا- (مريم ٧-١١)-

‘হে যাকারিয়া! আমি তোমাকে একটি পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি। তার নাম হবে ইয়াহইয়া। ইতিপূর্বে এই নামে আমি কারু নামকরণ করিনি’। ‘সে বলল, হে আমার পালনকর্তা! কেমন করে পুত্র সন্তান হবে? অথচ আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। আর আমিও বার্ধক্যের শেষপ্রান্তে উপনীত’। ‘তিনি বললেন, এভাবেই হবে। তোমার প্রভু বলে দিয়েছেন যে, এটা আমার জন্য খুবই সহজ। আমি তো ইতিপূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি, যখন তুমি কিছুই ছিলে না’। ‘সে বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে একটি নিদর্শন প্রদান করুন। তিনি বললেন, তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি (সুস্থ অবস্থায়) একটানা তিন দিন লোকজনের সাথে কথাবার্তা বলতে পারবে না’। ‘অতঃপর সে কক্ষ থেকে বের হয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে এল এবং ইঙ্গিতে তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহকে স্মরণ করতে বলল’ *(মারিয়াম ১৯/৭-১১)*।

ইয়াহইয়ার বৈশিষ্ট্য :

আল্লাহ বলেন,

فَنَادَتْهُ الْمَلآئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَـــى مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللهِ وَسَيِّداً وَحَصُوْراً وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِيْنَ- (آل عمران ٣٩)-

‘অতঃপর যখন সে কামরায় ছালাতরত অবস্থায় দাঁড়িয়েছিল, তখন ফেরেশতারা তাকে ডেকে বলল, যে, আল্লাহ আপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন ইয়াহইয়া সম্পর্কে। (১) যিনি সাক্ষ্য দিবেন আল্লাহ্র নির্দেশের সত্যতা সম্পর্কে। (২) যিনি নেতা হবেন এবং (৩) যিনি নারীসঙ্গ মুক্ত হবেন ও (৪) সৎকর্মশীল নবী হবেন’ *(আলে ইমরান ৩/৩৯)*। অতঃপর আল্লাহ্র নির্দেশ মতে যাকারিয়া তিনদিন যাবৎ লোকদের সাথে কথা বন্ধ রাখলেন ইশারা-ইঙ্গিত ব্যতীত এবং সকালে সন্ধ্যায় আল্লাহ্র ইবাদতে রত থাকলেন ও তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে লাগলেন *(আলে ইমরান ৩/৪০-৪১)*। যাকারিয়ার প্রার্থনা অন্যত্র এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে,

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لاَ تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ- فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوْا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَّرَهَباً وَّكَانُوْا لَنَا خَاشِعِينَ- (الأنبياء ٨٩-٩٠)-

‘এবং যাকারিয়ার কথা স্মরণ কর, যখন সে তার প্রভুকে আহ্বান করেছিল, হে আমার পালনকর্তা! তুমি ‘আমাকে (উত্তরাধিকারীহীন) একা ছেড়ো না! তুমি তো (ইলম ও নবুঅতের) সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী’। ‘অতঃপর আমরা তার দো‘আ কবুল করেছিলাম। তাকে দান করেছিলাম ইয়াহইয়া এবং তার জন্য তার স্ত্রীকে করেছিলাম যোগ্যতাসম্পন্ন। তারা সর্বদা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করত। তারা আশা ও ভীতি সহকারে আমাকে ডাকত এবং তারা ছিল আমার প্রতি বিনীত’ *(আম্বিয়া ২১/৮৯-৯০)*।

অতঃপর ইয়াহইয়া সম্পর্কে আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا- وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا- وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّاراً عَصِيًّا- وَسَلاَمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا- (مريم ١٢-١٥)-

‘হে ইয়াহ্ইয়া! দৃঢ়তার সাথে এই গ্রন্থ (তাওরাত) ধারণ কর। আর আমরা তাকে (৫) শৈশবেই প্রজ্ঞা দান করেছিলাম’*(মারিয়াম ১২)*। ‘এবং নিজের পক্ষ থেকে তাকে (৬) বিশেষভাবে দান করেছিলাম কোমলতা ও (৭) পবিত্রতা এবং সে ছিল (৮) অতীব তাক্বওয়াশীল’*(১৩)*। ‘সে ছিল (৯) পিতা-মাতার অনুগত এবং (১০) সে উদ্ধত ও অবাধ্য ছিল না’*(১৪)*। ‘তার উপরে শান্তি, যেদিন সে জন্মগ্রহণ করেছে, যেদিন সে মৃত্যুবরণ করেছে এবং যেদিন সে জীবিতাবস্থায় পুনরুত্থিত হবে’ *(মারিয়াম ১৯/১২-১৫)*।

উপরে বর্ণিত আলে-ইমরান ৩৯ ও মারিয়াম ১২-১৫ আয়াতে ইয়াহইয়া (আঃ)-কে প্রদত্ত মোট ১০ টি বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত হয়।

উপরোক্ত বর্ণনা সমূহ থেকে যাকারিয়া ও ইয়াহইয়া সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি প্রতিভাত হয়। যেমন-

(১) যাকারিয়া ও ইয়াহইয়া বায়তুল মুক্বাদ্দাসের সন্নিকটে বসবাস করেন এবং তাঁরা বনু ইস্রাঈল বংশের নবী ছিলেন।

(২) যাকারিয়া (আঃ) বিবি মারিয়ামের অভিভাবক ও লালন-পালনকারী ছিলেন।

(৩) যাকারিয়া অতি বৃদ্ধ বয়সে বন্ধ্যা স্ত্রীর গর্ভ হ’তে একমাত্র পুত্র সন্তান লাভ করেন এবং আল্লাহ স্বয়ং তার নাম রাখেন ইয়াহইয়া, যে নাম ইতিপূর্বে কারু জন্য রাখা হয়নি।

(৪) ইয়াহইয়া নবী হন। তিনি শৈশব থেকেই প্রজ্ঞাসম্পন্ন, কোমল হৃদয় ও পবিত্র ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি চিরকুমার ছিলেন। তিনি পিতা-মাতার অতীব অনুগত এবং আল্লাহভীরু ছিলেন।

(৫) মারিয়াম ছিলেন ইয়াহইয়ার খালাতো বোন এবং ইয়াহইয়ার পরেই মারিয়াম পুত্র ঈসা (আঃ) নবী এবং রাসূল হন। তারপর থেকে শেষনবীর আবির্ভাব পর্যন্ত প্রায় ছয়শো বছর নবী আগমনের সিলসিলা বন্ধ থাকে। যাকে فترة الرسل বা ‘রাসূল আগমনের বিরতিকাল’ বলা হয়।

(৬) যাকারিয়া (আঃ)-এর শরী‘আতে ছিয়াম অবস্থায় সর্বদা মৌন থাকা এবং ইশারা-ইঙ্গিত ব্যতীত কারু সাথে কথা না বলার বিধান ছিল। ইসলামী শরী‘আতে এটা রহিত হয়েছে এবং বলা হয়েছে, لاَيُتْمَ بعد احتلامٍ ولا صُمَاتَ يومٍ الى الليل ‘অর্থাৎ সন্তান বালেগ হওয়ার পরে পিতৃহারা হ’লে তাকে ইয়াতীম বলা যাবে না এবং রাত্রি পর্যন্ত সারা দিন মৌনতা অবলম্বন করা কোন ইবাদত নয়’।[৯২]

উল্লেখ্য যে, ইহুদীদের চরিত্র পরে এতই কলুষিত ও উদ্ধত হয় যে, তারা যাকারিয়া ও ইয়াহইয়ার ন্যায় মহান পয়গম্বরগণকে হত্যা করে এবং হযরত ঈসাকেও হত্যা করতে উদ্যত হয়। কিন্তু আল্লাহ তাকে জীবিত আসমানে উঠিয়ে নেন।[৯৩]

ইয়াহ্ইয়া ও যাকারিয়ার মৃত্যু :

যাকারিয়ার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল, না তাকে হত্যা করা হয়েছিল, এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। জনৈকা নষ্টা মহিলার প্ররোচনায় শাম দেশের বাদশাহ নবী ইয়াহইয়াকে হত্যা করলে ঐ রাতেই বাদশাহ সপরিবারে নিজ প্রাসাদসহ ভূমিধ্বসের গযবে ধ্বংস হয়ে যান। এতে লোকেরা হযরত যাকারিয়াকেই

---

৯২ . *আবুদাঊদ হা/২৮৭৩ ‘অছিয়ত সমূহ’ অধ্যায় ৯ অনুচ্ছেদ।*

৯৩. *ইবনু কাছীর, আল-বিদাহ ওয়ান নিহায়াহ ২/৪৭-৫০; রহমাতুল লিল আলামীন ৩/১১০-১১।*

দায়ী করে ও তাকে হত্যা করার জন্য ধাওয়া করে। তখন একটি গাছ ফাঁক হয়ে তাঁকে আশ্রয় দেয়। পরে শয়তানের প্ররোচনায় লোকেরা ঐ গাছটি করাতে চিরে দু'ভাগ করে ফেলে এবং এভাবেই যাকারিয়া নিহত হন বলে যাকারিয়া (আঃ) নিজেই মে'রাজ রজনীতে শেষনবী (ছাঃ)-এর সাথে বর্ণনা করেছেন বলে ইবনু আব্বাস-এর নামে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, সে সম্পর্কে হাফেয ইবনু কাছীর বলেন, هذا سياق غريب جدا وحديث عجيب ورفعه منكر– 'এটি বিস্ময়করভাবে পূর্বাপর সম্পর্কহীন ও আশ্চর্যজনক হাদীছ এবং এটি রাসূল থেকে বর্ণিত হওয়াটা একেবারেই অমূলক।[৯৪] ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ বলেন, গাছের ফাটলে আশ্রয় গ্রহণকারী ব্যক্তি ছিলেন শা'ইয়া (شعيا)। আর যাকারিয়া স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করেন।[৯৫] মানছূরপুরী বাইবেলের বর্ণনার আলোকে বলেন, ইয়াহ্ইয়াকে প্রথমে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু বাদশাহ্র প্রেমিকা ঐ নষ্টা মহিলা তার মাথা দাবী করায় জেলখানায় তাকে হত্যা করে তার ছিন্ন মস্তক ও রক্ত এনে ঐ মহিলাকে উপহার দেওয়া হয়।[৯৬]

অতএব উক্ত দুই নবীর মৃত্যুর সঠিক ঘটনার বিষয়ে আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

---

৯৪. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ২/৫০।*
৯৫. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ২/৪৮।*
৯৬. *রহমাতুল লিল আলামীন ৩/১১১ পৃঃ।*

২৪. হযরত ঈসা *(আলাইহিস সালাম)*

হযরত ঈসা (আঃ) ছিলেন বনু ইস্রাঈল বংশের সর্বশেষ নবী ও কিতাবধারী রাসূল। তিনি ‘ইনজীল’ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাঁরপর থেকে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আবির্ভাব পর্যন্ত আর কোন নবী আগমন করেননি। এই সময়টাকে فترة الرسل বা ‘রাসূল আগমনের বিরতিকাল’ বলা হয়। ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার অব্যবহিত কাল পূর্বে হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ্র হুকুমে পুনরায় পৃথিবীতে অবতরণ করবেন এবং মুহাম্মাদী শরী‘আত অনুসরণে ইমাম মাহদীর নেতৃত্বে সারা পৃথিবীতে শান্তির রাজ্য কায়েম করবেন। তিনি উম্মতে মুহাম্মাদীর সাথে বিশ্ব সংস্কারে ব্রতী হবেন। তাই তাঁর সম্পর্কে সঠিক ও বিস্তৃত ধারণা দেওয়া অত্যন্ত যরূরী বিবেচনা করে আল্লাহ্ পাক শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, মূসা (আঃ)-এর অনুসারী হওয়ার দাবীদার ইহুদীরা তাঁকে নবী বলেই স্বীকার করেনি। অত্যন্ত লজ্জাষ্করভাবে তারা তাঁকে জনৈক ইউসুফ মিস্ত্রীর জারজ সন্তান বলে আখ্যায়িত করেছে (নাঊযুবিল্লাহ)। অন্যদিকে ঈসা (আঃ)-এর ভক্ত ও অনুসারী হবার দাবীদার খৃষ্টানরা বাড়াবাড়ি করে তাঁকে ‘আল্লাহ্র পুত্র’ *(তওবাহ ৯/৩০)* বানিয়েছে’। বরং ত্রিত্ববাদী খৃষ্টানরা তাঁকে সরাসরি ‘আল্লাহ’ সাব্যস্ত করেছে এবং বলেছে যে, তিনি হ’লেন তিন আল্লাহ্র একজন (ثَالِثُ ثَلَٰثَةٍ =*মায়েদাহ ৭৩*)। অর্থাৎ ঈসা, মারিয়াম ও আল্লাহ প্রত্যেকেই আল্লাহ এবং তারা এটাকে ‘বুদ্ধি বহির্ভূত সত্য’ বলে ক্ষান্ত হয়। অথচ এরূপ ধারণা পোষণকারীদের আল্লাহ দ্ব্যর্থহীনভাবে ‘কাফের’ বলে ঘোষণা করেছেন *(মায়েদাহ ৫/৭২-৭৩)*। কুরআন তাঁর সম্পর্কে সঠিক তথ্য উপস্থাপন করেছে। আমরা এখন সেদিকে মনোনিবেশ করব।

উল্লেখ্য যে, হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের মোট ১৫টি সূরায় ৯৮টি আয়াতে[৯৭] বর্ণিত হয়েছে।

---

৯৭. *যথাক্রমে (১) বাক্বারাহ ২/৮৭, ১৩৬, ২৫৩; (২) আলে-ইমরান ৩/৩৫-৬৩=২৯ ,৮৪; (৩) নিসা ৪/১৫৬-১৫৮=৩, ১৬৩, ১৭১-১৭২; (৪) মায়েদাহ ৫/১৭, ৪৬-৪৭, ৭২-৭৫=৪, ৭৮, ১১০-১১৮=৯; (৫) আন‘আম ৬/৮৫; (৬) তওবা ৯/৩০-৩১; (৭) মারিয়াম ১৯/১৬-৪০=২৫; (৮) আম্বিয়া ২১/৯১; (৯) মুমিনূন ২৩/৫০; (১০) আহযাব ৩২/৭; (১১) শূরা ৪২/১৩; (১২) যুখরুফ ৪৩/৫৭-৫৯=৩, ৬৩-৬৫=৩; (১৩) হাদীদ ৫৭/২৭; (১৪) ছফ ৬১/৬, ১৪; (১৫) তাহরীম ৬৬/১২। সর্বমোট = ৯৮টি ॥*

ঈসার মা ও নানী :

ঈসা (আঃ)-এর আলোচনা করতে গেলে তাঁর মা ও নানীর আলোচনা আগেই করে নিতে হয়। কারণ তাঁদের ঘটনাবলীর সাথে ঈসার জীবনের গভীর যোগসূত্র রয়েছে। পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের শরী'আতে প্রচলিত ইবাদত-পদ্ধতির মধ্যে আল্লাহ্র নামে সন্তান উৎসর্গ করার রেওয়াজও চালু ছিল। এসব উৎসর্গীত সন্তানদের পার্থিব কোন কাজকর্মে নিযুক্ত করা হ'ত না। এ পদ্ধতি অনুযায়ী ঈসার নানী অর্থাৎ ইমরানের স্ত্রী নিজের গর্ভস্থ সন্তান সম্পর্কে মানত করলেন যে, তাকে বিশেষভাবে আল্লাহ্র ঘর বায়তুল মুক্বাদ্দাসের খিদমতে নিয়োজিত করা হবে। তিনি ভেবেছিলেন যে পুত্র সন্তান হবে। কিন্তু যখন তিনি কন্যা সন্তান প্রসব করলেন, তখন আক্ষেপ করে বললেন, 'হে আল্লাহ! আমি কন্যা প্রসব করেছি'? *(আলে ইমরান ৩৬)*। অর্থাৎ একে দিয়ে তো আমার মানত পূর্ণ হবে না। কিন্তু আল্লাহ্র ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ। তিনি উক্ত কন্যাকেই কবুল করে নেন। বস্তুতঃ ইনিই ছিলেন মারিয়াম বিনতে ইমরান, যিনি ঈসা (আঃ)-এর কুমারী মাতা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যাকে জান্নাতের শ্রেষ্ঠ চারজন মহিলার অন্যতম হিসাবে বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি বলেন,

أفضلُ نساءِ أهلِ الجنةِ خديجةُ بنتِ خُوَيْلدٍ وفاطمةُ بنتِ محمدٍ ومـــريمُ بنـــتِ عمرانَ وآسيةُ بنتِ مُزَاحِمَ امرأةُ فرعونَ، رواه أحمد والطبراني والحاكم عـــن ابن عباس رضـــ

'জান্নাতবাসী মহিলাগণের মধ্যে সেরা হ'লেন চারজন: খাদীজা বিনতে খুওয়ালিদ, ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদ, মারিয়াম বিনতে ইমরান এবং আসিয়া বিনতে মুযাহিম, যিনি ফেরাঊনের স্ত্রী'।[৯৮]

মারিয়ামের জন্ম ও লালন-পালন :

মারিয়ামের জন্ম ও লালন-পালন সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِيْ بَطْنِيْ مُحَرَّراً فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ- فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا

---

৯৮. *আহমাদ, ত্বাবারাণী, হাকেম, ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে; সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৫০৮।*

Contents

وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وِإِنِّي أُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ- فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتاً حَسَناً وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقاً قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَـــذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ- (آل عمران ٣٥-٣٧)-

‘যখন ইমরানের স্ত্রী বলল, হে আমার প্রভু! আমার গর্ভে যা রয়েছে তাকে আমি তোমার নামে উৎসর্গ করলাম সবার কাছ থেকে মুক্ত হিসাবে। অতএব আমার পক্ষ থেকে তুমি তাকে কবুল করে নাও। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ’ *(আলে ইমরান ৩৫)*। ‘অতঃপর সে যখন তাকে প্রসব করল, তখন বলল, হে প্রভু! আমি তো কন্যা সন্তান প্রসব করেছি! অথচ আল্লাহ ভাল করেই জানেন, সে কি প্রসব করেছে। (আল্লাহ সান্ত্বনা দিয়ে বললেন,) এই কন্যার মত কোন পুত্রই যে নেই। আর আমি তার নাম রাখলাম ‘মারিয়াম’। (মারিয়ামের মা দো‘আ করে বলল, হে আল্লাহ!) আমি তাকে ও তার সন্তানদেরকে তোমার আশ্রয়ে সমর্পণ করছি, অভিশপ্ত শয়তানের কবল হ’তে’ *(৩৬)*। আল্লাহ বলেন, ‘অতঃপর তার প্রভু তাকে উত্তমভাবে গ্রহণ করে নিলেন এবং তাকে প্রবৃদ্ধি দান করলেন সুন্দর প্রবৃদ্ধি। আর তিনি তাকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে সমর্পণ করলেন। (অতঃপর ঘটনা হ’ল এই যে,) যখনই যাকারিয়া মেহরাবের মধ্যে তার কাছে আসতেন, তখনই কিছু খাদ্য দেখতে পেতেন। তিনি জিজ্ঞেস করতেন, মারিয়াম! এসব কোথা থেকে তোমার কাছে এল? মারিয়াম বলত, ‘এসব আল্লাহ্র নিকট থেকে আসে। নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান করে থাকেন’ *(আলে ইমরান ৩/৩৫-৩৭)*।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্র নামে উৎসর্গীত সন্তান পালন করাকে তখনকার সময়ে খুবই পুণ্যের কাজ মনে করা হ’ত। আর সেকারণে মারিয়ামকে প্রতিপালনের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য রীতিমত প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। ফলে লটারীর ব্যবস্থা করা হয় এবং আল্লাহ্র ইচ্ছায় তাঁর বয়োবৃদ্ধ নবী হযরত যাকারিয়া (আঃ) মারিয়ামের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন *(আলে ইমরান ৩/৪৪)*।

ঈসার জন্ম ও লালন-পালন :

এভাবে মেহরাবে অবস্থান করে মারিয়াম বায়তুল মুক্বাদ্দাসের খিদমত করতে থাকেন। সম্মানিত নবী ও মারিয়ামের বয়োবৃদ্ধ খালু যাকারিয়া (আঃ) সর্বদা তাকে দেখাশুনা করতেন। মেহরাবের উত্তর-পূর্বদিকে সম্ভবতঃ খেজুর বাগান ও ঝর্ণাধারা ছিল। যেখানে মারিয়াম পর্দা টাঙিয়ে মাঝে-মধ্যে পায়চারি করতেন। অভ্যাসমত তিনি উক্ত নির্জন স্থানে একদিন পায়চারি করছিলেন। এমন সময় হঠাৎ মানুষের বেশে সেখানে জিবরাঈল উপস্থিত হন। স্বাভাবিকভাবেই তাতে মারিয়াম ভীত হয়ে পড়েন। এ বিষয়ে কুরআনী বর্ণনা নিম্নরূপ:

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَاناً شَرْقِيًّا- فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَاباً فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا- قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا- قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلاَمًا زَكِيًّا- قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلاَمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا- قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا- (مريم ١٦-٢١)-

(হে মুহাম্মাদ!) 'আপনি এই কিতাবে মারিয়ামের কথা বর্ণনা করুন। যখন সে তার পরিবারের লোকজন হ'তে পৃথক হয়ে পূর্বদিকে একস্থানে আশ্রয় নিল' *(মারিয়াম ১৬)*। 'অতঃপর সে তাদের থেকে আড়াল করার জন্য পর্দা টাঙিয়ে নিল। অতঃপর আমরা তার নিকটে আমাদের 'রূহ' (অর্থাৎ জিব্রীলকে) প্রেরণ করলাম। সে তার কাছে গিয়ে পূর্ণাঙ্গ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল' *(১৭)*। 'মারিয়াম বলল, আমি তোমার থেকে করুণাময় আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যদি তুমি আল্লাহভীরু হও' *(১৮)*। 'সে বলল, আমি তো কেবল তোমার প্রভুর প্রেরিত। এজন্য যে, আমি তোমাকে একটি পবিত্র পুত্র সন্তান দান করে যাব' *(১৯)*। 'মারিয়াম বলল, কিভাবে আমার পুত্র সন্তান হবে? অথচ কোন মানুষ আমাকে স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণী নই' *(২০)*। 'সে বলল, এভাবেই হবে। তোমার পালনকর্তা বলেছেন, এটা আমার জন্য সহজ ব্যাপার এবং আমরা তাকে (ঈসাকে) মানবজাতির জন্য একটা নিদর্শন

Contents

ও আমাদের পক্ষ হ’তে বিশেষ অনুগ্রহরূপে পয়দা করতে চাই। তাছাড়া এটা (পূর্ব থেকেই) নির্ধারিত বিষয়’ *(মারিয়াম ১৯/১৬-২১)*। অতঃপর জিব্রীল মারিয়ামের মুখে অথবা তাঁর পরিহিত জামায় ফুঁক মারলেন এবং তাতেই তাঁর গর্ভ সঞ্চার হ’ল *(আম্বিয়া ২১/৯১; তাহরীম ৬৬/১২)*। অন্য আয়াতে একে ‘আল্লাহ্র কলেমা’ (بِكَلِمَةٍ مِنْهُ) অর্থাৎ ‘কুন্’ (হও) বলা হয়েছে *(আলে ইমরান ৩/৪৫)*।

অতঃপর আল্লাহ বলেন,

فَحَمَلَتْهُ فَانتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا- فَأَجَاءهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا- فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلاَّ تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا- وَهُزِّيْ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا- فَكُلِيْ وَاشْرَبِيْ وَقَرِّيْ عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُوْلِيْ إِنِّيْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا- (مريم ٢٢-٢٦)-

‘অতঃপর মারিয়াম গর্ভে সন্তান ধারণ করল এবং তৎসহ একটু দূরবর্তী স্থানে চলে গেল’ *(মারিয়াম ২২)*। ‘এমতাবস্থায় প্রসব বেদনা তাকে একটি খর্জুর বৃক্ষের মূলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। তখন সে বলল, হায়! আমি যদি এর আগেই মারা যেতাম এবং আমি যদি মানুষের স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেতাম’ *(২৩)*। ‘এমন সময় ফেরেশতা তাকে নিম্নদেশ থেকে (অর্থাৎ পার্শ্ববর্তী নিম্নভূমি থেকে) আওয়ায দিয়ে বলল, তুমি দুঃখ করো না। তোমার পালনকর্তা তোমার পাদদেশে একটি ঝর্ণাধারা সৃষ্টি করেছেন’ *(২৪)*। ‘আর তুমি খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ড ধরে নিজের দিকে নাড়া দাও, তা থেকে তোমার দিকে সুপক্ক খেজুর পতিত হবে’ *(২৫)*। ‘তুমি আহার কর, পান কর এং স্বীয় চক্ষু শীতল কর। আর যদি কোন মানুষকে তুমি দেখ, তবে তাকে বলে দিয়ো যে, আমি দয়াময় আল্লাহ্র জন্য ছিয়াম পালনের মানত করেছি। সুতরাং আমি আজ কারু সাথে কোন মতেই কথা বলব না’ *(মারিয়াম ১৯/২২-২৬)*।

উল্লেখ্য যে, ইসলাম-পূর্ব কালের বিভিন্ন শরী‘আতে সম্ভবতঃ ছিয়াম পালনের সাথে অন্যতম নিয়ম ছিল সারাদিন মৌনতা অবলম্বন করা। হযরত যাকারিয়া (আঃ)-কেও সন্তান প্রদানের নিদর্শন হিসাবে তিন দিন ছিয়ামের সাথে মৌনতা অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তবে ঐ অবস্থায় ইশারা-ইঙ্গিতে

কথা বলার অবকাশ ছিল *(মারিয়াম ১৯/১০-১১)*। একইভাবে মারিয়ামকেও নির্দেশ দেওয়া হ'ল *(মারিয়াম ১৯/২৬)*।

আলোচনা :

(১) যেহেতু ঈসা (আঃ)-এর জন্মগ্রহণের ব্যাপারটি সম্পূর্ণভাবে অলৌকিক, তাই তার গর্ভধারণের মেয়াদ স্বাভাবিক নিয়মের বহির্ভূত ছিল বলেই ধরে নিতে হবে। নয় মাস দশদিন পরে সন্তান প্রসব শেষে চল্লিশ দিন 'নেফাস' অর্থাৎ রজঃস্রাব হ'তে পবিত্রতার মেয়াদও এখানে ধর্তব্য না হওয়াই সমীচীন। অতএব ঈসাকে গর্ভধারণের ব্যাপারটাও যেমন নিয়ম বহির্ভূত, তার ভূমিষ্ঠ হওয়া ও তার মায়ের পবিত্রতা লাভের পুরা ঘটনাটাই নিয়ম বহির্ভূত এবং অলৌকিক। আর এটা আল্লাহ্র জন্য একেবারেই সাধারণ বিষয়। স্বামী-স্ত্রীর মাধ্যমে সন্তান জন্ম হবে, মাকে দশ মাস গর্ভধারণ করতে হবে ইত্যাদি নিয়ম আল্লাহরই সৃষ্টি এবং এই নিয়ম ভেঙ্গে সন্তান দান করাও তাঁরই এখতিয়ার। এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেন,

إِنَّ مَثَلَ عِيْسَى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ- الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ- (آل عمران ٥٩-٦٠)-

'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নিকটে ঈসার দৃষ্টান্ত হ'ল আদমের মত। তাকে তিনি মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেন এবং বলেন, হয়ে যাও ব্যস হয়ে গেল'। 'যা তোমার প্রভু আল্লাহ বলেন, সেটাই সত্য। অতএব তুমি সংশয়বাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না' *(আলে ইমরান ৩/৫৯-৬০)*। অর্থাৎ আদমকে যেমন পিতা-মাতা ছাড়াই সৃষ্টি করা হয়েছে, ঈসাকে তেমনি পিতা ছাড়াই শুধু মায়ের মাধ্যমেই সৃষ্টি করা হয়েছে। আর এটাই যে সত্য এবং এর বাইরে যাবতীয় জল্পনা-কল্পনা যে মিথ্যা, সে কথাও উপরোক্ত আয়াতে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলে দেওয়া হয়েছে। দুর্ভাগ্য এই যে, যে বনু ইস্রাঈলের নবী ও রাসূল হয়ে ঈসা (আঃ)-এর আগমন ঘটলো, সেই ইহুদী-নাছারারাই আল্লাহ্র উক্ত ঘোষণাকে মিথ্যা বলে গণ্য করেছে। অথচ এই হতভাগারা মারিয়ামের পূর্বদিকে যাওয়ার অনুসরণে পূর্বদিককে তাদের ক্বিবলা বানিয়েছে।[৯৯]

---

৯৯. ঈসার জন্মের স্থানটিকে এখন Bethlehem (بيت لحم) বলা হয়। যা উত্তর কুদ্স থেকে ৮ কি:মি: দক্ষিণে অবস্থিত এবং ফিলিস্তীনের পশ্চিম তীরে ইস্রাঈলের দখলীভুক্ত।- লেখক ॥

Contents

(২) এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, মারিয়ামকে খেজুর গাছের কাণ্ড ধরে নাড়া দিতে বলা হয়েছে, যাতে সুপক্ক খেজুর নীচে পতিত হয়। এটাতে বুঝা যায় যে, ওটা ছিল তখন খেজুর পাকার মৌসুম অর্থাৎ গ্রীষ্মকাল। আর খৃষ্টানরা কথিত যীশু খৃষ্টের জন্মদিন তথা তাদের ভাষায় X-mas Day বা বড় দিন উৎসব পালন করে থাকে শীতকালে ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে। অথচ এর কোন ভিত্তি তাদের কাছে নেই। যেমন কোন ভিত্তি নেই মুসলমানদের কাছে ১২ই রবীউল আউয়াল একই তারিখে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জন্ম ও মৃত্যু দিবস পালনের। অথচ জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব অনুযায়ী রাসূলের জন্মদিবস ছিল ৯ই রবীউল আউয়াল সোমবার ও মৃত্যুর তারিখ ছিল ১২ই রবীউল আউয়াল সোমবার।

ইসলামে কারু জন্ম বা মৃত্যু দিবস পালনের বিধান নেই। ক্রুসেড যুদ্ধের সময় খৃষ্টান বাহিনীর বড় দিন পালনের দেখাদেখি ৬০৫ অথবা ৬২৫ হিজরীতে ইরাকের এরবল প্রদেশের গভর্ণর আবু সাঈদ মুযাফফরুদ্দীন কুকুবুরী *(৫৮৬-৬৩২ হিঃ)*-এর মাধ্যমে কথিত ঈদে মীলাদুন্নবীর প্রথা প্রথম চালু হয়। এই বিদ‘আতী প্রথা কোন কোন মুসলিম দেশে বিশেষ করে ভারত উপমহাদেশে শিকড় গেড়ে বসেছে।

(৩) এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, খেজুর গাছের গোড়া ধরে নাড়া দেওয়া কখনোই সম্ভব নয়। বিশেষ করে একজন সদ্য প্রসূত সন্তানের মায়ের পক্ষে। এর মধ্যে এ বিষয়ে ইঙ্গিত রয়েছে যে, নেকীর কাজে আল্লাহ্‌র উপরে ভরসা করে বান্দাকে অবশ্যই এগিয়ে যেতে হবে। যত সামান্যই হৌক কাজ করতে হবে। আল্লাহ তাতেই বরকত দিবেন। যেমন তালূত ও দাঊদকে আল্লাহ দিয়েছিলেন এবং যেমন শেষনবী (ছাঃ)-কে আল্লাহ সাহায্য করেছিলেন বিশেষভাবে হিজরতের রাত্রিতে মক্কা ত্যাগের সময়, হিজরতকালীন সফরে এবং বদর ও খন্দক যুদ্ধের কঠিন সময়ে। অতএব আমরা ধরে নিতে পারি যে, মারিয়ামের গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব ও প্রসব পরবর্তী পবিত্রতা অর্জন সবই ছিল অলৌকিক এবং সবই অত্যন্ত দ্রুত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়।

এর পরের ঘটনা আমরা সরাসরি কুরআন থেকে বিবৃত করব। আল্লাহ বলেন,

Contents

فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوْا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا- يَا أُخْتَ هَارُوْنَ مَا كَانَ أَبُوْكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا- (مريم ٢٧-٢٨)-

'অতঃপর মারিয়াম তার সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হ'ল। তারা বলল, হে মারিয়াম! তুমি একটা আশ্চর্য বস্তু নিয়ে এসেছ'। 'হে হারূণের বোন![১০০] তোমার পিতা কোন অসৎ ব্যক্তি ছিলেন না কিংবা তোমার মাতাও কোন ব্যভিচারিণী মহিলা ছিলেন না' *(মারিয়াম ১৯/২৭-২৮)*। কওমের লোকদের এ ধরনের কথা ও সন্দেহের জওয়াবে নিজে কিছু না বলে বিবি মারিয়াম তার সদ্য প্রসূত সন্তানের দিকে ইশারা করলেন। অর্থাৎ একথার জবাব সেই-ই দিবে। কেননা সে আল্লাহ্র দেওয়া এক অলৌকিক সন্তান, যা কওমের লোকেরা জানে না। আল্লাহ বলেন,

فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا- قَالَ إِنِّيْ عَبْـــدُ اللهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا- وَجَعَلَنِيْ مُبَارَكاً أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِيْ بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا- وَبَرًّا بِوَالِدَتِيْ وَلَمْ يَجْعَلْنِيْ جَبَّارًا شَقِيًّا- وَالسَّلاَمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوْتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا- (مريم ٢٩-٣٣)-

'অতঃপর মারিয়াম ঈসার দিকে ইঙ্গিত করল। তখন লোকেরা বলল, কোলের শিশুর সাথে আমরা কিভাবে কথা বলব'? *(মারিয়াম ২৯)*। ঈসা তখন বলে উঠল, 'আমি আল্লাহ্র দাস। তিনি আমাকে কিতাব (ইনজীল) প্রদান করেছেন এবং আমাকে নবী করেছেন' *(৩০)*। 'আমি যেখানেই থাকি, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। তিনি আমাকে জোরালো নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন ছালাত ও যাকাত আদায় করতে' *(৩১)*। 'এবং আমার মায়ের অনুগত থাকতে। আল্লাহ আমাকে উদ্ধত ও হতভাগা করেননি' *(৩২)*। 'আমার প্রতি শান্তি যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন আমি মৃত্যুবরণ করব এবং যেদিন জীবিত পুনরুত্থিত হব' *(মারিয়াম ১৯/২৯-৩৩)*।

---

১০০. *মারিয়ামের এক ইবাদতগুযার ভাইয়ের নাম ছিল হারূণ। অথবা হারূণ (আঃ)-এর বংশধর হওয়ার কারণেও এটা বলা হ'তে পারে (কুরতুবী)।*

ঈসার উপরোক্ত বক্তব্য শেষ করার পর সংশয়বাদী ও বিতর্ককারী লোকদের উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলেন,

ذَلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِيْ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ- مَا كَانَ لِلّٰهِ أَن يَّتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ- وَإِنَّ اللهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ- (مريم ٣٤-٣٦)-

‘ইনিই হ’লেন মারিয়াম পুত্র ঈসা। আর ওটাই হ’ল সত্যকথা (যা উপরে বর্ণিত হয়েছে), যে বিষয়ে লোকেরা (অহেতুক) বিতর্ক করে থাকে’ *(মারিয়াম ৩৪)*। ‘আল্লাহ এমন নন যে, তিনি সন্তান গ্রহণ করবেন (যেমন অতিভক্ত খৃষ্টানরা বলে থাকে যে, ঈসা ‘আল্লাহ্‌র পুত্র’)। তিনি মহাপবিত্র। যখন তিনি কোন কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন বলেন, হও! ব্যস, হয়ে যায়’ *(৩৫)*। ‘ঈসা আরও বলল, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার পালনকর্তা এবং তোমাদের পালনকর্তা। অতএব তোমরা তাঁর ইবাদত কর। (মনে রেখ) এটাই হ’ল সরল পথ’ *(মারিয়াম ১৯/৩৪-৩৬)*।

কিন্তু সদ্যপ্রসূত শিশু ঈসার মুখ দিয়ে অনুরূপ সারগর্ভ কথা শুনেও কি কওমের লোকেরা আশ্বস্ত হ’তে পেরেছিল? কিছু লোক আশ্বস্ত হ’লেও অনেকে পারেনি। তারা নানা বাজে কথা রটাতে থাকে। তাদের ঐসব বাক-বিতণ্ডার প্রতি ইঙ্গিত করেই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ বলেন,

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيْمٍ- أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُوْنَنَا لَكِنِ الظَّالِمُوْنَ الْيَوْمَ فِيْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ- (مريم ٣٧-٣٨)-

‘অতঃপর তাদের মধ্যকার বিভিন্ন দল বিভিন্ন (মত ও পথে) বিভক্ত হয়ে গেল (দুনিয়াতে যার শেষ হবে না)। অতএব ক্বিয়ামতের মহাদিবস আগমন কালে অবিশ্বাসী কাফিরদের জন্য ধ্বংস’। ‘সেদিন তারা চমৎকারভাবে শুনবে ও দেখবে, যেদিন তারা সবাই আমাদের কাছে আগমন করবে। কিন্তু আজ যালেমরা প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে রয়েছে’ *(মারিয়াম ১৯/৩৭-৩৮)*।

মারিয়ামের সতীত্ব সম্পর্কে আল্লাহ্র সাক্ষ্য :

আল্লাহ পাক নিজেই মারিয়ামের সতীত্ব সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়ে বলেন,

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ- (التحريم ١٢)-

'তিনি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন ইমরান তনয়া মারিয়ামের, যে তার সতীত্ব বজায় রেখেছিল। অতঃপর আমি তার মধ্যে আমার পক্ষ হ'তে রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং সে তার পালনকর্তার বাণী ও কিতাব সমূহকে সত্যে পরিণত করেছিল এবং সে ছিল বিনয়ীদের অন্যতম' *(তাহরীম ৬৬/১২)*।

মারিয়ামের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

(১) তিনি ছিলেন বিশ্ব নারী সমাজের শীর্ষস্থানীয়া এবং আল্লাহ্র মনোনীত ও পবিত্র ব্যক্তিত্ব *(আলে ইমরান ৩/৪২)*।

(২) তিনি ছিলেন সর্বদা আল্লাহ্র উপাসনায় রত, বিনয়ী, রুকু কারিনী ও সিজদাকারিনী *(ঐ, ৩/৪৩)*।

(৩) তিনি ছিলেন সতীসাধ্বী এবং আল্লাহ্র আদেশ ও বাণী সমূহের বাস্তবায়নকারিনী *(তাহরীম ৬৬/১২)*।

(৪) আল্লাহ নিজেই তার নাম রাখেন 'মারিয়াম' *(আলে ইমরান ৩/৩৬)*। অতএব তিনি ছিলেন অতীব সৌভাগ্যবতী।

শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ:

(১) মারিয়াম ছিলেন তার মায়ের মানতের সন্তান এবং তার নাম আল্লাহ নিজে রেখেছিলেন।

(২) মারিয়ামের মা দো'আ করেছিলেন এই মর্মে যে, আমি তাকে ও তার সন্তানদেরকে আল্লাহ্র আশ্রয়ে সমর্পণ করছি অভিশপ্ত শয়তানের কবল হ'তে এবং আল্লাহ সে দো'আ কবুল করেছিলেন উত্তমরূপে। অতএব মারিয়াম ও তার পুত্র ঈসার পবিত্রতা সম্পর্কে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নেই।

Contents

(৩) মারিয়াম আল্লাহ্র ঘর বায়তুল মুক্বাদ্দাসের খিদমতে রত ছিলেন এবং তাকে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে বিশেষ ফল-ফলাদির মাধ্যমে খাদ্য পরিবেশন করা হ'ত *(আলে ইমরান ৩/৩৭)*। এতে বুঝা যায় যে, পবিত্রাত্মা মহিলাগণ মসজিদের খিদমত করতে পারেন এবং আল্লাহ তাঁর নেককার বান্দাদের জন্য যেকোন স্থানে খাদ্য পরিবেশন করে থাকেন।

(৪) মারিয়ামের গর্ভধারণ ও ঈসার জন্মগ্রহণ ছিল সম্পূর্ণরূপে অলৌকিক ঘটনা। আল্লাহ পাক নিয়মের স্রষ্টা এবং তিনিই নিয়মের ভঙ্গকারী। তাকে কোন বিষয়ে বাধ্য করার মত কেউ নেই। তিনি পিতা-মাতা ছাড়াই আদমকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর পিতা ছাড়াই শুধু মাতার মাধ্যমে ঈসাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি যা খুশী তাই করতে পারেন।

(৫) ঈসার জন্ম গ্রীষ্মকালে হয়েছিল খেজুর পাকার মওসুমে। খৃষ্টানদের মধ্যে প্রচলিত ধারণা মতে ২৫শে ডিসেম্বরের প্রচণ্ড শীতের সময়ে নয়।

(৬) ফেরেশতা মানবাকৃতি ধারণ করে অথবা অদৃশ্য থেকে নেককার বান্দাকে আল্লাহ্র হুকুমে সাহায্য করে থাকেন। যেমন জিব্রীল মানবাকৃতি ধারণ করে মারিয়ামের জামায় ফুঁক দিলেন। অতঃপর অদৃশ্য থেকে আওয়ায দিয়ে তার খাদ্য ও পানীয়ের পথ নির্দেশ দান করলেন।

(৭) বান্দাকে কেবল প্রার্থনা করলেই চলবে না, তাকে কাজে নামতে হবে। তবেই তাতে আল্লাহ্র সাহায্য নেমে আসবে। যেমন খেজুর বৃক্ষের কাণ্ড ধরে নাড়া দেওয়ার সামান্য প্রচেষ্টার মাধ্যমে আল্লাহ্র হুকুমে সুপক্ক খেজুর সমূহ পতিত হয়।

(৮) বিশেষ সময়ে আল্লাহ্র হুকুমে শিশু সন্তানের মুখ দিয়ে সারগর্ভ বক্তব্য সমূহ বের হ'তে পারে। যেমন ঈসার মুখ দিয়ে বের হয়েছিল তার মায়ের পবিত্রতা প্রমাণের জন্য। বুখারী শরীফে বর্ণিত বনু ইস্রাঈলের জুরায়েজ-এর ঘটনায়ও এর প্রমাণ পাওয়া যায়।[১০১]

(৯) ঈসা কোন উপাস্য ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন অন্যদের মত আল্লাহ্র একজন দাস মাত্র এবং তিনি ছিলেন আল্লাহ্র একজন সম্মানিত নবী ও কিতাবধারী রাসূল।

---

১০১. *বুখারী, হা/২৪৮২ 'মাযালিম' অধ্যায় ৩৫ অনুচ্ছেদ।*

(১০) ঈসা যে বিনা বাপে পয়দা হয়েছিলেন, তার অন্যতম প্রমাণ এই যে, কুরআনের সর্বত্র তাঁকে 'মারিয়াম-পুত্র' (عيسى ابن مريم) বলা হয়েছে *(বাক্বারাহ ২/৮৭, ২৫৩; আলে ইমরান ৩/৪৫ প্রভৃতি)*। পিতা-মাতা উভয়ে থাকলে হয়তবা তাঁকে কেবল ঈসা বলেই সম্বোধন করা হ'ত, যেমন অন্যান্য নবীগণের বেলায় করা হয়েছে। অথচ মারিয়ামকে তার পিতার দিকে সম্বন্ধ করে 'মারিয়াম বিনতে ইমরান' (ابنت عمران) 'ইমরান-কন্যা' বলা হয়েছে *(তাহরীম ৬৬/১২)*।

(১১) একমাত্র মারিয়ামের নাম ধরেই আল্লাহ তাঁর সতীত্বের সাক্ষ্য ঘোষণা করেছেন *(তাহরীম ৬৬/১২)*। যা পৃথিবীর অন্য কোন মহিলা সম্পর্কে করা হয়নি। অতএব যাবতীয় বিতর্কের অবসানের জন্য এটুকুই যথেষ্ট। তাছাড়া আল্লাহ তাঁকে 'ছিদ্দীক্বাহ' অর্থাৎ কথায় ও কর্মে 'সত্যবাদীনী' আখ্যা দিয়েছেন *(মায়েদাহ ৫/৭৫)*। যেটা অন্য কোন মহিলা সম্পর্কে দেওয়া হয়নি।

ঈসা (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্য সমূহ :

(১) তিনি ছিলেন বিনা বাপে পয়দা বিশ্বের একমাত্র নবী *(আলে ইমরান ৩/৪৬ প্রভৃতি)*। (২) আল্লাহ স্বয়ং যার নাম রাখেন মসীহ ঈসা রূপে *(আলে ইমরান ৩/৪৫)*। (৩) তিনি শয়তানের অনিষ্টকারিতা হ'তে মুক্ত ছিলেন *(ঐ, ৩/৩৬-৩৭)*। (৪) দুনিয়া ও আখেরাতে তিনি ছিলেন মহা সম্মানের অধিকারী এবং আল্লাহ্র একান্ত প্রিয়জনদের অন্যতম *(আলে ইমরান ৩/৪৫)*। (৫) তিনি মাতৃক্রোড়ে থেকেই সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন *(মারিয়াম ১৯/২৭-৩৩; আলে ইমরান ৩/৪৬)*। (৬) তিনি বনু ইস্রাঈলগণের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন *(আলে ইমরান ৩/৪৯)* এবং শেষনবী 'আহমাদ'-এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করেন *(ছফ ৬১/৬)*। (৭) তাঁর মো'জেযা সমূহের মধ্যে ছিল- (ক) তিনি মাটির তৈরী পাখিতে ফুঁক দিলেই তা জীবন্ত হয়ে উড়ে যেত (খ) তিনি জন্মান্ধকে চক্ষুষ্মান ও কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করতে পারতেন (গ) তিনি মৃতকে জীবিত করতে পারতেন (ঘ) তিনি বলে দিতে পারতেন মানুষ বাড়ী থেকে যা খেয়ে আসে এবং যা সে ঘরে সঞ্চিত রেখে আসে *(আলে ইমরান ৩/৪৯; মায়েদাহ ৫/১১০)*।

(৮) তিনি আল্লাহ্র কিতাব ইনজীল প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং পূর্ববর্তী গ্রন্থ তওরাতের সত্যায়নকারী ছিলেন। তবে তওরাতে হারামকৃত অনেক বিষয়কে তিনি হালাল করেন *(আলে ইমরান ৩/৫০)*। (৯) তিনি ইহুদী চক্রান্তের শিকার

Contents

হয়ে সরকারী নির্যাতনের সম্মুখীন হন। ফলে আল্লাহ তাঁকে সশরীরে আসমানে উঠিয়ে নেন *(আলে ইমরান ৩/৫২, ৫৪-৫৫; নিসা ৪/১৫৮)*। শত্রুরা তাঁরই মত আরেকজনকে সন্দেহ বশে শূলে চড়িয়ে হত্যা করে এবং তারা নিশ্চিতভাবেই ঈসাকে হত্যা করেনি’ *(নিসা ৪/১৫৭)*। (১০) তিনিই একমাত্র নবী, যাকে আল্লাহ জীবিত অবস্থায় দুনিয়া থেকে আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন এবং ক্বিয়ামতের প্রাক্কালে তিনি পুনরায় সশরীরে দুনিয়াতে অবতরণ করবেন এবং দাজ্জাল, ক্রুশ, শূকর প্রভৃতি ধ্বংস করবেন। অতঃপর ইমাম মাহদীর নেতৃত্বে সারা পৃথিবীতে ইসলামী শরী‘আত অনুযায়ী শান্তির রাজ্য কায়েম করবেন।[১০২]

হযরত ঈসা (আঃ)-এর কাহিনী :

সাধারণতঃ সকল নবীই ৪০ বছর বয়সে নবুঅত লাভ করেছেন। তবে ঈসা (আঃ) সম্ভবতঃ তার কিছু পূর্বেই নবুঅত ও কিতাব প্রাপ্ত হন। কেননা বিভিন্ন রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, আকাশে তুলে নেবার সময় তাঁর বয়স ৩০ থেকে ৩৫-এর মধ্যে ছিল। তিনি যৌবনে আকাশে উত্তোলিত হয়েছিলেন এবং পৌঢ় বয়সে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে এসে মানুষকে তাওহীদের দাওয়াত দিবেন।

ঈসা (আঃ)-এর দাওয়াত :

ঈসা (আঃ) নবুঅত লাভ করার পর স্বীয় কওমকে প্রধানতঃ নিম্নোক্ত ৭টি বিষয়ে দাওয়াত দিয়ে বলেন, يَابَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ– ‘হে বনু ইস্রাঈলগণ! আমি তোমাদের নিকটে আগমন করেছি **(১)** আল্লাহ্র রাসূল হিসাবে **(২)** আমার পূর্ববর্তী তওরাত কিতাবের সত্যায়নকারী হিসাবে এবং **(৩)** আমার পরে আগমনকারী রাসূলের সুসংবাদ দানকারী হিসাবে, যার নাম হবে আহমাদ’... *(ছফ ৬১/৬)*। তিনি বললেন, وَإِنَّ اللهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ‘**(৪)** নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার পালনকর্তা এবং তোমাদের পালনকর্তা। অতএব তোমরা তাঁর ইবাদত কর। এটাই সরল পথ’ *(মারিয়াম ১৯/৩৬)*।

১০২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫০৫-৭ ‘ফিতান’ অধ্যায় ‘ঈসার অবতরণ’ অনুচ্ছেদ-৫; তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫৪৫২-৫, ঐ, ‘ক্বিয়ামতের আলামত সমূহ’ অনুচ্ছেদ-২*।

তিনি বললেন, وَمُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِيْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُواْ اللهَ وَأَطِيعُونِ- (آل عمران ٥٠)- 'আমার আনীত এ কিতাব (ইনজীল) পূর্ববর্তী কিতাব তাওরাতকে সত্যায়ন করে এবং এজন্য যে, **(৫)** আমি তোমাদের জন্য হালাল করে দেব কোন কোন বস্তু, যা তোমাদের জন্য হারাম ছিল। আর **(৬)** আমি তোমাদের নিকটে এসেছি তোমাদের পালনকর্তার নিদর্শন সহ। অতএব **(৭)** তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর' *(আলে ইমরান ৩/৫০)*।

এটার ব্যাখ্যা এসেছে অন্য আয়াতে যে,

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ كَثِيْرًا- وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيْماً- (النساء ١٦٠-١٦١)-

'বস্তুতঃ ইহুদীদের পাপের কারণে আমরা তাদের উপরে হারাম করেছিলাম বহু পবিত্র বস্তু, যা তাদের জন্য হালাল ছিল। এটা ছিল **(১)** আল্লাহ্র পথে তাদের অধিক বাধা দানের কারণে'। 'এবং এ কারণে যে, **(২)** তারা সূদ গ্রহণ করত। অথচ এ ব্যাপারে তাদের নিষেধ করা হয়েছিল এবং এ কারণে যে, **(৩)** তারা অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করত। বস্তুতঃ আমরা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি বেদনাদায়ক শাস্তি' *(নিসা ৪/১৬০-১৬১)*। তিনি আরও বলেন,

وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِيْ ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُوْرُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وِإِنَّا لَصَادِقُوْنَ- (الأنعام ١٤٦)-

'এবং ইহুদীদের জন্য আমরা **(১)** প্রত্যেক নখবিশিষ্ট পশু হারাম করেছিলাম এবং **(২)** ছাগল ও গরু থেকে এতদুভয়ের চর্বি আমরা তাদের জন্য হারাম করেছিলাম। কিন্তু ঐ চর্বি ব্যতীত যা পৃষ্ঠে কিংবা অন্ত্রে সংযুক্ত থাকে অথবা অস্থির সাথে মিলিত থাকে। তাদের অবাধ্যতার কারণে আমরা তাদের এ শাস্তি দিয়েছিলাম। আর আমরা অবশ্যই সত্যবাদী' *(আন'আম ৬/১৪৬)*।

ঈসা (আঃ)-এর পেশকৃত পাঁচটি নিদর্শন :

তাওহীদ ও রিসালাতের উপরে ঈমান আনার দাওয়াত দেওয়ার পরে তিনি বনু ইস্রাঈলকে তাঁর আনীত নিদর্শন সমূহ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,

وَرَسُوْلاً إِلَى بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ أَنِّيْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّيْ أَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْراً بِإِذْنِ اللهِ وَأُبْرِئُ الأَكْمَهَ والأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ فِيْ بُيُوْتِكُمْ إِنَّ فِيْ ذَلِكَ لآيَةً لَّكُمْ إِنْ كُنتُم مُّؤْمِنِينَ- (آل عمران ٤٩)-

‘নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকটে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে এসেছি নিদর্শনসমূহ নিয়ে। (যেমন-) **(১)** আমি তোমাদের জন্য মাটি দ্বারা পাখির আকৃতি তৈরী করে দেই। তারপর তাতে যখন ফুঁক দেই, তখন তা উড়ন্ত পাখিতে পরিণত হয়ে যায় আল্লাহ্‌র হুকুমে। **(২)** আর আমি সুস্থ করে তুলি জন্মান্ধকে এবং **(৩)** ধবল-কুষ্ঠ রোগীকে। **(৪)** আর আমি জীবিত করে দেই মৃতকে আল্লাহ্‌র হুকুমে। **(৫)** আমি তোমাদেরকে বলে দেই যা তোমরা খেয়ে আস এবং যা তোমরা ঘরে রেখে আস। এতে প্রকৃষ্ট নিদর্শন রয়েছে যদি তোমরা বিশ্বাসী হও’ *(আলে ইমরান ৩/৪৯)*।

উল্লেখ্য যে, যখন যে দেশে যে বিষয়ের আধিক্য ও উৎকর্ষ থাকে, তখন সেই দেশে সেই বিষয়ে সর্বোচ্চ ব্যুৎপত্তি সহ নবী প্রেরণ করা হয়। যেমন মূসার সময় মিসরে ছিল জাদুবিদ্যার প্রাদুর্ভাব। ফলে আল্লাহ তাঁকে লাঠির মো‘জেযা দিয়ে পাঠালেন। অনুরূপভাবে ঈসার সময়ে শাম বা সিরিয়া এলাকা ছিল চিকিৎসা বিদ্যায় সেরা। সেকারণ ঈসাকে আল্লাহ উপরে বর্ণিত অলৌকিক ক্ষমতা ও মো‘জেযা সমূহ দিয়ে পাঠান। যেমন শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সময়ে আরবরা ভাষা ও সাহিত্যের সর্বোচ্চ অলংকারে ভূষিত ছিল। ফলে কুরআন তাদের সামনে হতবুদ্ধিকারী মো‘জেযা রূপে নাযিল হয়। যাতে আরবের স্বনামখ্যাত কবিরা মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়।

দাওয়াতের ফলশ্রুতি :

ঈসা (আঃ)-এর মো‘জেযা সমূহ দেখে এবং তাঁর মুখনিঃসৃত তাওহীদের বাণী শুনে গরীব শ্রেণীর কিছু লোক তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হ’লেও দুনিয়াদার সমাজ নেতারা তাঁর প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে। কারণ তাওহীদের সাম্য বাণী সমাজের কায়েমী স্বার্থবাদী নেতাদের স্বার্থেই প্রথম আঘাত হেনে থাকে। শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রণা দেয়। ফলে তারা ঈসা (আঃ)-এর বিরোধিতায় লিপ্ত হয়।

বিগত নবীগণের ন্যায় বনু ইস্রাঈলগণ তাদের বংশের শেষ নবী ঈসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে নানাবিধ চক্রান্ত শুরু করে। তারা প্রথমেই ঈসা (আঃ)-কে ‘জাদুকর’ বলে আখ্যায়িত করে। যেমন আল্লাহ বলেন, (হে ঈসা!) إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ إِنْ هَـــذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِيْنٌ- (المائدة ١١٠)- ‘যখন তুমি তাদের কাছে প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিলে। অতঃপর তাদের মধ্যে যারা কাফের তারা বলল, এটা প্রকাশ্য জাদু ব্যতীত কিছুই নয়’ *(মায়েদাহ ৫/১১০)*।

উক্ত অপবাদে ঈসা (আঃ) ক্ষান্ত না হয়ে বরং আরও দ্বিগুণ বেগে দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে যেতে থাকেন। তখন বিরোধীরা বেছে নেয় অতীব নোংরা পথ। তারা তাঁর মায়ের নামে অপবাদ রটাতে শুরু করে। যাতে ঈসা (আঃ) অত্যন্ত ব্যথা পেলেও নবুঅতের গুরুদায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সবকিছু নীরবে সহ্য করতে থাকেন। ফলে ঈসা (আঃ)-এর সমর্থক সংখ্যা যতই বাড়তে থাকে, অবিশ্বাসী সমাজ নেতাদের চক্রান্ত ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে। এবার তারা তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করল এবং সেজন্য দেশের বাদশাহকে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র করল। তারা অনবরত বাদশাহ্র কান ভারি করতে থাকে এই মর্মে যে, লোকটি আল্লাহ দ্রোহী। সে তাওরাত পরিবর্তন করে সবাইকে বিধর্মী করতে সচেষ্ট। এসব অভিযোগ শুনে অবশেষে বাদশাহ তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করেন। তখন ইহুদীদের এসব ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করার জন্য আল্লাহ স্বীয় কৌশল প্রেরণ করেন এবং ঈসা (আঃ)-কে সশরীরে আসমানে উঠিয়ে নেন।

ইহুদীদের উপর প্রেরিত গযব ও তার কারণ সমূহ :

ঈসা (আঃ)-এর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করার কারণে আল্লাহ ইহুদী কাফিরদের উপরে নানাবিধ দুনিয়াবী গযব নাযিল করেন। তাদেরকে কেন শাস্তি দেওয়া হয়েছিল- সে বিষয়ে অনেকগুলি কারণের মধ্যে আল্লাহ বলেন,

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بَآيَاتِ اللهِ وَقَتْلِهِمُ الأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُوْنَ إِلاَّ قَلِيْلاً- وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَاناً عَظِيْماً- وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللهِ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلَـــكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْناً- بَل رَّفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللهُ عَزِيْزاً حَكِيْماً- (النساء ١٥٥-١٥٨)-

‘তারা যে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছিল, তা ছিল (১) তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে, (২) অন্যায়ভাবে রাসূলগণকে হত্যা করার কারণে এবং (৩) তাদের এই উক্তির কারণে যে, ‘আমাদের হৃদয় আচ্ছন্ন’... *(নিসা ১৫৫)*। ‘আর (৪) তাদের কুফরীর কারণে এবং (৫) মারিয়ামের প্রতি মহা অপবাদ আরোপের কারণে’ *(১৫৬)*। ‘আর তাদের (৬) একথার কারণে যে, ‘আমরা মারিয়াম-পুত্র ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি, যিনি ছিলেন আল্লাহ্র রাসূল। অথচ তারা না তাঁকে হত্যা করেছিল, না শূলে চড়িয়েছিল। বরং তাদের জন্য ধাঁধার সৃষ্টি করা হয়েছিল। বস্তুতঃ তারা এ ব্যাপারে নানাবিধ কথা বলে। তারা এ বিষয়ে সন্দেহের মাঝে পড়ে আছে। শুধুমাত্র ধারণার অনুসরণ করা ব্যতীত এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞানই নেই। আর নিশ্চিতভাবেই তারা তাকে হত্যা করেনি’ *(১৫৭)*। ‘বরং তাকে আল্লাহ নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন। আর আল্লাহ হ’লেন মহা পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়’ *(নিসা ৪/১৫৫-১৫৮)*।

ইহুদীদের অভিশপ্ত হওয়ার ১০টি কারণ :

সূরা নিসা ১৫৫-৬১ আয়াতে ইহুদীদের ইপর আল্লাহ্র গযব নাযিলের ও তাদের অভিশপ্ত হওয়ার যে কারণ সমূহ বর্ণিত হয়েছে, তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

(১) তাদের ব্যাপক পাপাচার (২) আল্লাহ্র পথে বাধা দান (৩) সূদী লেনদেন (৪) অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ (৫) অঙ্গীকার ভঙ্গ করা (৬) নবীগণকে হত্যা করা (৭) আল্লাহ্র পথে আগ্রহী না হওয়া এবং অজুহাত দেওয়া যে, আমাদের হৃদয় আচ্ছন্ন (৮) কুফরী করা (৯) মারিয়ামের প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেওয়া (১০) ঈসাকে শূলে বিদ্ধ করে হত্যার মিথ্যা দাবী করা।

ঈসা (আঃ)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র ও তাঁর ঊর্ধ্বারোহন :

তৎকালীন রোম সম্রাট ছাতিয়ূনুস-এর নির্দেশে (মাযহারী) ঈসা (আঃ)-কে গ্রেফতারের জন্য সরকারী বাহিনী ও ইহুদী চক্রান্তকারীরা তাঁর বাড়ী ঘেরাও করে। তারা জনৈক নরাধমকে ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করার জন্য পাঠায়। কিন্তু ইতিপূর্বে আল্লাহ ঈসা (আঃ)-কে উঠিয়ে নেওয়ায় সে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যায়। কিন্তু এরি মধ্যে আল্লাহ্র হুকুমে তার চেহারা ঈসা (আঃ)-এর সদৃশ হয়ে যায়। ফলে ইহুদীরা তাকেই ঈসা ভেবে শূলে বিদ্ধ করে হত্যা করে।

ইহুদী-নাছারারা কেবল সন্দেহের বশবর্তী হয়েই নানা কথা বলে এবং ঈসাকে হত্যা করার মিথ্যা দাবী করে। আল্লাহ বলেন, ‘এ বিষয়ে তাদের কোনই জ্ঞান নেই। তারা কেবলই সন্দেহের মধ্যে পড়ে আছে। এটা নিশ্চিত যে, তারা তাকে হত্যা করতে পারেনি’*(নিসা ৪/১৫৭)*। বরং তার মত কাউকে তারা হত্যা করেছিল ।

উল্লেখ্য যে, ঈসা (আঃ) তাঁর উপরে বিশ্বাসী সে যুগের ও পরবর্তী যুগের সকল খৃষ্টানের পাপের বোঝা নিজে কাঁধে নিয়ে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ শূলে বিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে খৃষ্টানদের দাবী স্রেফ প্রতারণা ও অপপ্রচার বৈ কিছুই নয়।

আল্লাহ্র পাঁচটি অঙ্গীকার :

ইহুদীদের বিপক্ষে হযরত ঈসা (আঃ)-কে সাহায্যের ব্যাপারে আল্লাহ পাঁচটি ওয়াদা করেছিলেন এবং সবক’টিই তিনি পূর্ণ করেন। (১) হত্যার মাধ্যমে নয় বরং তার স্বাভাবিক মৃত্যু হবে (২) তাঁকে ঊর্ধ্বজগতে তুলে নেওয়া হবে (৩) তাকে শত্রুদের অপবাদ থেকে মুক্ত করা হবে (৪) অবিশ্বাসীদের বিপক্ষে ঈসার অনুসারীদেরকে ক্বিয়ামত অবধি বিজয়ী রাখা হবে এবং (৫) ক্বিয়ামতের দিন সবকিছুর চূড়ান্ত ফায়ছালা করা হবে। এ বিষয়গুলি বর্ণিত হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতে। যেমন আল্লাহ বলেন,

إِذْ قَالَ اللهُ يَا عِيْسَى إِنِّيْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ- (آل عمران ٥٥)-

‘আর স্মরণ কর যখন আল্লাহ বললেন, হে ঈসা! আমি তোমাকে ওফাত দিব এবং তোমাকে আমার কাছে তুলে নেব এবং তোমাকে কাফিরদের হাত থেকে মুক্ত করব। আর যারা তোমার অনুসরণ করবে, তাদেরকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত কাফিরদের বিরুদ্ধে বিজয়ী করে রাখবো। অতঃপর তোমাদের সবাইকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে, তখন আমি তোমাদের মধ্যকার বিবাদীয় বিষয়ে ফায়ছালা করে দেব’ *(আলে ইমরান ৩/৫৫)*।

উক্ত আয়াতে বর্ণিত مُتَوَفِّيْكَ অর্থ ‘আমি তোমাকে ওফাত দিব’। ‘ওফাত’ অর্থ পুরোপুরি নেওয়া। মৃত্যুকালে মানুষের আয়ু পূর্ণ হয় বলে একে ‘ওফাত’ বলা হয়। রূপক অর্থে নিদ্রা যাওয়াকেও ওফাত বা মৃত্যু বলা হয়। যেমন আল্লাহ বলেন, –اللهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِـــيْ مَنَامِهَـــا ‘আল্লাহ মানুষের প্রাণ নিয়ে নেন তার মৃত্যুকালে, আর যে মরেনা তার নিদ্রাকালে’ *(যুমার ৩৯/৪২)*। সেকারণ যাহহাক, ফাররা প্রমুখ বিদ্বানগণ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ -এর অর্থ বলেন, আমি আপনাকে নিজের কাছে উঠিয়ে নেব এবং শেষ যামানায় (পৃথিবীতে নামিয়ে দিয়ে) স্বাভাবিক মৃত্যু দান করব। এখানে বর্ণনার আগপিছ হয়েছে মাত্র’ *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। যা কুরআনের বহু স্থানে হয়েছে। ঈসার অবতরণ, দাজ্জাল নিধন, পৃথিবীতে শান্তির রাজ্য স্থাপন ইত্যাদি বিষয়ে ছহীহ ও মুতাওয়াতির হাদীছ সমূহ বর্ণিত হয়েছে। প্রায় সকল বড় বড় নবীই হিজরত করেছেন। এক্ষণে পৃথিবী থেকে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া, অতঃপর পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়ে দিয়ে স্বাভাবিক মৃত্যু দান করা- এটা ঈসা (আঃ)-এর জন্য এক ধরনের হিজরত বৈ কি! পার্থক্য এই যে, অন্যান্য নবীগণ দুনিয়াতেই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে হিজরত করেছেন। পক্ষান্তরে ঈসা (আঃ) দুনিয়া থেকে আসমানে হিজরত করেছেন। অতঃপর আসমান থেকে দুনিয়াতে ফিরে আসবেন। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত এবং তিনিই সকল ক্ষমতার অধিকারী।

অতঃপর ঈসার অনুসারীদের ক্বিয়ামত অবধি বিজয়ী করে রাখার অর্থ ঈমানী বিজয় এবং সেটি ঈসা (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অনুসারীদের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়েছে। ঈমানী বিজয়ের সাথে সাথে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিজয় যেমন খেলাফত যুগে হয়েছে,

ভবিষ্যতে আবারও সেটা হবে। এমনকি কোন বস্তিঘরেও ইসলামের বিজয় নিশান উড়তে বাকী থাকবে না। সবশেষে ক্বিয়ামত প্রাক্কালে ঈসা ও মাহদীর নেতৃত্বে বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক বিজয় সংঘটিত হবে এবং সারা পৃথিবী শান্তির রাজ্যে পরিণত হবে।[১০৩]

‘হাওয়ারী’ কারা?

حَوارِىّ শব্দটি حَوَرٌ ধাতু থেকে ব্যুৎপন্ন। অর্থ দেওয়ালে চুনকাম করার জন্য ধবধবে সাদা চুন। পারিভাষিক অর্থে ঈসা (আঃ)-এর খাঁটি অনুসারী শীর্ষস্থানীয় ভক্ত ও সাহায্যকারী ব্যক্তিগণকে ‘হাওয়ারী’ বলা হ’ত। কেউ বলেছেন যে, নাবাত্বী ভাষায় হাওয়ারী অর্থ ধোপা (القصار)। ঈসার খাঁটি অনুসারীগণ ধোপা ছিলেন, যারা কাপড় ধৌত করতেন। পরে তারা ঐ নামেই পরিচিত হন। অথবা এজন্য তাদের উপাধি ‘হাওয়ারী’ ছিল যে, তারা সর্বদা সাদা পোষাক পরিধান করতেন। কোন কোন তাফসীরবিদ তাঁদের সংখ্যা ১২ জন বলেছেন। ঈসা (আঃ)-এর ভক্ত সহচরগণকে যেমন ‘হাওয়ারী’ বলা হয়; শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ভক্ত সহচরগণকে তেমনি ‘ছাহাবী’ বলা হয়। আভিধানিক অর্থে ছাহাবী অর্থ সাথী বা সহচর হ’লেও পারিভাষিক অর্থে রাসূল (ছাঃ) ব্যতীত অন্যদের সাথীগণকে ‘ছাহাবী’ বলা হয় না। কেননা এই পরিভাষাটি কেবল ঐসকল পবিত্রাত্মা ব্যক্তিগণের জন্যেই সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য ‘হাওয়ারী’ শব্দটি কোন কোন সময় শুধু ‘সাহায্যকারী’ বা আন্তরিক বন্ধু অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা বলেন, ‘প্রত্যেক নবীর একজন ‘হাওয়ারী’ অর্থাৎ খাঁটি সহচর থাকে। তেমনি আমার ‘হাওয়ারী’ হ’ল যুবায়ের’।[১০৪]

ঈসা (আঃ) যখন বনু ইস্রাঈলের স্বার্থবাদী নেতাদের বিরোধিতা ও চক্রান্ত বুঝতে পারলেন, তখন নিজের একনিষ্ঠ সাথীদের বাছাই করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন এবং সবাইকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে আমার সত্যিকারের ভক্ত ও অনুসারী কারা? একথাটিই কুরআনে বর্ণিত হয়েছে নিম্নোক্তভাবে-

---

১০৩. *আহমাদ, সনদ ছহীহ মিশকাত হা/৪২; তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৪৭৫, সনদ ছহীহ; আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫৪৫৩-৫৪; মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫০৭।*

১০৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬১০১ ‘মানক্বিব’ অধ্যায় ৯ অনুচ্ছেদ।*

Contents

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللهِ آمَنَّا بِاللهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ- رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ- (آل عمران ٥٢-٥٣)-

‘যখন ঈসা বনু ইস্রাঈলের কুফরী অনুধাবণ করলেন, তখন বললেন, কারা আছ আল্লাহ্র পথে আমাকে সাহায্যকারী? তখন হাওয়ারীগণ বলল, আমরাই আল্লাহ্র পথে আপনার সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহ্র উপরে ঈমান এনেছি। আপনি সাক্ষ্য থাকুন যে আমরা সবাই আত্মসমর্পণকারী’। ‘হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা সেই সব বিষয়ের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করেছি, যা তুমি নাযিল করেছ এবং আমরা রাসূলের অনুসারী হয়েছি। অতএব তুমি আমাদেরকে মান্যকারীদের তালিকাভুক্ত করে নাও’ *(আলে ইমরান ৩/৫২-৫৩)*

অন্যত্র এসেছে এভাবে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوْا أَنصَارَ اللهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللهِ فَآمَنَت طَّائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَت طَّائِفَةٌ، فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ- (الصف ١٤)-

‘হে বিশ্বাসী গণ! তোমরা আল্লাহ্র সাহায্যকারী হয়ে যাও। যেমন মারিয়াম-তনয় ঈসা হাওয়ারীদের বলেছিল, কে আছ আল্লাহ্র জন্য আমাকে সাহায্যকারী? হাওয়ারীরা বলেছিল, আমরাই আল্লাহ্র সাহায্যকারী। অতঃপর বনু ইস্রাঈলের একটি দল বিশ্বাস স্থাপন করল এবং অন্যদল প্রত্যাখ্যান করল। অতঃপর আমরা বিশ্বাসীদের সাহায্য করলাম তাদের শত্রুদের উপরে। ফলে তারা বিজয়ী হ’ল’ *(ছফ ৬১/১৪)*।

অবশ্য হাওয়ারীদের এই আনুগত্য প্রকাশের ক্ষমতা আল্লাহ দান করেছিলেন তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে। যেমন তিনি বলেন,

وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّيْنَ أَنْ آمِنُوْا بِيْ وَبِرَسُوْلِيْ قَالُوْا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ- (المائدة ١١١)-

‘আর যখন আমি হাওয়ারীদের মনে জাগ্রত করলাম যে, আমার প্রতি ও আমার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তখন তারা বলল, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা সবাই আত্মসমর্পণকারী’ *(মায়েদাহ ৫/১১১)*। এখানে হাওয়ারীদের নিকট ‘অহি’ করা অর্থ তাদের হৃদয়ে বিষয়টি সঞ্চার করা বা জাগ্রত করা। এটা নবুঅতের ‘অহি’ নয়।

বস্তুতঃ শত্রুদের উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে ঈসা (আঃ) তাঁর অনুসারীগণের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানাতে বাধ্য হয়েছিলেন। সাথে সাথে বার জন ভক্ত অনুসারী তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন এবং আনুগত্যের শপথ নিয়েছিলেন। অতঃপর তারাই ঈসা (আঃ)-এর ঊর্ধ্বারোহণের পরে ঈসায়ী ধর্ম প্রচারে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। যদিও পরবর্তী কালে তাদের মধ্যে বহু ভেজাল ঢুকে পড়ে এবং তারা বহু দলে বিভক্ত হয়ে যায়। আজও বিশ্ব খৃষ্টান সমাজ রোমান ক্যাথলিক ও প্রটেষ্ট্যান্ট নামে প্রধান দু’দলে বিভক্ত। যাদের রয়েছে অসংখ্য উপদল। আর এরা সব দলই ভ্রান্ত।

ইমাম বাগাভী (রহঃ) সূরা ছফ ১৪ আয়াতের তাফসীরে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, ঈসা (আঃ)-এর ঊর্ধ্বারোহণের পর খৃষ্টান জাতি তিন দলে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল তাকে ‘আল্লাহ’ বলে। একদল তাঁকে ‘আল্লাহ্র পুত্র’ বলে এবং একদল তাকে ‘আল্লাহ্র দাস ও রাসূল’ বলে। প্রত্যেক দলের অনুসারী দল ছিল। তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহ বাড়তে থাকে। অতঃপর শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমন ঘটে এবং তিনি মুমিনদের দলকে সমর্থন দেন। ফলে তারাই দলীলের ভিত্তিতে জয়লাভ করে। বলা বাহুল্য মুমিন ঈসায়ীগণ সবাই ইসলাম কবুল করে ধন্য হন। ‘বিশ্বাসীদেরকে আল্লাহ সাহায্য করলেন ও তারা বিজয়ী হ’ল’ বলতে উম্মতে মুহাম্মাদীকে বুঝানো হয়েছে। যারা ঈসা ও মুহাম্মাদ উভয় নবীর উপরে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন এবং অবিশ্বাসী কাফের মুশরিকদের উপর দুনিয়া ও আখেরাতে বিজয়ী হয়েছেন।

আসমান থেকে খাঞ্চা ভর্তি খাদ্য অবতরণ :

মূসা (আঃ)-এর উম্মতগণের জন্য আল্লাহ আসমান থেকে মান্না ও সালওয়ার জান্নাতী খাবার নামিয়ে দিয়েছিলেন। সম্ভবতঃ তাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে একদা হাওয়ারীগণ ঈসা (আঃ)-এর নিকটে অনুরূপ দাবী করে বসলো। বিষয়টির কুরআনী বর্ণনা নিম্নরূপ-

إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِـــدَةً مِّنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوْا اللهَ إِنْ كُنْتُم مُّؤْمِنِيْنَ- قَالُوْا نُرِيْدُ أَن نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُوْنَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِيْنَ- قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْداً لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَـــا وَآيَـــةً مِّنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ- قَالَ اللهُ إِنِّيْ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّيْ أُعَذِّبُهُ عَذَاباً لاَّ أُعَذِّبُهُ أَحَداً مِّنَ الْعَالَمِيْنَ- (المائدة ١١٢-١١٥)-

‘যখন হাওয়ারীরা বলল, হে মারিয়াম-পুত্র ঈসা! আপনার পালনকর্তা কি এরূপ করতে পারেন যে, আমাদের জন্য আকাশ থেকে খাদ্য ভর্তি খাঞ্চা অবতরণ করে দেবেন? তিনি বললেন, যদি তোমরা ঈমানদার হও, তবে আল্লাহকে ভয় কর’ *(মায়েদাহ ১১২)*। ‘তারা বলল, আমরা তা থেকে খেতে চাই, আমাদের অন্তর পরিতৃপ্ত হবে এবং আমরা জেনে নেব যে, আপনি সত্য বলেছেন ও আমরা সাক্ষ্যদাতা হয়ে যাব’ *(১১৩)*। ‘তখন মরিয়াম-তনয় ঈসা বলল, হে আল্লাহ! হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের প্রতি আসমান থেকে খাদ্যভর্তি খাঞ্চা অবতীর্ণ করুন। তা আমাদের জন্য তথা আমাদের প্রথম ও পরবর্তী সবার জন্য আনন্দোৎসব হবে এবং আপনার পক্ষ হ’তে একটি নিদর্শন হবে। আপনি আমাদের রূযী দান করুন। আপনিই শ্রেষ্ঠ রূযীদাতা’ *(১১৪)*। ‘আল্লাহ বললেন, নিশ্চয়ই আমি সে খাঞ্চা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করব। অতঃপর যে ব্যক্তি অকৃতজ্ঞ হবে, আমি তাকে এমন শাস্তি দেব, যে শাস্তি বিশ্বজগতে অপর কাউকে দেব না’ *(মায়েদাহ ৫/১১২-১১৫)*।

উল্লেখ্য যে, উক্ত খাদ্য সঞ্চিত রাখা নিষিদ্ধ ছিল। তিরমিযীর একটি হাদীছে আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ) হ’তে বর্ণিত হয়েছে যে, উক্ত খাদ্যভর্তি খাঞ্চা আসমান হ’তে নাযিল হয়েছিল এবং হাওয়ারীগণ তৃপ্তিভরে খেয়েছিল। কিন্তু লোকদের মধ্যে কিছু লোক তা সঞ্চিত রেখেছিল। ফলে তারা বানর ও শূকরে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল।[১০৫]

১০৫. আলবানী, যঈফ তিরমিযী হা/৩০৬১, ‘তাফসীর’ অধ্যায়; মিশকাত হা/৫১৫০ ‘শিষ্টাচার’ অধ্যায় ‘ন্যায় কাজের আদেশ’ অনুচ্ছেদ-২২।

ঈসা (আঃ)-এর অনুসারীদের কুফরী এবং ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র সঙ্গে ঈসা (আঃ)-এর কথোপকথন :

ঈসা (আঃ)-এর ঊর্ধ্বারোহনের ফলে ঈসায়ীদের মধ্যে যে আক্বীদাগত বিভ্রান্তি দেখা দেয় এবং তারা যে কুফরীতে লিপ্ত হয়, সে বিষয়ে আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন ঈসাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ قَالَ اللهُ يَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِيْ وَأُمِّيَ إِلَـــهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُوْنُ لِيْ أَنْ أَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُـــهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِيْ وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْـــسِكَ إِنَّـــكَ أَنْـــتَ عَـــلاَّمُ الْغُيُوْبِ- مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَمَرْتَنِيْ بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُـــمْ وَكُنْـــتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْداً مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَـــيْهِمْ وَأَنْـــتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ- إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّـــكَ أَنْـــتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ- (المائدة ١١٦-١١٨)-

‘যখন আল্লাহ বলবেন, হে মরিয়াম-তনয় ঈসা! তুমি কি লোকদের বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে আমাকে ও আমার মাতাকে উপাস্য সাব্যস্ত কর? ঈসা বলবেন, আপনি মহাপবিত্র। আমার জন্য শোভা পায় না যে, আমি এমন কথা বলি, যা বলার কোন অধিকার আমার নেই। যদি আমি বলে থাকি, তবে আপনি অবশ্যই তা জানেন। বস্তুতঃ আপনি আমার মনের কথা জানেন, কিন্তু আমি জানি না কি আপনার মনের মধ্যে আছে। নিশ্চয়ই আপনি অদৃশ্য বিষয়ে অবগত’ *(মায়েদাহ ১১৬)*। ‘আমি তো তাদের কিছুই বলিনি, কেবল সেকথাই বলেছি যা আপনি বলতে বলেছেন যে, তোমরা আল্লাহ্র দাসত্ব কর, যিনি আমার ও তোমাদের পালনকর্তা। বস্তুতঃ আমি তাদের সম্পর্কে অবগত ছিলাম, যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম। অতঃপর যখন আপনি আমাকে লোকান্তরিত করলেন, তখন থেকে আপনিই তাদের সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। আপনি সকল বিষয়ে পূর্ণ অবগত’ *(১১৭)*। ‘এক্ষণে যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা আপনার দাস। আর যদি আপনি তাদের ক্ষমা করেন, তবে আপনিই পরাক্রান্ত ও মহাবিজ্ঞ’ *(মায়েদাহ ৫/১১৬-১১৮)*।

উপরোক্ত **১১৭**নং আয়াতে বর্ণিত فَلَمَّا تَـــوَفَّيْتَنِيْ বাক্যটিতে ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুর দলীল তালাশ করার এবং তাঁর ঊর্ধ্বারোহনের বিষয়টিকে অস্বীকার করার প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করার কোন সুযোগ নেই। কেননা এ কথোপকথনটি ক্বিয়ামতের দিন হবে। যার আগে আসমান থেকে অবতরণের পর দুনিয়ায় তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়ে যাবে।[১০৬]

ঈসা (আঃ)-এর কাহিনী থেকে শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ :

হযরত ঈসা (আঃ)-এর নবুঅতী জীবন থেকে আমরা নিম্নোক্ত শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ জানতে পারি। যেমন-

(১) পিতা ইবরাহীম (আঃ)-এর কনিষ্ঠ পুত্র ইসহাক (আঃ)-এর বংশের হাযার হাযার নবী-রাসূলের মধ্যে সর্বশেষ নবী ও কিতাবধারী রাসূল ছিলেন হযরত ঈসা (আঃ)। তাঁর পূর্বেকার সকল নবী এবং তিনি নিজে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন, যিনি ইবরাহীম (আঃ)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশের একমাত্র নবী এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল। ঈসা (আঃ) পর্যন্ত সকল নবী ও রাসূল বনু ইস্রাঈল তথা স্ব স্ব গোত্রের প্রতি আগমন করলেও শেষনবী প্রেরিত হয়েছিলেন বিশ্ব মানবতার প্রতি বিশ্বনবী হিসাবে। অতএব ঈসা (আঃ)-এর প্রতিশ্রুত শেষনবী ‘আহমাদ’ বা মুহাম্মাদ-এর অনুসারী উম্মতে মুহাম্মাদীই হ’ল ঈসা (আঃ)-এর প্রকৃত অনুসারী ও প্রকৃত উত্তরসুরী। নামধারী খৃষ্টানরা নয়।

(২) মু‘জেযা প্রদর্শনের মাধ্যমে বিরোধী পক্ষকে ভয় দেখানো যায় বা চুপ করানো যায়। কিন্তু হেদায়াতের জন্য আল্লাহ্র রহমত আবশ্যক। যেমন ঈসা (আঃ)-কে যে মু‘জেযা দেওয়া হয়েছিল, সে ধরনের মু‘জেযা অন্য কোন নবীকে দেওয়া হয়নি। এমনকি তাঁর জন্মটাই ছিল এক জীবন্ত মু‘জেযা। কিন্তু তা সত্ত্বেও শত্রুরা হেদায়াত লাভ করেনি।

---

১০৬. মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৭৫ ‘ফিতান’ অধ্যায় ‘ক্বিয়ামত প্রাক্কালের নিদর্শন সমূহ ও দাজ্জালের বর্ণনা’ অনুচ্ছেদ-৩; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫০৫-০৭, ‘ফিতান’ অধ্যায় ‘ঈসার অবতরণ’ অনুচ্ছেদ-৫।

(৩) সবকিছু মানবীয় জ্ঞান দ্বারা পরিমাপ করা যায় না। বরং সর্বদা এলাহী সিদ্ধান্তের প্রতি বিশ্বাসী ও আকাংখী থাকতে হয়। যেমন মারিয়াম ও তৎপুত্র ঈসার জীবনের প্রতিটি ঘটনায় প্রমাণিত হয়েছে।

(৪) যারা নিঃস্বার্থভাবে সমাজের কাজ করেন ও পরকালীন মঙ্গলের পথ প্রদর্শন করেন, স্বার্থপর ও দুনিয়া পূজারী সমাজ নেতারা তাদের শত্রু হয় এবং পদে পদে বাধা দেয়। কিন্তু সাথে সাথে একদল নিঃস্বার্থ সহযোগীও তারা পেয়ে থাকেন। যেমন ঈসা (আঃ) পেয়েছিলেন।

(৫) দুনিয়াবী সংঘাতে দুনিয়াদারদের পার্থিব বিজয় হ'লেও চূড়ান্ত বিচারে তাদের পরাজয় হয় এবং তারা ইতিহাসে সর্বাধিক নিন্দিত ব্যক্তিতে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে নবী ও সমাজ সংস্কারকগণ নির্যাতিত হ'লেও চূড়ান্ত বিচারে তারাই বিজয়ী হন এবং সারা বিশ্ব তাদেরই ভক্ত ও অনুসারী হয়। ঈসা (আঃ)-এর জীবন তারই অন্যতম প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

(দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত)

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ –

اللَّهُمَّ اغْفِرْلِى وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الحِسَابُ–

দ্বিতীয় খণ্ড

॥ প্রশ্নমালা ॥

১৪-১৫. হযরত মূসা ও হারূণ (আঃ)

প্রশ্ন (১৪-১৫/১) : কুরআন মাজীদে কোন্ নবীর আলোচনা সর্বাধিক স্থানে এসেছে এবং কেন? (উত্তর পৃঃ ৯ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/২) : কওমে মূসা ও ফেরাঊনের আলোচনা কুরআনের কয়টি সূরায় কত জায়গায় এসেছে? (উত্তর পৃঃ ১০ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৩) : ফেরাঊনের পরিচয় কি? মূসার ফেরাঊন কয়জন ছিলেন? তাদের নাম কি? (উত্তর পৃঃ ১০ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৪) : ডুবে মরা ফেরাঊনের লাশ কবে কোথায় পাওয়া যায়? তা এখন কোথায় সংরক্ষিত আছে? (উত্তর পৃঃ ১০-১১ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৫) : ফেরাউনের আলোচনা কুরআন মাজীদে বেশী হওয়ার কারণ কি? (উত্তর পৃঃ ১১-১২ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৬) : বনু ইস্রাঈল মূলতঃ কার বংশধর? কুরআনে তাদের উক্ত নামে অভিহিত করার কারণ কি? (উত্তর পৃঃ ১২ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৭) : প্রথম ও শেষনবী ব্যতীত অধিকাংশ নবীগণের আবাসস্থল কোথায় ছিল? (উত্তর পৃঃ ১২ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৮) : বনু ইস্রাঈলদের আদি বাসস্থান কোথায়? (উত্তর পৃঃ ১২ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৯) : মূসা ও হারূণ ইউসুফ (আঃ)-এর কততম অধঃস্তন পুরুষ ছিলেন? (উত্তর পৃঃ ১৩ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/১০) : হাকসূসগণ কখন মিসর শাসন করেন? তাদের শাসনামল কতদিন স্থায়ী ছিল? (উত্তর পৃঃ ১২-১৩ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/১১) : ইয়াকূবের মিসর আগমন ও মূসার প্রস্থানের মধ্যে কত বছরের ব্যবধান ছিল? (উত্তর পৃঃ ১৩ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/১২) : মূসার পরিচয় কি? (উত্তর পৃঃ ১৩ দ্রঃ)।

Contents

Contents

প্রশ্ন (১৪-১৫/২৮) : মাদিয়ানে পৌঁছে মূসা (আঃ) কার কাছে আশ্রয় লাভ করেন? (উত্তর পৃ: ২৩ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/২৯) : মূসা (আঃ) কাকে বিবাহ করেন এবং তাঁর বিবাহের মোহরানা কি ছিল? (উত্তর পৃ: ২৩ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৩০) : সর্বাধিক দূরদর্শী তিনজন ব্যক্তি কে কে ছিলেন? (উত্তর পৃ: ২৪ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৩১) : মূসা (আঃ) কখন মিসর যাত্রা করেন? (উত্তর পৃ: ২৪ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৩২) : মূসা (আঃ)-এর পথ হারিয়ে তূর পাহাড়ে পৌছনোর তাৎপর্য কী? সেখানে গিয়ে তিনি কোথায় দাঁড়ালেন? (উত্তর পৃ: ২৫ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৩৩) : তিনি তূর পাহাড়ে গিয়ে কি দেখলেন? (উত্তর পৃ: ২৫ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৩৪) : তিনি কিভাবে নবুঅত পেলেন? (উত্তর পৃ:২৫-২৬ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৩৫) : ঐ সময় মূসাকে প্রদত্ত দু'টি মু'জেযা ছিল কি কি? (উত্তর পৃ: ২৬-২৭ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৩৬) : মিসরে প্রদর্শিত নয়টি নিদর্শন ছিল কি কি? (উত্তর পৃ: ২৭-২৮ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৩৭) : মূসা (আঃ) যে পাঁচটি দো'আ করেছিলেন, সেগুলি ছিল কি কি? (উত্তর পৃ: ৩০-৩৩ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৩৮) : মূসা (আঃ) কিভাবে কালীমুল্লাহ হ'লেন? (উত্তর পৃ: ৩৩ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৩৯) : ফেরাঊন ও তার সভাসদগণকে আল্লাহ কি নামে অভিহিত করেছেন? (উত্তর পৃ: ৩৪ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৪০) : ফেরাঊনের কাছে প্রেরণের সময় মুসাকে আল্লাহ কি বলে অভয় দেন? (উত্তর পৃ: ৩৪ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৪১) : মূসা (আঃ) ফেরাঊনকে কি বিষয়ে দাওয়াত দিয়েছিলেন? (উত্তর পৃ: ৩৪-৩৫ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৪২) : দাওয়াতের সার-সংক্ষেপ কি ছিল? (উত্তর পৃ: ৩৬ দ্র:)।

Contents

Contents

প্রশ্ন (১৪-১৫/৫৮) : বনু ইস্রাঈলের উপর ফেরাঊনী যুলুমসমূহ ছিল কি কি? (উত্তর পৃ: ৫০, ৫২ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৫৯) : মূসা (আঃ) স্বীয় কওমকে কি উপদেশ দেন? (উত্তর পৃ: ৫২ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৬০) : বনু ইস্রাঈলদের ক্বিবলা কি ছিল? (উত্তর পৃ: ৫২ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৬১) : মূসা (আঃ) ফেরাঊন ও তার কওমের জন্য কি বদ দো‘আ করেন? (উত্তর পৃ: ৫৩ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৬২) : যুলুম সত্ত্বেও বনু ইস্রাঈলকে হিজরতের নির্দেশ না দেওয়ার কারণ কি ছিল? (উত্তর পৃ: ৫৪ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৬৩) : ফেরাঊনী আচরণ থেকে কি কি শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে? (উত্তর পৃ: ৫৪-৫৫ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৬৪) : ফেরাঊনী সম্প্রদায়ের প্রতি কি কি গযব আপতিত হয়? গযবের মূল উদ্দেশ্য কি ছিল? (উত্তর পৃ: ৫৬ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৬৫) : মিসরে প্রদর্শিত নিদর্শন সমূহ ছিল কয়টি ও কি কি? (উত্তর পৃ: ৫৬ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৬৬) : মিসরে বনু ইস্রাঈলের লোকসংখ্যা কত ছিল? (উত্তর পৃ: ৬৩ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৬৭) : মূসা সাগরডুবি থেকে কোন তারিখ মুক্তি পেয়েছিলেন? এ দিনটি কি নামে এবং কেন এত প্রসিদ্ধ? (উত্তর পৃ: ৬৬ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৬৮) : ফেরাঊনের বাহিনীকে ডুবিয়ে মারার কারণ কি ছিল? (উত্তর পৃ: ৬৮ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৬৯) : ফেরাঊন ও তার বাহিনীর ধ্বংসের পর মূসা (আঃ) মিসরে গিয়ে সিংহাসন দখল করলেন না কেন? (উত্তর পৃ: ৭০ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৭০) : নাজাত লাভের পর বনু ইস্রাঈল কোথায় গিয়েছিল? (উত্তর পৃ: ৭১ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৭১) : বনু ইস্রাঈলগণ নাজাত লাভের পর মূর্তিপূজার আবদার করল কেন? (উত্তর পৃ: ৭১ দ্র:)।

Contents

প্রশ্ন (১৪-১৫/৭২) : মূসা (আঃ) কখন কিভাবে তাওরাত লাভ করেন? (উত্তর পৃঃ ৭২-৭৩ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৭৩) : সামেরী কিভাবে গো-বৎস তৈরী করেছিল? (উত্তর পৃঃ ৭৬ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৭৪) : গো-বৎস পূজার শাস্তি কি হয়েছিল? (উত্তর পৃঃ ৭৭ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৭৫) : তুর পাহাড় তুলে ধরা হয় কেন? (উত্তর পৃঃ ৭৭ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৭৬) : সামেরীর কৈফিয়ত ও তার শাস্তি কি হয়েছিল? (উত্তর পৃঃ ৭৮-৮০ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৭৭) : আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখতে চাওয়ার পরিণতি কি হয়েছিল? (উত্তর পৃঃ ৮০ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৭৮) : 'পবিত্র ভূমি' বলে পৃথিবীর কোন স্থানকে বুঝানো হয়েছে? এ এলাকাকে বরকতময় বলার কারণ কি? (উত্তর পৃঃ ৮২-৮৩ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৭৯) : দাজ্জাল কোন কোন স্থানে যেতে পারবে না? (উত্তর পৃঃ ৮৩ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৮০) : 'আরীহা' শহরটি কোথায় অবস্থিত? এই শহর তখন কাদের রাজধানী ছিল? (উত্তর পৃঃ ৮৪ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৮১) : বায়তুল মুক্বাদ্দাস অভিযানে মূসার নির্দেশ অগ্রাহ্য করে ইহুদী নেতারা কি বলেছিল ? (উত্তর পৃঃ ৮৬ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৮২) : মিসর থেকে বনু ইস্রাঈলের রাতের অন্ধকারে পলায়নের কারণ কি ছিল এবং এতে কি শিক্ষণীয় রয়েছে? (উত্তর পৃঃ ৮৭ দ্রঃ)।

প্রশ্ন(১৪-১৫/৮৩) : বাল'আম বা'ঊরা কে ছিলেন? তার পরিণতি কি হয়েছিল? (উত্তর পৃঃ ৮৭-৮৮ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৮৪) : তীহ্ প্রান্তর কোথায় অবস্থিত? সেখানে বনু ইস্রাঈলকে ৪০ বছর কেন বন্দী রাখা হয়েছিল? (উত্তর পৃঃ ৮৯ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৪-১৫/৮৫) : বনু ইস্রাঈলের প্রতি আল্লাহ কি কি নে'মত দান করেন? (উত্তর পৃঃ ৯০-৯১ দ্রঃ)।

Contents

Contents

১৬. হযরত ইউনুস (আঃ)

প্রশ্ন (১৬/১) : ইউনুস (আঃ)-এর ঘটনা কুরআনের কয়টি সূরায় কতটি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে? (উত্তর পৃঃ ১১২ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৬/২) : ইউনুস (আঃ-এর পুরা নাম কি? তাকে কুরআনে কোথায় কি কি নামে অভিহিত করা হয়েছে? (উত্তর পৃঃ ১১২ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৬/৩) : ইউনুস (আঃ) কোন এলাকার নবী ছিলেন? (উত্তর পৃঃ ১১২ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৬/৪) : ইউনুস (আঃ) কেন মাছের পেটে গেলেন? (উত্তর পৃঃ ১১৩-১১৪ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৬/৫) : তিনি কত সময় মাছের পেটে ছিলেন? (উত্তর পৃঃ ১১৪ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৬/৬) : তিনি কিভাবে মাছের পেট হ'তে মুক্তি পান? (উত্তর পৃঃ ১১৫ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৬/৭) : দো'আয়ে ইউনুস কি? তা কুরআনের কোন সূরায় কত নং আয়াতে রয়েছে? এর ফযীলত কি? (উত্তর পৃঃ ১১৬-১৭ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৬/৮) : মাছের পেট থেকে বের হয়ে প্রথম তিনি কি খান? (উত্তর পৃঃ ১১৭ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৬/৯) : তাঁর জীবনীতে কি কি শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে? (উত্তর পৃঃ ১১৮ দ্রঃ)।

১৭. হযরত দাউদ (আঃ)

প্রশ্ন (১৭/১) : দাঊদ (আঃ)-এর পরিচয় কি? তিনি কোন এলাকার নবী ছিলেন? তার বয়স কত ছিল? (উত্তর পৃঃ ১১৯ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৭/২) : দাঊদ (আঃ) সম্পর্কে কয়টি সূরায় কয়টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে? (উত্তর পৃঃ ১১৯ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৭/৩) : তিনি শেষনবী (ছাঃ)-এর কত বছর পূর্বেকার নবী ছিলেন? (উত্তর পৃঃ ১১৯ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৭/৪) : মূসার পরে কোন নবীর নেতৃত্বে ফিলিস্তীন বিজিত হয়? (উত্তর পৃঃ ১২০ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৭/৫) : আমালেক্বাদের সাথে যুদ্ধে সেনাপতি কে ছিলেন এবং তাঁর মধ্যে প্রধান দু'টি যোগ্যতা কি ছিল? (উত্তর পৃঃ ১২১ দ্রঃ)।

Contents

প্রশ্ন (১৭/৬) : বনু ইস্রাঈল তালূতকে নেতা হিসাবে কিভাবে মানতে বাধ্য হ'ল? (উত্তর পৃঃ ১২১-১২২ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৭/৭) : তালূত পথিমধ্যে তার সৈন্যদের কি পরীক্ষা নেন এবং তাতে কতজন উত্তীর্ণ হয়েছিল? (উত্তর পৃঃ ১২২-১২৩ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৭/৮) : যুদ্ধে দাঊদ কিভাবে জালূতকে পরাস্ত করেন? (উত্তর পৃঃ ১২৪ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৭/৯) : তালূতের জীবনী থেকে শিক্ষণীয় বিষয় কি? (উত্তর পৃঃ ১২৪-১২৫ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৭/১০) : দাঊদ (আঃ)-এর কতটি পুত্র সন্তান ছিল? তন্মধ্যে কে নবী হয়েছিলেন? (উত্তর পৃঃ ১২৫ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৭/১১) : দাঊদ (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্য কি কি ছিল? (উত্তর পৃঃ ১২৬-১৩০ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৭/১২) : তাঁর জীবনের স্মরণীয় ঘটনাবলী ছিল কি কি? (উত্তর পৃঃ ১৩০ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৭/১৩) : দাঊদের কওমের লোকেরা বানর ও শূকরের পরিণতি বরণ করেছিল কেন? (উত্তর পৃঃ ১৩৩ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৭/১৪) : তাদের মধ্যে কয়টি দল হয়েছিল? (উত্তর পৃঃ ১৩৪ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৭/১৫) : সর্বযুগে হকপন্থীদের করণীয় কি? (উত্তর পৃঃ ১৩৫ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৭/১৬) : আল্লাহ্র গযবে আকৃতি পরিবর্তিতদের বংশধারা থাকে কি? (উত্তর পৃঃ ১৩৫ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৭/১৭) : দাঊদ (আঃ)-এর জীবনীতে শিক্ষণীয় বিষয় কি কি? (উত্তর পৃঃ ১৩৭ দ্রঃ)।

১৮. হযরত সুলায়মান (আঃ)

প্রশ্ন (১৮/১) : সুলায়মান (আঃ) কত বছর বয়স পেয়েছিলেন এবং কোন এলাকার নবী ছিলেন? তিনি কত বছর রাজকার্য পরিচালনা করেন? (উত্তর পৃঃ ১৩৮ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৮/২) : সুলায়মান (আঃ) সম্পর্কে কয়টি সূরায় কয়টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে? (উত্তর পৃঃ ১৩৮ দ্রঃ)।

Contents

প্রশ্ন (১৮/৩) : বাল্যকালে সুলায়মান (আঃ)-এর প্রজ্ঞা কিরূপ ছিল? এ বিষয়ে বর্ণিত ঘটনা দু'টি কি? (উত্তর পৃঃ ১৩৮-৩৯ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৮/৪) : সুলায়মান (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্য সমূহ কি কি ছিল? (উত্তর পৃঃ ১৩৯ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৮/৫) : তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী কয়টি? (উত্তর পৃঃ ১৪৫ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৮/৬) : হুদহুদ পাখির পরিচয় কি? সুলায়মান (আঃ) বিশেষ করে তাকে কেন খোঁজ করলেন? (উত্তর পৃঃ ১৪৭-১৪৮ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৮/৭) : হুদহুদ পাখি বিষয়ে ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে কি প্রশ্ন করা হয় এবং তিনি জওয়াবে কি বলেন? (উত্তর পৃঃ ১৪৮ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৮/৮) : বিলক্বীস কোন রাজ্যের রাণী ছিলেন? (উত্তর পৃঃ ১৪৮ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৮/৯) : রাণী বিলক্বীসের কাহিনী কুরআনের কোন স্থানে কয়টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে? (উত্তর পৃঃ ১৫২ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৮/১০) : বিলক্বীসের সিংহাসন উঠিয়ে আনা ও স্ফটিক স্বচ্ছ প্রাসাদ নির্মাণের উদ্দেশ্য কি ছিল? (উত্তর পৃঃ ১৫২ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৮/১১) : সুলায়মানের সাথে বিলক্বীসের বিবাহ হয়েছিল কি? (উত্তর পৃঃ ১৫৩ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৮/১২) : হারূত ও মারূত ফেরেশতাদ্বয়কে কোন শহরে ও কি উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছিল? (উত্তর পৃঃ ১৫৭ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৮/১৩) : বায়তুল মুক্বাদ্দাস প্রথম কার মাধ্যমে কখন ও কোথায় নির্মিত হয়? (উত্তর পৃঃ ১৫৯ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৮/১৪) : সুলায়মান (আঃ) কর্তৃক বায়তুল মুক্বাদ্দাস কিভাবে পুনর্নির্মিত হয়? (উত্তর পৃঃ ১৫৯-১৬০ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৮/১৫) : তিনি কখন কিভাবে মৃত্যু বরণ করেন? (উত্তর পৃঃ ১৫৯-১৬০ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৮/১৬) : তাঁর মৃত্যু কাহিনীতে কি শিক্ষা রয়েছে? (উত্তর পৃঃ ১৬০ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (১৮/১৭) : সুলায়মান (আঃ)-এর জীবনীতে কি কি শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে? (উত্তর পৃঃ ১৬৪ দ্রঃ)।

Contents

প্রশ্ন (১৮/১৮) : সুলায়মান (আঃ) কত বছর বেঁচে ছিলেন এবং কত বছর রাজত্ব করেছিলেন? (উত্তর পৃ: ১৬৪ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৮/১৯) : শেষনবী (ছাঃ)-এর আবির্ভাবের কত বছর পূর্বে তিনি মৃত্যুবরণ করেন? (উত্তর পৃ: ১৬৪ দ্র:)।

১৯. হযরত ইলিয়াস (আঃ)

প্রশ্ন (১৯/১) : ইলিয়াস (আঃ) কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? তিনি কোন এলাকার নবী ছিলেন? (উত্তর পৃ: ১৬৫ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৯/২) : ইলিয়াস (আঃ)-এর আগমন কালে ফিলিস্তীনের ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থা কেমন ছিল? (উত্তর পৃ: ১৬৫ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৮/৩) : সুলায়মানের উত্তরসূরীদের অপকর্মের কারণে বনু ইস্রাঈল সাম্রাজ্য কয় ভাগে বিভক্ত হয়েছিল এবং সেগুলো কি কি? (উত্তর পৃ: ১৬৫ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৯/৪) : তাঁর সময় 'ইস্রাঈল'-এর শাসনকর্তার নাম কি ছিল? (উত্তর পৃ: ১৬৫ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৯/৫) : ইলিয়াস (আঃ)-এর কওম কোন মূর্তির পূজা করত? (উত্তর পৃ: ১৬৫ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৯/৬) : ইলিয়াস (আঃ) তাঁর কওমকে কি বিষয় দাওয়াত দেন? (উত্তর পৃ: ১৬৬ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৯/৭) : তাঁর দাওয়াতের ফলশ্রুতি কি হয়েছিল? (উত্তর পৃ: ১৬৭ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৯/৮) : আল্লাহ ও বা'ল দেবতার নামে কোথায় কুরবানী হয়েছিল? তার ফলাফল কি ছিল? (উত্তর পৃ: ১৬৭-১৬৮ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৯/৯) : ইলিয়াস (আঃ) কি বর্তমানে জীবিত? (উত্তর পৃ: ১৬৮-১৬৯ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৯/১০) : বা'ল দেবতার পরিচয় কি? বা'লা বাক্কা বর্তমানে কোথায় অবস্থিত? (উত্তর পৃ: ১৬৯ দ্র:)।

প্রশ্ন (১৯/১১) : ইলিয়াস (আঃ)-এর কাহিনীতে কি শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে? (উত্তর পৃ: ১৭০ দ্র:)।

২০. হযরত আল-ইয়াসা‘ (আঃ)

প্রশ্ন (২০/১) : আল-ইয়াসা‘ (আঃ)-এর আলোচনা কুরআনের কয়টি সূরায় কয়টি আয়াতে এসেছে? (উত্তর পৃঃ ১৭১ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (২০/২) : আল-ইয়াসা‘ (আঃ)-এর পরিচয় কি? তিনি কোন এলাকার নবী ছিলেন? (উত্তর পৃঃ ১৭১ দ্রঃ)।

২১. হযরত যুল-কিফ্ল (আঃ)

প্রশ্ন (২১/১) : যুল-কিফ্ল (আঃ)-এর আলোচনা কুরআনের কয়টি সূরায় কতটি আয়াতে এসেছে? (উত্তর পৃঃ ১৭২ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (২১/২) : তিনি কোন এলাকায় প্রেরিত হয়েছিলেন? (উত্তর পৃঃ ১৭২ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (২১/৩) : যুল-কিফ্ল (আঃ) জীবনে কি পরীক্ষার সম্মুখীন হন? (উত্তর পৃঃ ১৭৩-১৭৪ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (২১/৪) : যুল-কিফলের জীবনী থেকে শিক্ষণীয় বিষয় কি কি? (উত্তর পৃঃ ১৭৪-১৭৫ দ্রঃ)।

২২-২৩. হযরত যাকারিয়া ও ইয়াহ্ইয়া (আঃ)

প্রশ্ন (২২-২৩/১) : যাকারিয়া ও ইয়াহইয়া কোন এলাকার অধিবাসী ছিলেন? (উত্তর পৃঃ ১৭৮ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (২২-২৩/২) : ইয়াহইয়া ও ঈসা (আঃ)-এর মধ্যে সম্পর্ক কি? (উত্তর পৃঃ ১৭৮ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (২২-২৩/৩) : যাকারিয়া ও ইয়াহইয়া (আঃ) সম্পর্কে কুরআনের কয়টি সূরার কয়টি আয়াতে এসেছে? (উত্তর পৃঃ ১৭৮ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (২২-২৩/৪) : মারিয়ামের তত্ত্বাবধায়ক কে ছিলেন এবং তিনি কিভাবে মনোনীত হন? (উত্তর পৃঃ ১৭৮-১৭৯ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (২২-২৩/৫) : যাকারিয়া (আঃ) কখন সন্তান লাভে উদ্বুদ্ধ হন? (উত্তর পৃঃ ১৭৯ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (২২-২৩/৬) : যাকারিয়া (আঃ)-এর দো‘আ কবুলের নিদর্শন কি ছিল? (উত্তর পৃঃ ১৮০-৮১ দ্রঃ)।

প্রশ্ন (২২-২৩/৭) : ইয়াহইয়া (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্য ছিল কয়টি ও কি কি? (উত্তর পৃঃ ১৮১-৮২ দ্রঃ)।

Contents

২৪. হযরত ঈসা (আঃ)

প্রশ্ন (২৪/১৫) : ঈসা (আঃ)-এর দাওয়াত কি ছিল? (উত্তর পৃ: ১৯৭-১৯৮ দ্র:)।

প্রশ্ন (২৪/১৬) : প্রধানতঃ কি কি কারণে কোন কোন বস্তু ইহুদীদের উপরে হারাম করা হয়, যা পূর্বে হালাল ছিল? (উত্তর পৃ: ১৯৮ দ্র:)।

প্রশ্ন (২৪/১৭) : ঈসা (আঃ)-এর পেশকৃত পাঁচটি নিদর্শন কি কি ছিল? (উত্তর পৃ: ১৯৯ দ্র:)।

প্রশ্ন (২৪/১৮) : ঈসা (আঃ)-এর দাওয়াতের ফলশ্রুতি কি ছিল? (উত্তর পৃ: ২০০ দ্র:)।

প্রশ্ন (২৪/১৯) : ইহুদীদের অভিশপ্ত হওয়ার কারণসমূহ ছিল কয়টি ও কি কি? (উত্তর পৃ: ২০১ দ্র:)।

প্রশ্ন (২৪/২০) : ঈসা (আঃ)-কে শত্রুরা হত্যা করতে পেরেছিল কি? (উত্তর পৃ: ২০২ দ্র:)।

প্রশ্ন (২৪/২১) : ঈসা (আঃ)-কে প্রদত্ত আল্লাহর পাঁচটি অঙ্গীকার কি কি? (উত্তর পৃ: ২০২ দ্র:)।

প্রশ্ন (২৪/২২) : 'আমি তোমাকে ওফাত দিব'-এর অর্থ কি? (উত্তর পৃ: ২০৩ দ্র:)।

প্রশ্ন (২৪/২৩) : ঈসা (আঃ)-এর অনুসারীদের ক্বিয়ামত অবধি বিজয়ী করে রাখার অর্থ কি এবং তারা কারা? (উত্তর পৃ: ২০৩-২০৪ দ্র:)।

প্রশ্ন (২৪/২৪) : 'হাওয়ারী' কারা এবং তাদের সংখ্যা কত? (উত্তর পৃ: ২০৪ দ্র:)।

প্রশ্ন (২৪/২৫) : হাওয়ারীদের নিকট অহী করা বলতে কি বুঝায়? (উত্তর পৃ: ২০৬ দ্র:)।

প্রশ্ন (২৪/২৬) : উর্ধ্বারোহণের পর ঈসায়ীগণ কয় দলে বিভক্ত হয়? (উত্তর পৃ: ২০৬ দ্র:)।

প্রশ্ন (২৪/২৭) : 'বিশ্বাসীদেরকে আল্লাহ সাহায্য করলেন' বলতে কাদের বুঝানো হয়েছে? (উত্তর পৃ: ২০৬ দ্র:)।

প্রশ্ন (২৪/২৮) : ঈসা (আঃ)-এর জীবনীতে কি কি শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে? (উত্তর পৃ: ২০৯-২১০ দ্র:)।